প্রাক্‌কথন

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক শ্রেণির জন্য যে পাঠক্রম প্রবর্তিত হয়েছে, তার লক্ষ্যণীয় বৈশিষ্ট্য হল প্রতিটি শিক্ষার্থীকে তাঁর পছন্দমতো কোনো বিষয়ে সাম্মানিক (honours) স্তরে শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ করে দেওয়া। এক্ষেত্রে ব্যক্তিগতভাবে তাঁদের গ্রহণ ক্ষমতা আগে থেকেই অনুমান করে না নিয়ে নিয়ত মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে সেটা স্থির করাই যুক্তিযুক্ত। সেই অনুযায়ী একাধিক বিষয়ে সাম্মানিক মানের পাঠ-উপকরণ রচিত হয়েছে ও হচ্ছে—যার মূল কাঠামো স্থিরীকৃত হয়েছে একটি সুচিন্তিত পাঠক্রমের ভিত্তিতে। কেন্দ্র ও রাজ্যের অগ্রগণ্য বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের পাঠক্রম অনুসরণ করে তার আদর্শ উপকরণগুলির সমন্বয়ে রচিত হয়েছে এই পাঠক্রম। সেইসঙ্গে যুক্ত হয়েছে অধ্যেতব্য বিষয়ে নতুন তথ্য, মনন ও বিশ্লেষণের সমাবেশ।

দূর-সঞ্চারী শিক্ষাদানের স্বীকৃতি পদ্ধতি অনুসরণ করেই এইসব পাঠ-উপকরণ লেখার কাজ চলছে। বিভিন্ন বিষয়ের অভিজ্ঞ পণ্ডিতমণ্ডলীর সাহায্য এ-কাজে অপরিহার্য এবং যাঁদের নিরলস পরিশ্রমে লেখা, সম্পাদনা তথা বিন্যাসকর্ম সুসম্পন্ন হচ্ছে তাঁরা সকলেই ধন্যবাদের পাত্র। আসলে, এঁরা সকলেই অলক্ষ্যে থেকে দূর-সঞ্চারী শিক্ষাদানের কার্যক্রমে অংশ নিচ্ছেন; যখনই কোনো শিক্ষার্থী এই পাঠ্যবস্তুনিচয়ের সাহায্য নেবেন, তখনই তিনি কার্যত একাধিক শিক্ষকমণ্ডলীর পরোক্ষ অধ্যাপনার তাবৎ সুবিধা পেয়ে যাচ্ছেন।

এইসব পাঠ-উপকরণের চর্চা ও অনুশীলনে যতটা মনোনিবেশ করবেন কোনো শিক্ষার্থী, বিষয়ের গভীরে যাওয়া তাঁর পক্ষে ততই সহজ হবে। বিষয়বস্তু যাতে নিজের চেষ্টায় অধিগত হয়, পাঠ-উপকরণের ভাষা ও উপস্থাপনা তার উপযোগী করার দিকে সর্বস্তরে নজর রাখা হয়েছে। এর পর যেখানে যতটুকু অস্পষ্টতা দেখা দেবে, বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন পাঠকেন্দ্রে নিযুক্ত শিক্ষা-সহায়কগণের পরামর্শে তার নিরসন অবশ্যই হতে পারবে। তার ওপর প্রতি পর্যায়ের শেষে প্রদত্ত অনুশীলনী ও অতিরিক্ত জ্ঞান অর্জনের জন্য গ্রন্থ-নির্দেশ শিক্ষার্থীর গ্রহণক্ষমতা ও চিন্তাশীলতা বৃদ্ধির সহায়ক হবে।

এই অভিনব আয়োজনের বেশ কিছু প্রয়াসই এখনও পরীক্ষামূলক—অনেক ক্ষেত্রে একেবারে প্রথম পদক্ষেপ। স্বভাবতই, ত্রুটি-বিচ্যুতি কিছু কিছু থাকতে পারে, যা অবশ্যই সংশোধন ও পরিমার্জনার অপেক্ষা রাখে। সাধারণভাবে আশা করা যায়, ব্যাপকতর ব্যবহারের মধ্য দিয়ে পাঠ-উপকরণগুলি সর্বত্র সমাদৃত হবে।

অধ্যাপক (ড.) শুভ শঙ্কর সরকার
উপাচার্য

চতুর্থ পুনর্মুদ্রণ : আগস্ট, 2018

ভারত সরকারের দূরশিক্ষা পর্ষদের বিধি অনুযায়ী মুদ্রিত।

Printed in accordance with the regulations of the Distance Education
Bureau of the University Grants Commission.

পরিচিতি

বিষয় : ঐচ্ছিক বাংলা | **সাম্মানিক স্তর**

পাঠক্রম ঃ পর্যায় ঃ EBG : 8 : 30

	রচনা	সম্পাদনা
একক 109—111	❑ শ্রীমতী শর্মিষ্ঠা মজুমদার	অধ্যাপক পল্লব সেনগুপ্ত

পাঠক্রম ঃ পর্যায় ঃ EBG : 8 : 31

	রচনা	সম্পাদনা
	❑ অধ্যাপক সুধীন্দ্র দেবনাথ	অধ্যাপক পবিত্র সরকার

পাঠক্রম ঃ পর্যায় ঃ EBG : 8 : 32

	রচনা	সম্পাদনা
একক 112—114	❑ অধ্যাপক বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য	অধ্যাপক দিলীপ কুমার নন্দী

পাঠক্রম ঃ পর্যায় ঃ EBG : 8 : 33

	রচনা	সম্পাদনা
একক 115—123	❑ অধ্যাপক গণেশ বসু	অধ্যাপক পার্থ চ্যাটার্জী

পরিমার্জন ও পুনঃসম্পাদনা

ড. মননকুমার মণ্ডল, অ্যাসোসিয়েট প্রফেসর, বাংলা বিভাগ
মানববিদ্যা অনুষদ

প্রজ্ঞাপন

এই পাঠ-সংকলনের সমুদয় স্বত্ব নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা সংরক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ছাড়া এর কোনও অংশের পুনর্মুদ্রণ বা কোনওভাবে উদ্ধৃতি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

মোহন কুমার চট্টোপাধ্যায়
নিবন্ধক

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

EBG—8

(স্নাতক পাঠক্রম)

পর্যায়
30

একক 109	❑ অনুবাদচর্চার কারণ, বিকাশধারা এবং প্রকরণ প্রণালী	7–28
একক 110	❑ অনুবাদের সমস্যা এবং সমাধান	29–42
একক 111	❑ রূপান্তর—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গীতাঞ্জলি ঃ মূল ও অনুবাদ	43–63

পর্যায়
31

একক 112	❑ বাংলা বানানের বিবর্তন ধারা	64–110
একক 113	❑ বাংলা বানানের সমস্যা ও সমাধান-প্রয়াস	111–142
একক 114	❑ বাংলা বর্ণমালা ও তাদের উচ্চারণ	143–155
একক 115	❑ বাংলা বানানের সরলীকরণ ও তার সীমা	156–200

পর্যায়
32

একক 116	❑ সম্পাদনার সাধারণ সূত্র	203–216
একক 117	❑ সম্পাদনার নীতি ও তার প্রয়োগ	217–239
একক 118	❑ প্রসঙ্গ সম্পাদনা	240–255

পর্যায়
33

একক 119	❑ সাংবাদিকতার প্রথম পাঠ ও প্রতিবেদন রচনার প্রস্তুতি	259–270
একক 120	❑ সাংবাদিক সংরূপ ও প্রতিবেদনের শিরোনাম	271–304
একক 121	❑ প্রতিবেদন রচনা	305–340
একক 122	❑ মাধ্যম-বৈচিত্র্য ও প্রতিবেদনের রকমফের	341–372
একক 123	❑ অনুচ্ছেদ	373–384

একক ১০৯ ❑ অনুবাদচর্চার কারণ, বিকাশধারা এবং প্রকরণ প্রণালী

গঠন

১০৯.১ উদ্দেশ্য

১০৯.২ প্রস্তাবনা

১০৯.৩ মূলপাঠ ১—অনুবাদচর্চার কারণ

১০৯.৪ সারাংশ ১

১০৯.৫ অনুশীলনী ১

১০৯.৬ মূলপাঠ ২—অনুবাদচর্চার বিকাশধারা ও প্রকরণ প্রণালী

১০৯.৭ সারাংশ ২

১০৯.৮ অনুশীলনী ২

১০৯.৯ উত্তরমালা

১০৯.১০ গ্রন্থপঞ্জি

১০৯.১ উদ্দেশ্য

যদি আপনি এই এককটি যত্নসহকারে পাঠ করেন, তাহলে আপনি—

- অনুবাদচর্চা কেন করা হয়, সে সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন।
- অনুবাদচর্চার বিকাশধারা সম্পর্কে ধারণা পাবেন।
- অনুবাদের তিনটি প্রকরণ সম্পর্কে আপনারা আলোচনা করতে পারবেন।

১০৯.২ প্রস্তাবনা

এই এককটি মূল দুটি ভাগে বিভক্ত। এককটির প্রথম অংশে ১৮ শতাব্দীর জার্মানী মনীষী ইয়োহান গটফ্রিড হার্ডারের বিশ্বসংস্কৃতির ধারণার কথা বলা হয়েছে। এর পাশাপাশি জার্মানিরই মহাকবি ভল্‌ফগ্যাঙ গ্যেটে কেন পারস্পরিক ভাবে সাহিত্যের সৃজন-সম্ভার বিনিময়ের ক্ষেত্রে অনুবাদের আশ্রয় নিতে চেয়েছিলেন, সে সম্পর্কেও এখানে আলোচনা করা হয়েছে। দেশ-কালের দূরত্ব মোচনের জন্য, অনুবাদই সবেচেয়ে কার্যকরী পন্থা, একথা উল্লেখ করে—কেন যুগে যুগে অনুবাদচর্চার প্রয়োজন ঘটেছে, সেকথাও এখানে আলোচনা করা হয়েছে।

এককটির দ্বিতীয় অংশে প্রথমে পাশ্চাত্য দেশে অনুবাদচর্চার বিকাশধারা সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। এরপরে সংস্কৃত সাহিত্যের অনুবাদের প্রসঙ্গে উল্লেখিত। সংস্কৃতভাষায় লেখা রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত ইত্যাদি গ্রন্থ কেন বাংলা ভাষায় অনুবাদ করা হয়েছে, সে সম্পর্কেও প্রাসঙ্গিকভাবে আলোচনা করা হয়েছে। এরই পাশাপাশি, অনুবাদের বিভিন্ন প্রকার-প্রকরণ নিয়েও এখানে বিস্তৃতভাবে তথ্যবিচার ও বিশ্লেষণ পাওয়া যাবে।

আপনি যদি এই এককটি ভালো করে পড়েন, তাহলে আপনি অনুবাদচর্চার কারণ এবং বিকাশধারা ও প্রকরণ প্রণালী সম্পর্কে জানতে পারবেন এবং আলোচনা করতে পারবেন। বিষয়বস্তু সহজ করে, আলোচনা করা হয়েছে, তাই বুঝতে কোনো অসুবিধাই হবে না। ভালো করে এককটি পাঠ করে অনুশীলনী দুটির উত্তর দিতে চেষ্টা করুন, প্রয়োজনে উত্তর-সংকেত মিলিয়ে দেখুন।

১০৯.৩ মূলপাঠ ১ — অনুবাদচর্চার কারণ

বিখ্যাত জার্মান কবি-দার্শনিক গ্যেটের এক বয়োজ্যেষ্ঠ বন্ধু হার্ডারই সর্বপ্রথম ‘বিশ্বসংস্কৃতি’ নামে এক ধারণার কথা বলেন। একটি বিশেষ দেশের সংস্কৃতি যদি রাজনৈতিক, ভৌগোলিক বা অন্য কোনো কারণে অন্যদেশে ছড়াতে না পারে, বা অন্যদেশের সংস্কৃতির উল্লেখযোগ্য গুণগুলিকে আত্মগত করতে না পারে, তাহলে সেই সংস্কৃতির বিকাশ রুদ্ধ হয়ে যায়। অর্থাৎ সেই সংস্কৃতির প্রাণশক্তি অন্যদেশের সংস্কৃতির সঙ্গে যদি বিনিময় করার ক্ষমতা হারিয়ে ফেলে তাহলে তার সমৃদ্ধি এবং বিকাশ রুদ্ধ হতে বাধ্য। এই বিনিময়ক্ষেত্রে বিভিন্ন দেশের সৃষ্টিকর্ম এবং চিন্তাভাবনার পারস্পরিক দেওয়া-নেওয়া হবে। কিন্তু সঙ্গে-সঙ্গেই এটিও

মনে রাখতে হবে যে, প্রত্যেক দেশেরই আলাদাভাবে জাতীয় সংস্কৃতি বলে একটা বিশেষ চরিত্র আছে। সেই পৃথক চরিত্রেকে নিয়েই সেইসব আলাদা আলাদা সংস্কৃতির মিলগুলিকে খুঁজে নিয়ে কাছাকাছি আনতে হবে এবং তাদের ভিতরকার গ্রহণযোগ্য বিষয়গুলিকে গ্রহণ করতে হবে। অর্থাৎ এক কথায়, পারস্পরিকভাবে বিনিময় করতে হবে। কাজেই একটি বিশেষ ভাষায় লেখকের কাজ হবে তাঁর নিজের ভাষার ভাবনাচিন্তা এবং প্রকাশভঙ্গির যেসব বৈশিষ্ট্য তাঁদের সৃষ্টিকর্মে প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলিকে অন্যদেশের লেখক ও পাঠকদের সামনে মেলে ধরা। যদি কোনো ভাষা সাহিত্যিক ঐতিহ্য, সৃষ্টিকর্মে, দক্ষতায় অন্যদেশের তুলনায় কম সমৃদ্ধ হয় তাহলে সেই দেশের সাহিত্য অন্যান্য সব সমৃদ্ধ দেশের সাহিত্যের কাছ থেকে চিন্তাভাবনা বা সৃষ্টিকর্মের শৈলীজ্ঞানকে গ্রহণ করতে পারে। এইভাবে একটি বিশেষ দেশের সাহিত্যের লেখক একটি ব্যাপক প্রেক্ষাপটের সামনে দাঁড়িয়ে তাঁদের নিজেদের সৃষ্টিকর্মের ঘাটতি পূরণ করতে পারেন এবং সেই বিনিময়ের সাহায্যে পারস্পরিক আদান-প্রদানের মধ্যে দিয়ে আমরা সকলেই সমৃদ্ধ হতে পারি। ভারতবর্ষের মতো বহুভাষী দেশের মানুষদের মধ্যে পারস্পরিক ঐক্যবোধ জাগরূক করার জন্য ও ব্যাপক ও সুষ্ঠু অনুবাদকর্মের একটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকাও যে আছে, সে কথাও এখানে একান্তভাবেই স্মরণযোগ্য।

তবে একটি কোনো সাহিত্যের এলাকাভুক্ত লেখকের পক্ষে বহুদেশের সাহিত্য আয়ত্ত করা কখনোই সম্ভব নয়। কেননা বহুদেশের সাহিত্য আয়ত্ত করতে গেলে বহুভাষাবিদ্ হতে হবে। সাধারণভাবে, প্রত্যেকটি সাহিত্য পাঠকের পক্ষেও অনেকগুলি ভাষা শেখা সম্ভব নয়। সমস্ত সাংস্কৃতিক বলয়েই দু-চারজনই থাকেন যাঁরা একাধিক ভাষায় দক্ষতা অর্জন করতে পারেন। সেইজন্যই গ্যেটে পারস্পরিক ভাবনার বিনিময়ের ক্ষেত্রে সাহিত্যের অনুবাদের আশ্রয় নিতে চেয়েছিলেন। অবশ্য তিনি এটা ভালোভাবেই জানতেন যে, যে-কোনো সাহিত্যেই 'ভালো' অনুবাদ দুর্লভ। (এখানে প্রচলিত একটি ইতালীয় প্রবচন স্মরণীয় "অনুবাদ যদি সুন্দরী হয়, তাহলে তাকে অবিশ্বস্তা হতেই হবে এবং বিশ্বাসভাগিনী হলে, কুদর্শনা হবেই সে!") কিন্তু তা সত্ত্বেও, অনুবাদ আমাদের করতে হবে এবং অনুবাদের মাধ্যমে যে সমস্ত সমস্যার উদ্ভব হয়, সেগুলির সম্বন্ধেও সচেতন থাকতে হবে। কেননা, প্রত্যেক ভাষারই নিজস্ব কিছু সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য থাকে এবং তার প্রেক্ষাপটে সাহিত্যের মধ্যেও এমন কিছু বৈশিষ্ট্য ও প্রকাশভঙ্গির সক্রিয়তা থাকে, সেগুলিকে অন্যদেশের ভাষায় অনুবাদ করা খুবই সমস্যার ব্যাপার।

কিছু আগেই বলেছি যে, দেশে-কালের দূরত্ব মোচনের যে কয়েকটি উপায় আমাদের জানা আছে, তার মধ্যে অনুবাদ একদিক থেকে সবচেয়ে কার্যকরী। লেখক এবং তাঁর ভাষা যখন প্রাচীন, তখন তাঁকে সমকালীন জীবনের মধ্যে সংকলিত করার কাজও এক অর্থে অনুবাদকেরই দায়িত্ব বলে স্বীকার্য, অনুবাদই সেই ঘটক, যার প্রণোদনার মধ্যে দিয়ে আমরা বুঝতে পারি যে প্রাচীন সাহিত্য একটা বৃহদায়তন স্থাবর

সম্পত্তি নয়, যুগে-যুগে তা জঙ্গম হয়ে ভাব-বাণিজ্যের যোগ্য বলেই আমরা তাকে 'ক্লাসিক' বা ধ্রুপদী নাম দিয়েছি এবং আমাদের আজকের দিনের সম্পূর্ণ এই ভিন্ন পরিবেশেও তার সংলগ্নতা বা প্রাসঙ্গিকতা হারিয়ে যায়নি। অর্থাৎ বলা যেতে পারে, অনুবাদ সেই প্রাচীনকে সজীব ও সমকালীন সাহিত্যের অংশ করে তোলে। আর সেইজন্যই যুগে-যুগে নতুন অনুবাদের প্রয়োজন হয়। যেহেতু ভাষাই সাহিত্যের বাহন, তাই কোনো একটি অনুবাদ চিরকাল ধরে পর্যাপ্ত বলে গণ্য থাকে না, প্রত্যেকটি যুগ তার সমকালীন ভাষায় যে বিশেষ ভঙ্গির এবং ভাবনার যে বিশিষ্ট চরিত্রের জন্ম দেয়, তার মধ্যে দিয়েই পুরোনো অনুবাদের পুনরুজ্জীবন ঘটে থাকে। ইউরোপের বিভিন্ন ভাষাগুলিতে গ্রিক ও লাতিন সাহিত্যের প্রচুরায়ত অনুবাদ প্রতি যুগেই হয়ে আসছে এবং তার ফলে সংশ্লিষ্ট ভাষাগুলির উত্তরোত্তর সমৃদ্ধিই ঘটেছে।

আবার অন্যভাবে দেখলে এটাই বলতে হয় যে, অধিকাংশ পাঠকের পক্ষেই অন্যভাষার মূল রচনা পড়া সম্ভবপর হয় না বলে অনুবাদের প্রয়োজন হয়। অনেক সময় এক-একটি অনুবাদ এক-একটি দেশ বা মহাদেশের সাহিত্যের ধারা বদ্‌লে দিয়েছে, এমনকি যাঁরা মূল রচনার সঙ্গে পরিচিত, তাঁরাও অনেক সময়েই ভালো অনুবাদ পড়ে লাভবানই হন—কারণ ভালো অনুবাদ শুধুমাত্র মূল রচনার প্রতিনিধিত্বই করে না, তার যুগ ও অনুবাদকের নিজস্ব ব্যক্তিত্বের স্বাদও পাঠককে উপলব্ধি করায়। এখানে একটা তাত্ত্বিক প্রশ্নও অবশ্য ওঠে ''গুড ট্রানস্লেশ্যন ইজ অ্যাকচুয়ালী গুড ট্র্যানসক্রিয়েশ্যন'' (ভালো অনুবাদ বস্তুতপক্ষে নতুন একটি রূপসৃষ্টিই) এই তত্ত্বগত অবস্থানটিকেও মেনে নিতে হয় সুসাহিত্যপাঠের খাতিরে। এই 'নতুন রূপসৃষ্টি বা 'ট্র্যানসক্রিয়েশ্যন' কিন্তু নির্বাধন স্বাধীনতার ছাড়পত্র দেয় না; মূল সৃষ্টির ভাব সৌন্দর্যকে অনাহত রেখেই কিন্তু যে-সংস্কৃতি বলয়ের ভাষায় তার 'অনুবাদ' - তথা - 'নতুন রূপায়ণ' করা হয়েছে, তার শৈলী ও রুচি মর্জিকে সেখানে সংলগ্ন করতে হবে আন্তন চেখভের নাটক 'চেরি অর্চাড'-কে অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় 'মঞ্জুরী, আমের মঞ্জুরী'-তে যেভাবে রূপায়িত করেছেন, ট্র্যানসক্রিয়েশ্যন-এর একটি ভালো নিদর্শন হিসেবে সেটি বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

১০৯.৪ সারাংশ—১

এই আলোচনা শুরুতেই, বিশ্বসংস্কৃতির ধারণায় কথা হার্ডার-ই সর্বপ্রথম বলেন সে কথার উল্লেখ করেছি। এক দেশের সংস্কৃতি অন্য দেশে ছড়াতে ব্যর্থ হলে এবং অন্যদেশের সংস্কৃতির রস নিজের মধ্যে আহরণ না করতে পারলে, সেই সংস্কৃতির বিকাশ রুদ্ধ হয়ে যায়। অর্থাৎ, একটি সংস্কৃতির আয়ত্তে অন্যদেশের সংস্কৃতির সঙ্গে বিনিময়ে করার ক্ষমতা থাকা প্রয়োজন। এর ফলে বিভিন্ন দেশের সৃষ্টিকর্ম

এবং চিন্তাভাবনার পারস্পরিক বিনিময় হবে। তবে বিনিময় করার সময় প্রত্যেক দেশের জাতীয় সংস্কৃতি নামক পৃথক চরিত্রকে বজায় রাখা প্রয়োজন। এইভাবে পারস্পরিক বিনিময়ের মধ্যে দিয়ে একটি ভাষা যেমন সমৃদ্ধ হতে পারে, তেমনি একজন সাহিত্যিকও নিজের সৃষ্টিকর্মের ঘাটতি পূরণ করতে পারেন এবং এভাবে সকলেই আমরা সমৃদ্ধ হয়ে উঠতে পারি।

একজন সাহিত্যিকের পক্ষে যেমন বিভিন্ন ভাষা জানা সম্ভব নয়, তেমনি একজন মাত্র পাঠকের পক্ষেও অনেকগুলি ভাষা শেখা সম্ভব নয়। তাই পারস্পরিক সাহিত্যের বিনিময়ের ক্ষেত্রে গ্যেটে অনুবাদের আশ্রয় নিয়ে চেয়েছিলেন। দেশ-কালের দূরত্ব মোচনের জন্য অনুবাদ-ই সবচেয়ে কার্যকরী। প্রাচীন সাহিত্য যাকে আমরা 'ক্লাসিক' (ধ্রুপদী) নাম দিয়েছি, অনুবাদের মধ্যে দিয়ে সেই প্রাচীন সাহিত্য সমকালীন সাহিত্যের অংশ হয়ে ওঠে। আর সেই কারণেই যুগে যুগে নতুন অনুবাদের প্রয়োজন হয়।

১০৯.৫ অনুশীলনী—১

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন। উত্তর শেষে, প্রদত্ত উত্তরমালার সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন।

১. অনুবাদচর্চার প্রয়োজন কেন, তা নিজের ভাষায় বর্ণনা করুন।

২. গ্যেটে পারস্পরিক সাহিত্যের বিনিময়ের ক্ষেত্রে অনুবাদের আশ্রয় কেন নিতে চেয়েছিলেন, তা লিখুন।

৩. ভারতবর্ষের মতো বহুভাষী দেশে অনুবাদচর্চার গুরুত্ব বেশি কেন, সেটি বুঝিয়ে বলুন।

৪. **শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ**

(ক) প্রত্যেক দেশেরই আলাদা ভাবে__________ বলে একটা বিশেষ চরিত্র আছে।

(খ) __________ পারস্পরিক সাহিত্যের বিনিময়ের ক্ষেত্রে আশ্রয় নিতে চেয়েছিলেন।

১০৯.৬ মূলপাঠ ২—অনুবাদ-চর্চার বিকাশধারা ও প্রকরণ প্রণালী

উনিশ শতকের বাংলাদেশের ভাবজীবনে যে-অভিনব চিন্তাতরঙ্গের আলোড়ন দেখা গিয়েছিল তা সাধারণভাবে রেনেসাঁস বা নবচেতনা নামে চিহ্নিত। ইংরেজ-অধিকার এই দেশের গ্রামকেন্দ্রিক সামন্ততান্ত্রিক কাঠামোর অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ধ্বংস করল এবং তার ফলে পল্লীসংস্কৃতি শুকিয়ে গেল। ইংরেজের

ঔপনিবেশিক শাসনের সহায়ক হলে নতুন গড়ে ওঠা একটি ধনবান ও একটি শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী। তৎকালীন পৃথিবীর বিভিন্ন উন্নত দেশের (মূলত, ইংলন্ডেরই) সংস্কৃতি ছিল তাদের কাছে অনুকরণীয়, এর পাশাপাশি তারা বিজয়ী শাসকশ্রেণীর ব্যবহারিক সংস্কৃতিকেও অনুসরণ করতে থাকল। কাজেই দেখা গেল নবচেতনার কালে প্রাচীন সংস্কৃতির অবক্ষয়, ভাঙনের মধ্যে শূন্যস্থান পূরণের জন্য শাসকশ্রেণীর সংস্কৃতিকে দুর্বলভাবে অনুসরণ (বা অনুকরণ) করাই হল প্রধান বৈশিষ্ট্য।

এই অনুকরণের যা-যা উপজীব্য ছিল, তাদের মধ্যে আধুনিক যুগের বিশ্বসংস্কৃতির আদর্শও দেখা যায়। অন্যভাবেও এই অনুকৃত সাহিত্য-সংস্কৃতির তাৎপর্য লক্ষ করা যায়। ইংরেজ শাসনের প্রতিষ্ঠা একদিকে যেমন বাঙালির রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক ভিতকে নাড়িয়ে দিল, তেমনি আবার সেই ধ্বংসের মধ্যে দিয়েই ইংরেজদের বিরুদ্ধে নতুন বিরোধের বীজও লক্ষ করা গেল। যে নতুন শিক্ষিত মধ্যবিত্ত শ্রেণী গড়ে উঠল, তারাই আবার পাশ্চাত্য শিক্ষাদীক্ষায় শিক্ষিত হয়ে সাম্রাজ্যবাদের বিরুদ্ধে নতুন শিক্ষা ও সংস্কৃতিকে অস্ত্র হিসাবে প্রয়োগ করতে উদ্যত হয়েছিল। একারণে বিজয়ী সংস্কৃতির আদর্শ গ্রহণ করতে তারা বাধ্য হয়েছিল। এইসময় সেকালের উন্নত ও প্রগতিশীল মনীষীরা, যেমন রামমোহন, ডিরোজিও, বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, অক্ষয়কুমার প্রমুখ ইংরেজি শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিস্তার চেয়েছিলেন। আবার, সঙ্গে সঙ্গে স্বদেশীয় কৃষ্টি-কলা-সাহিত্য-সংস্কৃতিরও সুপ্রতিষ্ঠ অবস্থানও তাঁদের বিশেষভাবে অভীপ্সিত ছিল। উনিশ শতকে প্রথম অর্ধে শিক্ষা ও সংস্কৃতি আন্দোলনে ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের অনুসরণ দেখা দিয়েছিল আর পরবর্তী অর্ধশতাব্দীতে পাশ্চাত্যের সাহিত্য-সংস্কৃতির অনুপ্রেরণায় তৈরি হওয়া নতুন বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতির সাহায্যে বিদেশি শক্তি ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা হয়েছিল। এই নতুন সংস্কৃতির জন্য পাশ্চাত্য সাহিত্যর ভাবরূপের অনুপ্রেরণায় নতুন একটি সাহিত্যধারা গড়ে উঠল। আর তারই অনুষঙ্গে অনুবাদেরও ব্যাপক প্রয়োজন দেখা দিল। আধুনিক যুগেও বাঙালি বুদ্ধিজীবী ও সাহিত্যিকরা গভীরভাবে পাশ্চাত্যের সাহিত্যকে যেভাবে অধ্যয়ন করে চলেছেন তা তাঁদের মৌলিক রচনায় যেমন উদ্‌ভাসিত হয়েছে, তেমনি পাশ্চাত্য সাহিত্যের অনুবাদচর্চাতেও তা প্রকাশ পেয়েছে।

ইংরেজ সিভিলিয়ানদের বাংলা শেখানোর জন্য ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রতিষ্ঠা হয়। তারপর মূলত ডেভিড হেয়ারের উদ্যোগে সর্বসাধারণের জন্য হিন্দু কলেজ প্রতিষ্ঠা হল ১৮১৭ সালে। এই সময়ে পাঠ্যগ্রন্থ প্রণয়নে অনুবাদই প্রধান অবলম্বন ছিল। সংস্কৃতি, ফারসি ও ইংরেজি এই তিন ভাষা থেকেই অনুবাদ ও গ্রন্থরচনা শুরু হয় এই সময় থেকে।

১৮০০ সালে উইলিয়াম কেরী রচিত 'মঙ্গল সমাচার মাতিউর রচিত'—'গস্‌পেল অব সেন্ট ম্যাথু'—ইংরেজি থেকে বাংলায় প্রথম অনুবাদ গ্রন্থ। এরপরে ১৮০৩-তে 'ওরিয়েন্টাল ফেবুলিস্ট' নামে ঈশপের

গল্প কয়েকটি ভারতীয় ভাষায় রচিত হয়। বাংলা অনুবাদটি করেছিলেন তারিণীচরণ মিত্র। ফোর্ট উইলিয়মের অন্যতম সেনানী সি. মংকটন ১৮০৯ সালে শেক্সপিয়রের ‘দ টেম্পেস্ট’ নাটকের অনুবাদ করেছিলেন। ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের ছাত্র জে. সার্জেন্ট প্রথম বাংলায় পাশ্চাত্য ক্লাসিক কাব্য অনুবাদ করেছিলেন। ভার্জিলের ‘ঈনিড’ কাব্যের প্রথম সর্গ তিনি ১৮০৫ খ্রিস্টাব্দে অনুবাদ করেন। এরপরে গিরিশচন্দ্র বসু ‘‘ইলিয়াড’’-এর প্রথম সর্গ এবং মিলটনের ‘প্যারাডাইস্ লস্ট’-এর অনুবাদ করেন। ১৮৫৪ খ্রিস্টাব্দে রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায় হোমারের কাব্য ‘ভেক মূষিকের যুদ্ধ’ নামে অনুবাদ করেন। এই সময় হরিমোহন গুপ্ত পার্নেলের ‘দ্য হার্মিট’ কাব্যের অনুবাদ করেন। অনুবাদটির নাম ‘সন্ন্যাসীর উপাখ্যান।’ ১৮৬২ খ্রিস্টাব্দে যদুনাথ চট্টোপাধ্যায় গোল্ডস্মিথ-এর ‘ডেজার্টেড ভিলেজ’-এর অনুবাদ করেন ‘পরিত্যক্ত গ্রাম’ নামে। টেনিসনের ‘ইন মেমোরিয়াম’ কবিতার অনুবাদ করেন রাজকৃষ্ণ মুখোপাধ্যায় ‘মিত্রবিলাপ ও অন্যান্য কবিতাবলী এই নামে ১৮৬৯ খ্রিস্টাব্দে। ১৮৭৫-তেওয়াল্টার স্কটের ‘দ্য ল্যে অবদ্য লাস্ট মিনস্টেল’-এর অনুবাদ করেন রাখালদাস সেনগুপ্ত’ ‘শেষ বন্দীর গান নাম’ দিয়ে।

এরই পাশাপাশি আধুনিক কালের বাংলা সাহিত্যের প্রথম যুগ থেকেই গদ্য, উপন্যাস, ছোটগল্প এবং নাটক রচনাতেও অনুবাদের প্রয়োগ লক্ষ করা যায়। বাংলা ভাষার প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাস, ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের ‘ঐতিহাসিক উপন্যাস’ অনুবাদমূলক। ১৮৭৬ সালে জোনাথন সুইফ্‌টের-এর ‘গালিভার’স ট্রাভেল্‌স’-এর ‘অপূর্ব দেশভ্রমণ’ নাম দিয়ে উপেন্দ্রনাথ মিত্র অনুবাদ করেন। ১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে ‘অদ্ভুত দিগ্বিজয় (প্রথম খণ্ড)’ নাম দিয়ে বিখ্যাত স্পেনীয় লেখক সার্ভেন্তিসের ‘দোন কীহোতে’ (ডন কুইক্‌জোট) এবং ‘মন্মথ মনোরমা’ (প্রথম খণ্ড) নাম দিয়ে হেনরি ফিলডিঙের ‘আমেলিয়া’—এই গ্রন্থদুটির অনুবাদ করেন বিপিনবিহারী চক্রবর্তী। সেকালের ইংল্যান্ডের জনপ্রিয় রেনল্‌ডসের ‘মিস্ট্রিজ অব দ্য কোর্ট অব লন্ডন’-এর কিছু অনুবাদ প্রকাশিত হয় সেই সময়ে কথাসাহিত্যের অনুবাদে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলেন কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য। তিনি ফরাসি ভাষা থেকে বার্নাদ্যাঁ দ্য সাঁ পিয়ের-এর ‘পোল এৎ ভির্জিনি’র ‘পৌলবর্জিনী’ নামে অনুবাদ করেছিলেন। এই অনুবাদের কথা রবীন্দ্রনাথও উল্লেখ করেছেন। তাঁর বাংলা ভাষার প্রথম সার্থক ছোটগল্প প্রমথ চৌধুরীর ‘ফুলজানি’ ফরাসি লেখক প্রস্পার মেরিমির গল্প থেকে অনুবাদ করা হয়েছে।

বিলিতি নাটকের প্রথম পূর্ণাঙ্গ ভাবানুবাদ করেন হরচন্দ্র ঘোষ ১৮৫৩ খ্রিস্টাব্দে। শেক্সপিয়রের ‘মার্চেন্ট অব ভেনিস’-এর ভাবানুবাদ করেন তিনি ‘ভানুমতী চিত্তবিলাস’ নাম দিয়ে। ১৮৫৪-তে তিনি আবার শেক্সপিয়রের অনুবাদে প্রবৃত্ত হন। ‘রোমিও অ্যান্ড জুলিয়েট’ তার হাতে পরিণত হয় ‘চারুমুখ চিত্তহরা’-তে।

মাইকেল মধুসূদন দত্তের ‘মেঘনাদবধ কাব্য’-এ পাশ্চাত্য প্রভাব লক্ষ করা যায়। তিনি হোমারের ‘ইলিয়াদ’ মহাকাব্যের আংশিক অনুবাদ করেন ‘হেক্টর বধ’ (১৮৭১) নামে। প্রাক্-রবীন্দ্রযুগ অনুবাদের ক্ষেত্রে

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের নাম উল্লেখযোগ্য। ১৮৬৮ খ্রিস্টাব্দে তিনি শেক্সপিয়রের ‘টেম্পেস্ট’ নাটকের অনুবাদ করেন ‘নলিনী বসন্ত’ নাম দিয়ে। এরপরে ১৩০১ বঙ্গাব্দে তিনি শেক্সপিয়রের ‘রোমিও অ্যান্ড জুলিয়েট’ নাটকের অনুসরণে ‘রোমিও জুলিয়েত’ নাটক রচনা করেন। এছাড়া তিনি কয়েকটি ইংরেজি কবিতাও অনুবাদ করেছিলেন। যেমন—লংফেলোর রচিত ‘সাম্ অব লাইফ’-এর অনুবাদ ‘জীবন সঙ্গীত’, আলেকজান্ডার পোপের ‘এলয়সা টু আবেলার্ড’-এর প্রেরণায় ‘মদন পারিজাত’, শেলির ‘দ্য স্কাইলার্ক-এর অনুসরণে ‘ভরতপক্ষীর প্রতি’ (চাতকপক্ষীর প্রতি) ইত্যাদি রচনা করেছিলেন। ‘জীবন সঙ্গীত’ কবিতাটি পুরো মূলানুগ, তবে ‘মদন পারিজাত’-এ স্থানে স্থানে মূলনানুগত্য লক্ষ করা যায়। ‘ভরতপক্ষীর প্রতি’, যা পরে হয়েছিল ‘চাতকপক্ষীর প্রতি কবিতাটিতে কবি মূল রচনাকে প্রায় পুরোপুরি-ই অনুবাদ করতে চেয়েছেন।

হেমচন্দ্রের পরবর্তীকালে নবীনচন্দ্র সেন শেক্সপিয়রের ‘এ মিড সামার নাইট’স ড্রিম’-এর মর্মানুবাদ করেছিলেন। আরো পরবর্তীকালে অক্ষয়কুমার দত্ত কিছু অনুবাদ করেছিলেন। যেমন—তাঁর ‘গেছে’ কবিতাটি ব্রাউনিঙ-এর একটি কবিতার আংশিক ভাবানুবাদ ঃ

“এই পথ দিয়ে গেছে — এখনো যেতেছে দেখা
শত শুভ্র তৃণ ফুলে চরণ — অলরক্ত রেখা;
এই পথ দিয়ে গেছে ছিঁড়ে পাতা তুলে ফুল;”
“This path so soft to pace shall lead
Thro’ the magic of May to herself indeed?”

এরপরে আমরা চলে আসি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের অনুবাদচর্চার প্রসঙ্গে। পাশ্চাত্যের বহু কবিতার অনুবাদ তিনি করেছিলেন। দীর্ঘ আট বছর ধরে তাঁর এই অনুবাদচর্চার প্রসারিত ছিল। ১৮৭৩ খ্রিস্টাব্দে গৃহশিক্ষক জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্যের অনুরোধ কবি ‘ম্যাকবেথ’ নাটকের অনুবাদ করেন। তবে সেটি আক্ষরিক অনুবাদ নয়, ইচ্ছামতো কবি এখানে শব্দের পরিবর্তন করেছেন। যেমন—“The rumpfed ronyon cries”-এর বাংলা ধরা হয়েছে “পোড়ারমুখী বোল্লে রেগে”, যাকে আমরা কখনোই অনুবাদ বলতে পারিনা। তবে ডাইনিদের সংলাপের মূল ভাব অনুবাদে ভাষায় আশ্চর্য রকমভাবে জীবন্ত হয়ে উঠেছে।

এর পাশাপাশি তিনি ম্যুর, বায়রন, বার্নস কবির বিভিন্ন কবিতা অনুবাদ করেছেন। যেমন—‘বিচ্ছেদ কবিতাটির ম্যুরের ‘As Slow Our shop’-এর অনুবাদ। ‘বিদায় চুম্বন’ কবিতাটি বার্নসের ‘As Fond Kiss’ কবিতারি অনুবাদ। বার্নসের ‘O philly, Happy be that day’ কবিতার অনুবাদ করে রবীন্দ্রনাথ তার নাম দিয়েছিলেন ‘ললিত নলিনী (কৃষকের প্রেমালাপ)’।

অনুবাদচর্চায় রবীন্দ্রনাথের উত্তরসূরী হিসেবে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ের অনুবাদ প্রধান কাব্যগ্রন্থ 'আর্যগাথা' (১ম) প্রকাশিত হয় ১৮৮২ খ্রিস্টাব্দে। দ্বিতীয় খণ্ড প্রকাশিত হয় ১৮৯৩ খ্রিস্টাব্দে। তাঁর পূর্ববর্তী বাংলা সাহিত্যে প্রচুর অনুবাদ হয়েছিল। তাঁর অনুবাদের প্রাথমিক প্রেরণা ছিল ইংরেজি সাহিত্য আস্বাদন এবং শিক্ষক ও অল্প শিক্ষিতদের মধ্যে পাশচাত্য সাহিত্যরস পৌঁছে দেওয়া।

দ্বিজেন্দ্রলালের পরবর্তীকালে সত্যেন্দ্রনাথ দত্ত—শেলি, কীটস্ ওয়ার্ডসওয়ার্থ, সুইনবার্ন, ব্রাউনিং, এডগার অ্যালান প্যো, ওয়ালট হুইটম্যান প্রমুখ পাশচাত্যের সাহিত্যিকদের লেখার পাশাপাশি, সংস্কৃতি, ফরাসি, চিনা, জাপানি, তামিল ইত্যাদি ভাষা থেকে এবং ডিরোজিও, তরু দত্ত প্রমুখ এদেশি ইংরেজি কবিদেরও কিছু অনুবাদ করেছিলেন। তাঁর কয়েকটি অনুবাদ সংকলন হল : 'তীর্থসলিল', 'তীর্থরেণু' এবং 'মণিমঞ্জুষা'।

এতক্ষণ আমরা পাশচাত্য সাহিত্যের অনুবাদ সম্পর্কে আলোচনা করলাম। এবার আসি সংস্কৃত সাহিত্যের অনুবাদ প্রসঙ্গে। উনিশ শতক নবজাগরণের যুগ। এযুগে শিক্ষিত বাঙালির পাশ্চাত্য সাহিত্যের সংস্পর্শে এসে বিদেশি ভাবধারাকে গ্রহণের পাশাপাশি নিজের দেশের প্রাচীন সাহিত্যের গরিমা আবিষ্কারও করতে চেয়েছেন এবং এর ফলেই প্রাচীন ভারতীয় অনুবাদচর্চা শুরু হয়েছে।

প্রাচীন বাংলা সাহিত্যে অনুবাদ সাহিত্য একটি বিশিষ্ট শাখা। সংস্কৃতি ভাষায় রচিত রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত ইত্যাদির বঙ্গানুবাদকে প্রাচীন বাংলা অনুবাদ সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করা হয়। এই অনুবাদ সাহিত্যের উদ্ভবের মূলে কিছু কারণ উল্লেখিত হয়ে থাকে। প্রথমত, অনেকে বলে থাকেন তুর্কি আক্রমণের ফলে যখন প্রাচীন সংস্কৃতি বিনষ্ট হবার উপক্রম দেখা যায়, তখন জনসাধারণকে উদ্দীপ্ত করার জন্য সংস্কৃত থেকে মহাকাব্য, পুরাণ ইত্যাদি গ্রন্থের অনুবাদ শুরু হল। সমাজ ও সংস্কৃতি এবং ধর্মের উপর রাজশক্তির আক্রমণে, একসময় ব্রাহ্মণ্য বিধিশাসিত হিন্দুসমাজ চিন্তিত হয়ে পড়েছিল। খ্রিস্টীয় চতুর্দশ শতাব্দীতে তুর্কি আক্রমণজনিত উত্তালতা কিছুটা শান্তরূপ ধারণ করলে সমাজে আবার শিল্প-সংস্কৃতির জোয়ার এলো। অনুবাদ-সাহিত্যের প্রথম গ্রন্থগুলি, তুর্কি বিজয়ের প্রথম দু-শতকের অনিশ্চয়তা, অস্থিরতার অবসানের পরে এবং চৈতন্য-প্রভাব বিস্তারিত হবার আগে রচিত হয়েছিল। তুর্কি-বিজয়ের ফলে পরাজিত হিন্দুশক্তি ধর্মী, সাংস্কৃতিক প্রতিরোধের সাহায্যে আত্মরক্ষা করতে চেয়েছিল। এই প্রতিরোধের মূল কথা ছিল উপরতলার ব্রাহ্মণ্য-বৈদিক-স্মার্ত-পৌরাণিক ধারার সঙ্গে লোকজীবনে প্রচলিত অব্রাহ্মণ্য-অবৈদিক-অস্মার্ত-অপৌরাণিক ধারার মিশ্রণ। এই মিশ্রণের ফলে যে নতুন ভাবধারা গড়ে উঠেছিল, তার সামনে পৌরাণিক আদর্শ তুলে ধরার প্রয়োজন ছিল। বাংলা ভাষা সংস্কৃতের উত্তরাধিকারী। তাই সংস্কৃত ভাষার প্রাচীন আখ্যায়িকাগুলি উত্তরাধিকার সূত্রেই প্রাপ্ত হয়েছে। কিন্তু সংস্কৃত ভাষায় রচিত গ্রন্থের প্রচার ছিল সীমাবদ্ধ।

কিন্তু হিন্দু সমাজের সব শ্রেণীর মধ্যেই নিজের ধর্ম ও সংস্কৃতির প্রতি আস্থা ফিরিয়ে আনার জন্য পৌরাণিক সাহিত্য—বিশেষ করে রামায়ণ, মহাভারতের প্রচারের প্রয়োজন ছিল। তাই অনুবাদের মধ্যে দিয়ে রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত যা কিনা সংস্কৃত ভাষায় রচিত হয়েছিল তা জনসাধারণের জীবনের সঙ্গে একদম জড়িয়ে যাবার সুযোগ পেল।

দ্বিতীয়ত, অনেকে বলেন, গৌড়ের সুলতানেরা সিংহাসনে সুস্থির হয়ে রাজসভায় পণ্ডিতদের ডেকে তাঁদের কাছে হিন্দুর শাস্ত্রগ্রন্থাদি শোনার যখন আগ্রহ দেখান, তখন থেকেই এসব গ্রন্থ অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। তাতার-তুর্কি-খোরাসানি-পাঠান-মুসলমানরা প্রথম দিকে দূরত্ব বজায় রেখে এদেশকে শাসন করলেও ধীরে ধীরে তাঁরা এদেশকে ভালোবেসে, এদেশের ভাষা শিখে, এদেশের সাহিত্য-সংস্কৃতির প্রতি আকৃষ্ট হলেন। অনেক সুলতান-ই হিন্দু পণ্ডিতদের কাছ থেকে রামায়ণ, মহাভারতের গল্প শুনতে চাইতেন এবং অনেক সময় তাঁরা সেগুলিকে বাংলা ভাষায় অনুবাদ করতেও উদ্বুদ্ধ করতেন। বাংলা সাহিত্যের আদি ইতিহাসকার ডাঃ দীনেশচন্দ্র সেন তাঁর 'বঙ্গভাষা ও সাহিত্য' গ্রন্থে বলেছিলেন, ''মুসলমান, ইরান, তুরাণ প্রভৃতি যে স্থান হইতেই আসুন না কেন, এদেশে আসিয়া সম্পূর্ণরূপে বাঙ্গালী হইয়া পড়িলেন। তাঁহারা হিন্দুপ্রজামণ্ডলী পরিবৃত হইয়া বাস করিতে লাগিলেন। মসজিদের পার্শ্বে দেবমন্দিরের ঘণ্টা বাজিতে লাগিল, ঈদ, সবেবরাৎ প্রভৃতির পার্শ্বে দুর্গোৎসব, রাস, দোলোৎসব প্রভৃতি চলিতে লাগিল। রামায়ণ ও মহাভারতের অপূর্ব প্রভাব মুসলমান সম্রাটগণ লক্ষ্য করিলেন। এদিকে দীর্ঘকাল এদেশে বাসনিবন্ধন বাঙ্গালা তাঁহাদের একরূপ মাতৃভাষা হইয়া পড়িল। হিন্দুদের ধর্ম, আচার ব্যবহার প্রভৃতি জানিবার জন্য তাঁহাদের পরম কৌতূহল হইল। গৌড়ের সম্রাটগণের প্রবর্তনায় হিন্দু শাস্ত্র গ্রন্থের অনুবাদ আরম্ভ রইল।" মালাধর বসু তাঁর গ্রন্থে সুলতান বারবক শাহের কথা বলেছেন। আবার কবীন্দ্র পরমেশ্বর ও শ্রীকর নন্দী ছুটি খাঁর সভাকবি ছিলেন। অবশ্য এঁরা দুজনেই মুসলমান সুলতানের কাছ থেকে প্রত্যক্ষ আনুকূল্য পেয়েছিলেন। এই সমস্ত মুসলমান নৃপতিরা মহাভারতের কাহিনির প্রতিই বেশি আকৃষ্ট হয়েছিলেন। দীনেশচন্দ্র সেন বাংলা সাহিত্যের এই যুগকে হুসেনশাহী যুগ নামে অভিহিত করেছেন।

তৃতীয়ত, রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত ইত্যাদি গ্রন্থের কাহিনি কবিদের মুগ্ধ করেছিল এবং তাঁরা এগুলি অনুবাদ করেছিলেন। কিন্তু তাঁরা যে শুধু সুলতান বা নৃপতিদের আনুকুল্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়েই কাব্য রচনা করেছিলেন তা নয়, কাব্যগুলির সাহিত্যগুণে মুগ্ধ হয়েও সেগুলি অনুবাদে আগ্রহী হয়েছিলেন।

প্রথমযুগে রচিত এইসব অনূদিত গ্রন্থের কিছু কিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায়। যেমন—এই সময় বাঙালি কবিদের সামনে কালিদাসের বিখ্যাত সব কাব্য, নানারকম পুরাণ ইত্যাদি থাকলেও, তাঁরা প্রধানত রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত ইত্যাদি গ্রন্থগুলির অনুবাদই বেশি করেছেন। কারণ কাব্যসৌন্দর্য অপেক্ষা ধর্মীয় মাহাত্ম্যের দিকেই তাঁরা বেশি আগ্রহী ছিলেন। পরবর্তীকালেও অনুবাদের ক্ষেত্রে এটা লক্ষ করা যায়।

প্রথম যুগের অনুবাদকরা অনুবাদ করার সময় মৌলিক চিন্তা অপেক্ষা, মূল গ্রন্থের যে অনুসরণ করতে চাইবেন, তা ছিল স্বাভাবিক এবং হয়েছেও তাই। কৃত্তিবাস ছাড়া অন্য কবিরা, যেমন—মালাধর বসু, শ্রীকর নন্দী, কবীন্দ্র পরমেশ্বর প্রমুখ মোটামুটি ভাবে মূল গ্রন্থকেই অনুসরণ করেছেন। তবে মালাধর বসু মূল ভাগবতের অংশবিশেষ অনুবাদ করেছিলেন। শ্রীকর নন্দী জৈমিনি মহাভারতের অশ্বমেধ পর্ব অনুবাদ করেছিলেন। কবীন্দ্র পরমেশ্বর মূল মহাভারতের সংক্ষিপ্ত অনুবাদ করেছিলেন।

তবে বাংলাভাষায় সংস্কৃত বহু গ্রন্থের অনুবাদ হয়েছে এবং এখনও হচ্ছে। এর ফলে বাংলা ভাষা সমৃদ্ধিশালিনীও হয়েছে এবং বাংলা ভাষার সম্পদও বৃদ্ধি পেয়েছে। ঊনবিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে রাজা রামমোহন রায় কয়েকটি উপনিষদ্ ও বেদান্তের অনুবাদ করেছিলেন। রমেশচন্দ্র দত্ত ঋগ্‌বেদের অনুবাদ করেছিলেন। রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী করেছিলেন ঐতরেয় ব্রাহ্মণের অনুবাদ। নবীনচন্দ্র দাস রঘুবংশের পদ্যানুবাদ করেছিলেন। এর পাশাপাশি কালিদাসের প্রতিটি কাব্যের অনুবাদ হয়েছে। এছাড়া পাণিনির ব্যাকরণ, সিদ্ধান্ত কৌমুদী, পতঞ্জলির মহাভাষ্য, অমরকোষ, সাহিত্যদর্পণ, মনুসংহিতা, যাজ্ঞবল্ক্য সংহিতা ইত্যাদি গ্রন্থও অনুবাদ হয়েছে।

ইংরেজি এবং সংস্কৃত সাহিত্যের পাশাপাশি পালি ও প্রাকৃত বহু গ্রন্থের অনুবাদ বাংলা ভাষায় হয়েছে। বসন্তকুমার চট্টোপাধ্যায়ের কল্পসূত্র, জগৎরাম ভট্টাচার্যের দশবৈকালিক সূত্র, রাধাগোবিন্দ বসাকের গাথাসপ্তশতীর অনুবাদ সর্বজনবিদিত। ঈশানচন্দ্র ঘোষের জাতকের অনুবাদ তো বিশেষভাবেই উল্লেখযোগ্য।

❐

এতক্ষণ আমরা ইংরেজি ও সংস্কৃতি অনুবাদ সাহিত্যের বিকাশধারা নিয়ে আলোচনা করলাম। এবার আসি অনুবাদের প্রকার পদ্ধতি নিয়ে। অনুবাদের পদ্ধতি অনেক প্রকারের হতে পারে। যেমন ঃ আক্ষরিক অনুবাদ, ভাবানুবাদ, আংশিক অনুবাদ, বিকৃত অনুবাদ, কবিতার অনুবাদ ইত্যাদি। এখানে আমাদের আলোচ্য আক্ষরিক অনুবাদ, ভাবানুবাদ এবং কবিতার অনুবাদ।

প্রথমে আসা যাক আক্ষরিক অনুবাদের কথায় ঃ

(১) আক্ষরিক অনুবাদ ঃ যে-সমস্ত অনুবাদের মূল গ্রন্থের আক্ষরিক অনুবাদ করা হয়, তাকে আক্ষরিক অনুবাদ বা মূলানুবাদ বলে। আক্ষরিক অনুবাদে শব্দ ও তার নিজস্ব প্রয়োগগত অর্থ বজায় রেখে তার দ্বারা ভাষান্তরে শব্দের নির্মাণ ঘটায়। প্রাচীন বাংলা অনুবাদ সাহিত্যে আক্ষরিক অনুবাদের রীতি খুব একটা গৃহীত হয়নি। ইংরেজি থেকে বাংলা করা কিছু অনুবাদে আক্ষরিক অনুবাদের প্রয়োগ দেখা যায়। ওয়াল্ট হুইটম্যানের 'I saw in Luisiana a live oak growing' কবিতাটিকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ১৩৪১,

বৈশাখ সংখ্যার 'বঙ্গশ্রী'-তে 'গদ্যছন্দ' প্রবন্ধে আক্ষরিক অনুবাদ করেছেন। এখানে প্রথমে মূল ইংরেজি কবিতাটি উল্লেখ করে, রবীন্দ্রনাথকৃত অনুবাদটি দেওয়া হল।

"I saw in luisiana a live oak growing,
All alone stood it and the moss hung down from the branches,
Without any companion it grew there uttering joyous leaves of dark green,
And its look, rude, unbending, lusty, made methink of myself.
But I wonder'd how it could utter joyous leaves standing.
Alone there without its friend near, for I knew I could not,
And took off a twig with a certain number of leaves upon
It, and twined around it a little moss,
And brought it away, and I have placed it in sight in my room,
It is not needed to remind me as of my own dear friends.
(For I believe lately I think of little else than of them)
Yet it remains to me a curious token, it makes me think of manly love,
For all that, and though the oak glistens there in
Luisiana solitary in a wide flat space,
Uttering joyous leaves all its life without a friend a lover near,
I know very well I could not."

"লুইসিয়ানাতে দেখলুম একটি তাজা ওক গাছ বেড়ে উঠেছে
একলা সে দাঁড়িয়ে, তার ডালগুলো শ্যাওলা পড়ছে ঝুলে।
কোন দোসর নেই তার, ঘন সবুজ পাতায় কথা কইছে তার খুশিটি।
তার কড়া খাড়া তেজালো চেহারা মনে করিয়ে দিলে আমারই নিজেকে।
আশ্চর্য লাগল, কেমন করে এ গাছ ব্যক্ত করছে খুশিতে ভরা আপন পাতাগুলিকে
যখন না আছে ওর বন্ধু, না আছে দোসর
আমি বেশ জানি আমি তো পারতুম না।
গুটিকতক পাতাওয়ালা একটি ডাল তার ভেঙে নিলেম,
তাতে জড়িয়ে দিলাম শ্যাওলা।

নিয়ে এসে চোখের সামনে রেখে দিলেম আমার ঘরে
প্রিয় বন্ধুদের কথা স্মরণ করাবার জন্যে যে তা নয়।
(সম্প্রতি ওই বন্ধুদের ছাড়া আর কোন কথা আমার মনে ছিল না।)
ও রইল একটি অদ্ভুত চিহ্নের মতো,
পুরুষের ভালবাসা যে কী তাই মনে করাবে।
তা যাই হোক, যদিও সেই তাজা ওক গাছ
লুইসিয়ানার বিস্তীর্ণ মাঠে একলা ঝলমল করছে,
বিনা বন্ধু বিনা দোসরে খুশিতে ভরা পাতাগুলি প্রকাশ করছে চিরজীবন ধরে,
তবু আমার মনে হয়, আমি তো পারতুম না।"

অনুবাদটি সম্পূর্ণ মূলানুগ। এমন মূলানুগ অথচ কাব্যরসান্বিত অনুবাদ খুব কম পাওয়া যায়। অনুবাদে কবি মূলের প্রায় প্রতিটি শব্দেরই যথার্থ্য রক্ষা করেছেন। এমনকি অনুবাদে রবীন্দ্রনাথ যে সব শব্দ প্রয়োগ করেছেন, তা-ও মূল ভাবের অনুসারী। যেমন—

"....uttering joyous leaves of dark green."–

পংক্তিটির অনুবাদে রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, —

"...ঘন সবুজ পাতায় কথা কইছে তার খুশিটি।"—

এই অনুবাদ একই সঙ্গে স্বচ্ছন্দ এবং কঠিন মূলানুগত্যের বাঁধনে বাঁধা।.... হয়ত কেবল রবীন্দ্রনাথের পক্ষেই এমন সুন্দর ও মূলানুগত অনুবাদ করা সম্ভব—সেই পূর্বোল্লিখিত ইতালীয় প্রবচনটিকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করে!

(২) ভাবানুবাদ ঃ এতে মূলের অবিকল অনুসরণের প্রয়োজন হয় না। ভাবানুবাদের ক্ষেত্রে বক্তব্যের ভাব বজায় রেখে ভাষান্তরের মধ্যে দিয়ে তা পরিবেশন করা হয়। এমনকি এখানে ভাষা সম্পর্কেও অনুসরণের কোনো বাধ্যবাধকতা নেই। সংস্কৃত রামায়ণ, মহাভারত এবং ভাগবতের যে বিশাল অনুবাদ সম্ভার এদেশে গড়ে উঠেছিল তাতে ভাবানুবাদ-ই বেশি পাওয়া যায়। তবে এইসব গ্রন্থে কবিরা মূল সংস্কৃত গ্রন্থকে অনুসরণ করলেও, অনেক সময় নিজের ইচ্ছামতোও কাহিনিকে বর্ণনা করেছেন। ইংরেজি এবং অন্যান্য ইউরোপীয় সাহিত্য থেকে বাংলা সাহিত্যে কৃত অনুবাদের সময়ে ভাবানুবাদেরই আধিক্য লক্ষ করা যায়। বিশেষত, নাটকের ক্ষেত্রে এখানে বার্নসের কবিতা "O Philly, happy be that day" এবং তার পাশাপাশি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের "ললিত নলিনী (কৃষকের প্রেমালাপ)" কবিতা মিলিয়ে দেখা যায় ঃ

“HE O Philly, happy be that day
When roving through the gather’d hay
My youthful heart was stown away
And by thy charms my Philly.

SHE O Willy, are I bless the grove
Where first I own’d my maiden-love,
Whilst thou didst pledge the powers above
To be my ain dear Willy.

HE As songsters of the early year
Are ilka day mair sweet to hear,
So ilka day to mair dear,
And charming is my Philly.

SHE As on the brier the budding rose
Still richer breathes and fairer blows
So in my tender bosom grows
The love I bear my Willy.

HE The milder sun and bluer sky
That crown my harvest cares wi’joy
Were ne’er so welcome to my eye
As is a sight of Philly.

SHE The little swallow’s want on wing,
Though wafting o’er the flowery spring
Did ne’er to me sic tidings bring
As meeting o’ my Willy.

HE The bee that through the sunny hour
Sips nectar in the opening flower,
Compared wi’ my delight is poor
Upon the lips of Philly.

SHE The woodbine in the dewy weet,
When evening shades in silence meet,
Is nocht sae fragranter say sweet
As is a kiss o' Willy.

HE Let fortune's wheel at random rin,
And fools may tyne, and knaves may win
My thoughts are a' bound up in one,
And that's my ain dear Philly.

SHE What's a' the joys tha gowd can gie?
I care na wealth a single flie;
The lad I love's the lad for me
And that's my ain dear Willy."

"ললিত। হা নলিনী গেছে আহা কী সুখের দিন,
দোঁহে যবে এক সাথে, বেড়াতেম হাতে হাতে
নবীন হৃদয় চুরি করিলি নলিন!
হা নলিনী কত সুখে গেছে সেই দিন!

নলিনী। কত ভালোবাসি সেই বনেরে ললিত,
প্রথমে বলিনু যেথা, মনের লুকানো কথা,
স্বর্গ-সাক্ষী করি যেথা হয়ে হরষিত
বলিলে, আমারি তুমি হইবে ললিত।

ললিত। বসন্ত-বিহগ যথা সুললিত ভাষী
যত শুনি তত তার ভালে লাগে গীতধার
যতদিন যায় তত তোরে ভালোবাসি
যতদিন যায় তব বাড়ে রূপরাশি।

নলিনী। কোমল গোলাপ কলি থাকে যথা গাছে
দিন দিন ফুটে যত, পরিমল বাড়ে তত
এ হৃদয় ভালোবাসা আলো করে আছে
সঁপেছি সে ভালোবাসা তোমারিগো কাছে।

ললিত। মৃদুতর রবিকর সুনীল আকাশ
হেরিলে শস্যের আশে, হৃদয় হরষে ভাসে
তার চেয়ে এ হৃদয়ে বাড়ে গো উল্লাস
হেরিলে নলিনী তোর মৃদু মধু হাস।

নলিনী। মধু আগমনে বার্তা করিতে কূজিত
কোকিল যখন ডাকে হৃদয় নাচিতে থাকে
কিন্তু তার চেয়ে হৃদি হয় উথলিত
মিলিলে তোমারি সাথে প্রাণের ললিত।

ললিত। কুসুমের মধুময় অধর যখন
ভ্রমর প্রণয়ভরে, হরষে চুম্বন করে
সে কি এত সুখ পায় আমার মতন
যবে ও অধরখানি করি গো চুম্বন?

নলিনী। শিশিরাক্ত পত্রকোলে মল্লিকা হাসিত
বিজন সন্ধ্যার বায়ে ফুটে সে মলয়বায়ে
সে এমন নহে মিষ্ট নহে সুবাসিত
তোমার চুম্বন আহা যেমন ললিত।

ললিত। ঘুরুক অদৃষ্টচক্র সুখ দুখ দিয়া
কভু দিক রসাতলে কভু বা স্বরগে তুলে
রহিবে একটি চিন্তা হৃদয়ে জাগিয়া
সে চিন্তা তোমারি তরে জানি ওগো প্রিয়া।

নলিনী। ধন রত্ন কনকের নাহি ধার ধারি
পদতলে বিলাসীর, নত করিব না শির
প্রণয়ধনের আমি দরিদ্র ভিখারি
সে প্রণয়, ললিত গো তোমারি তোমারি।”

এটি মূল কবিতার মোটামুটি ভাবানুবাদ হয়েছে। মূল কবিতার ‘He’ এবং She অনুবাদে ‘ললিত’ ও ‘নলিনী’ হয়েছে। অনুবাদে মূলের স্তবক রক্ষিত হয়েছে। এমনকি মূল কবিতার ছন্দস্পন্দনও অনুবাদে ধরা পড়েছে। শেষ স্তবকেও প্রথম দু’চরণের ভাবানুবাদ হয়েছে।

(৩) কবিতার অনুবাদ ঃ গদ্যের পাশাপাশি কবিতার অনুবাদও লক্ষ করা যায়। কবিতার অনুবাদের তেমন বিশেষ কোনো বৈশিষ্ট্য লক্ষ করা যায় না। কবিতার অনুবাদ যেমন আক্ষরিক হতে পারে, তেমনি ভাবানুবাদও হতে পারে। এখানে বার্নসের ‘Ae fond Kiss’ কবিতা এবং রবীন্দ্রনাথ কৃত অনূদিত ‘বিদায় চুম্বন’ কবিতাটি দেওয়া হল।

“Ae fond kiss, and then we sever;
Ae farewel and then, forever!
Deep in heart, wrung tears, I’ll pledge thee
Warring sighs and groans I’ll wage thee.
Who shall say that fortune grieves him.
While the star of hope she leaves him?
Me, nae cheerful twinkle lights me;
Dark despair around be nights me.
I’ll ne’er blame my partial fancy,
Nae thing could resist my nancy;
But to see her and love for ever.
Had we never loved but kindly,
Had we never loved sae blindly,
Never met or never parted,
We have never been broken hearted
Fare thee well, thou first and fairest!

Fare thee well, thou best and dearest!
Thine be like joy and treasure.
Peace, enjoyment, Love and Pleasure!
Ae fond kiss and then we rever."

"একটি চুম্বন দাও প্রমদা আমার
জনমের মতো দেখা হবে নাকো আর
মর্মভেদী অশ্রু নিয়ে, পূজিব তোমারে প্রিয়ে
দুখের নিশ্বাস আমি দিব উপহার।
সেতো তবু আছে ভালো,   একটু আশার আলো
          জ্বলিতেছে অদৃষ্টের আকাশে যাহার,
কিন্তু মোর আশা নাই   যে দিকে ফিরিয়া চাই
          সেই দিকে নিরাশার দারুণ আঁধার।
ভালো যে বেসেছি তারে দোষ কী আমার?
উপায় কী আছে বল উপায় কী তার?
দেখামাত্র সেই জনে   ভালোবাসা আসে মনে
          ভালোবাসিলেই ভুলা নাহি যায় আর।
নাহি বাসিতাম যদি এত ভালো তারে
অন্ধ হয়ে প্রেমে তার মজিতাম নারে
যদি নাহি দেখিতাম   বিচ্ছেদ না জানিতাম
          তা হলে হৃদয় ভেঙে যেত না আমার।
আমারে বিদায় দাও যাই গো সুন্দরী,
যাই তবে হৃদয়ের প্রিয় অধীশ্বরী,
থাকো তুমি থাকো সুখে, বিমল শান্তির বুকে
          সুখ, প্রেম, যশ, আশা থাকুক তোমার
একটি চুম্বন দাও প্রমদা আমার।

এই অনুবাদটি মূল কবিতার আক্ষরিক অর্থ, বাক্য পরম্পরা এবং ভাব প্রায় অক্ষুণ্ণ রেখেছে।

১০৯.৭ সারাংশ—২

উনিশ শতকে বাংলাদেশের ভাবজীবনে রেনেসাঁস বা নবচেতনা দেখা গিয়েছিল। এই সময় সেকালের উন্নত ও প্রগতিশীল মনীষীরা ইংরেজি শিক্ষা ও সংস্কৃতির বিস্তার চেয়েছিলেন। উনিশ শতকের প্রথম অর্ধে শিক্ষা-সংস্কৃতি আন্দোলনে ইংরেজি ভাষা ও সাহিত্যের অনুসরণ দেখা গিয়েছিল, আর পরবর্তী অর্ধে এই অনুসরণের ফলে গড়ে ওঠা নতুন বাংলা সাহিত্য-সংস্কৃতির সাহায্যে বিদেশি শক্তি ও সংস্কৃতির বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলা হয়েছিল। এই নতুন সংস্কৃতির জন্য নতুন সাহিত্য গড়ে উঠল। আর এই প্রয়োজনেই অনুবাদের ব্যাপক চর্চার প্রয়োজন হল। সংস্কৃত, ফরাসি ও ইংরেজি এই তিন ভাষা থেকে অনুবাদ ও গ্রন্থরচনা শুরু হয়। ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে উইলিয়াম কেরির 'মঙ্গল সমাচার মাতিউর রচিত' ইংরেজি থেকে করা প্রথম অনুবাদ। বাংলা ভাষার প্রথম ঐতিহাসিক উপন্যাস ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের 'ঐতিহাসিক উপন্যাস' অনুবাদমূলক। এর পাশাপাশি কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য, প্রমথ চৌধুরী, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, অক্ষয়কুমার দত্ত, নবীনচন্দ্র সেন প্রমুখ উল্লেখযোগ্য।

এরপরেও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর পাশ্চাত্যের বহু সাহিত্য অনুবাদ করেছেন। ছোটবেলার গৃহশিক্ষক জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্যের অনুরোধে কবি 'ম্যাকবেথ' নাটকের অনুবাদ করেন। তবে অনুবাদটি আক্ষরিক নয়। এর পাশাপাশি তিনি ম্যূর, বায়রন, বার্নস প্রভৃতি কবির বিভিন্ন কবিতাও অনুবাদ করেছেন।

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরে দ্বিজেন্দ্রলাল রায়ও কিছু অনুবাদ করেছিলেন।

উনিশ শতকে পাশ্চাত্য সাহিত্যের পাশাপাশি সংস্কৃত সাহিত্যেরও কিছু অনুবাদ হয়েছিল। সংস্কৃত ভাষায় রচিত রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত বাংলা ভাষায় অনুবাদ হয়েছিল যাকে আমরা প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের অন্তর্ভুক্ত করতে পারি।

এই অনুবাদ সাহিত্যের উদ্ভবের মূলে কয়েকটি কারণ ধরা হয় একটি মতে, তুর্কি আক্রমণের ফলে যখন প্রাচীন সংস্কৃতি বিনষ্ট হবার উপক্রম দেখা যায়, তখন জনসাধারণকে উদ্দীপিত করার জন্য সংস্কৃত-পুরাণাদি গ্রন্থের অনুবাদ শুরু হয়। আরেকটি মতে,—গৌড়ের সুলতানরা সিংহাসনে বসে রাজসভার পন্ডিতদের ডেকে তাঁদের কাছে হিন্দু শাস্ত্রগ্রন্থাদি শোনার আগ্রহ জানালে এসব গ্রন্থের অনুবাদের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়। তৃতীয় একটি মতে,—রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত ইত্যাদি গ্রন্থের কাহিনি কবিদের মুগ্ধ করেছিল এবং তাঁরা কাব্যগুলির সাহিত্যরসে মুগ্ধ হয়ে সেগুলির অনুবাদ করেছিলেন।

ইংরেজি এবং সংস্কৃত সাহিত্যের পাশাপাশি পালি এবং প্রাকৃত বহু গ্রন্থের অনুবাদও বাংলায় হয়েছে। যেমন—কল্পসূত্র, দশবৈকালিক সূত্র, গাথাসপ্তশতী ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য।

অনুবাদ নানাভাবে করা যেতে পারে। যেমন—(১) আক্ষরিক অনুবাদ। এই ধরণের অনুবাদে মূল গ্রন্থের আক্ষরিক অনুবাদ করা হয়। (২) ভাবানুবাদ—এই ধরণের অনুবাদে বক্তব্যের ভাব বজায় রেখে ভাষান্তরের মধ্যে দিয়ে তা পরিবেশন করা হয়। (৩) কবিতার অনুবাদ—এই অনুবাদ আক্ষরিকও হতে পারে আবার ভাবানুবাদও হতে পারে। এছাড়া আংশিক অনুবাদ, বিকৃত অনুবাদ ইত্যাদিও লক্ষ করা যায়।

১০৯.৮ অনুশীলনী—২

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন। উত্তরশেষে উত্তরমালার সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন।

১. অনুবাদচর্চার বিকাশধারা সম্পর্কে যা জানেন লিখুন।

২. বাংলা ভাষায় পাশ্চাত্য সাহিত্যের অনুবাদচর্চা সম্পর্কে সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।

৩. প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের অনুবাদের উদ্ভবের মূলে কী কী কারণ স্বীকৃত হয়ে থাকে?

৪. আক্ষরিক অনুবাদ বলতে কী বোঝায়, সংজ্ঞা সহ ব্যাখ্যা করুন।

৫. ভাবানুবাদ কাকে বলে উল্লেখ করে উদাহরণ দিন।

৬. কবিতার অনুবাদ বলতে কি বোঝায়; উদাহরণ দিন।

৭. **শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ**

(ক) ইংরেজ সিভিলিয়ানদের বাংলা শেখানোর জন্য —— ফোর্ট উইলিয়াম কলেজের প্রতিষ্ঠা হয়।

(খ) বাংলা ভাষার —— ঐতিহাসিক উপন্যাস ভূদেব মুখোপাধ্যায়ের —— অনুবাদমূলক।

(গ) কথাসাহিত্য অনুবাদে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলেন ——।

(ঘ) 'বিচ্ছেদ' কবিতাটি ম্যূরের ——-এর অনুবাদ।

(ঙ) রমেশচন্দ্র দত্ত —— অনুবাদ করেছিলেন।

৮. **সঠিক উত্তরে (✓) চিহ্ন দিন :**

(ক) 'ভেক মুষিকের যুদ্ধ' গ্রন্থটির রচয়িতা —

১. রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

২. তারিণীচরণ মিত্র

৩. হরিমোহন গুপ্ত

(খ) উপেন্দ্রনাথ মিত্র রচনা করেছিলেন—

১. অপূর্ব দেশভ্রমণ

২. মন্মথ মনোরমা

৩. পরিত্যক্ত গ্রাম

(গ) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'ললিত নলিনী (কৃষকের প্রেমালাপ)' কবিতাটি—

১. আক্ষরিক অনুবাদ

২. ভাবানুবাদ

৩. কবিতার অনুবাদ

১০৯.৯ উত্তরমালা

অনুশীলনী—১

১ এবং ২ নম্বর প্রশ্নের উত্তরের জন্য মূলপাঠ ১-এর প্রাসঙ্গিক অনুচ্ছেদগুলি ভালো করে পড়ুন। তাহলেই উত্তর লিখতে পারবেন।

৩. (ক) জাতীয় সংস্কৃতি

(খ) গ্যেটে, অনুবাদের

অনুশীলনী—২

১—৬ সংখ্যক প্রশ্নের উত্তরের জন্য মূলপাঠ ২-এর প্রাসঙ্গিক অনুচ্ছেদগুলি ভালো করে পড়ুন। তাহলেই উত্তর করতে পারবেন।

৭. (ক) ১৮০০ খ্রিস্টাব্দে

(খ) প্রথম, ঐতিহাসিক উপন্যাস

(গ) কৃষ্ণকমল ভট্টাচার্য

(ঘ) As Slow Our Ship

(ঙ) ঋগ্‌বেদের

৮. (ক) রঙ্গলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

(খ) অপূর্ব দেশভ্রমণ

(গ) ভাবানুবাদ

১০৯.১০ গ্রন্থপঞ্জি

১. কালিসাধন মুখোপাধ্যায় — পাশ্চাত্য কবিতার অনুবাদে রবীন্দ্রনাথ

২. বুদ্ধদেব বসু — কালিদাসের মেঘদূত

৩. সত্যরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় — সংস্কৃত সাহিত্য সমালোচনা সংগ্রহ

একক ১১০ ❑ অনুবাদের সমস্যা এবং সমাধান

গঠন

১১০.১ উদ্দেশ্য

১১০.২ প্রস্তাবনা

১১০.৩ মূলপাঠ ১ — অনুবাদের সমস্যা

১১০.৪ সারাংশ ১

১১০.৫ অনুশীলনী ১

১১০.৬ মূলপাঠ ২ — অনুবাদের সমস্যার সমাধান

১১০.৭ সারাংশ ২

১১০.৮ অনুশীলনী ২

১১০.৯ উত্তরমালা

১১০.১০ গ্রন্থপঞ্জি

১১০.১ উদ্দেশ্য

যদি আপনি এই এককটি যত্নসহকারে পাঠ করেন, তাহলে আপনি—

- অনুবাদ করতে গেলে যে বিভিন্ন প্রকারের সমস্যার উদ্ভব হয়, সেই সম্পর্কে জানতে পারবেন।
- সেইসব সমস্যার সমাধান সম্পর্কে অবগত হবেন।

১১০.২ প্রস্তাবনা

এই এককটিতে অনুবাদ করতে গেলে যেসব সমস্যার সৃষ্টি হয়, সেগুলি সম্পর্কে প্রথমে আলোচনা করা হয়েছে। অনুবাদ করতে গেলে ভাষাগত, ভাবগত, শব্দবিন্যাসগত বিভিন্ন দিক থেকে যেসব সমস্যার

উদ্ভব হয়, সে সম্পর্কেও এখানে আলোচনা আছে। এছাড়া কবিতার অনুবাদকালে শিল্পরূপায়ণ এবং ছন্দগত দিক থেকে যেসব সমস্যার সৃষ্টি হয়, তাও এখানে বলা আছে। প্রতিশব্দ ব্যবহারের ক্ষেত্রেও অনুবাদকালে কিছু সমস্যার উদ্ভব হয়, তার কথাও এখানে পাওয়া যাবে।

এককটির দ্বিতীয় অংশে অনুবাদের সমস্যার নানা ধরণের সমাধান পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। অনুবাদের সার্থকতার পেছনে পাঠকের যে একটা বড় ভূমিকা থাকে, সে কথাও এখানে বলা হয়েছে। অনুবাদের বিভিন্ন সমস্যার সমাধানের জন্য অনুবাদককে মূল রচনার গ্রহণ, বর্জন এবং পরিমার্জনা করতে হয়। এইভাবে অনুবাদ করলে অনুবাদক ও রচনাকারের মধ্যে কোনো বিরোধ থাকে না, ফলে অনুবাদকের মাধ্যমে মূল রচনার যেন নবজন্ম (transcreation) হয়ে থাকে এবং অনুবাদ এক নতুন শিল্প হয়ে ওঠে।

আপনি এই এককটি ভালো করে পাঠ করলে আপনি অনুবাদের বিভিন্ন সমস্যা এবং সমস্যার সমাধান সম্পর্কে আলোচনা করতে পারবেন। বিষয়বস্তুও সহজ করে আলোচনা করা হয়েছে, তাই বুঝতে আপনার কোনো অসুবিধা হবে না। ভালো করে এককটি পাঠের পর অনুশীলনীগুলির উত্তর দিতে চেষ্টা করুন, প্রয়োজনে উত্তর-সংকেত মিলিয়ে দেখুন।

১১০.৩ মূলপাঠ ১ — অনুবাদের সমস্যা

আগের এককের মধ্যে আমরা অনুবাদের চর্চা কেন করা হয় এবং অনুবাদের নানা প্রকার প্রকরণ নিয়ে আলোচনা করেছি। এখানে আমরা অনুবাদ করতে গেলে যে-যে সমস্যার উদ্ভব হয় এবং সেইসব সমস্যার সমাধানের উপায় সম্পর্কে আলোচনা করব।

দেশ-কালের দূরত্ব দূর করবার জন্য যে কয়েকটি উপায় আছে, তার মধ্যে অনুবাদ সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য। কিন্তু একটি ভাষা থেকে, অনুবাদক যখন কোনো গদ্য বা পদ্য অন্য ভাষায় অনুবাদ করতে যান, তখন দেখা দেয় নানারকম অভাবিতপূর্ব সমস্যা। এই সমস্যা নানাভাবে দেখা দিতে পারে। যেমন— ভাষাগত দিক থেকে, ভাবগত দিক থেকে, শব্দবিন্যাসের দিক থেকে ইত্যাদি।

এবারে আমরা অনুবাদ করতে গেলে যে-যে সমস্যার উদ্ভব হয়, সেই সমস্যাগুলি সম্পর্কে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করব।

অনুবাদকের উদ্দেশ্য যতটা পরিমাণে মূল লেখকের উদ্দেশ্যের সমধর্মী হয়, অনুবাদকের শিল্পপ্রকরণও ততটা পরিমাণে মূলানুগত হয় এবং অনুবাদ হয় সার্থক। এই বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের অনুবাদচর্চার ব্যাপারটি

দেখানো যেতে পারে। তাঁর অনুবাদ কর্মের প্রথম দিকে পাওয়া যায় 'ম্যাকবেথ' নাটকের ডাইনিদের সংলাপ। এ অনুবাদ তাঁর ভাষাশিক্ষার অঙ্গ ছিল, ভাষার চর্চাই ছিল এখানে মুখ্য। যদিও তিনি পুরো 'ম্যাকবেথ' নাটকটিই অনুবাদ করেছিলেন, তবু এই অংশটি ছাড়া বাকিটা লুপ্ত। এই অনুবাদে দেখা যায় শব্দগত দিক থেকে অনুবাদক যথেষ্ট যত্নবান। অনুবাদের কয়েক জায়গায় রবীন্দ্রনাথ নিজে কিছু গ্রাম্য অশ্লীল শব্দ ব্যবহার করেছেন। যেমন—শেক্সপিয়রের লেখাতে রয়েছে : "Give me" quoth I / 'Aroint thee' witch!" the rumpfed ronyon cries. এটাই রবীন্দ্রনাথ অনুবাদে করেছেন এভাবে : চাইলুম তার কাছে গিয়ে / পোড়ামুখী রেগে / 'ডাইনী মাগী, যা তুই ভেগে'....আক্ষরিক শব্দানুবাদ করেননি তিনি। কিন্তু মূল ভাবরূপের নিখুঁত এক অনুবাদ করা হয়েছে এখানে। এর ফলে অনুবাদ হয়ে উঠেছে আরো জীবন্ত। ফলে মূল নাট্যরচনার সংলাপের প্রতি অনুবাদকের আকর্ষণ মূল নাট্যকার ও অনুবাদকের উদ্দেশ্যকে এক করেছে।

সুতরাং যেমন মৌলিকরচনায়, তেমনি অনুবাদের ক্ষেত্রে একটি জরুরি প্রশ্ন হল ভাষার ভঙ্গি বা স্টাইল। বাংলা ভাষার লেখকের পক্ষে সমস্যাটিকে প্রভাবে দাঁড় করানো যায়— লেখার মধ্যে বিভিন্ন ভাষার শব্দের মাত্রাবিতরণ কী রকম হবে, কাব্যিক রীতি বা পুরোনো ভাষা কোন্ পর্যন্ত প্রশ্রয় পাবে?

দুটি সম্পূর্ণ বিভিন্ন ভাষার মধ্যে প্রতিটি শব্দেরই আক্ষরিক অনুবাদ হতে পারে না। ইংরেজি ও বাংলা দুই ভাষা প্রকাশের পথ সম্পূর্ণ আলাদা এবং পরস্পরের মধ্যে শব্দ ও তার ভাষান্তরিত প্রতিশব্দের একই রকম মিল পাওয়া অসম্ভব। এছাড়া বাক্য রচনাতে ইংরেজির সঙ্গে বাংলার পার্থক্য এই যে, বিশেষণ বাক্যাংশ (অর্থাৎ Adjective clause) বাংলায় কর্তৃপদের আগে বসে, ইংরেজিতে বিশেষণ সমেত কর্তৃপদ প্রথমে ব্যবহৃত হয়, তারপরে আসে বিশেষণ-বাক্যাংশ। যেমন, বাংলাতে বলা হয়—"Rhodopis নামে একটি সুন্দরী বালিকা নীল নদের জলে স্নান করিতেছিল।" এখানে "সুন্দরী বালিকা" কর্তৃপদ। "Rhodopis নামে" তার আগে বসেছে। কিন্তু ইংরেজিতে তা পরে বসে— "A beautiful girl named Rhodopis" সমস্তটা মিলে কর্তা। ইংরেজিতে সাধারণত কর্তার কিছু পরে, কখনো বা আগে ক্রিয়াপদ বসে। আর বাংলায় ক্রিয়াপদ বাক্যের শেষে বসে। ইংরেজিতে 'স্নান করিতেছিল' ক্রিয়াপদ কর্তার কিছু পরেই বসবে। তা হলে বাক্যটা এরকম হবে "A beautiful girl named Rhodopis was bathing" বাংলায় 'জল' শব্দের বহুবচনে প্রয়োগ নেই—আমরা 'জলগুলি' কখনোই বলি না, ইংরেজিতে এবং সংস্কৃতেও 'জল' শব্দের বহুবচনে প্রয়োগ হতে পারে, এখানে তাই হয়েছে। "A beautiful girl named Rhodopis was bathing in the water of the Nile." 'River' শব্দটি এখানে না দিলেই ভালো হয়।

অনুবাদকের ক্ষেত্রে কঠিনতম সমস্যা হল শিল্পরূপায়ণের। যে-কোনো শিল্প অতি জটিল, গভীর, রহস্যময়। যেমন—কবিতার শিল্প। কবি তাঁর আবেগ ও চিন্তাতরঙ্গকে সংহত ও ঘন করে তোলেন রূপগ্রাহ্য

চিত্রে—যাতে কবির বিশিষ্ট অনুভূতির অভিজ্ঞতা অন্য সব সাধারণ অভিজ্ঞতা থেকে আলাদা ও উচ্চতর স্তরে উন্নীত হয়। এই 'চিত্র' হল—কবির মনের সকল স্মৃতি-অনুষঙ্গ থেকে নির্মিত 'চিত্রকল্প' (অর্থাৎ, image)। কবিতাটি এই সবের অচ্ছেদ্য সমন্বয় ও সৌষম্যে অনবদ্য হয়ে ওঠে। এই শিল্পরূপের অনুসরণ অনুবাদের সার্থকতায় যেমনই মূল্যবান তেমনই সমস্যা-সংকুল। এই ধরণের সমস্যা সাধারণত কবিতার অনুবাদকরাই উপলব্ধি করেছেন।

কবিতার অনুবাদকালে ছন্দগত দিক থেকেও কিছু সমস্যার উদ্ভব হয়। সাধারণত শব্দবিন্যাসে এক ভাষার সঙ্গে অন্য ভাষার উচ্চারণের রীতি অনুসারে 'ঝোঁক' (stress)-এর একটা পার্থক্য থাকে। লাতিন কবিতায় প্রচুর স্বরাঘাত থাকে এবং সে স্বরাঘাতের নানা নিয়মও থাকে নির্দিষ্ট। কিন্তু ইংরেজি পদ্যছন্দে কানে শোনা স্বরের দৈর্ঘ্যের ওপর স্বরাঘাতের পরিমাণ নির্ভর করে। সেইজন্য এক ভাষার কবিতার ছন্দকে অন্য ভাষার কবিতায় অনুবাদ করা কঠিন হয়ে যায়। তবে যদি দুটি ভাষার মধ্যে শব্দব্যুৎপত্তি, বিশিষ্ট বাক্‌রীতি, ধাতু ও ক্রিয়াপদ প্রভৃতির সম্বন্ধ থাকে, যেমন ইংরেজির সঙ্গে ফরাসি বা জার্মান ভাষার, অথবা সংস্কৃতের সঙ্গে প্রাকৃতের ও বাংলা ভাষার, সেখানে মূল ছন্দ অনুবাদ করা তেমন কঠিন নয়। রবীন্দ্রনাথ বাংলায় 'মেঘদূত' এবং 'গীতগোবিন্দ'-এর আংশিক অনুবাদে আর বিদ্যাপতির দু-একটি পদের অনুবাদে মূল কবিতার ছন্দ রক্ষা করেছেন। সংস্কৃত ও বাংলা ভাষার মধ্যে মিল থাকা সত্ত্বেও দুই ভাষার মধ্যে ঝোঁকের পার্থক্য আছে। বাংলায় প্রতিটি অক্ষরের মাত্রা সমান। অক্ষরের হ্রস্ব দীর্ঘ উচ্চারণ নেই। সংস্কৃত শব্দে হ্রস্ব-দীর্ঘ উচ্চারণ আছে। তাই বাংলা রীতি অনুসরণ করলে সংস্কৃত ছন্দ বাংলায় রক্ষা করা যায় না।

আবার ইংরেজি ও বাংলা বাক্যের গঠনেও শব্দোচ্চারণ রীতির পার্থক্য পাওয়া যায়। এ প্রসঙ্গে রবীন্দ্রনাথ অধ্যাপক এন্ডারসনকে লেখা এক চিঠিতে বলেছিলেন—"ইংরেজিতে প্রত্যেক শব্দেরই একটা নিজস্ব ঝোঁক আছে। সেই বিচিত্র ঝোঁকগুলিকে নিপুণভাবে ব্যবহার করার দ্বারাই ছন্দসংগীত মুখরিত হইয়া ওঠে ... বাংলা বাক্যের অসুবিধা এই যে, একটা ঝোঁকের টানে এক সঙ্গে অনেকগুলো শব্দ অনায়াসে আমাদের কানের উপর দিয়া পিছলাইয়া চলিয়া যায়। তাহাদের প্রত্যেকটার সঙ্গে সুস্পষ্ট পরিচয়ের সময় পাওয়া যায় না।" যেমন এডগার অ্যালান পো-র 'র‍্যাভেন' কবিতার এই দুটি চরণের অনুবাদ।

> "Ah, distinctly I remember
> It was in the bleak December"

রবীন্দ্রনাথ এভাবে করেছেন,—

> "আহা মোর মনে আসে
> দারুণ শীতের মাঝে।"

রবীন্দ্রনাথ নিজে বলেছেন, ইংরেজি ছন্দটা চৌপদী বলে ধরে একটি ঝোঁকে তিনি চার মাত্রা ধরে অনুবাদ করেছেন, ইংরেজি ছন্দে এভাবে চার মাত্রা ধরা যায় না। তাই ইংরেজি শব্দের স্বাভাবিক ঝোঁক বাংলায় নেই বলে—অনুবাদটি মূল কবিতার ধ্বনিরূপ ও ছন্দের প্যাটার্ন রক্ষা করতে পারেনি। ইংরেজি ব্ল্যাংকভার্সের বাংলা রূপায়ণ অমিত্রাক্ষর। কিন্তু বাংলা ধ্বনিপ্রবাহে ইংরেজির মতো ঝোঁক না থাকায় ইংরেজি ছন্দের যথার্থ প্রতিরূপ বাংলায় প্রায়শই পাওয়া যায় না। ইংরেজি ব্ল্যাংকভার্সের প্রতি চরণের শেষে একটি ধ্বনির অনুরণন থেকেই যায়। বাংলা ছন্দে তা পাওয়া যায় না। তাই অনুবাদের সার্থকতার জন্য মূল ছন্দ অনুসরণের ক্ষেত্রে অনুবাদকের স্বাধীনতা কিছুটা পরিমাণে মেনে নিতেই হবে। আবার পদ্যের অনুবাদ গদ্যে পরিবেশন করতে গেলেও কিছু সমস্যার উদ্ভব হয়। একটি কবিতার মূল ভাব গদ্যে অনুবাদ করা হলে কবিতার অর্থ, শব্দ রক্ষা করা গেলেও সেখানে কবিতার যে একটা তান আছে, তা পাওয়া যায় না। তাই সেখানে কোনো ভাষার অনুবাদে শ্রেষ্ঠ কবির অনুবাদ কখনোই মূলানুগত্য রক্ষা করতে পারে না। করাটা বাঞ্ছনীয়ও নয়, কারণ তাতে রসের উপলব্ধিটাই ব্যাহত হবে। তবে সতর্ক অনুবাদক যদি মূল কবিতার চলনকে অনুবাদে অন্তত কিছুটাও প্রতিধ্বনিত করতে পারেন, তাহলে ছন্দগত পার্থক্যটুকু অনেকটাই কমে আসে। যেমন—

“উজ্জ্বল একঝাঁক পায়রা
সূর্যের উজ্জ্বল রৌদ্রে
চঞ্চল পাখ্‌নায় উড়ছে
নিঃসীম ঘন নীল অম্বর
গ্রহ তারা থাকে যদি
থাক নীল শূন্যে।

বিমলচন্দ্র ঘোষের এই কবিতা, “দুলকি চালের মাত্রাবৃত্ত” ঃ ৪ + ৪ + ৩, ৪ + ৪ + ৩, ৪ + ৪ + ৩, ৪ + ৪ + ৪, ৪ + ৪ + ৪ + ৩, এই ভাবে চলেছে। এই চলন্‌টাকে ধরেই অনুবাদককে এগোতে হয় এভাবে—

“A glitt’ring group of pigeons
Gliding beneath the sun-rays
Restless wings are gliding
Sapphire cosmos unbarr’d
Let stay Planets and starlets, let stay.”

(পল্লব সেনগুপ্ত)

EBG (P-8 M 30-33)—3

—মূলত চতুর্মাত্রিক (শেষ পর্বে ত্রিমাত্রিক) আয়াম্বিক ছন্দের মাধ্যমে এটা করা গেছে বলেই, মূলের তাল ও সুর দুইই অনেকটা প্রতিফলিত হতে পেরেছে এই অনুবাদে।

অনুবাদের ক্ষেত্রে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা হল প্রতিশব্দের ব্যবহার। উদাহরণ দিয়ে ব্যাপারটি বোঝানো যায়। ইংরেজি ও ফরাসি ভাষার বহু শব্দ প্রায় একইরকম। তবু অনুবাদ করতে গেলে মূল ভাব সবসময় বজায় রাখা যায় না যে, তা অনুবাদ বিশেষজ্ঞ জে. ও'ব্রায়েন সুন্দর উদাহরণ দিয়ে দেখিয়ে দিয়েছেন। টি. এস. এলিয়টের "rats' feet over broken glass" -এর সঠিক ফরাসি অনুবাদ "La course des rats sur les debris de verre." এটি আক্ষরিক ভাবে মূলের অনুবাদ হল না। "La course des rats." মানে ইঁদুরের পা নয়, ইদুঁরের চলা। এখানে "Les pattes" বললে ইঁদুরের পা থাকবে, কিন্তু চঞ্চলতা থাকবে না। রবীন্দ্রনাথ যেমন প্রথম জীবনে "Woodbine"-কে "মল্লিকা" করেছিলেন, কিন্তু পরবর্তীকালে 'সাধনা'-য় হাইনের একটি অনুবাদে "নীল বায়োলেট নয়ন" বলে বিদেশি শব্দই ব্যবহার করেছে।

এই প্রসঙ্গে আর একটি সমস্যার কথাও বলতে কবি স্বয়ং যদি তাঁর কোনো লেখার অনুবাদে ব্রতী হন, তাহলেও যে এ-ধরনের কিছু সমস্যা হবে না এমন নয়। ফলত, অন্য কেউ অনুবাদ করতে গেলে, তিনি মূলের প্রতিটি শব্দ, চিত্রকল্প, বাক্প্রতিমা ইত্যাদি সম্পর্কে যতটা সাবধানতা অবলম্বন করবেন (অন্তত করতে চেষ্টা করবেন) সেটা কবি স্বয়ং অনুবাদ করলে সম্ভাব্য নয় যে, তার প্রমাণ জীবনানন্দ দাশের 'বনলতা সেন' কবিতার স্ব-কৃত অনুবাদ।

উদাহরণ হিসেবে দেখুন :

১(ক) "আমি ক্লান্ত প্রাণ এক চারিদিকে জীবনের সমুদ্র সফেন
আমারে দু-দন্ড শান্তি দিয়েছিল নাটোরের বনলতা সেন।"

(খ) "At moments when life was too much of sounds
I had Banalata Sen of Natore and her wisdom."

কবির স্ব-কৃত এই অনুবাদে "ক্লান্ত প্রাণ" এবং "জীবনের সমুদ্র সফেন" নিরুদ্দেশ এবং "দু-দন্ড শান্তি"-র বদলে "wisdom" ব্যবহৃত হয়ে ছবিটাই বদ্‌লে গেল। অথচ, দ্বিতীয় কোনো অনুবাদক এখানে যে রকম করেছেন, তা প্রায় মূলানুগ :

(গ) "I'm a weary soul : the foamy waves of life wafted at large
I had a momentary bliss with Banalata; she came from Natore."

২(ক) “.... বলেছে সে, এত দিন কোথায় ছিলেন?”

পাখির নীড়ের মতো চোখ তুলে নাটোরের বনলতা সেন।”

(খ) “I have also seen her, Banalata Sen of Natore.”

মূলে, বনলতার ঐ প্রশ্ন এবং পাখির নীড়ের সঙ্গে উপমিত তার চোখে—এই দুয়ে মিলে যে-বাক্‌প্রতিমা গড়েছে, সেই অনবদ্য ভাবনাটি কবির নিজের অনুবাদে একেবারে নিশ্চিহ্ন! অথচ, অন্য অনুবাদক সেটাকে সাধ্যমতো রাখারই প্রয়াসী হয়েছেন ঃ

(গ) “......She, lifting her nestling eyes

Asked me, ‘Where hast thou been so long, Monsieur?’

She, that Banalata of Natore.’

—“এতদিন কোথায় ছিলেন?” -এর মধ্যে সম্বোধনের দূরত্ব এবং সম্পর্কের নৈকট্য যেভাবে সমন্বিত আছে, অনুবাদে সেটা মেলানো অত্যন্ত দূরহ; তবু ফরাসি ‘মঁসিয়ে’ খানিকটা কাছাকাছি যায়, যা ইংরেজি ‘স্যার’-এ আসে না। “নেস্‌লিং আইজ” “পাখির নীড়ের মতো চোখ”—এর ভাবানুবাদ; ‘নেস্ট-লাইক’ বা ‘নেস্টলি’ করলে—মূলের আরও কাছাকাছি যেত ঠিকই, কিন্তু প্রথম শুদ্ধ হলেও গদ্যময়, দ্বিতীয়টি শ্রুতিমধুর বটে, কিন্তু অশুদ্ধ শব্দ! [(গ) - অংশগুলি পল্লব সেনগুপ্তের অনুবাদ]

আসলে, নিজের কবিতা নিজে অনুবাদ করলে প্রায় ক্ষেত্রেই যে, সেটি ‘অনুবাদ’ না হয়ে নূতন একটি কবিতায় পরিণত হয়, সেটাই এর থেকে প্রমাণিত হচ্ছে। এ জিনিস যে হামেশাই ঘটে তার সবচেয়ে বড় প্রমাণ রবীন্দ্রনাথের ‘গীতাঞ্জলি’ এবং তাঁর নিজের অনূদিত ইংরেজি ‘Gitanjali’-যা নিয়ে বিশদভাবে পরে আলোচনা করা হয়েছে।

১১০.৪ সারাংশ—১

একটি ভাষা থেকে আরেকটি ভাষায় কোনো সাহিত্য অনুবাদ করতে গেলে ভাষাগত, ভাবগত, শব্দবিন্যাসগত নানা সমস্যার উদ্ভব হয়।

অনুবাদের একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল ভাষার ভঙ্গি বা স্টাইল। দুটি ভিন্ন ভাষা প্রকাশের পথ সম্পূর্ণ আলাদা, তাদের মধ্যে শব্দ ও প্রতিশব্দের মিলও পাওয়া যায় না। আবার বাংলাতে বিশেষণ বাক্যাংশ যেমন কর্তৃপদের আগে বসে, ইংরেজিতে বিশেষণ সমেত কর্তৃপদ প্রথমে বসে, তারপরে বিশেষণ বাক্যাংশ বসে। ইংরেজিতে ক্রিয়াপদ কর্তার কিছু পরে, কখনো আগে বসে। আর বাংলায় ক্রিয়াপদ বাক্যের শেষে বসে।

অনুবাদকের ক্ষেত্রে আরেকটি সমস্যা হল শিল্পরূপায়ণের। এছাড়া ছন্দগত দিক থেকেও অনুবাদকালে কিছু সমস্যা দেখা যায়। উচ্চারণ রীতি অনুসারে এক ভাষার সঙ্গে অন্য ভাষার ঝোঁকের একটা পার্থক্য থাকে। সেজন্য একভাষার কবিতার ছন্দকে অন্যভাষার কবিতায় অনুবাদ করা কঠিন হয়ে যায়, আবার একটি কবিতাকে গদ্যে অনুবাদ করা হলে, কবিতার যে তান আছে, তাও অনুবাদে পাওয়া যায় না।

১১০.৫ অনুশীলনী—১

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন। উত্তর শেষে উত্তরমালার সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন।

১. **শূন্যস্থান পূরণ করুন :**

(ক) ইংরেজিতে —— কিছু পরে, কখনো বা আগে সাধারণত —— বসে।

(খ) অনুবাদকের ক্ষেত্রে কঠিনতম সমস্যা হল ——।

২. **সঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দিন।**

(ক) বিশেষণ বাক্যাংশ বাংলায় ব্যবহৃত হয় কর্তৃপদের—

(১) আগে

(২) পরে

(৩) সঙ্গে।

(খ) বাংলায় ক্রিয়াপদ বসে বাক্যের —

(১) আগে

(২) শেষে

(৩) মাঝে।

৩. অনুবাদকালে কী-কী সমস্যার উদ্ভব হতে পারে, তা নিজের ভাষায় লিখুন।

৪. অনুবাদকালে ছন্দগত দিক থেকে কী ধরণের সমস্যা হতে পারে, তা বর্ণনা করুন। কীভাবে তার সমাধান করা যায়, তাও দেখান।

৫. অনুবাদের সময়ে মূলের কোনো শব্দ বা চিত্রকল্পকে হুবহু ভাষান্তরিত না-করা গেলে, কী করা বাঞ্ছনীয় বলে মনে হয়?

৬. লেখক স্বয়ং অনুবাদে ব্রতী হলে কী ধরনের সমস্যা ঘটিতে পারে তার আলোচনা করুন।

১১০.৬ মূলপাঠ ২ — অনুবাদের সমস্যার সমাধান

অনুবাদের যেমন নানা প্রকার সমস্যা আছে, তেমনি সেই সমস্যার সমাধানও আছে।

অনুবাদের সাফল্যের পেছনে একটা বড় ভূমিকা নিয়ে থাকেন রসাস্বাদনের অংশীদার সাধারণ পাঠক। সচরাচর তাঁরা মূল রচনার ভাষার সঙ্গে অপরিচিত, মূল রচনার দেশ-কাল-পরিবেশ ব্যাপারে অজ্ঞ। তাঁরা অনুবাদে উপভোগ্য রস চাইবেন। তাই অনুবাদক যখন ভিন্ন ভাষা, ভিন্ন পরিবেশ এবং ভিন্ন সংস্কৃতিতে গড়ে ওঠা কোনো সাহিত্যকে অনুবাদ করতে যান, তখন যদি তিনি তার মধ্যে নিজের দেশের সংস্কৃতিকে ফুটিয়ে তুলতে না পারেন, তবে সেই অনুবাদ পাঠকের রসসংবেদন করতে ব্যর্থ হবে। এর ফলে অনুবাদকের উদ্দেশ্য এবং পাঠকের উদ্দেশ্যের মধ্যে বিরোধ ঘটবে। এই সমস্যার সমাধানে অনুবাদককে কয়েকটি উপায় গ্রহণ করতে হয়—তা হল গ্রহণ, বর্জন ও পরিমার্জনা, বার্নসের ''ও ফিলি'' কবিতা থেকে রবীন্দ্রনাথকৃত অনুবাদ থেকে এর উদাহরণ দেওয়া যায়—

"The Woodbine in the dewy wit"
''শিশিরাক্ত পত্রকোলে মল্লিকা হাসিত''

উদাহরণটিতে "Woodbine" পরিণত হয়েছে ''মল্লিকা''-য়। কারণ ''মল্লিকা'' নামটি বাঙালি পাঠকের অনেক কাছাকাছি। "wit"-এর বিকল্পে 'হাসিত' শব্দটি নতুন গ্রহণ হয়েছে। এই গ্রহণ মূল অর্থকে বিঘ্নিত না করেই পরিমার্জনা করা হয়েছে।

একটি শ্রেষ্ঠ সাহিত্যে প্রতিটি শব্দের অবস্থান, অনুক্রম, স্বর ও ব্যঞ্জনধ্বনির বন্টন, সবকিছুই একটা ঐক্যসুষমায় বিধৃত থাকে। যেমন একটি বিদেশি ভাষায় রচিত কবিতার অনুবাদে শ্রেষ্ঠ কবির অনুবাদও কখনো পরিপূর্ণভাবে মূলানুগত্য রক্ষা করতে পারে না। তখন অনুবাদকের কল্পনাশক্তি ও কাব্যচেতনা, যতটা সম্ভব শব্দের পরিমার্জনা বা নতুন শব্দ প্রয়োগের উপায়কে গ্রহণ করে। এসব ক্ষেত্রে অনুবাদকের কল্পনাশক্তি, নতুন শব্দ প্রয়োগ মূল কবির কাছাকাছি হলে, শব্দের গ্রহণ, বর্জনের মধ্যে দিয়েও মূল কবিতার ভাব; রূপ, রস লাভ করা যায়।

তাই পাঠক মনোরঞ্জনই সবসময় অনুবাদের মূল লক্ষ্য নয়। অনুবাদক একটি রচনা পড়ে যে-আনন্দ উপভোগ করেন, সেই আনন্দ-ই তাঁকে অনুবাদকর্মে প্রেরণা দেয়। এর ফলে মূল রচনাকার এবং অনুবাদকের মধ্যে উদ্দেশ্যের বিরোধিতা থাকে না, আবার পাঠকের সঙ্গে যেটুকু বিরোধ, তাও গৌণ হয়ে যায় এবং তখনই অনুবাদ এক নতুন শিল্প হয়ে ওঠে।

অনুবাদচর্চায় অনুবাদকের উদ্দেশ্য তাঁর অনুবাদের সার্থকতার ক্ষেত্রে যে গুরুত্বপূর্ণ, সে বিষয়ে তিনটি সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া যায় :

১. মূল রচনাকারের উদ্দেশ্যের সঙ্গে অনুবাদকের উদ্দেশ্যের বিরোধ ঘটলে অনুবাদ হয় পঙ্গু, রসরিক্ত।

২. মূল রচনাকারের উদ্দেশ্যের সঙ্গে অনুবাদকের উদ্দেশ্যের সঙ্গে অনুবাদকের উদ্দেশ্যের বিরোধিতা না থেকেও কিছু ভিন্নতা থাকলে অনুবাদে মূলানুগত্যের দিকে যত্ন হয় কম, যদিও অনুবাদকের উদ্দেশ্যের মধ্যে সাহিত্যচর্চা ও রসের উপভোগই প্রধান হলে — অনুবাদ সাহিত্য হিসেবে উপভোগ্য হয়ে ওঠে।

৩. মূল রচনাকারের উদ্দেশ্যের সঙ্গে অনুবাদকের উদ্দেশ্যের একপ্রাণতা ঘটলে অনুবাদে ভিন্ন ভাষা, ভিন্ন দেশজ সংস্কার রক্ষা করেও যথাসম্ভব মূলানুগত্য এবং রচনার সার্বিক সৌন্দর্য রক্ষা সম্ভব হয়।

সংস্কৃত থেকে অনুবাদ করার সময়, লেখায় সংস্কৃত ও প্রাকৃত শব্দের মাত্রাবিতরণ কী রকম থাকবে, সেই সমস্যার কথা আগেই বলা হয়েছে। এখানে বলা যেতে পারে, এখন আমরা পুরোপুরি বাংলাতেই লিখে থাকি, অর্ধেক সংস্কৃতে নয়, — সন্ধি ও সমাসের পরিমাণ আধুনিক বাংলায় অনেক কমে গেছে, দীর্ঘ সমাসের ব্যবহার প্রায় লোপ পেয়েছে, যতি-চিহ্নের প্রয়োগ অনেক বেড়েছে এবং শব্দব্যবহারে সংস্কৃত ও দেশজের মিশ্রণ অনেক বেড়েছে। বুদ্ধদেব বসু তাঁর মেঘদূতের অনুবাদে তাই আধুনিক বাংলার পাশাপাশি 'অম্বু', 'অম্ভোজ' — ইত্যাদি শব্দ যা আধুনিক বাংলায় অপ্রচলিত, তাও ব্যবহার করেছেন। এছাড়া 'যুবতী-জল-কেলি-সৌরভ' ইত্যাদি দীর্ঘ সমাসও ব্যবহার করেছেন। এর পাশাপাশি 'যবে', 'পুন' ইত্যাদি কাব্যিক শব্দ, 'ললনা', 'অঙ্গনা', 'প্রমদা' ইত্যাদি প্রতিশব্দও অনুবাদে ব্যবহার করেছেন। এইভাবে খাঁটি বাংলার পাশাপাশি সংস্কৃত ভাষা ও ভঙ্গির মিশ্রণে অনুবাদটি সার্থক হয়ে উঠেছে। প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য, সুধীন্দ্রনাথ দত্ত ব্যাপকভাবে সংস্কৃত শব্দ — যাদের অনেকগুলিই অপ্রচলিত—ব্যবহার করেছেন। বরং বিষ্ণু দে অনুবাদে প্রচলিত—এমনকী লৌকিক বাক্রীতি-নির্ভর শব্দও প্রয়োগ করেছেন অনেক সময়। এই সূত্রে বলি : সুধীন্দ্রনাথের 'প্রতিধ্বনি', বিষ্ণু দের 'হে বিদেশী ফুল', 'এলিয়টের কবিতা', বুদ্ধদেবের 'শার্ল বোদলেয়ারের কবিতা', 'হ্যেল্ডার্লিনের কবিতা', 'রাইনার মারিয়া রিলকের কবিতা', প্রেমেন্দ্র মিত্রের 'হুইটম্যানের কবিতা', অলোকরঞ্জন দাশগুপ্ত ও দেবীপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায়ের সম্পাদিত সংকলন 'সপ্তসিন্ধু দশদিগন্ত', নন্দগোপাল সেনগুপ্তের 'Book of Bengali Verse'-ইত্যাদি বই গত কয়েক দশকের উল্লেখযোগ্য কাব্যানুবাদ সংগ্রহ।

হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় শেক্সপিয়ারের ‘রোমিও জুলিয়েট’ নাটকের অনুবাদ করতে গিয়ে অনুবাদচর্চার আদর্শ সম্বন্ধে যে উক্তি করেছেন, তার থেকেই অনুবাদ করতে গেলে যেসব সমস্যার উদ্ভব হয় তাদের কয়েকটি সমাধান পাওয়া যায়। সেগুলি হল, —

(১) বিদেশি সাহিত্যের অনুবাদচর্চা একান্তই প্রয়োজনীয়। তবে বিদেশি স্থান-কাল ও রুচিগত ঐতিহ্য — স্বদেশের স্থান-কাল ও রুচিগত ঐতিহ্যের সঙ্গে বিরোধ সৃষ্টি করতে পারে। তাই অনুবাদককে দেশের পাঠকের রুচির দিকে লক্ষ্য করে অনুবাদের পরিমার্জনা, পরিবর্তন করতে হবে।

(২) মূল রচনার স্থান ও ব্যক্তিনাম অনুবাদে পরিবর্তন করা যেতে পারে, কিন্তু চরিত্র, মূলভাব ও মূলকাহিনি যথাসাধ্য রক্ষিত হওয়া প্রয়োজন। তবে স্বয়ং হেমচন্দ্রই যে, রোমিও-জুলিয়েটের কাহিনিতে কলকাতার গড়ের মাঠের উল্লেখ করেছেন, তেমন রূপান্তরণ আদৌ বাঞ্ছিত নয়।

(৩) যথাযথ অনুবাদের জন্য, অনুবাদকে উন্নত করার জন্য অনুবাদক স্থানে-স্থানে নিজস্ব কল্পনার আশ্রয়ও নিতে পারেন।

অনুবাদের সময় অনুবাদক ও রচনাকারের মধ্যে যখন প্রকাশ ভাবনার ক্ষেত্রে বিরোধ থাকে না, তখনই সার্তক অনুবাদের সৃষ্টি হয়ে থাকে। তার প্রভাব অনুবাদকের মনকে যেমন উদ্দীপ্ত করে, তেমনি সমকালীন পাঠকের সাহিত্য-মানসেও তার প্রভাব সঞ্চারিত হয়। সমকালীন পাঠকের দাবী ও সংস্কারের সঙ্গে অনুবাদকের সম্ভাব্য বিরোধগুলি যথাসম্ভব অতিক্রান্ত হলে—অনুবাদকের ভাব ও রূপের আস্বাদন সমকালীন পাঠকের কাছে নতুন এক সাহিত্য ঐতিহ্য হিসেবে প্রতীত হয়ে ওঠে। সূক্ষতরভাবে এই প্রভাব সঞ্চারিত হয় সাহিত্যিক ও কবিদের মধ্যে, যাঁরা নতুন ভাবস্পন্দন ও রসের সন্ধান করেন। অনূদিত সাহিত্য অনুবাদের ভাষার সাধারণ অনুষঙ্গ ও ধ্বনিতরঙ্গের মধ্যে অন্বিত হলে উন্মেষশীল সাহিত্য নির্মাতাদের প্রভাবিত করে; সাহিত্যে নতুন ভাব ও আঙ্গিক নির্মাণে, শব্দের নতুন ব্যঞ্জনা, তাঁদের সাহিত্য চেতনায় এনে দেয়। সামগ্রিকভাবে এক নতুন ভাব-ঐশ্বর্য সেই ভাষার সাহিত্যে সংযোজিত হয়।

অনুবাদের বৃহত্তর সার্থকতা এই যে, তা সার্বিকভাবে ভাষাকে সমৃদ্ধ করে, এক নতুন সৌন্দর্যের জগৎ সেই ভাষাভাষী পাঠকের চেতনায় সঞ্চারিত হয়। যে-রূপ আমাদের চোখে ধরা পড়েনি, সার্থক অনুবাদের মধ্যে দিয়ে তার অভিনব আবির্ভাব আমাদের নান্দনিক-চৈতন্যকে পরিপূর্ণভাবে ঋদ্ধিমান করে তোলে।

১১০.৭ সারাংশ—২

সাধারণ পাঠকরাই একটি অনুবাদের সাফল্যের বিচার করার ক্ষেত্রে বড় ভূমিকা নিয়ে থাকেন। তাই অনুবাদক যদি অনুবাদে নিজের দেশের সংস্কৃতিকে ফুটিয়ে তুলতে না পারেন, তবে তা পাঠকের রসসংবেদন করতে ব্যর্থ হবে। তখন অনুবাদকের উদ্দেশ্য এবং পাঠকের উদ্দেশ্যের মধ্যে বিরোধ ঘটবে, এজন্য অনুবাদকালে উদ্ভূত সমস্যার সমাধানের জন্য প্রথমেই অনুবাদককে মূল রচনার গ্রহণ, বর্জন ও পরিমার্জনা করতে হয়।

তবে সবসময় শুধু পাঠকই কোনো অনুবাদের মূল লক্ষ্য নন। অনুবাদক একটি রচনা পাঠ করে যে-আনন্দ উপলব্ধি করেন, তাই তাঁকে অনুবাদ করতে প্রেরণা দেয়। এর ফলে মূল রচনাকার এবং অনুবাদকের উদ্দেশ্যের মধ্যে কোনো বিরোধিতা থাকে না এবং অনুবাদ এক নতুন শিল্পকর্ম হয়ে ওঠে। কারণ মূল রচনাকার এবং অনুবাদকের উদ্দেশ্যের মধ্যে বিরোধ ঘটলে অনুবাদ হয় পঙ্গু।

তবে আদর্শ অনুবাদের সার্থকতা এই যে, তা ভাষাকে সমৃদ্ধ করে এবং আমাদের নান্দনিক চৈতন্যকে সমৃদ্ধ করে তোলে।

১১০.৮ অনুশীলনী—২

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর দিন। উত্তরশেষে, প্রদত্ত উত্তরমালার সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন।

১. শূন্যস্থান পূরণ করুন :

(ক) অনুবাদের সাফল্যের পেছনে একটা বড় ভূমিকা নিয়ে থাকেন রসাস্বাদনের অংশীদার সাধারণ ——।

(খ) অনুবাদের সময় অনুবাদক ও —— মধ্যে যখন বিরোধ থাকে না, তখন —— নবসৃষ্টি হয়ে থাকে।

২. সঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

(ক) সন্ধি ও সমাসের পরিমাণ আধুনিক বাংলায় —

(১) কমেছে

(২) বেড়েছে

(৩) একইরকম আছে

(খ) শেক্সপিয়রের 'রোমিও অ্যান্ড জুলিয়েট' নাটকের অনুবাদ করেছেন—

(১) হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

(২) রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

(৩) বুদ্ধদেব বসু

৩. অনুবাদকালে কৃত সমস্যার সমাধান কীভাবে করা যেতে পারে, তা নিজের ভাষায় বর্ণনা করুন।

৪. অনুবাদ কীভাবে এক নতুন ধরণের শিল্প হয়ে উঠতে পারে, তা নিজের ভাষায় লিখুন।

১১০.৯ উত্তরমালা

অনুশীলনী—১

১. (ক) কর্তার, ক্রিয়াপদ।

(খ) শিল্পরূপায়ণের।

২. (ক) আগে

(খ) শেষে

৩ এবং ৪ সংখ্যাক প্রশ্নের উত্তরের জন্য মূলপাঠ ১-এর প্রতিটি অনুচ্ছেদ ভালো করে পড়ুন, তাহলেই উত্তর লিখতে পারবেন।

৫ এবং ৬ সংখ্যক প্রশ্নের উত্তরের জন্য '২, ৩' অংশের শেষ দিকের অনুচ্ছেদগুলি ভালভাবে পড়ুন।

অনুশীলনী—২

১. (ক) পাঠক।

(খ) রচনাকারের, অনুবাদের।

২. (ক) কমেছে।

(খ) হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

৩ এবং ৪ সংখ্যক প্রশ্নের উত্তরের জন্য মূলপাঠ ২-এর প্রতিটি অনুচ্ছেদ ভালো করে পড়ুন, তাহলেই উত্তর লিখতে পারবেন।

১১০.১০ গ্রন্থপঞ্জি

১. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর — অনুবাদচর্চা (রবীন্দ্র রচনাবলী ১৪ খণ্ড);

২. কালিসাধন মুখোপাধ্যায় — পাশ্চাত্য কবিতার অনুবাদে রবীন্দ্রনাথ;

৩. বুদ্ধদেব বসু — কালিদাসের মেঘদূত;

৪. পল্লব সেনগুপ্ত — অনুবাদের ভাষা : কবিতার অনুবাদ (রবীন্দ্রভারতী বিশ্ববিদ্যালয় বাংলা বিভাগীয় পত্রিকা, ৭ম-৮ম সংখ্যা, ১৯৯০;

৫. মঞ্জুভাষ মিত্র — আধুনিক বাংলা কবিতায় ইয়োরোপীয় প্রভাব।

একক ১১১ ❑ রূপান্তর — রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর গীতাঞ্জলি — মূল ও অনুবাদ

গঠন

১১১.১ উদ্দেশ্য

১১১.২ প্রস্তাবনা

১১১.৩ মূলপাঠ ১ — রবীন্দ্রসাহিত্যে রূপান্তর

১১১.৪ সারাংশ ২— গীতাঞ্জলি : মূল ও অনুবাদ

১১১.৫ সারাংশ

১১১.৬ অনুশীলনী

১১১.৭ উত্তরমালা

১১১.৮ গ্রন্থপঞ্জি

১১১.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি যত্নসহকারে পাঠ করলে আপনি, —

- সাহিত্যের রূপান্তর সম্পর্কে ধারণা করতে পারবেন।
- রবীন্দ্রসাহিত্যে রূপান্তরের বিভিন্ন প্রক্রিয়া সম্পর্কে অবগত হবেন।
- ‘গীতাঞ্জলি’-র মূল ও অনুবাদের মধ্যে যা পার্থক্য আছে সে সম্পর্কে ধারণা করতে পারবেন।
- ‘Gitanjali’ গ্রন্থটি সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে এবং বিভিন্ন ব্যক্তি এবং পত্রপত্রিকার মতামত সম্পর্কে আপনারা অবগত হবেন।

১১১.২ প্রস্তাবনা

এই এককটিতে রবীন্দ্রসাহিত্যে রূপান্তর সম্পর্কে মূলপাঠ-১ আলোচনা করা হয়েছে রূপান্তরের বিভিন্ন যেসব প্রক্রিয়া রবীন্দ্রসাহিত্যে পাওয়া যায় সে-সম্পর্কেও এখানে আলোচনা আছে।

এককটির দ্বিতীয় অংশে রবীন্দ্রনাথের ভাষান্তরকালীন অনুবাদের মধ্যে সবচেয়ে বড়ো কৃতিত্ব 'Gitanjali' সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে, 'Gitanjali' সম্পর্কে বিভিন্ন ব্যক্তি এবং পত্রপত্রিকাতে প্রকাশিত মতামতও এখানে পাওয়া যাবে। পাশাপাশি দুটি কবিতা ধরে এখানে তুলনামূলক আলোচনা করা হয়েছে এবং শেষে রবীন্দ্রনাথের অনুবাদ সম্পর্কে এজরা পাউন্ডের মতামত এখানে আলোচনা করা হয়েছে।

আপনি এই এককটি ভালো করে পাঠ করুন। তাহলে আপনি রবীন্দ্রসাহিত্যে রূপান্তর সম্পর্কে যেমন ধারণা করতে পারবেন, তেমনি তার বিষয়ে আলোচনাও করতে পারবেন। বিষয়বস্তুটি সহজ করে আলোচনা করা হয়েছে। তাই বুঝতে আপনার কোনো অসুবিধা হবে না। ভালো করে এককটি পাঠের পরে অনুশীলনীর উত্তর দিতে চেষ্টা করুন, প্রয়োজনে উত্তর-সংকেত মিলিয়ে দেখুন।

১১১.৩ মূলপাঠ ১—রবীন্দ্রসাহিত্যে রূপান্তর

সাহিত্যিকগণ অনেক সময় তাঁদের রচনার মূল, প্রাচীন রচনা থেকে নিয়ে নিজের প্রয়োজনে এবং রুচি অনুসারে পরিবর্জন, পরিবর্তন, পরিবর্ধন এবং নতুন অর্থ আরোপ করে থাকেন। একে রূপান্তর বলা যেতে পারে। এই রূপান্তর-প্রক্রিয়ার দ্বারা পুরোনো কাহিনি স্বকীয় হয়ে ওঠে এবং এই স্বকীয়তার মধ্যে কবির বিশেষ পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু অনুবাদের ক্ষেত্রে, সাহিত্যিকগণ একটি ভাষার রচনাকে আরেকটি ভাষায় অনুবাদ করে থাকেন। অবশ্য সেক্ষেত্রে তিনি ইচ্ছামতো মূল রচনার গ্রহণ, বর্জন এবং পরিমার্জন করতে পারেন।

রূপান্তর-প্রক্রিয়া এত ব্যাপকভাবেও হতে পারে যে, মূল এবং রূপান্তরিত অংশের তুলনা করলে বহু সময়েই দুটিকে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র সৃষ্টি বলে মনে হতে পারে। যেমন—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'রাজা ও রাণী' এবং 'তপতী' নাটক দুটি, এর পাশাপাশি রূপান্তর প্রক্রিয়ার সাহায্যে একটি রচনার অনেক'টি রূপও পাওয়া যায়। কিন্তু অনুবাদের প্রক্রিয়া এত ব্যাপকভাবে কখনোই হতে পারে না যে, মূল রচনা এবং অনূদিত রচনা দুটিকে পৃথক রচনা বলে মনে হবে।

রূপান্তরে বিভিন্ন প্রক্রিয়া লক্ষ করা যায়। যেমন—উপন্যাস থেকে নাটক, গল্প থেকে নাটক, কাব্যকবিতা থেকে নাটক, পদ্যনাটক থেকে গদ্যনাটক ইত্যাদি। অনুবাদেরও বিভিন্ন প্রক্রিয়া আমরা লক্ষ করি। যেমন—আক্ষরিক অনুবাদ, ভাবানুবাদ, বিকৃত অনুবাদ, সংক্ষিপ্ত অনুবাদ ইত্যাদি।

অনুবাদ করার সময়ে সাহিত্যিকদের একটি বড় দায়িত্ব থাকে। সাধারণভাবে প্রত্যেক সাহিত্যপাঠকের পক্ষে অনেকগুলি ভাষা শেখা সম্ভব নয়। তাই পারস্পরিক সাহিত্যের বিনিময়ের মধ্যে দিয়ে অর্থাৎ অনুবাদের মধ্যে দিয়ে একটি দেশের সাহিত্য অন্য সমৃদ্ধ দেশের সাহিত্যের কাছ থেকে চিন্তাভাবনা এবং সৃষ্টিকর্মে দক্ষতা গ্রহণ করতে পারে। কিন্তু রূপান্তর করার সময় সাহিত্যিকদের তেমন কোনো বড় দায়িত্ব থাকে না।

রবীন্দ্রসাহিত্যে রূপান্তর

আমাদের পৃথিবীতে যেমন অসংখ্য ভূ-স্তর বর্তমান, তেমনি রবীন্দ্রনাথের অনেক রচনায় বর্তমান আকারের অন্তরালে নানা সংস্কার-সংশোধনের ইতিহাস রয়ে গেছে। এই সংস্কার-সংশোধনের ইতিহাস ছড়িয়ে আছে অভিনয়কালে ব্যবহৃত কপিতে কবিকর্তৃক সংশোধনে আবার কখনো বা পাণ্ডুলিপিতে।

এই রূপান্তর বিভিন্ন ভাবে হতে পারে। যেমন—গল্প থেকে নাটক, উপন্যাস থেকে নাটক, কাব্যকবিতা থেকে নাটক, গদ্যনাটকের রূপান্তর, পদ্যনাটক থেকে গদ্যনাটক, গীতিনাট্যে-নৃত্যনাট্যে রূপান্তর, ভাষান্তরকালীন রূপান্তর ইত্যাদি।

প্রথমেই আমাদের আলোচনার বিষয় গল্প থেকে নাটকের রূপান্তর। রবীন্দ্রনাথ তাঁর পাঁচটি গল্পকে নাট্যরূপ দিয়েছিলেন। 'মুকুট' নামে বড় গল্পটিকে তিনি 'মুকুট' নাটকে রূপান্তর করেছিলেন। বড়গল্পটিতে এগারোটি পরিচ্ছেদ এবং একটি পরিশিষ্ট অংশ আছে; আর নাটকটিতে আছে তিনটি অঙ্ক এবং বারোটি দৃশ্য। গল্পটি ট্র্যাজেডিমূলক, আর নাটকটি মিলনাত্মক। এর পরবর্তী গল্প 'শেষের রাত্রি'। যা থেকে রূপান্তরিত হয়ে 'গৃহপ্রবেশ' নাটকটি রচিত হয়েছিল। গল্পের ক্ষুদ্র-ক্ষুদ্র অংশগুলিকে ঘটনা, চরিত্র ও সংলাপের বহুলতার দ্বারা এক-একটি নাটকীয় দৃশ্যে রূপান্তরিত করা হয়েছে। 'কমফল' গল্পটির নাট্যরূপের নাম 'শোধবোধ'। গল্পটি পাত্র-পাত্রীর সংলাপের মধ্যে দিয়েই এগিয়ে গেছে। গল্পটিতে নাটকের মতোই পরিচ্ছেদের ভাগ করা হয়েছে, তাই গল্পটিকে নাটক রূপ দিতে গিয়ে রবীন্দ্রনাথের বিশেষ কোনো কষ্ট হয়নি। গল্পে বর্ণিত ভাদুড়ি পরিবার নাটকে লাহিড়ি পরিবার হয়েছে। নাটকের প্রথম দৃশ্যে নলিনীর জন্মোৎসব বিবরণ সম্পূর্ণ নতুন সংযোজন। পরবর্তী একটি 'আষাঢ়ে গল্প' অবলম্বনে রবীন্দ্রনাথ 'তাসের দেশ' নাটকটি রচনা করেছিলেন। গল্প থেকে নাটকটির রূপান্তর শুধু রূপান্তর নয়, যেন নবজন্ম হয়েছে।

গল্পটি হরতনের বিবির সঙ্গে রাজপুত্রের প্রণয় এবং পরিণয়ের মধ্যে দিয়ে শেষ হয়েছে। নাটকে তা পাওয়া যায় না। তবে নাটকটিতে তীব্রধার ব্যঙ্গ পাওয়া যায়, যা গল্পটিতে একেবারেই অনুপস্থিত। নাটকের শেষে যে সংস্কারের বন্ধনমুক্তি এবং নবজীবনের উদ্ভাস দেখানো হয়েছে, তা গল্পে আদৌ ছিল না। নাটকটির মধ্যে গানগুলি নতুন যোগ হয়েছে। ‘মুক্তির উপায়’ গল্পটিকে ‘মুক্তির উপায়’ নাম দিয়েই রবীন্দ্রনাথ নাটকে রূপান্তরিত করেছেন। গল্পে কোনো গুরুর অস্তিত্ব না থাকলেও, নাটকটিতে গুরুর আবির্ভাব ঘটেছে।

এরপরে আমাদের আলোচ্য, উপন্যাস থেকে নাট্যরূপান্তর। রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের উপন্যাস থেকে উপকরণ সংগ্রহ করেই নাটক রচনা করেছিলেন। এখানে প্রথম আলোচ্য উপন্যাস হল ‘বউঠাকুরানীর হাট’; এই উপন্যাসটির নাট্যরূপের তিনি নাম দিয়েছেন ‘প্রায়শ্চিত্ত’। উপন্যাসটির নাট্যকৃত রূপসম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন, ‘‘মূল উপন্যাসখানির অনেক পরিবর্তন হওয়াতে এই নাটকটি প্রায় নূতন গ্রন্থের মতোই হইয়াছে।’’ কিন্তু তা সত্ত্বেও উপন্যাসের পরিচ্ছেদগুলি প্রায় অক্ষুণ্ণভাবেই নাটকের দৃশ্যে রূপান্তরিত করা হয়েছে। নাটকে ধনঞ্জয় বৈরাগী চরিত্রটি নতুন। এই ধনঞ্জয় চরিত্রকে আমরা আবার পাই প্রায়শ্চিত্তের নবরূপ ‘পরিত্রাণ’ নাটকে। পরবর্তী ‘রাজর্ষি’ উপন্যাসের প্রথমাংশকে ‘বিসর্জন’ নাটকে রূপান্তরিত করা হয়েছে। উপন্যাসের পরবর্তী অংশের কাহিনি নাটকে অনুপস্থিত। উপন্যাসে যে ঐক্য ও সংহতির অভাব লক্ষ করা যায়, নাটকে সেই ঐক্য ও সংহতি এমন এক রূপ লাভ করেছে যে তার ফলে বাস্তবিকই বিস্মিত হতে হয়। উপন্যাসের নাম ‘রাজর্ষি’ হওয়ায় উপন্যাসে ঋষিকল্প রাজা গোবিন্দমাণিক্য গুরুত্ব পেয়েছিল, কিন্তু ‘বিসর্জন’ নাটকে জয়সিংহের অন্তর্দ্বন্দ্ব ও শেষে আত্মবিসর্জন দেওয়া প্রধান হওয়ায় জয়সিংহ-ই প্রধান চরিত্র হয়ে উঠেছে। উপন্যাসের অপ্রধান চরিত্র জয়সিংহই নাটকে প্রধান হয়ে উঠেছে। নাটকে নতুন চরিত্রগুলি হল চাঁদপাল, নয়ন রায়, গুণবতী, অপর্ণা ইত্যাদি। এছাড়া এখানে আছে ভাষাগত রূপান্তর। ভাষাগত পরিবর্তন দুভাবে হয়েছে। প্রথমত, যেখানে ‘রাজর্ষি’র গদ্যসংলাপকে ‘বিসর্জন’এও গদ্য রাখা হয়েছে। দ্বিতীয়ত, সেখানে ‘রাজর্ষি’র গদ্য সংলাপকে বিসর্জন’এ অমিত্রাক্ষর ছন্দে নিবন্ধ করা হয়েছে।

‘প্রজাপতির নির্বন্ধ’ উপন্যাসটিকে রবীন্দ্রনাথ ‘চিরকুমার সভা’ নামক প্রহসনে রূপান্তরিত করেছেন। প্রথমে উপন্যাসটির নাম ‘চিরকুমার সভা’-ই ছিল, পরে গ্রন্থাকারে প্রকাশকালে উপন্যাসটির নাম হয় ‘প্রজাপতির নির্বন্ধ’। উপন্যাসটি নাটকের মতোই সংলাপের পর সংলাপ সাজিয়ে লেখা হয়েছিল এবং নাটকের দৃশ্যের মতোই উপন্যাসের পরিচ্ছেদগুলি বিভক্ত। কিন্তু ‘প্রজাপতির নির্বন্ধ’ বহিরঙ্গে ‘আধানাটক’ হলেও, অন্তরঙ্গে তা কিন্তু উপন্যাস ছাড়া আর কিছু নয়।

এবারে কবিতা থেকে নাটকের রূপান্তরের বিষয়ে কিছু বলা যেতে পারে। ‘কবিকাহিনী’র সঙ্গে ‘ভগ্নহৃদয়’ এবং ‘ভগ্নহৃদয়’-এর সঙ্গে ‘নলিনী’ নাটকের গভীর সাদৃশ্য দেখে মনে হয়, এগুলি একই কাহিনির রূপান্তর। ‘কবিকাহিনী’ কাব্য, ‘ভগ্নহৃদয়’ নাটকাকারে কাব্য আর ‘নলিনী’ সম্পূর্ণভাবে নাটক। ‘কবিকাহিনি’ এবং ‘ভগ্নহৃদয়’ পদ্যে লেখা এবং ‘নলিনী’ গদ্যে লেখা হয়েছে। ‘ভগ্নহৃদয়’-এ অনিল ও ললিতার উপকাহিনী নতুন রচনা, যা ‘নলিনী’তে বর্জিত হয়েছে। নাটকে কবির নাম হয়েছে নীরদ, ভগ্নহৃদয়ে মুরলা হয়েছে নীরজা। ‘পূজারিণী’ কবিতার বিষয় অবলম্বন করে রবীন্দ্রনাথ ‘নটীর পূজা’ নাটকটি রচনা করেন। কবিতা এবং নাটকের গল্প মূলত এক। কবিতাতে শ্রীমতীর পূজা নিবেদনের উদ্যোগ দেখে বধু অমিতা এবং রাজকুমারী শুক্লার বিপরীত প্রতিক্রিয়া নাটকে নন্দা অজিতা ভদ্রা, বাসবী এবং রত্নবলীর মধ্যে দিয়ে প্রকাশিত হয়েছে। তবে এখানে বলা যেতে পারে কবিতার কাহিনিটুকু নিয়ে নাটকটি লেখা হলেও, তা সম্পূর্ণ নতুন করে লেখা।

এবারে আমাদের আলোচনার বিষয় পদ্যনাটক থেকে গদ্যনাটকের রূপান্তর। ‘রাজা ও রানী’ পদ্যনাটকটিকে রবীন্দ্রনাথ ‘তপতী’ নামক গদ্যনাটকে রূপান্তর করেছিলেন। পদ্যনাটকের সূচনায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, ‘‘এর নাট্যভূমিতে রয়েছে লিরিকের প্লাবন, তাতে নাটককে করেছে দুর্বল। এ হয়েছে কাব্যের জলাভূমি। ওই লিরিকের টানে এর মধ্যে প্রবেশ করেছে ইলা এবং কুমারের উপসর্গ। সেটা অত্যন্ত শোচনীয়রূপে অসঙ্গত। ‘রাজা ও রানী’ নাটকে কুমার ও ইলার প্রেমের বৃত্তান্ত যে লিরিকের প্লাবন এনেছিল ‘তপতী’ নাটকে সেই প্রেমের প্রতিধ্বনি নরেশ-বিপাশার প্রেমের উপাখ্যানে পাওয়া যায়। তবে তাতে গদ্যনাটকটিতে লিরিক ভাবরসের উপস্থিতি একটু কম হয়নি। ‘রাজা ও রানী’-তে সাতটি এবং ‘তপতী-তে মোট দশটি গান আছে। ‘রাজা ও রানী’-র সংলাপ অমিত্রাক্ষরে লেখা হলেও তার মধ্যে যে নাটকীয়তা আছে, ‘তপতী’ গদ্যে লেখা হলেও তার মধ্যে সেই নাটকীয়তা লক্ষ করা যায় না।

‘রাজা ও রানী’ থেকে ‘তপতী’-তে রূপান্তর শুধু ভারতীয় প্রত্যাবর্তন নয়। এই পরিবর্তন শেক্সপিয়র থেকে স্বকীয়তায় ফিরে আসা। ‘রাজা ও রানী’ নাটকে শেক্সপিয়রের সবচেয়ে বেশি প্রভাব পড়েছে। যেমন রেবতী নিঃসন্দেহে লেডি ম্যাকবেথের প্রতিচ্ছবি। ‘তপতী’-তে এই চরিত্রটি পরিত্যক্ত হয়েছে। ‘রাজা ও রানী’ নাটকে বিক্রমের অনুতাপের হাহাকারে যেখানে নাটক শেষ হয়েছে, ‘তপতী’ নাটকে সেখানে এক সুদূর অমৃতালোকের বিভায় নাটক শেষ হয়েছে।

এবার আমাদের আলোচ্য বিষয় গদ্যনাটক থেকে গদ্যনাটকের রূপান্তর। প্রথমেই আমাদের আলোচ্য ‘গোড়ার গলদ’ নাটক থেকে দীর্ঘ সাঁইত্রিশ বছর পরে ‘শেষরক্ষা’ নাটকের রূপান্তর শিশির কুমার ভাদুড়ীর অনুরোধে রবীন্দ্রনাথ এই রূপান্তর করেছিলেন। মূল নাটকে পাঁচটি অঙ্কে কুড়িটি দৃশ্য ছিল, রূপান্তরিত

নাটকে সেখানে চারটি অঙ্ক, সাতটি দৃশ্য আছে। সংলাপও যথাসম্ভব লঘু হয়েছে। যেমন 'গোড়ায় গলদ'-এর চতুর্থ অঙ্কের প্রথম দৃশ্যের আরম্ভে বিনোদবিহারী পনেরোটি বাক্য নিয়ে দীর্ঘ সংলাপ 'শেষরক্ষা'তে তিনটি বাক্যেই শেষ হয়েছে। তবে কয়েকটিক্ষেত্রে তা দীর্ঘও হয়েছে। এর পাশাপাশি 'গোড়ায় গলদ' নাটকে আছে একটি গান, আর 'শেষরক্ষা'তে আছে দশটি গান। 'শারদোৎসব' গদ্যনাটকটিকে 'ঋণশোধ' নামক গদ্যনাটকে রূপান্তর করা হয়েছিল। ১৯২১ সালে 'শারদোৎসব' নাটকের রূপান্তরিত রূপ রচিত হয়। রচনাবলীতে জানানো হয়েছে দুই নাটকের প্রধান পার্থক্য ঋণশোধের ভূমিকা ও শেখর চরিত্রের সন্নিবেশ। 'শারদোৎসব' নাটকে শরৎ প্রকৃতির আগমনের মধ্যে দিয়ে ধরণীর যে-আনন্দ প্রকাশিত তার অন্তরালে যে-তত্ত্বকথা লুকানো ছিল, তাই 'ঋণশোধ' নাটকে প্রধান হয়ে উঠেছে। রূপান্তরিত নাটকে শেখর চরিত্রের প্রাধান্যের জন্য সম্রাট বিজয়াদিত্য ও ঠাকুরদার গুরুত্ব কমে গেছে। 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকটির দুটি রূপান্তর পাওয়া যায় 'মুক্তধারা' এবং 'পরিত্রাণ'। 'মুক্তধারা' নাটকটি সম্পর্কে নাট্যকার নিজেই বলেছিলেন—নাটকের পাত্র ধনঞ্জয় এবং তার কথোপকথনের খানিকটা অংশ 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটক থেকে নেওয়া। 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকে যে-প্রজাবিদ্রোহের কাহিনি ছিল, তাই 'মুক্তধারা' নাটকে পরিপূর্ণ রূপ পেয়েছে। 'মুক্তধারা'-র রণজিৎ ও বিভূতি-কে একত্রে 'প্রায়শ্চিত্ত'-এর প্রতাপ বলা যেতে পারে। নাটকটির ঘটনাবলী 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকের মতো নানা জায়গায় ঘটেনি, সব ঘটনাই এখানে ঘটেছে পথ! 'প্রায়শ্চিত্ত' নাটকে পারিবারিক কাহিনিই প্রধান ছিল, সেই পারিবারিক কাহিনি নিয়েই গড়ে উঠেছিল 'পরিত্রাণ' নাটকটি। মূল নাটকের একাধিক ছোট ছোট দৃশ্যগুলি একসঙ্গে যোগ করে রূপান্তরিত নাটকের দৃশ্যগুলি দীর্ঘ করা হয়েছে। 'পরিত্রাণ' এর গদ্যসংলাপ 'প্রায়শ্চিত্ত' থেকে অবিকৃত ভাবে এসেছে। পরবর্তী আলোচ্য নাটক 'রাজা'। এই নাটকটির তিনটি রূপান্তরিত রূপ পাওয়া যায়। 'অরূপরতন', 'শাপমোচন কবিতা' এবং 'শাপমোচন কথিকা'।

প্রথমেই আসা যাক 'অরূপরতন' নাটকটির প্রসঙ্গে। রবীন্দ্রনাথ নিজেই বলেছেন 'অরূপরতন' নাটকটি 'রাজা' নাটকের সংক্ষিপ্ত সংস্করণ। 'রাজা' নাটকে রাজাকে দেখা না গেলেও তার ভূমিকা অপ্রধান নয়। কিন্তু 'অরূপরতন' নাটকে রাজার ভূমিকা একেবারে বাদ গেছে। 'রাজা' নাটকের শেষে ''আমরা অন্ধকারের প্রভুকে, আমার নিষ্ঠুরকে, আশার ভয়ানককে'' সুদর্শনা প্রণাম করেছিল। আর 'অরূপরতন' নাটকে প্রণামের পরেও আছে গান, 'শাপমোচন'-এর ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, ''যে বৌদ্ধ আখ্যান অবলম্বন করে 'রাজা' নাটক রচিত তারই আভাসে শাপমোচন কথিকাটি রচনা করা হল।'' 'শাপমোচন'-এ মূল ভাব অক্ষুণ্ণ থাকলেও কাহিনি পরিবর্তিত হয়ে গেছে, 'রাজা' ও 'অরূপরতন'-এর মতো এখানে নারী নয়, পুরুষই প্রিয়মিলনের জন্য উৎসুক হয়েছে। কবিতা থেকে কথিকায়-তথা-নৃত্যনাট্যে রূপান্তরকালে ঊনত্রিশটি নৃত্য সহযোগে গান ব্যবহৃত হয়েছে। মোটের ওপর 'শাপমোচন' গদ্যকবিতার রূপান্তর শাপমোচন গদ্যকথিকা।

'গুরু' নাটকের ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, ''সহজে অভিনয়যোগ্য করিবার অভিপ্রায়ে অচলায়তন নাটকটি গুরু নামে এবং কিঞ্চিৎ রূপান্তরিত ও লঘুতর আকারে প্রকাশ করা হইল।'' 'অচলায়তন' নাটক যেখানে পঞ্চক ও মহাপঞ্চকে সংলাপের মধ্যে দিয়ে শুরু হয়েছে, 'গুরু' নাটকে বালকদের কথোপকথনের মধ্যে দিয়ে নাটক শুরু হয়েছে। 'অচলায়তন-এর পরিহাসপ্রাধান্য থেকে 'গুরু'-তে আধ্যাত্মিক সত্যরূপায়ণের প্রবণতা—এই পরিবর্তনের জন্যই নাটকটির রূপান্তর করা হয়েছে। মূল নাটকের তৃতীয় দৃশ্য থেকে রাজার প্রবেশ, দাদাঠাকুরের নেতৃত্বে শোনপাংশুদের আক্রমণ সংবাদ, 'গুরু' নাটকে সুভদ্র-উপকাহিনির পরে যুক্ত হয়েছে। শোনপাংশুরা রূপান্তরিত নাটকে হয়েছে সূনক। অচলায়তনের পঞ্চক দৃশ্য হয়েছে গুরুর চতুর্থ দৃশ্য। 'গুরু' নাটকের শেষ গান ''ভেঙেছ দুয়ার, এসেছে জ্যোতির্ময়'' 'অচলায়তন'-এ ব্যবহৃত হয়নি।

এবার আসা যাক গীতিনাট্যের রূপান্তর-এ। প্রথমে আলোচনা করা 'বাল্মীকি প্রতিভা' ও 'কালমৃগয়া' গীতিনাট্য নিয়ে। দুটি নাটকই কবির পারিবারিক সাঙ্গীতিক পরিবেশের ফল এবং যৌথ রচনা 'বাল্মিকী প্রতিভা'-র প্রথম সংস্করণ থেকে বর্তমানে প্রচলিত 'বাল্মীকি প্রতিভা'-র রূপান্তর হয়েছে এবং সেই রূপান্তরকালে 'কালমৃগয়া' গীতিনাট্যের উপকরণ 'বাল্মীকি প্রতিভা'য় ব্যবহার করা হয়েছে। প্রথম সংস্করণের প্রথম দস্যুর ''আজকে তবে মিলে সবে করব লুটের ভাগ'' গানের আগে দ্বিতীয় সংস্করণে বনদেবীদের গান এবং প্রথম দস্যুর ''আঃ বেঁচেছি এখন'' গান যুক্ত হয়েছে। এর পাশাপাশি বালিকারূপিণী সরস্বতী ''এ কী ঘোর বনে'' গান গেয়ে প্রবেশ করেছে প্রথম সংস্করণে, কিন্তু দ্বিতীয় সংস্করণে এর আগে বালিকাকণ্ঠে ''ওই মেঘ করে বুঝি গগনে'' গানটি যুক্ত হয়েছে। প্রথম সংস্করণের তৃতীয় দৃশ্য দ্বিতীয় সংস্করণের পঞ্চম দৃশ্যে রূপান্তরিত হয়েছে। দ্বিতীয় সংস্করণের ''ব্যাকুল হয়ে বনে বনে'' গানটি সম্পূর্ণ নতুন গান। এই সংস্করণেরই চতুর্থ দৃশ্যে দস্যুদের শিকারবৃত্তান্ত কিছুটা নতুন করে লেখা, আর কিছুটা 'কালমৃগয়া'-র রূপান্তর। পরবর্তী আলোচিত গীতিনাট্যদ্বয় 'নলিনী' ও 'মায়ার খেলা'। রবীন্দ্রনাথ 'মায়ার খেলা' রচনাকালে কাহিনিগত উপকরণ যেমন 'নলিনী' থেকে নিয়েছেন, তেমনি তার পূর্বরূপ 'ভগ্নহৃদয়' থেকেও নিয়েছেন। 'ভগ্নহৃদয়ে'র নায়ক কবির নাম নেই, 'নলিনী'তে তার নাম নীরদ, 'মায়ার খেলা'-তে সেই হয়েছে অমর। তবে 'মায়ার খেলা' গীতিনাট্যে 'ভগ্নহৃদয়' বা 'নলিনী' থেকে ভাষা রূপান্তরিত করে গ্রহণ করা হয়নি।

গীতিনাট্যের পর নৃত্যনাট্যের রূপান্তরের প্রসঙ্গ। 'চিত্রাঙ্গদা' নাট্যকাব্যটিকে রবীন্দ্রনাথ 'চিত্রাঙ্গদা' নৃত্যনাট্যে রূপান্তরিত করেছিলেন। নাট্যকাব্যে সুরূপা চিত্রাঙ্গদাকে অর্জুন আগে দেখেছে, নিজের মধ্যে রূপলাবণ্যের আবির্ভাবে চিত্রাঙ্গদার বিস্ময়ের বর্ণনা করে পাওয়া যায়। কিন্তু নৃত্যনাট্যে পুরো ঘটনাটাই বিপরীত হয়েছে। পরবর্তী আলোচিত নৃত্যনাট্য 'চণ্ডালিকা'। নৃত্যনাট্যের প্রথমে 'অস্পৃশ্যা' প্রকৃতি—দইওয়ালা,

ফুলওয়ালি, চুড়িবিক্রেতার দ্বারা প্রত্যাখ্যাত হচ্ছে, তা গদ্যনাট্যে পাওয়া যায় না। গদ্যনাটকের মোট চারটি গান নৃত্যনাটকে গৃহীত হয়েছে এবং এগারোটি গান পরিত্যক্ত হয়েছে। পরবর্তী আলোচিত নৃত্যনাট্য হল 'শ্যামা'। রবীন্দ্রনাথ বলেছেন, ''কথা ও কাহিনীতে প্রকাশিত পরিশোধ নামক পদ্যকাহিনিটিকে নৃত্যাভিনয় উপলক্ষে নাট্টীকৃত করা হয়েছে।' 'শ্যামা' নৃত্যনাট্য এই 'পরিশোধ'-এরই পরিবর্তিত, পরিবর্ধিত ও সমৃদ্ধতর রূপ। কবিতাটিতে উত্তীয় চরিত্রটিকে তেমন ভাবে পাওয়া যায় না। কিন্তু নৃত্যনাট্যে উত্তীয় উপস্থিত হয়েছে খুব গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকায়। রূপান্তরকালে নৃত্যনাট্যে বহু অংশ যোগ হয়েছে, ফলে তার আয়তনও অনেক বেড়েছে।

এবারে আলোচনা করব নাট্যরূপান্তর প্রসঙ্গে। 'কালের যাত্রা' গ্রন্থের 'রথের রশি' নাটকটি প্রথমে 'রথযাত্রা' নামে প্রকাশিত হয়। দুই রূপের মধ্যে বেশ কিছু পার্থক্য আছে। 'রথযাত্রা' নাটকে রথই প্রধান। রথই 'সমাজ'! কিন্তু রবীন্দ্রনাথ জোর দিয়েছেন সমাজকে যে-শক্তি গতি দেয় তার ওপর। সমাজরথকে যে রশি গতি দেবে, 'রথের রশি' নাটকে সেই শক্তির কথাই বলা হয়েছে। 'রথযাত্রা' নাটকে যেমন পুরুষদের প্রাধান্য 'রথের রশি' নাটকে তেমনি নারীদের প্রাধান্য লক্ষ করা যায়। 'রথের রশি' নাটকের সন্ন্যাসীকেও 'রথযাত্রা' নাটকে পাওয়া যায় না। দুই নাটকের মধ্যে সবচেয়ে বড় পার্থক্য 'রথযাত্রা' নাটকটি গদ্যে এবং 'রথের রশি' নাটকটি গদ্যছন্দে লেখা।

রূপান্তরের আলোচনায় আমাদের সর্বশেষ আলোচ্য বিষয় ভাষান্তরকালীন রূপান্তর। প্রথমেই আমরা আলোচনা করব 'চিত্রাঙ্গদা' এবং তার রূপান্তর 'Chitra' নিয়ে। পঞ্চম দৃশ্য পর্যন্ত 'Chitra' 'চিত্রাঙ্গদা'-কে অনুসরণ করলেও, 'চিত্রাঙ্গদা'-র ষষ্ঠ ও অষ্টম দৃশ্য মিলে 'Chitra'-র ষষ্ঠ দৃশ্য রচিত হয়েছে। এর পাশাপাশি 'Chitra'-তে মূলের সপ্তম দৃশ্য নেই, দশম দৃশ্য সপ্তম দৃশ্যে, নবম-অষ্টম দৃশ্যে এবং একাদশ-নবম দৃশ্যে পরিণত হয়েছে। মূলের অনেক সংলাপ যেমন রূপান্তর-এ নেই, তেমনি অনেক সংলাপ সংক্ষিপ্তও হয়েছে। পরবর্তী আলোচিত নাটক 'প্রকৃতির প্রতিশোধ' এবং তার অনুবাদ 'Sanyasi or the Ascetic'। মূল নাটকের ষোলোটি দৃশ্য অনুবাদে চারটি দৃশ্যে পরিণত হয়েছে। আবার অনেক অংশ তিনি নতুন ভাবে সংযোজনও করেছেন। মূলে অস্পৃশ্যা রঘুর মেয়ের কোনো নাম না থাকলেও, রূপান্তরে তার নাম হয়েছে Vasanti। নাটকে প্রধান দুটি চরিত্র থাকলেও এদের আশেপাশে অসংখ্য চরিত্র এসেছে, রূপান্তরে সেই চরিত্রগুলির সংখ্যা অনেক কমিয়ে ফেলা হয়েছে। এরপরে আলোচনা করব 'মালিনী' ও তার রূপান্তর 'Malini' নিয়ে। মূলে সংলাপ পয়ারে লেখা হয়েছে, কিন্তু অনুবাদে তা গদ্যে লেখা হয়েছে। 'মালিনী' নাটকে চারটি দৃশ্য ছিল 'Malini'-তে তা দুটি অঙ্কে পরিণত হয়েছে। 'Malini'-তে কাশ্যপ চরিত্র, সেনাপতি চরিত্র বর্জিত হয়েছে।

এরপরে আসুন আমরা আলোচনা করি 'বিসর্জন' ও 'Sacrifice' নিয়ে। 'বিসর্জন' লেখা হয় ১৮৯০ সালে, আর তাকে 'Sacrifice'-এ অনুবাদ করা হয় ১৯১৭ সালে। মূলের অনেক অংশই অনুবাদে বর্জিত হয়েছে। ভাষান্তরকালীন রূপান্তরের আলোচনায় আমাদের সর্বশেষ আলোচ্য নাটক 'রাজা ও রানী' ও 'The King and the Queen'। মূলের পাঁচটি অঙ্কের তিরিশটি দৃশ্য রূপান্তরে দুটি দৃশ্য ভাগহীন অবিচ্ছিন্ন অঙ্কে পরিণত। অনেক চরিত্র, সংলাপ অনুবাদে বাদ গেছে। উচ্চারণে সুবিধার জন্য গোবিন্দমাণিক্য হয়েছে Govinda, বিক্রমদেব হয়েছে Vikram. শিলাদিত্য ও যুধাজিৎ হয়েছে Sila ও Ajit। মূল নাটকের তৃতীয় অঙ্কের কোনো দৃশ্যই রূপান্তরে গ্রহণ করা হয়নি। রূপান্তরে ইলার উক্তি, "King, I hear the bridal music, Where is my lover? I am ready" মূলে পাওয়া যায় না। সেখানে ইলা "একী! একী! মহারাজ, কুমার আমার" বলে অজ্ঞান হয়ে গেছে।

১১১.৪ মূলপাঠ — ২ গীতাঞ্জলি ঃ মূল ও অনুবাদ

পূর্বোক্ত মূলপাঠে আপনারা রবীন্দ্রনাথের ভাষান্তরকালীন অনুবাদ সম্পর্কে জেনেছেন। তাঁর ভাষান্তরকালীন অনুবাদের মধ্যে সবচেয়ে বড় কৃতিত্ব হ'ল 'গীতাঞ্জলি'-র অনুবাদ। মনের কোনো এক বিচিত্র খেয়ালে তিনি তাঁর লেখা কিছু কবিতা ও গান ইংরেজিতে অনুবাদ করতে শুরু করেছিলেন। এই অনুবাদের মধ্যে দিয়েই তিনি ব্রিটেনের সাহিত্যমহলে পরিচিত হয়েছিলেন।

'গীতাঞ্জলি'-র জন্য যখন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নাম নোবেল কমিটিতে উঠল, তখন ইউরোপের খুব স্বল্পসংখ্যক বুদ্ধিজীবী ছাড়া তাঁর নাম কেউই প্রায় শোনেননি। এই নোবেল পুরস্কারের জন্য তাঁর পাশাপাশি আনাতোল ফ্রাঁস, টমাস হার্ডি, প্রমুখ আঠাশজন লব্ধপ্রতিষ্ঠ সাহিত্যিকের নাম ছিল। হার্ডির নাম যেখানে ইংল্যান্ডের রয়্যাল সোসাইটি অব লিটারেচার-এর সাতানব্বই জন সদস্যের সকলেই সুপারিশ করেছিলেন, পক্ষান্তরে রবীন্দ্রনাথের নাম সুপারিশ করেছিলেন মাত্র একজন। রবীন্দ্রনাথের নাম নোবেল কমিটির কাছে সমর্থন করাতে রবীন্দ্র-সমর্থকদের যথেষ্ট পরিশ্রমও করতে হয়েছিল। কমিটির অন্যতম সদস্য পের অগাস্ট লিওনার্ড হ্যালস্ট্রম রবীন্দ্রনাথের পক্ষে যে রিপোর্ট পেশ করেছিলেন, তাতে একজায়গায় বলা হয়েছিল, — "The small collection of poems creates such a surprisingly rich and genuinely poetic impression that there is nothing odd or absurd in the proposal to reward it even with such a distinction as it is a question here"। এই সময় নোবেল কমিটির অন্যান্য সদস্যরা আরো একবছর অপেক্ষা করতে চেয়েছিলেন। আবার অনেকে মূল কবিতা অর্থাৎ বাংলা

কবিতা সম্পর্কে আরো কিছু ধারনা করতে চেয়েছিলেন। তা সত্ত্বেও ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে ঘটে গেল সেই অভাবিত ঘটনা। চরম রায় দিলেন কার্ল গুস্তাভ ভের্নের ভন হাইডেন্স্ট্যাম। পুরস্কার পেলেন প্রায় নাম-না-জানা, অচেনা এক ভারতীয় কবি।

এর আগেই ইন্ডিয়া সোসাইটির সংবর্ধনা সভায় (১০ জুলাই, ১৯১২) রবীন্দ্রনাথ বলেছিলেন, 'আমি জানি আমাদের ভাষা আলাদা, আচরণও এক নয়; কিন্তু হৃদয়ের গভীরে আমরা সবাই এক। ....পুব, পুবের মতো—পশ্চিম, পশ্চিম-ই। ....কিন্তু, সখ্য, শান্তি এবং পারস্পরিক বোঝাপড়ার মধ্য দিয়ে দুয়ের মিলন হোক।" তিনি আজীবন পূর্ব-পশ্চিমের বৈচিত্র্যের মধ্যে দিয়ে এক ঐক্যের স্বপ্ন দেখেছিলেন। রবীন্দ্রনাথের এই ভাষণের পরিপ্রেক্ষিতেই ১৯১২ খ্রিস্টাব্দের ১৬ জুলাই 'দ্য টাইমস' পত্রিকায় 'দ্য ট্রায়াম্ফ অব আর্ট ওভার সারকামস্ট্যানসেজ'—এই শিরোনামে এক সম্পাদকীয় প্রকাশিত হয়। যেখানে যা বলা হয়েছে, তার মূল কথা : "শিল্পই হল পারস্পরিক ভাব বিনিময়ের মাধ্যম .... শিল্প মানুষের মন থেকে মনান্তরে অনুভূতি পৌঁছে দেয়।" 'অনুবাদ' এমনই এক শিল্পমাধ্যম যার সাহায্যে এক দেশীয় সাহিত্যিকের জীবন ভাবনা, বোধ অন্যদেশীয় পাঠকের মনে এক বিশেষ অনুভূতির সঞ্চার করে দেয়। ঐ সম্পাদকীয়তেই কবিতাগুলি সম্পর্কে বলা হয়েছে, "....... অনুবাদ যতই ভালো হোক না কেন, ভালো কবিতার সৌন্দর্যের অনেকখানি অনুবাদে হারিয়ে যায়। তা সত্ত্বেও রসজ্ঞ পাঠকের, কবিতার অন্তর্গত প্রতিপাদ্য বিষয় খুঁজে নিতে অসুবিধা হয় না। মিস্টার টেগোর তাঁর নিজের অনুবাদের জন্য ইংরেজ কবিদের প্রশংসা পেয়েছেন। তাঁদের কাছে এই কবি বাঙালি নয়—তাঁদেরই ভ্রাতৃকবি। কেবল পার্থক্যের জন্য কিংবা স্থানিক বৈচিত্র্যে রঙিন বলে কবিতাগুলি তাঁদের আনন্দ দিয়েছে তা নয়—ভালো লেগেছে কারণ এইগুলি কবিতা—যে কবিতা প্রাচ্য পাশ্চাত্য সবদেশের কবিতার মতো একই প্রকৃতির।"

ইন্ডিয়া সোসাইটি মোট ১০৩-টি কবিতার ইংরেজি অনুবাদ 'Gitanjali' নাম দিয়ে প্রকাশ করেন ১৯১২ সালের ১ নভেম্বরে। কবিতা নির্বাচন ও সম্পাদনায় সাহায্য করেন প্রখ্যাত কবি ডব্লু. বি. ইয়েট্স। ইংরাজি গ্রন্থটি কিন্তু বাংলা গ্রন্থের হুবহু অনুবাদ নয়। এতে বাংলা 'গীতাঞ্জলি'-র মোট ৫৩টি কবিতা স্থান পেয়েছে। এর পাশাপাশি 'গীতিমাল্য'-র ১৬টি, 'নৈবেদ্য'-র ১৫টি, 'খেয়া'-র ১টি, 'শিশু'-র ৩টি, 'স্মরণ'-এর ১টি, 'কল্পনা'-র ১টি, 'চৈতালি'-র ১টি, 'উৎসর্গ'-র ১১টি এবং 'অচলায়তন'-এর ১টি গান 'Gitanjali'-তে স্থান পেয়েছে। বইটি উৎসর্গ করা হয়েছিল রোদেনস্টাইনকে, আর ভূমিকা রচনা করেছিলেন বিখ্যাত কবি উইলিয়াম্ বাটলার ইয়েট্সই। সেখানে তিনি বলেছিলেন, "........These verses will not lie in little well printed books upon ladies' tables, who turn the pages with indolent hands that they may sigh over a life without meaning, which is yet

all they can know of life or be carried about by student at the university to be laid aside when the work of life begins but, as the generations pass, travellers will hum them on the highway and men rowing upon rivers. Lovers, while they await one another, shall find, in murmuring them, this love of God a magic gulf wherein their own bitter passion may bathe and renew its youth." অর্থাৎ এই কবিতাগুলি প্রকাশের কয়েক দিনের মধ্যেই 'টাইমস লিটেরারি সাপ্লিমেন্ট'-এ 'Gitanjali'-র প্রথম সমালোচনা বের হয় ৭ নভেম্বর ১৯১২ খ্রিস্টাব্দে। সেখানে লেখা হয়েছিল, "রবীন্দ্রনাথ তাঁর নিজের কবিতা ইংরেজি গদ্যে প্রাঞ্জলভাবে এবং ক্ষেত্রবিশেষে আংশিক ছন্দোবন্ধে অনুবাদ করেছেন। সঙ্গত কারণে ভাষার অপর্যাপ্ততা সত্ত্বেও কবিতার ভাব দুর্বোধ্য হয়ে ওঠেনি। এই ভারতীয় কবি ধর্ম ও দর্শনকে এক করেছেন। তিনি বিশ্বের ধ্যানে বসেছেন এবং সেই ধ্যান থেকে যেন অত্যন্ত স্বাভাবিক ও সরলপথে উৎসারিত হয়েছে তাঁর 'কবিতা'।" ম্যাকমিলানের সুলভ সংস্করণ 'Gitanjali' প্রকাশিত হয় ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দের ১ মার্চ। 'Gitanjali'-র একাধিক সমালোচনা প্রকাশিত হতে থাকে 'গ্লোব', 'নিউ স্টেটসম্যান' প্রভৃতি পত্রিকায়। ক্রমে ক্রমে 'বুকম্যান', 'হিবার্ট জুর্নাল' প্রভৃতিতেও সমালোচনা ও প্রশংসা প্রকাশিত হতে থাকে। এ বিষয়ে বিভিন্ন উল্লেখযোগ্য বক্তব্য হল :

'এথেনিয়াম' : "মিস্টার টেগোরের অনুবাদ গতিহীন, এতে কোনও রঙ চাপানো হয়নি; আছে কেবল এক ভাবাবিষ্ট সৌন্দর্য। .... অতীন্দ্রিয়তাই কবির প্রেরণা। ...." (১৬. ১১. ১৯১২)

'নেশ্যন' : "ছন্দোবন্ধ গদ্যে লেখকের নিজস্ব অনুবাদ করা একশ তিনটি গীতিকবিতায় রয়েছে অনন্য সৌন্দর্য, এক উন্নত আধ্যাত্মিকতার ব্যক্তিগত ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাপ্রসূত, অপরিবর্তনশীল অথচ বৈচিত্র্যপূর্ণ, এক অনির্বচনীয় অথচ অত্যন্ত পরিচিত মরমিয়া সুর, যা আমার বিভিন্ন সময়ে শ্রেষ্ঠ অতীন্দ্রিয়বাদীদের কবিতায় পেয়ে এসেছি। ....." (১৬. ১১. ১৯১২)

ট্যাবলয়েড সান্ধ্য পত্রিকা 'গ্লোব' : "......তাঁর কাজের মধ্যে সর্বত্র যেন ঈশ্বর মুদ্রিত হয়ে আছে যা সম্পূর্ণভাবে সাধারণ চিন্তাধারার বর্হির্ভূত। ...." (১. ৪. ১৯১৩)

একসময় রবীন্দ্রনাথ অনুবাদকার্যের জন্য ডব্লু. বি. ইয়েট্স, এজরা পাউন্ড প্রমুখ কবিদের মতামতকে গুরুত্ব দিতেন। কিন্তু পরবর্তীকালে তিনি নিজেই তাঁর কবিতাগুলি অনুবাদ করতে থাকেন। 'Gitanjali'-তেও আমরা কবিকৃত অনুবাদই পেয়েছি। যদিও রোঁদেনস্টাইনকে একটি চিঠিতে তিনি বলেছিলেন তাঁর অনুবাদে 'ফরেন রি-ইনকার্নেশ্যন' বা 'বিদেশি জন্মান্তর' হয়েছে। একথা সত্যিই যে 'গীতাঞ্জলি'-র অনুবাদক

রবীন্দ্রনাথ আর অন্যান্য সাহিত্যস্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ এক নন। ইংরেজি ভাষায় রচনার গভীর প্রত্যয় তাঁর ছিল না। রোদেনস্টাইনকে তিনি জানান, — ‘‘আমি এত নির্বোধ নই যে আমার ইংরিজি ভাষা, যা বেশী বয়সে আমাকে ধার করে সংগ্রহ করতে হয়েছে, তার জন্য চড়া দাম চেয়ে বসব। তোমার নিশ্চয় মনে আছে কত বাধোবাধো ভাবে, কত অনিশ্চয়তার সঙ্গে তোমার হাতে আমার ‘গীতাঞ্জলি’-র পাণ্ডুলিপি তুলে দিয়েছিলেম, আমার ইংরিজি বড়োই অদ্ভুত, যার বিন্যাসের জন্য ইশকুলের ছেলেরা পর্যন্ত বকুনি খেতে পারে।’’ রবীন্দ্রনাথের এই দ্বিধা, তাঁর অনুবাদে পাওয়া যায়, যা মূল বাংলা রচনায় নেই। তাই দেখা যায় ‘Gitanjali’ বাংলা ‘গীতাঞ্জলি’-র আক্ষরিক অনুবাদ না হয়ে ভাবানুবাদ হয়ে উঠেছে। দ্বিতীয়ত, ‘গীতাঞ্জলি’ মূলত গান। তার গীতিমূর্ছনার এক চিরস্থায়ী প্রভাব পাঠকমনকে প্লাবিত করে, ‘Gitanjali’ কিন্তু মূলত কবিতা। সেখানে বিদেশি পাঠকরা আধ্যাত্মিক অনুভূতি উপলব্ধি করলেও ‘গীতাঞ্জলি’-র অনির্বচনীয়তা সেখানে অনুপস্থিত।

এই পরিপ্রেক্ষিতে বাংলা ‘গীতাঞ্জলি’ ও ইংরেজি ‘Gitanjali’-র দুটি কবিতার তুলনামূলক আলোচনা করা যেতে পারে :

(১)

(ক) ‘‘আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার
পরানসখা বন্ধু হে আমার।
আকাশ কাঁদে হতাশসম,
নাই যে ঘুম নয়নে মম,
দুয়ার খুলি, হে প্রিয়তম,
চাই যে বারে বার।
পরানসখা বন্ধু হে আমার।
বাহিরে কিছু দেখিতে নাহি পাই,
তোমার পথ কোথায় ভাবি তাই।
সুদূর কোন্ নদীর পারে,
গহন কোন্ বনের ধারে,
গভীর কোন্ অন্ধকারে
হতেছ তুমি পার
পরানসখা বন্ধু হে আমার।’’

(খ) “ART thou abroad on this stormy night on thy journey of love, my friend? the sky groans like one in despair.

I have no sleep tonight. Ever and again I open my door and look out on the darkness, my friend !

I can see nothing before me. I wonder where lies thy path !

By what dim shore of the ink-black. river, by what far edge of the frowning forest, through what mazy depth of gloom art thou threading thy course to come to me, my friend ?”

মূল কবিতাটি গান হিসেবে আমাদের স্মৃতিতে চিরজাগরূপ থাকে। “আজি ঝড়ের রাতে তোমার অভিসার পরানসখা বন্ধু হে আমার” — এই অংশটি হয়েছে “Art thou .... of love, my friend?” এই অংশটি ভাবানুবাদ হয়েছে। আক্ষরিক অনুবাদ হলে এরকম হতো — “Tonight, this stormy night is your rendez-vous / My sweetheart, my friend!” (নবনীতা দেবসেন) “আজি ঝড়ের রাতে ..... হে আমার” — এই দুই পংক্তিতে কবির নিশ্চিত প্রতীতি ছিল ‘পরানসখা’ বন্ধু শুধু বাইরের নন, তিনি অন্তরের। ‘অভিসার’ শব্দটি আমাদের রাধাকৃষ্ণের চিরন্তন প্রেমকে মনে করিয়ে দেয়। কবির চির-আরাধ্য ‘জীবন দেবতা’-ই তাঁর ‘পরানসখা’, তাঁর প্রার্থিত কামনার ধন। ঝড়ের রাতে বাইরের প্রকৃতি যখন উত্তাল, কবির অন্তর্প্রকৃতি তখন অপেক্ষায় অধীর — “নাই যে ঘুম নয়নে মম, /দুয়ার খুলি, হে প্রিয়তম,/চাই যে বারেবার।” কবিতাটিতে রাত্রির অন্ধকারের প্রেক্ষাপটেই চিরবাঞ্ছিতের জন্য অনুসন্ধান নির্মিত হয়েছে। “সুদূর কোন .... তুমি পার।” কবিতাটির অনুবাদে খুব গুরুত্বপূর্ণ সম্বোধন ‘পরানসখা’-কে পাওয়া যায় না। অনুবাদে “my friend” শব্দটির ব্যবহার করা হয়েছে, যার দ্বারা ‘পরানসখা’ শব্দটির গভীর ব্যঞ্জনা প্রকাশ পায় না। ইংরেজি অনুবাদে এই মূল সম্বোধনটির চিহ্নও নেই। দ্বিতীয়ত, মূলে অভিসার বিষয়ে কোনো প্রশ্ন ছিল না, কারণ চিরবাঞ্ছিত বা অখণ্ডসত্তার সঙ্গে মিলনাকাঙ্ক্ষী খণ্ডসত্তার অভিসারযাত্রা সম্পর্কে কোনো সংশয় ছিল না অথচ অনুবাদে প্রশ্ন উচ্চারিত হয়েছে— “Art thou .... my friend?” তাই মূলে যে কবিভাবনা ছিল সংশয়রহিত, অনুবাদে তা হয়েছে প্রশ্নাকীর্ণ।

(ক) দিবস যদি সাঙ্গ হল, না যদি গাহে পাখি
ক্লান্ত বায়ু না যদি আর চলে
এবারে তবে গভীর করে ফ্যালো গো মোরে ঢাকি
অতি নিবিড় ঘনতিমির তলে —

স্বপন দিয়ে গোপনে ধীরে ধীরে
যেমন করে ঢেকেছ ধরণীরে,
যেমন করে ঢেকেছ তুমি মুদিয়া পড়া আঁখি,
ঢেকেছ তুমি রাতের শতদলে।

পাথেয় যার ফুরায়ে আসে পথের মাঝখানে,
ক্ষতির রেখা উঠেছে যার ফুটে,
বসনভূষা মলিন হল ধুলায় অপমানে,
শকতি যার পড়িতে চায় টুটে —
ঢাকিয়া দিক তাহার ক্ষতব্যথা
করুণাঘন গভীর গোপনতা,
ঘুচায়ে লাজ ফুটাও তারে নবীন ঊষা-পানে
জুড়ায়ে তারে আঁধার সুধাজলে।”

(খ) “If the day is done, if birds sing no more,
if the wind has flagged tired, then draw the
veil of darkness thick upon me, even as thou
hast wrapt the earth with the coverlet of
sleep and tenderly closed the petals of the
drooping lotus as dusk.
From the traveller, whose sack of provisions is
empty before the voyage is ended, whose garment
is torn and dustladen, whose strength is
exhausted, remove shame and poverty. and
renew his life like a flower under the cover
of thy kindly night.”

কবিতাটির মধ্যে “স্বপন দিয়ে গোপনে ধীরে ধীরে/যেমন করে ঢেকেছ ধরণীরে” অংশটি অনুবাদে হয়েছে “even as thou hast wrapt the earth with the coverlet of sleep.” এই অনুবাদ

নিতান্তই সাধারণ। আক্ষরিক অনুবাদ করলে অংশটি এইরকম দাঁড়ায়— "Just as you have secretly and slowly covered the earth with dreams." (নবনীতা দেবসেন) 'গোপনে' ও 'ধীরে ধীরে' এই দুটি মূল ক্রিয়া বিশেষণই কবিকৃত অনুবাদে বাদ পড়েছে এবং 'লেপ' (coverlet) এই শব্দটি যুক্ত হয়েছে। পরের অংশে ইংরেজি কবিতাটি বাংলার ব্যাখ্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে। "পাথেয় যার .... ধুলায় অপমানে" ভাষান্তরিত হয়েছে, "From the ..... dustladen." অংশটির আক্ষরিক অনুবাদ এভাবে করা যায় —

"Whose provisions end in the middle of the road
On whom signs of loss are evident
Whose cloths are dirty with dust and humiliations."

(নবনীতা দেবসেন)

কবিকৃত অনুবাদে সবচেয়ে কবিত্বময় পংক্তিটি ("ক্ষতির রেখা উঠেছে যার ফুটে') বাদ গেছে। 'ভ্রমণকারী' প্রভৃতি ব্যাখ্যামূলক বিশেষ্য যোগ করেছেন। এর পরবর্তী অংশে কবিতার মূল মর্মকথাই বাদ পড়েছে। "ঢাকিয়া দিক .... সুধাজলে"। অংশটির আক্ষরিক অনুবাদ এইরকম, —

"Let a kind and deep privacy
Conceal his wounds and pains
Effacing shame make him blossom out towards the new dawn
Soothing him in the life giving waters of the dark."

(নবনীতা দেবসেন)

কবি অংশটি এভাবে অনুবাদ করেছেন — "remove shame .... kindly night." — অংশটি যেন একটু বেশি সোচ্চার হয়ে গেছে। এখানে মূল কবিতার মর্মবেদনার গাঢ় ব্যাকুলতার চিহ্ন প্রকাশ পায়নি।

সামগ্রিকভাবে বলা যেতে পারে, 'Gitanjali' বাংলা 'গীতাঞ্জলি'-র অনুবাদ হলেও রবীন্দ্রনাথ তার মধ্যে বহু পরিবর্তন করেছেন। অনেক শব্দ বাদ পড়েছে, যার ফলে মূল কবিতার ভাবনাই পাল্‌টে গেছে। আবার অনেক শব্দ তিনি সংযোজনও করেছেন। যা মূলে পাওয়া যায় না। ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে 'ফর্টনাইটলি রিভিউ'-তে প্রকাশিত রবীন্দ্রনাথ-বিষয়ে পাউন্ডের প্রবন্ধের কিছু অংশ এখানে উদ্ধৃত করা যেতে পারে, "এতসব ছাঁটকাটের পরেও আমরা অনুবাদে কী পাই ভাবতে গেলে আমি কিন্তু রবীন্দ্রকাব্যের 'প্রসঙ্গ' অথবা 'বিষয়বস্তু'-র কথা আগে তুলব না। আগে তুলব তাঁর বাক্‌ভঙ্গি ও শিল্পশৈলীর দিকটা।" পাউন্ড

কয়েকটি বিষয় নিয়ে আলোচনা করেছিলেন। প্রথমত, বাংলায় বিভক্তি ব্যবহারের জন্য বাক্যের বিন্যাসে প্রচুর স্বাধীনতা আছে, ফলে কোনো শব্দ এদিক ওদিক হলেও তাতে অর্থের কোনো পরিবর্তন হয় না। যেটা ইংরেজিতে সম্ভব নয়। দ্বিতীয়ত, বিভক্তিযুক্ত ধাতুরূপ, শব্দরূপ দিয়ে মিল দেওয়া অনেক সহজ। তৃতীয়ত, বাংলায় সমাজবন্ধ শব্দ তৈরির দরুন শিল্পসৃষ্টিতে অনেক স্বাধীনতা আছে। চতুর্থত, ভারতীয় রাগরাগিনী, সুর কবিতার মূলভাব অর্থাৎ কোন ঋতু, দিনের কোন সময় ইত্যাদির নির্দেশ দেয় এবং তার ফলে কবিতা বোঝার উপযুক্ত আবহাওয়া তৈরি হয়ে যায়। কিন্তু শিল্পের এইসব ঐশ্বর্য আমরা অনুবাদে পাই না—একথা পাউন্ড বলেছেন। তাঁর মতে রবীন্দ্রসংগীতের ইংরেজি অনুবাদে এইসব সমস্যা আছে, যার ফলে তা মিলহারা, সুরহারা, ছন্দহারা হয়ে উঠেছে।

১১১.৫ সারাংশ

সাহিত্যিকরা অনেকসময় নিজের মূল রচনার পরিবর্তন, পরিবর্ধন করে নতুন অর্থ আরোপ করেন। একে রূপান্তর বলা হয়। রূপান্তর-প্রক্রিয়ার ফলে অনেকসময় দুটি সাহিত্যকে স্বতন্ত্র সাহিত্য মনে হয়। যেমন রবীন্দ্রনাথের 'রাজা ও রানী' ও 'তপতী' নাটকদুটি। রবীন্দ্রসাহিত্যে রূপান্তরের বিভিন্ন উদাহরণ পাওয়া যায়। যেমন প্রথমত, গল্প থেকে নাটকের রূপান্তর। রবীন্দ্রনাথ তাঁর পাঁচটি গল্পকে নাটকে রূপান্তরিত করেছিলেন। দ্বিতীয়ত, উপন্যাসের নাট্যরূপান্তর। তাঁর তিনটি উপন্যাসের নাট্যরূপান্তর হয়েছিল। তৃতীয়ত, কাব্যকবিতা থেকে নাটকের রূপান্তর। দুটি কবিতাকে নাটকে রূপান্তরিত করা হয়েছিল। চতুর্থত, পদ্যনাটক থেকে গদ্যনাটকের রূপান্তর। তাঁর একটিমাত্র পদ্যনাটককে গদ্যনাটকে রূপান্তরিত করা হয়েছিল। পঞ্চমত, গদ্যনাটক থেকে গদ্যনাটকে রূপান্তর। রবীন্দ্রনাথ তাঁর দুটি গদ্যনাটককে পুনরায় গদ্যনাটকে রূপান্তরিত করেছিলেন। ষষ্ঠত, তাঁর দুটি গীতিনাট্যের রূপান্তর হয়েছিল। সপ্তমত, দুটি নৃত্যনাট্যের রূপান্তর। এছাড়া আছে নাট্যরূপান্তর।

তবে রূপান্তরের ক্ষেত্রে তাঁর সবচেয়ে বড়ো কৃতিত্ব হল ভাষান্তরকালীন রূপান্তর। তিনি তাঁর বিভিন্ন নাটককে ইংরেজি ভাষায় রূপান্তরিত করেছিলেন। তবে তাঁর ভাষান্তরকালীন অনুবাদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হ'ল 'গীতাঞ্জলি'-র অনুবাদ। 'Gitanjali'-র জন্যই ১৯১৩ খ্রিস্টাব্দে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর নোবেল পুরস্কার লাভ করেন।

১৯১২ খ্রিস্টাব্দে ইন্ডিয়া সোসাইটি মোট ১০৩টি কবিতার অনুবাদ Gitanjali নাম দিয়ে প্রকাশ করেন। এতে বাংলা 'গীতাঞ্জলি'-র পাশাপাশি 'গীতিমাল্য', 'নৈবেদ্য', 'খেয়া', 'শিশু', 'স্মরণ', 'কল্পনা', 'চৈতালি',

'উৎসর্গ' এবং 'অচলায়তন'-এর কবিতা স্থান পেয়েছে। বইটি উৎসর্গ করা হয়েছিল রোদেনস্টাইনকে আর ভূমিকা রচনা করেছিলেন ডব্লু. বি. ইয়েট্স। বইটি প্রকাশের কয়েকদিনের মধ্যেই বিভিন্ন পত্রপত্রিকাতে সমালোচনা ও প্রশংসা দুই-ই প্রকাশিত হতে থাকে। এইসব পত্রিকার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল 'বুকম্যান', 'গ্লোব', 'এথেনিয়াম', 'নেশ্যন', 'হির্বাট জুর্নাল', 'নিউ স্টেট্সম্যান'-প্রভৃতি।

প্রথমদিকে কবি অনুবাদকার্যে ইয়েট্স, পাউন্ড প্রমুখ কবিদের মতামতকে গুরুত্ব দিলেও, পরবর্তীকালে তিনি নিজেই অনুবাদ করতে শুরু করেন। তবে নিজের ইংরেজি সম্পর্কে তাঁর নিজেরই দ্বিধা ছিল। তাই 'Gitanjali'-বাংলা 'গীতাঞ্জলি'-র আক্ষরিক অনুবাদ না হয়ে ভাবানুবাদ হয়ে উঠেছে। 'Gitanjali'-তে তিনি বহু ভাব ও শব্দ যেমন যোগ করেছেন, তেমনি বহু ভাব এবং শব্দ বাদও দিয়েছেন। যার ফলে মূল কবিতার অর্থ অনেক সময়ই বদলে গেছে। এবিষয়ে পাউন্ডের তিনটি মূল প্রশ্নের আলোচনার ভিত্তিতে বলা যায় রবীন্দ্রসঙ্গীতের ইংরেজি অনুবাদ সুরহারা, মিলহারা, ছন্দহারা, স্বচ্ছন্দ পুনর্বিন্যাস মাত্র।

১১১.৬ অনুশীলনী—২

নীচের প্রশ্নগুলির উত্তর করুন। উত্তরশেষে উত্তরমালার সঙ্গে মিলিয়ে দেখুন।

১. সঠিক উত্তরে টিক (✓) চিহ্ন দিন।

(ক) 'শেষের রাত্রি' গল্পটির রূপান্তরিত নাম —

(১) গৃহপ্রবেশ

(২) মুকুট

(৩) মুক্তির উপায়

(খ) 'রাজা ও রানী'-র রূপান্তরিত রূপ 'তপতী'-তে গান আছে—

(১) দশটি

(২) সাতটি

(৩) একটিও নয়।

(গ) 'Gitanjali'-র ভূমিকা রচনা করেছিলেন—

(১) ইয়েট্স

(২) পাউন্ড

(৩) রবীন্দ্রনাথ

(ঘ) ‘Gitanjali’-তে বাংলা ‘গীতাঞ্জলি’-র কবিতা সংখ্যা —

(১) ৫৩ টি

(২) ৫৫ টি

(৩) ১৬ টি

২. রবীন্দ্রসাহিত্যে রূপান্তর সম্পর্কে যা জানেন নিজের ভাষায় লিখুন।

৩. যে-কোনো একটি কবিতা অবলম্বনে বাংলা ও ইংরেজি ‘গীতাঞ্জলি’-র একটি তুলনামূলক আলোচনা করুন।

৪. রবীন্দ্রনাথের অনুবাদ সম্পর্কে পাউন্ডের মতামত নিজের ভাষায় বর্ণনা করুন।

১১১.৭ উত্তরমালা

১. (ক) গৃহপ্রবেশ

(খ) দশটি

(গ) ইয়েট্‌স

(ঘ) ৫৩ টি

২য় প্রশ্নের উত্তরের জন্য মূলপাঠ ১-এর প্রতিটি অনুচ্ছেদ ভালো করে পড়ুন। তাহলেই উত্তর লিখতে পারবেন।

৩ নং এবং ৪ নং প্রশ্নের উত্তরের জন্য মূলপাঠ ২-এর প্রতিটি অনুচ্ছেদ পড়ুন। তাহলেই উত্তর করতে পারবেন।

১১০.১০ গ্রন্থপঞ্জি

১. অশ্রুকুমার সিকদার — রবীন্দ্রনাট্যে রূপান্তর ও ঐক্য।

২. নবনীতা দেবসেন — ‘প্রবাসী জন্মান্তর’ প্রবন্ধ ও ‘ঈশ্বরের প্রতিদ্বন্দ্বী’ গ্রন্থ।

৩. কল্যাণ কুন্ডু — ইংরেজি ‘Gitanjali’ প্রসঙ্গে কিছু কথা — ‘পশ্চিমবঙ্গ’।

ই. বি. জি—৮
বাংলা বিষয়ের
ঐচ্ছিক পাঠ্যক্রম

পর্যায়
৩১

ভূমিকা

বাংলাভাষা ও সাহিত্য বিষয়ের ঐচ্ছিক পাঠক্রম আটটি পত্রে বিন্যস্ত। অষ্টম পত্রের পর্যায় ৩১-এর আলোচ্য বিষয় 'বানানবিধি'। পর্যায়টিকে চারটি এককে ভাগ করা হয়েছে। প্রতিটি এককের অন্তর্গত বিষয়বস্তু এইরকম ঃ

একক ১১২ ঃ 'বাংলা বানানের বিবর্তন-ধারা' নামের এই এককটিতে দেখানে হয়েছে, দশ-এগারো শতকের চর্যাপদ থেকে শুরু করে বিশ শতকের অন্নদাশঙ্কর রায়ের গদ্য পর্যন্ত বাংলাভাষার হাজার বছরের চর্চায় বাংলা বানান কীভাবে নানা কালপর্বে নানারকম প্রবণতা বিচ্যুতি বিভ্রান্তি পেরিয়ে ক্রমশ একটি পরিণামের দিকে এগিয়ে এসে একুশ শতকের দোরগোড়ায় পৌঁছেছে।

একক ১১৩ ঃ বানান-প্রয়োগের পাশাপাশি বানান নিয়ে ভাবনা চলছে গত ১২৫ বছর ধরে। এই বানান-ভাবনার ইতিবৃত্তে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব পেয়েছে বাংলা বানানের সমতাবিধানের সমস্যার ভাবনা। একই শব্দের নানারকম বানান লেখার ঝোঁক ক্রমশ বানান-বিভ্রান্তিতে ভরে তুলছে যখন বাংলা বানানের চর্চাকে, তখন এই সমস্যা নিয়ে ভাবনা-চিন্তার পাশাপাশি সমাধান সন্ধানের চেষ্টাও দেখা গেল ব্যক্তিগত এবং প্রতিষ্ঠানগত উদ্যোগে। একক ১১৩-এর আলোচ্য বিষয় এটাই।

একক ১১৪ ঃ বাংলা বানানের বিভ্রান্তির বড়ো কারণ বাংলা বর্ণমালা আর বাংলা উচ্চারণের অসংগতি— এই সত্য যখন বানান-ভাবুকেরা অনুভব করলেন, তখন সেই অসংগতি দূর করার উপায়টাও তাঁদের ভাবনার বিষয় হয়ে উঠল। এই প্রসঙ্গেই একক-১১৪-এর আলোচ্য, বাংলা বর্ণমালা এবং তার সঙ্গে বাংলা উচ্চারণের সম্পর্ক কতটা বিজ্ঞানসম্মত অথবা কীভাবে তাকে আরও বিজ্ঞানসম্মত করে তোলা সম্ভব, এই বিষয়টি।

একক ১১৫ ঃ বাংলা বানানে যেসব জটিলতা রয়েছে, তার কারণ সন্ধান করে তা দূর করা, বানানকে সরল করে তোলা, সরলীকরণের কী কী সূত্র বাংলা শব্দে প্রযোজ্য এবং কতদূর পর্যন্ত প্রযোজ্য—এই বিষয়গুলিই একক ১১৫-এর অন্তর্গত। সেইসঙ্গে বাংলা শব্দভাণ্ডার থেকে নানাশ্রেণির শব্দ সংগ্রহ করে, তাদের উপর সরলীকরণের সূত্র প্রয়োগ করে সরলীকরণের পদ্ধতি আর তার প্রয়োগ-সীমা তুলে ধরার চেষ্টা করা হয়েছে শিক্ষার্থীদের সামনে।

এই পর্যায়ের একক-চারটি তৈরি করতে নীচের বইগুলির সাহায্য নেওয়া হয়েছে নানাভাবে—

১. পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি ঃ আকাদেমি বানান অভিধান (২০০১)।

২. পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি ঃ প্রসঙ্গ বাংলাভাষা (১৯৮৬)।

৩. মণীন্দ্রকুমার ঘোষ ঃ বাংলা বানান (১৯৯৩)।

৪. নেপাল মজুমদার সংকলিত ঃ বানান বিতর্ক (১৯৯৭)।

৫. পবিত্র সরকার ঃ বাংলা বানান সংস্কার ঃ সমস্যা ও সম্ভাবনা (১৯৯২)

একক ১১২ ❑ বাংলা বানানের বিবর্তন-ধারা

গঠন

১১২.১ উদ্দেশ্য

১১২.২ প্রস্তাবনা

১১২.৩ মূলপাঠ ১ ঃ চর্যাপদ থেকে অন্নদামঙ্গল

১১২.৩.১ সারাংশ-১

১১২.৩.২ অনুশীলনী-১

১১২.৪ মূলপাঠ-২ ঃ উইলিয়াম কেরি থেকে বঙ্কিমচন্দ্র

১১২.৪.১ সারাংশ-২

১১২.৪.২ অনুশীলনী-২

১১২.৫ মূলপাঠ-৩ ঃ রবীন্দ্রনাথ-প্রমথ চৌধুরী-অন্নদাশঙ্কর রায়

১১২.৫.১ সারাংশ-৩

১১২.৫.২ অনুশীলনী-৩

১১২.৬ সহায়ক পাঠ

১১২.১ উদ্দেশ্য

এই এককটির উদ্দেশ্য, চর্যাপদ থেকে শুরু করে অন্নদাশঙ্কর রায় পর্যন্ত, দশ থেকে বিশ শতক পর্যন্ত, হাজার বছর ধরে বয়ে-আসা বাংলা ভাষার ধারাটির পাশাপাশি বাংলা বানানের ক্রম-বিবর্তনের যে ধারাটি বয়ে চলেছে, সেদিকে আপনার দৃষ্টি আকর্ষণ করা। এককটির নিবিড় পাঠ বাংলা বানানের ধারাবাহিকতার পাশাপাশি বিভিন্ন কালের বিভিন্ন লেখকের হাতে বানান-চর্চার নানারকম প্রবণতার নজিরও আপনাকে দেখিয়ে দেবে। সেইসঙ্গে বানান-লেখার ব্যাপারে আপনি নিজেও ক্রমশ সতর্ক হতে পারবেন, সঠিক বিজ্ঞানসম্মত বানান-লেখার বিষয়ে সামাজিক দায়িত্ববোধ বাড়িয়ে তুলতে পারবেন।

১১২.২ প্রস্তাবনা

'বানান' কথাটির তাৎপর্য বর্ণের পর বর্ণ সাজানো। 'বর্ণান' থেকে কথাটি এসেছে। বর্ণের পর বর্ণ সাজিয়েই তৈরি হয়ে ওঠে এক-একটি শব্দ। ধরা যাক 'বানান' শব্দটিই। 'ব-া-ন-া-ন'—এই পাঁচটি চিহ্ন পরপর সাজালে তবেই হয়ে ওঠে 'বানান'। মুখের কথায় বলতে গেলে কেবল কয়েকটি ধ্বনির উচ্চারণ, লিখতে গেলেই আবশ্যক হয়ে ওঠে বানান। এই বানানের হাত ধরেই ক্রমশ তৈরি হতে থাকে যেকোনও লেখ্যভাষার ক্রমিক বিবর্তনের ইতিহাস। সেইসঙ্গে অলক্ষ্যেই তৈরি হয়ে যায় বানান-প্রয়োগেরও একটি সূক্ষ্ম বিবর্তন-রেখা।

বাংলাভাষার প্রথম নিদর্শন চর্যাপদ, এর ভাষা আর হরফ হাজার বছরের পুরোনো। এর অর্থ, বাংলাভাষায় বাংলা হরফ-সাজানো বা বাংলা বানানের প্রয়োগ চলছে হাজার বছর ধরেই। চর্যাপদ থেকেই এর শুরু। বাংলাভাষার এই বিবর্তনের পথ ধরে একটু একটু করে তৈরি হয়েছে বাংলা বানানেরও ইতিহাস।

হাজার বছর ধরে পথ চলতে চলতে প্রাচীন-মধ্যযুগের হাতে-লেখা অজস্র পুথির পাতা পেরিয়ে, উনিশ-বিশ শতকের মুদ্রণযন্ত্রের হাত ঘুরে ঘুরে অবশেষে একুশ শতকের মুদ্রণ-প্রযুক্তির নিরাপদ আশ্রয়ে উত্তীর্ণ হল বাংলা বানান। চলার পথে ঘটছে বানানের স্বাভাবিক বিবর্তন, প্রাণবন্ত ভাষার স্বাভাবিক খেয়ালেই। এক লেখক থেকে অন্য লেখকে, এমনকী একই লেখকের পৃথক পৃথক কালপর্বে, এক যুগ থেকে অন্য যুগে বানান তার রূপ বদল করতে করতে চলেছে। পুথি ধরে ধরে বানান-বিবর্তনের পথ খুঁজে নেওয়া দুঃসাধ্য। বাংলা ভাষাসাহিত্যের নানাযুগের অজস্র বই এখন ছাপার হরফে হাতের কাছেই মিলছে। মূল লেখকের হাতে-লেখা পুথির বানানের সঙ্গে এর কিছু কিছু ফারাক থাকছে, এটা ধরে নিয়েও অগত্যা ছাপার হরফের পথ ধরেই চলুন, যথাসাধ্য সন্ধান করি বাংলা বানানের বিবর্তন-রেখাটি। চর্যাপদ থেকেই শুরু হোক আমাদের হাজার বছরের ইতিহাস-সন্ধান।

১১২.৩ মূলপাঠ —১ ঃ চর্যাপদ থেকে অন্নদামঙ্গল

বানান নিয়ে আমাদের আজকের তর্ক-বিতর্ক সংশয় বিভ্রান্তি মুখ্যত এই কটি এলাকায় —অ-ও ঈ-ঈ উ-ঊ ঋ-রি অ্যা-এ ঐ-অই ঔ-অউ ং-ঙ-গ জ-য ণ-ন ত-ৎ শ-ষ-স ক্ষ-খ, বিসর্গ আর হস্‌চিহ্নের প্রয়োগ, রেফযুক্ত ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব। আমাদের লক্ষ্য হবে, হাজার বছরের বানান-চর্চায় এইসব বিভ্রান্তির এলাকাগুলিতে একটু-আধটু চোখ বুলিয়ে নেওয়া। তা থেকে আন্দাজ করে নেওয়া যাবে নানাযুগের নানারকম

বানান-লেখায় নানারকম লেখকের নানারকম ঝোঁক। আসুন, চর্যাপদের পাতা থেকেই সেসব খুঁজতে শুরু করি, পরপর শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-চণ্ডীমঙ্গল-অন্নদামঙ্গল ছুঁয়ে ছুঁয়ে ক্রমশ পৌঁছে যাই আধুনিক বাংলার গদ্যে-পদ্যে।

চর্যাপদ ঃ দশ-এগারো শতক

চর্যাপদের কয়েকটি পঙ্‌ক্তি উদ্ধার করে কিছু কিছু শব্দ চিহ্নিত করে দিচ্ছি, লক্ষ করুন সেইসব শব্দের বানান—

১. অ-ও ঃ ও-উচ্চারণে চর্যাপদে কখনও ও-কার দেওয়া হচ্ছে, কখনও অ-কারই থাকছে। যেমন, চর্যা-১এ ‘দিঢ় **করিঅ**’, কিন্তু চর্যা-৫এ ‘নিবাণে **কোরিঅ**’—প্রথমটিতে ‘ক’, পরেরটিতে ‘কো’ বানান একই উচ্চারণে (কো উচ্চারণে)। একালের ‘কেহ’ কথাটি চর্যা-১৮ তে পেয়েছে উচ্চারণ-অনুগ ‘কেহো’ বানান (**কেহো কেহো** তোহোরে বিরুআ বোলই)।

২. ই-ঈ ঃ সহজে থির **করি** বারুণী সান্ধ (চর্যা-৩)
তো মুহ **চুম্বী** কমলরস পিবনি (চর্যা-৪)
এ বন **চ্ছাড়ী** হোহু ভান্তো (চর্যা-৬)
খুন্টি **উপাড়ী** মেলিলি **কাচ্ছি**।
বাহতু কামলি সদ্‌গুরু **পুচ্ছি**।। (চর্যা-৮)
**
বামদাহিণ **চাপী মিলি মিলি** মাঙ্গা (চর্যা-৮)

এখানে প্রতিটি চিহ্নিত শব্দই ই-অন্তক অসমাপিকা ক্রিয়া, অথচ এদের বানানে কোথাও ই-কার, কোথাও ঈ-কার। করি (করে)-পুচ্ছি (জিজ্ঞেস করে)-মিলি মিলি (মিলে মিলে)-র শেষে ই-কার, পাশাপাশি চুম্বী (চুম্বন করে)-চ্ছাড়ী (ছেড়ে)-উপাড়ী (উপড়ে ফেলে)-চাপী (চেপে)-র শেষে ঈ-কার। **এই বানান-বিভ্রান্তি ঘটেছে যেমন পৃথক কবির কবিতায়** (চর্যা-৩,৪,৬,৮), তেমনি একই কবির একই কবিতাতেও (চর্যা-৮)

৩. উ-ঊ ঃ **সুজ** লাউ সসি লাগেলি তান্তী (চর্যা-১৭)
চন্দসুজ্জ দুই চকা ....(চর্যা-১৪)
একই **‘সূর্য’** একটি পদে ‘সুজ’ অন্য পদে **‘সূজ্জ’**।

৪. ঐ-অই ঃ এ **তৈলোএ** এত বিসারা (চর্যা-৩০)
চঞ্চল চীএ **পইঠা** কাল (চর্যা-১)
ভুসুকু ভণই মূঢ়-হিঅহি ন **পইসই** (চর্যা-৬)

লক্ষ করুন 'তৈলোএ' বানানে ঐ-কার, অথচ একই উচ্চারণে 'পইঠা' আর 'পইসই' বানানে 'অই'।

৫. ঔ-অউ ঃ **চউশটি** ঘড়িয়ে দেল পসারা (চর্যা-৩)
এক সো পাদুমা **চৌষঠ্ঠী** পাখুড়ী (চর্যা-১০)

'চৌষট্টি' কথাটি কোনও পদে 'চউশটি' (অউ), আবার কোনও পদে 'চৌষঠ্ঠী' (ঔ-কার। একইভাবে 'চতুর্দিশ' কথাটিও একটি পদে (চর্যা-৮) হয়েছে 'চউদিস', অন্যপদে (চর্যা-৬) 'চৌদীস'।

৬. ঙ-ং ঃ আলো ডোম্বি তোএ সম করিব মো **সাঙ্গ**।
নিঘিন কাহ্নু কাপালি জোই **লাংগ**।। (চর্যা-১০)

একই কবি কাহ্নুপাদের একই চর্যাপদে দেখুন 'সাঙ্গ' বানানে 'ঙ' আর 'লাংগ' বানানে 'ং'। খুঁজলে আরও দেখা যাবে, সাঙ্কমত-অঙ্গন-মাঙ্গা-লাঙ্ক বানানের পাশাপাশি চাংগেড়া-এবংকার-তরংগতে-সিংগে বানানের অবাধ আনাগোনা।

৭. জ-য ঃ চর্যাপদের তৎসম বানানে একটিমাত্র 'য' (কাহ্নু কপালী **যোগী** পইঠ অচারে - ১১নং), অ-তৎসম শব্দ-বানানে 'য' নেই, আছে কেবল 'জ'। আজকের যেন-যাও-সূয্যি-যে বানান চর্যাপদে ছিল জেণ-জাহ-সূজ্জ-জে। চর্যাপদের কবিরা জ-ব্যবহারে জ-য-এর দ্বিধা থেকে মুক্ত।

৮. ণ-ন ঃ 'মন' শব্দটি কখনও 'মন' (নিঅ **মন** দে উলাল), কখনও **'মণ'** (জহি মণ ইন্দিঅ); 'শূন্য' কথাটি কখনও 'শূন' (পেখমি দহদিহ সব্বই **শূন**), কখনও 'শূণ' (চিঅ সহজে**শূণ** সংপুন্না)।

৯. শ-ষ-স ঃ ৫০-নং চর্যাপদে 'শবর' শব্দের তিনরকমের বানান লক্ষ করুন—
**
কঙ্গুচিনা পাকেলা রে **শবর**শবরী মাতেলা।
হের সে **সবর** নিরেবণ ভইলা ফিটিল **ষবরালী**।।

‘শেয়াল’ শব্দটিও চর্যাপদে কখনও ‘শিআলী’, কখনও ‘ষিআলা’, ‘চৌষট্টি’ শব্দের চউশটি-চৌষঠ্‌ঠী রূপান্তর একটু আগেই দেখলেন, ‘সহজে’ কথাটিও ‘সহজে’ আর ‘ষহজে’ দুরকম বানানেই লেখা রয়েছে।

১০. ক্ষ-খ ঃ ‘ক্ষ’-এর প্রয়োগ চর্যাপদে নেই। **‘ক্ষণ’**-র বদলে ‘খন’ আর **‘ক্ষুর’**-এর বদলে ‘খুর’-এর স্বচ্ছন্দ প্রয়োগ রয়েছে চর্যা-৬ এর **‘খনহ** ন ছাড়অ’ আর ‘হরিণার **খুর** ন দীসঅ’ কথাদুটির মধ্যে। চর্যা-৪ এ দেখতে পাবেন **‘ক্ষেপ’**-র বদলে ‘খেপ’-র প্রয়োগ (**খেপহু** জোইনি লেপ ন **জাঅ**)।

শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ঃ চোদ্দশতক

চর্যাপদের বানান-প্রয়োগের একটা চেহারা এইমাত্র দেখলেন। এবার দেখুন ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ কাব্যে বানান-প্রয়োগের কিছু কিছু নমুনা।

১. অ-ও ঃ শব্দশেষে ও-উচ্চারণে ও-কার প্রয়োগের ঝোঁক চর্যাপদের মতো ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ কাব্যেও আছে। ক্রিয়াপদের শেষে ও-কার প্রায় সর্বত্র—

মারিবোঁ পরাণে তোকে জাণাআঁ গোআল।। (তাম্বুলখণ্ড ঃ পৃ - ১০)
তবেঁ কেহ্নে **আসিবোঁ** মো তোমার সংহতী।। (ঐ)
আবসি **করিবোঁ** তবেঁ তোহ্মার বিনাশ।। (ঐ)
বড় অপমান **পাইলোঁ** এবেঁ **খাইবোঁ** বিসে।। (ঐ)
তোমার অন্তরেঁ **গেলোঁ** রাধিকার থানে।। (ঐ)
আইলো তোর বৃন্দাবন তোহ্মা অনুসরী।। (রাধাবিরহ ঃ পৃ -১৪১)

তবে কিছু কিছু শব্দে দু-রকম বানানের বিভ্রান্তিও দেখতে পাবেন। যেমন, কত-কতো কোন-কোনো জাঅ-জাওঁ। সেইসঙ্গে ‘কাল’ আর ‘গরূ’-তে দেখা যাবে ও-কার এড়ানোর নজির। ‘কেহো’ বানানে চর্যাপদের মতো ও-কার প্রয়োগের দিকেই শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কবির ঝোঁক, ও-কারহীন ‘কেহ’ খুব কম (কভো **কেহ** না কৈল যেন রস প্রবন্ধে’ : রাধাবিরহ ঃ পৃ -১৫১)

‘কাহারও’ বোঝাতে ‘কাহারো’ বানান ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’ থেকেই শুরু।

২. ই-ঈ ঃ ঈ-কার প্রয়োগের ঝোঁকটা যে ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে’ বেশ প্রবল, এটা বোঝা যায় চীত-ঊচীত-মতী-আসী-চুরী-দুঈ-ভরী-অনুসরী-মুকতী-স্থিতী-প্রতী-রাতী-মিনতী-উড়ী-তীন-হীত বানান থেকেই। তবে এর মধ্যে দু-চারটি শব্দের বিকল্প বানানে ই-কারের প্রয়োগও দেখা যাচ্ছে। যেমন, আসি-আসী, আনি-আনী দুই-দুঈ বিমতী-বিমতি ঊচিত-ঊচীত। ই-ঈ নিয়ে এ বিভ্রান্তি চর্যাপদে ছিল, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে’ও থাকছে।

‘কি-কী’ বানানের যে বিভ্রান্তি একাল পর্যন্ত গড়িয়েছে, তার গোড়াপত্তন শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে। লক্ষ করুন নীচের উদ্ধৃত পঙ্‌ক্তির অন্তর্গত ‘কি-কী’ বানান—

তাম্বুলখণ্ডে ঃ **কি** নাম তাহার কেহেন তার রূপ। (বিশেষণ) (পৃ - ৫)
সে **কি** রাধিকা ভৈলী সীতা সতী নারী।। (অব্যয়) (পৃ - ৬)
কুশলে **কি** আছহ নাতিনী। (অব্যয়) (পৃ - ৭)
তা সমে **কি** মোর নেহা।। (বিশেষণ) (পৃ - ৮)
এবেঁ তাক **কি** বুলিবোঁ বোল চক্রপাণী।। (সর্বনাম) (পৃ - ৯)
তোহ্মার দেহত কাহ্নাঞি না বসে **কি** পীত।। (অব্যয়) (পৃ - ১০)

দানখণ্ডে ঃ সুনিআঁ বা **কি** বুলিবে ঘরের গোআল।। (সর্বনাম) (পৃ - ১৩)
মোর রূপ যৌবনে তোহ্মাতে **কী**।। (সর্বনাম) (পৃ - ১৮)
গোআলকুলে **কি** তোহ্মে উপছিল সাণ্ড।। (অব্যয়) (পৃ - ৩৭)
এবেঁ সুন্দরি রাধে করিবেঁ **কী**। (সর্বনাম) (পৃ - ৪১)
দধি দুধ বিচি রাধা করিবেহেঁ **কী**। (সর্বনাম) (পৃ - ৬৮)

যমুনাখণ্ডে ঃ আহ্মে পাণি তুলী তোহ্মাত **কী**।। (সর্বনাম) (পৃ - ৯৫)
হারখণ্ডে ঃ তোহ্মার থানত আর কহিবোঁ মো **কী**। (সর্বনাম) (পৃ - ১০৫)
বংশীখণ্ডে ঃ কাহ্ন বিণি মোর রূপ যৌবনে কী।। (সর্বনাম) (পৃ - ১২০)

লক্ষ করুন, এখানে ১৪টি কি-কী বানানের ৮টি প্রশ্নমূলক সর্বনাম, ২টি প্রশ্নমূলক বিশেষণ আর ৪টি প্রশ্নমূলক অব্যয়। এর মধ্যে ৬টি সর্বনাম ঈ-কারান্ত (কী), বাকি ২টি সর্বনামসহ সবকটি বিশেষণ আর অব্যয় ই-কারান্ত (কি)। অর্থাৎ ‘কি-কী’ বানানে কিঞ্চিৎ বিভ্রান্তি থাকলেও সর্বনামে ‘কী’ আর অন্যত্র ‘কি’ প্রয়োগের একটি নীতি মোটামুটি তৈরি ছিল ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে’।

৩. উ-ঊ ঃ উ-ঊর বিভ্রান্তিও যথেষ্ট রয়েছে। কয়েকটি উদাহরণ এইরকম— উঠ-ঊঠ উচিত-ঊচিত উড়ী-ঊড়ী উদ্দেশ-ঊদ্দেশ উপরে-ঊপরে উপহাসে-ঊপহাসে শুন-শূন (শূন্য)।

৪. ঐ-অই ঃ ক্রিয়াপদে অই-উচ্চারণে ঐ-কারোর ঝোঁক (ভৈল-পৈশে-হৈলা), তবে পাশাপাশি ‘অই’র প্রয়োগও দেখা যাবে—হৈব-হইব কৈল-কইলা।

৫. ঔ-অউ ঃ কবি বিভ্রান্ত থাকছেন ‘চউঠ’ আর ‘চৌঠ’ বানানে।

৬. ং-ঙ ঃ ‘আঙ্গাদ-কঙ্কণ-আঙ্গুলি’র পাশে ‘রাংগে’ বানানে অথবা পাশাপাশি শঙ্খ-শংখ সঙ্গতি-সংঘাত বানানে বিভ্রান্তি রয়েছে।

৭. জ-য ঃ ‘জ’ উচ্চারণে ‘য’ প্রয়োগের বিভ্রান্তি চর্যাপদে ছিল না, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনেও নেই। আধুনিক বাংলার যখন-যতন-যেন-যবে-যা-যাও-যাহার শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে জখন-জতন-জেন-জবে-জা-জাঅ-জাহার। দুটি-একটি ক্ষেত্রে বিকল্পে যবে-যাইবোঁ-যেন দেখা গেলেও কবির ঝোঁক জ-এর দিকেই।

৮. ঞ ঃ মুখ্যত ইয়া-অন্তক অসমাপিকা ক্রিয়ার বানানে ঞ-র প্রায়োগ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে অব্যাহত থাকছে—আণিঞা গিঞাঁ পাঞাঁ। মাঝে মাঝে স্বয়ং ‘কানাই’ অবশ্য রয়েছেন ‘কানাঞি’-বানানের আবরণে।

৯. ণ-ন ঃ শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের কবি ণ-ন প্রয়োগে সবচেয়ে বেশি দ্বিধাগ্রস্ত। বিভ্রান্তির কয়েকটি উদাহরণ—জাণ-জান আগুণ-আগুন এখণ-এখন কাহিণী-কাহিনী কেমণে-কেমনে কোণো-কোন বিণি-বিনি, মন-মণ।

১০. শ-স ঃ শ-সর বিভ্রান্তি দেখুন আকাশ-আকাস পৈশে-পৈসে শুন-সুন বিকাশ-বিকাস শকতি সকতি বানানে। ‘বিকাশ-বিকাস’, বিকল্প বানানে অবশ্য সংস্কৃত ব্যাকরণের ছাড়পত্র আছে, তবে শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে কবি এ ব্যাপারে সচেতন থেকে বিকল্প প্রয়োগ করেছেন, এমন সম্ভাবনা কম। ‘সশুর’ বানানের মধ্যবর্তী ‘শ’ ‘সাসুড়ী’-তে এসে স্বচ্ছন্দে ‘স’ হয়ে পড়েছে, এ-ও দেখে নিন।

১১. রেফ ঃ বাংলাসাহিত্যে রেফের (´) প্রয়োগ ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে’ই প্রথম। রেফযুক্ত বানানে ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব থাকা তাই অত্যন্ত স্বাভাবিক, সংস্কৃতে বিধান থাকলেও বাংলায় রেফের নীচে একক ব্যঞ্জনের প্রবেশ আরও পরে। আপাতত ‘গর্জ্জুন’ (বৃক্ষ) ত বটেই, এমনকী ‘গর্ধ’-কেও স্বাগত জানানো হয়েছে ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তন’—কাব্যে। এর পাশে ‘দুর্জ্জন’ দুর্ব্বার’ তো আছেই।

১২. ক্ষ-খ ঃ ‘ক্ষ’-র প্রয়োগ ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে’-ই প্রথম। তৎসম ‘ক্ষমা’-র পাশে অতৎসম ‘ক্ষেমা-ক্ষেপে’ প্রয়োগ একাব্যে দেখা গেল। তবে, তৎসম ‘ক্ষণ-ক্ষুর’ আর অ-তৎসম ‘ক্ষুদ’ থেকে ‘ক্ষ’-কে স্থানচ্যুত করল ‘খ’, ‘ক্ষণ-ক্ষুর-ক্ষুদ’ হল ‘খনে-খণেক-খুর-খুদ’।

চর্যাপদ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন পেরিয়ে **চণ্ডীমঙ্গলে** পৌঁছতে বাংলা বানানের পাঁচ-ছ শ বছর কেটে গেল, বানান-বিভ্রান্তির উদাহরণও ক্রমশ কমে এল, সঠিক নির্দিষ্ট বানান-লেখায় কবিরা আরও যত্নবান হলেন। তবে বিভ্রান্তির এলাকা সংকুচিত হয় নি, বরং দুটি-একটি নতুন এলাকায় তার প্রসারণ লক্ষ করা যাবে। কেননা, ততদিনে বাংলা বানানে 'ত'-এর বিকল্পে এল 'ৎ', কবিদের ভাবনা শুরু হল হস্-চিহ্ন আর বিসর্গ (ঃ) নিয়ে। চর্যাপদ- শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের একচ্ছত্র 'জ' চণ্ডীমঙ্গলে এসে 'য'-এর প্রতিদ্বন্দ্বিতার মুখোমুখি হল।

এবারে এক-এক করে প্রতিটি এলাকা ঘুরে আসা যাক —

১. অ-ও ঃ আজকের 'কেহ' চর্যাপদে ছিল ও-কারান্ত 'কেহো', শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ঝোঁকটা ও-কারের দিকে থাকলেও তার পাশে উঠে এল দুটি-একটি 'কেহ'। চণ্ডীমঙ্গলের গোড়ার দিকে 'কেহ' আর 'কেহো' চলছে পাশাপাশি প্রায় সমান দাবি নিয়ে। 'কেহ-কেহো' নিয়ে কবি এখানে বিভ্রান্ত। '**কেহো** রথে **কেহো** গজে **কেহো** তুরঙ্গমে'-র ছ-টি পঙ্‌ক্তি পরেই কবি লিখছেন—'সিদ্ধান্ত করয়ে **কেহ কেহ** পূর্বপক্ষ' (কবিকঙ্কণ-চণ্ডী : পৃ-৪৬)। তবে, ক্রমশ 'কেহ' বানানেই কবি স্থির হলেন। অজস্র হৈল-হইল-হল্যার পাশে 'হলো' বানানের ও-কারান্ত চেহারাও দেখবেন 'উজির হলো রায়জাদা' (পৃ-৩০) কথাটির মধ্যে। তবে 'ভাল ত নহিবে তবে' (পৃ-৫২)—'ভাল' 'ত' এখনও ও-কারযুক্ত হয়ে ওঠেনি।

২. ঈ-ঈ ঃ 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে'-র বানানে ই-কার প্রয়োগের যে ঝোঁক দেখা গিয়েছিল, চণ্ডীমঙ্গলে তা অনেকটাই কমে এসেছে। ই-ঈর সহাবস্থানে এখানে স্বীকৃত, স্বাভাবিক। 'বোয়ালী'-র পাশেই 'চিঙ্গুড়ি'-র স্বচ্ছন্দ আনাগোনা চলছে, টাঙ্গী-ভঙ্গী-হাতী-শাড়ী-বাড়ীর পাশে নির্দ্বিধায় রয়েছে মরিচ-হাঁড়ি। তবে, বিভ্রান্তি রয়েছে যেমন চুবড়ি-চুবড়ীর মতো অ-তৎসম বানানে, তেমনি দুটি-একটি তৎসম বানানেও। লক্ষ করুন এই কথাটি —'সকল অঙ্গুলি ভরি মাণিকের অঙ্গুরী' (পৃ-২৩২)। অঙ্গুলি-অঙ্গুলী আর অঙ্গুরি-অঙ্গুরী—দুটি করে বানানই সংস্কৃত ব্যাকরণসম্মত। তবে 'অঙ্গুলি'-তে ই-কার আর 'অঙ্গুরী'-তে ঈ-কার নির্বাচনে বানান-বিভ্রান্ত কবিকেই খুঁজে পাই। আবার, পর পর দুটি বাক্যে লক্ষ করুন 'কাঁচলী' আর 'কাঁচলি'র সহাবস্থান—

'মনে করি ভগবতী, **কাঁচলী** নির্ম্মাণে তথি
বিশ্বকর্ম্মে করিলা সোঙরণ।।
সোঙরণে বিশাই আল্য দেবী তাঁরে আদেশিল
কাঁচলি-নির্ম্মাণে দিল মন।' (পৃ - ২৩৩)

‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে’ আমরা দেখেছি ‘কি-কী’ বানান-প্রয়োগে নীতি আর বিভ্রান্তি। চণ্ডীমঙ্গলে ‘কী’ নেই, বিশেষণ-সর্বনাম হিসেবেও কেবল ‘কি’—

১. নারদে বলিব **কি** ....(পৃ - ৪৭)

২. **মাগু** মৈল বুড়া কালে জীয়া কাজ **কি**।। (পৃ - ২০৫)

৩. **কি** কারণে এতগুলা তুলাল্যে ভবন।। (পৃ - ৩১৫)

৪. **কি** আর জিজ্ঞাসা কর..............(পৃ - ২৪৫)

৫. **কি** হেতু ছাড়িলে পতি। (পৃ - ২৪৪)

৩. উ-ঊ ঃ উ-ঊর বিভ্রান্তি সীমিত থাকছে ‘‘ঊরু-উরস্থল’’ ‘চূণ-চুণ’-এর মতো দুটি-একটি শব্দের বানানে। অ-তৎসম বানানে ঊ ক্রমশ নিশ্চিহ্ন হচ্ছে।

৪. ঐ-অই ঃ ‘ওই্’ উচ্চারণে ঐ-কার প্রয়োগের ঝোঁক শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের তুলনায় চণ্ডীমঙ্গলে অত্যন্ত বেশি, বৈসে-হৈল-হৈতে-লৈয়া-পৈতার পাশাপাশি বইসে-হইল-হইতে-লইয়া-পইতাও অবশ্য মাঝে মাঝে চোখে পড়ে। আবার, ‘**খই**’ আর ‘**দই**’ বানানেও ঐ-কারের প্রশ্রয় নেই—‘নিধানী করিয়া **খই** তাহাতে মহিষা **দই**’ (পৃ - ১৬৫)

৫. ঔ-অউ ঃ ঔ-কারের প্রয়োগ চণ্ডীমঙ্গলে বেশ কম, ‘চৌ’ বানানেই সীমাবদ্ধ (চৌদিকে-চৌখণ্ডিয়া-চৌরি)।

৬. ঙ-ং ঃ ঙ-র বিকল্পে ং-প্রয়োগের রেওয়াজ চণ্ডীমঙ্গলেও তৈরি হতে দেখছি না। ‘অহঙ্কার’ বানানের পাশাপাশি ‘অহংকার’-এর ব্যতিক্রমী প্রয়োগ থাকলেও সাধারণভাবে ঙ-প্রয়োগ চণ্ডীমঙ্গলের সর্বত্র দেখা যাবে (সঙ্গীত-ভয়ঙ্কর-শঙ্খ-রাঙ্গা)। ‘অহংকার’ বানানটি বিভ্রান্তি না হয়ে বিচ্যুতিও হতে পারে। কেননা, ঙ-র বিকল্পে ং-প্রয়োগের দৃষ্টান্ত আর দেখা যাচ্ছে না।

৭. ণ-ন ঃ ণ-প্রয়োগের ঝোঁক চণ্ডীমঙ্গলের অ-তৎসম বানানে অব্যাহত, বরং শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের তুলনায় একটু বেশিই। অজস্র লোণ-চূণ-মাণিক-বেণ্যা-পয়াণের পাশে দুটি-একটি বেন্যা-পয়ান অবশ্য উঁকি দেয়।

৮. জ-য ঃ ‘জ’-এর উচ্চারণে চর্যাপদে ‘য’ ছিল না, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে দুটি-একটি ছিল (যাইবোঁ, যান, যেন), চণ্ডীমঙ্গলে ‘জোগাব’-এর পাশে ‘যোগাব’ আর ‘জুড়ি’-র পাশে ‘যুড়ি’ এসে ‘জ’-কে ক্রমশ কোণঠাসা করে দিচ্ছে ‘য’।

৯. ঞ ঃ ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে’র ‘ঞ’ আবদ্ধ ছিল মুখ্যত অসমাপিকা ক্রিয়ায় (আণিঞা-গিঞা-পাঞা), চণ্ডীমঙ্গলে তা স্থানান্তরিত হল গোসাঞি-মুঞি-ঠাঞি-তেঞি-এর মতো কয়েকটি বিশেষ্য-বিশেষণ-সর্বনামেও।

১০. শ-ষ-স ঃ শ-ষ-স-এর বিভ্রান্তি ‘কবিকঙ্কণ-চণ্ডী’তে কম।

১১. ক্ষ-খ ঃ চর্যাপদে ‘ক্ষ’ ছিল না, ছিল কেবল ‘খ’ (খনহ-খুর), শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ‘খনে-খুদ-খুরে’-র পাশে দেখা গেল ‘ক্ষেমা-ক্ষেপে’-র ‘ক্ষ’। চণ্ডীমঙ্গলেও ‘খেনে-খুদ’ এর পাশাপাশি বাড়তি প্রশ্রয় পেল ‘ক্ষেমা-ক্ষেতি-ক্ষুদ-ক্ষেণে’ বানানের ‘ক্ষ’।

১২. রেফ ঃ রেফের নীচে ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব নিয়ে কোনও সংশয় এখনও পর্যন্ত শুরু হয় নি। অর্চ্চনা-অর্দ্ধ-আশীর্ব্বাদ-কর্ম্ম-বার্ত্তা-পর্ব্বত-পূর্ব্ব-চতুর্দ্দোল-এর মতো ব্যঞ্জনদ্বিত্ব প্রয়োগ খুব স্বাভাবিকভাবেই চলেছে চণ্ডীমঙ্গলে। তবে, ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে’ **‘গর্ধ’** বানানে যে ব্যঞ্জনদ্বিত্বের কিঞ্চিৎ বাড়াবাড়ি দেখেছিলেন, পরবর্তী বাংলাসাহিত্যে তা আর ফিরে আসে নি। চণ্ডীমঙ্গলেও চারপাশের অজস্র ব্যঞ্জনদ্বিত্বের পাশে দ্বিত্বহীন ‘গর্ভ’ বানানটিই দেখা যাচ্ছে—

‘ছলিয়া আনিয়ে পূর্ব্বে জন্মাইবে তোর **গর্ভে**’ (পৃ ঃ ১২১)

১৩. হস্‌চিহ্ন ঃ হস্‌চিহ্নের প্রয়োগ চর্যাপদ-শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ছিল না, চণ্ডীমঙ্গলেই এর প্রয়োগ শুরু হল। চণ্ডীমঙ্গলের কবি অবশ্য হস্‌-প্রয়োগে বিভ্রান্তি কাটিয়ে উঠতে পারেন নি— সম্পদ-সম্পদ্‌ বণিক-বণিক্‌ কোন-কোন্‌ দুরকম বানানই দেখতে পাই এ কাব্যে।

১৪. বিসর্গ ঃ একইরকমের বিভ্রান্তি রয়েছে বিসর্গ (ঃ) প্রয়োগেও —‘পুনঃ’ আর ‘পুন’ দুটি বানানই চণ্ডীমঙ্গলে গৃহীত। বানানে বিসর্গ-প্রয়োগ অবশ্য একাব্যে অত্যন্ত কম। প্রথম প্রয়োগে ‘ঃ’ নিয়ে দুটি-একটি বানান-বিভ্রান্তি অপ্রত্যাশিত নয়।

১৫. ত-ৎ ঃ ‘ত’-এর বিকল্পে ‘ৎ’-এর প্রয়োগ মধ্যযুগীয় বানানের নতুন সংযোজনা। সূচনা-পর্বে এ নিয়ে বিভ্রান্তিও স্বাভাবিক — তাবৎ-তাবত দুরকমই চলতে দেখা যায় পাশাপাশি। ‘**চিৎ** হয়্যা শুতে নারে কুজের প্রকারে’ (পৃ - ৯৯) — এখানে ‘চিৎ’ আসলে ‘চিত’ বানানের বিচ্যুতি। প্রথম প্রয়োগে ‘ৎ’-ও এমনি করে বিচ্যুতি আর বিভ্রান্তির শিকার হল।

এবারে চলে যাই আঠারো শতকের **‘অন্নদামঙ্গল’** কাব্যে।

ও-উচ্চারণ বোঝাতে ও-কার প্রয়োগের দ্বিধা আজকের বানানেও কাটেনি। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে-চণ্ডীমঙ্গলেও কত-কতো কেহ-কেহোর বিভ্রান্তি দেখেছি। কিন্তু 'অন্নদামঙ্গলে'-র কবি যখন আরো-বারো-পারো-এলো এমনকী 'আমারো' বানান প্রয়োগ করে চলেন একের পর এক, তখন তাঁকে সমকাল থেকে অনেকটা এগিয়ে থাকতেই দেখি। কয়েকটি নমুনা দেখুন—

১. একে ত নারদ **আরো** বিষ্ণুর আদেশ। (অন্নদামঙ্গল : পৃ - ১৫)

২. অল্প করি সিদ্ধি লহ মণ **লক্ষ বারো**।
ধুতুরার ফুল তাহে যত দিতে **পারো**।। (অন্নদামঙ্গল : পৃ - ২১)

৩. আমি যে বিধাতা শিব **আমারো** বিধাতা।। (ঐ : পৃ - ৪৯)

৪. **এলো** যথা পশুপতি।। (ঐ : পৃ - ১৭)

অ-তৎসম বানানে ঈ-কারের ঝোঁক অন্নদামঙ্গলে স্পষ্ট। চুরী-গাড়ী-বাড়ী-শাড়ী-দাড়ী-লড়ী-বড়ী-হাতী-বাজী-ভেলকী-মরীচ-মউরী-আমীনের পাশে দুটি-একটি ই-কারান্ত 'বাসি-ঝুড়ি'র সলজ্জ আনাগোনা দেখতে পাই। তা সত্ত্বেও তৎসম অঙ্গুলি-অঙ্গুলী থেকে কবি ই-কারান্ত 'অঙ্গুলি'কেই কেন বেছে নিলেন, বোঝা শক্ত। লক্ষ করুন, চণ্ডীমঙ্গলের 'বোয়ালী' আর 'চিঙ্গুড়ি' দু-শ বছর পর অন্নদামঙ্গলে এসে ই-ঈ-কারের বদল ঘটিয়ে 'বোয়ালি' আর 'চিঙ্গড়ী' হয়েছে, কিন্তু ই-ঈ-র ফারাকটা কেউ ছাড়ে নি—

শিঙ্গী ময়া পাবদা **বোয়ালি** ডানকোণা।
চিঙ্গড়ী টেঙ্গরা পুঁটি চান্দাগুঁড়া সোনা।। (অন্নদামঙ্গল : পৃ - ৩১)

চণ্ডীমঙ্গলের 'মরিচ'-ও অন্নদামঙ্গলে 'মরীচ' হয়েছে। 'কি-কী' বানানের বিভ্রান্তি এড়িয়ে কবি এ কাব্যে সর্বনামে-বিশেষণে-অব্যয়ে সর্বত্র 'কি' প্রয়োগ করে গেছেন।

উ-ঊ প্রয়োগে কবিকে বিভ্রান্তি হতে দেখি উরু-ঊরু বানানে—

'অতি দীর্ঘ কক্ষলোম পড়ে উরুপর' (অন্নদামঙ্গল : পৃ - ৩৯)
অথচ, 'মণি করিকর ঊরু মনোহর' (ঐ : পৃ - ৩০)

অ্যা-উচ্চারণে এ-কার প্রয়োগ করতে অন্নদামঙ্গলের কবিকেও লিখতে হল চেলা-চেঙ্গ-টেঙ্গরা, এ সমস্যার শুরু শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-চণ্ডীমঙ্গলের হেন-যেন বানান থেকেই।

ক্রিয়াপদে এবং দুটি-একটি বিশেষ্যেও ওই্-উচ্চারণে ঐ-কার প্রয়োগের একটা রেওয়াজ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন থেকেই তৈরি হয়েছিল, চণ্ডীমঙ্গল পেরিয়ে অন্নদামঙ্গলেও তা অব্যাহত। যেমন, হৈল-হৈতে-লৈলা-রৈল-কৈল-মৈলে। এদের পাশে অবশ্য হইল-লইল-লইয়ার মতো বিকল্প বানানও অন্নদামঙ্গলে গৃহীত। তবে,

চণ্ডীমঙ্গলের ‘খই’ আর ‘দই’ বিকল্পে খৈ-দৈ হয় নি, অন্নদামঙ্গলেও ‘কই’ (মাছ) কখনও ‘কৈ’ হয়ে ওঠে নি।

‘ওউ্’ উচ্চারণে ঔ-কাব্যের বিকল্পে ‘অউ’-এর প্রয়োগ চর্যাপদ থেকে শুরু করে অন্নদামঙ্গল পর্যন্ত টিকে রয়েছে। চর্যাপদে আছে চৌষঠ্‌ঠী-চৌদীসের পাশে চউশটি-চউদিস, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে আছে ‘চৌঠ’-র পাশে ‘চউঠ’, চণ্ডীমঙ্গলে চৌদিকে-চৌখণ্ডিয়ার পাশে মউলা-জউগ্রাম, আর অন্নদামঙ্গলে ‘চৌত্রিশ’ ‘হোক’-এর পাশে ‘মউরী’ ‘বউ’।

ঙ-র বিকল্প হিসেবে ং-এর প্রয়োগ চর্যাপদে (লাংগ তরংগতে), শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে (শংখ সংঘাত), চণ্ডীমঙ্গলে (অহংকার) দেখেছেন, তবে দুটি-একটির বেশি নয়। অন্নদামঙ্গলে ঙ-র বিকল্পহীন প্রয়োগ দেখবেন (সঙ্কট-সঙ্কল্প-অলঙ্কার)। তবে একক ‘ঙ’-র বদলে যুক্ত ‘ঙ্গ’ লেখার ঝোঁক আছে ‘ভাঙ্গন’ ‘টেঙ্গরা’ চিঙ্গড়ী’ বানানে।

অ-তৎসম বানানে জ-র বিকল্পে য-কে সক্রিয় হতে দেখছি ‘চণ্ডীমঙ্গল’ থেকেই। অন্নদামঙ্গলে তা অব্যাহত। তবে এ নিয়ে কোনও বিভ্রান্তি (অর্থাৎ একই শব্দের একাধিক বানান) এ কাব্যে নেই।

অ-তৎসম বানানে সংস্কৃতের ণ-ত্ব বিধান মেনে ণ-প্রয়োগের প্রথা চর্যাপদ থেকে শুরু করে অন্নদামঙ্গল পর্যন্ত চলছে (পরগণা-পরাণ-বেণে)। তবে ণ-ন এর বিভ্রান্তি অন্নদামঙ্গলের বানানে নেই। ঞ-র-প্রয়োগও বাংলাকাব্য থেকে বিদায় নিল।

শ-ষ-স প্রয়োগ নিয়ে কোনও বিভ্রান্তির দৃষ্টান্ত অন্নদামঙ্গলে দেখা যাচ্ছে না। বিভ্রান্তি নেই ক্ষ-খ প্রয়োগ নিয়েও—তবে ‘ক্ষণ’ আর ‘খুদ’ বানানে এ দুটি বর্ণ স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করে চলেছে।

রেফযুক্ত বানানে ব্যঞ্জন-দ্বিত্ব প্রয়োগের নীতি শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-চণ্ডীমঙ্গলের মতো অন্নদামঙ্গলেও মান্য করা হয়েছে। এমনকী, সর্ব্ব-সূর্য্য-মর্ম্ম-অর্দ্ধ-মূর্ত্তি বানানের তৎসম সীমানা পেরিয়ে অ-তৎসম ‘আলিবর্দ্দী মুখুর্য্যা বানানেও চলছে এ নীতির অনধিকার চর্চা।

হস্‌চিহ্নের প্রয়োগে অন্নদামঙ্গলের ঝোঁকটা চোখে পড়ার মতো। সংস্কৃত বতুপ্ (বান্) আর মতুপ্ (মান্) প্রত্যয়ে হস্‌চিহ্ন দেওয়ার বিধি প্রতিটি শব্দে মেনে চলছেন অন্নদামঙ্গলের কবি (গুণবান্-জ্ঞানবান্-যত্নবান্- মূর্ত্তিমান্-ধীমান্)। কিন্তু, কোন-কোন্ বানানেই ঘটছে বিভ্রান্তি—অন্নদামঙ্গলের ৫৪ পৃষ্ঠায় ‘**কোন** সুখে যাইব ধরণী’-র পাশে ৩৭ পৃষ্ঠায় দেখবেন ‘কোথা **কোন্** যজ্ঞ হয়’। বিসর্গ-প্রয়োগে বিভ্রান্তির নমুনা দেখুন চণ্ডীমঙ্গলের মতো অন্নদামঙ্গলেও—‘**পুনঃ** কহ কি হইবে এখানে মরিলে’ (পৃ - ৫২), অথচ ‘পুন হবে স্বর্গবাসী’ (পৃ - ৫৪)। তবে বিশেষতঃ-স্বভাবতঃ বানানে বিসর্গ-বিভ্রাট নেই। এমনকী বিদেশি ‘মুজঃফর’ শব্দের বানানেও বিসর্গ-প্রয়োগে কবির দ্বিধা দেখছি না।

১১২.৩.১ সারাংশ—১

দশ-এগারো শতকের ‘চর্যাপদে’ এই কটি বর্ণ বা চিহ্নের প্রয়োগ শুরুই হয় নি—ঋ ৎ য ক্ষ ঃ আর রেফ (´)। অতএব, কোনো শব্দ-বানানে ঋ-রি, ত-ৎ, জ-য, ক্ষ-খ, বিসর্গ থাকা বা না-থাকা, রেফের নীচে ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব হওয়া বা না-হওয়া—এ ধরনের সমস্যা তখনও তৈরি হয় নি। বানানে বিভ্রান্তি এসেছে যেসব ক্ষেত্রে, সেগুলি লক্ষ করুন—

১. অ-ও ঃ ‘করিঅ’-র পাশে ‘কোরিঅ’।

২. ই-ঈ ঃ ‘করি-পুচ্ছি-মিলি’-র পাশে চুম্বী-চ্ছাড়ী-উপাড়ী-চাপী।

৩. উ-ঊ ঃ ‘সূর্য’ অর্থে ‘সুজ’-র পাশে ‘সুজ্জ’।

৪. ঐ-অই ঃ ‘তৈলোএ’-র পাশে ‘পইঠা-পইসই’।

৫. ঔ-অউ ঃ ‘চৌষঠ্‌ঠী’-র পাশে ‘চউশটি’।

৬. ঙ-ং ঃ ‘সাঙ্গ’-র পাশে ‘লাংগ’।

৭. ণ-ন ঃ ‘মণ’-র পাশে ‘মন’, ‘শূণ’-র পাশে ‘শূন’।

৮. শ-ষ-স ঃ ‘শবর’-এর পাশে ‘সবর’ বা ‘ষবরালী’, ‘সহজে’-র পাশে ‘ষহজে’, ‘শিআলী’-র পাশে ‘ষিআলা’।

চোদ্দ শতকের ‘শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে’ শব্দ-বানানে শুরু হল ঞ, ক্ষ আর রেফের (´) প্রয়োগ। তবে এসব বর্ণ বা চিহ্ন নিয়ে বানানে খুব একটা বিভ্রান্তি দেখা যায় নি। ইয়া-অন্তক অসমাপিকা ক্রিয়ার শেষে ঞ-কে কবি মেনে নিয়েছেন সর্বত্র—আনিঞা-গিঁঞা-পাঞা। ‘কানাঞি’-ও নির্দ্বিধায় চলছে। দুটি-একটি ক্ষেত্রে ‘জ’-এর পাশাপাশি ‘য’ থাকলেও (‘জবে-জাইবোঁ-জেন’-র পাশে ‘যবে-যাইবোঁ-যেন) কবি ঝোঁক ‘জ’ প্রয়োগের দিকেই। তৎসম ‘ক্ষমা’-র পাশাপাশি অ-তৎসম ‘ক্ষেমা-ক্ষেপে’-ও বেমানান ঠেকছে না। রেফের নীচে ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব নিয়ে সংশয় তখনও জাগে নি (‘গর্জ্জুন’ ‘গর্ধ’)। এবার বানানের অন্যান্য ক্ষেত্রগুলিতে দেখুন কিছু কিছু বিভ্রান্তির পাশাপাশি বিশেষ বর্ণ-প্রয়োগের ঝোঁক—

১. অ-ও ঃ শব্দশেষে ও-কার প্রয়োগের ঝোঁক —মারিবোঁ-আসিবোঁ-করিবোঁ-খাইবোঁ-পাইলোঁ-গেলোঁ-আইলো, এমনকী ‘কেহো’ ‘কাহারো’। তবে বিভ্রান্তি আছে কত-কতো কোন-কোণো জাঅ-জাওঁ বানানে।

২. ই-ঈ ঃ ঈ-কারের ঝোঁক প্রবল—চীত-মুকতী-মতী-আসী-চুরী-স্থিতী-মিনতী। বিভ্রান্তি থাকছে

আসি-আসী আনি-আনী বিমতি-বিমতী দুই-দুঈ উচিত-ঊচীত বানানে। সর্বনামে ‘কী’ আর অব্যয়ে ‘কি’ এখান থেকেই শুরু।

৩. উ-ঊ ঃ বিভ্রান্তির উদাহরণ উঠ-ঊঠ উচিত-ঊচিত উড়ী-ঊড়ী উদ্দেশ-ঊদ্দেশ উপরে-ঊপরে উপহাসে-ঊপহাসে শুন-শূন (শূন্য)।

৪. ঐ-অই ঃ ক্রিয়াপদে ঐ-কার প্রয়োগে ঝোঁক —ভৈল-পৈশে-হৈলা। বিভ্রান্তি রয়েছে হৈব-হইব কৈল-কইলা বানানে।

৫. ঔ-অউ ঃ বিভ্রান্তির উদাহরণ ‘চৌঠ’-র পাশে ‘চউঠ’।

৬. ঙ-ং ঃ বিভ্রান্তি রয়েছে শঙ্খ-শংখ সঙ্গতি-সংঘাত বানানে।

৭. ণ-ন ঃ বিভ্রান্তির অজস্র উদাহরণের মধ্য থেকে কয়েকটি এইরকম—মন-মণ জান-জাণ আগুন-আগুণ এখন-এখণ কেমনে-কেমণে।

৮. শ-স ঃ বিভ্রান্তি দেখুন—‘আকাশ’-এর পাশে ‘আকাস’, ‘শুন’-র পাশে ‘সুন’, ‘সশুর’-এর পাশে ‘সাসুড়ী’ বানানে।

ষোলো শতকের চণ্ডীমঙ্গলে এসে বানানের এলাকা আরও একটু বাড়ল, শুরু ‘ৎ’ ‘ঃ’ আর হস্‌চিহ্নের প্রয়োগ। বিশেষ বর্ণ-প্রয়োগের ঝোঁক আর বানান-বিভ্রান্তি কতটা ঘটল দেখা যাক—

১. অ-ও ঃ ‘কেহ-কেহো’-র বিভ্রান্তি কাটিয়ে কবি ক্রমশ স্থির হচ্ছেন ‘কেহ’ বানানে। অজস্র হৈল-হইল-হল্যর পাশে দুটি-একটি ‘হলো’।

২. ই-ঈ ঃ ঈ-কারের পুরোনো ঝোঁক কমে এসেছে, ই-ঈর এখানে সহাবস্থান। বিভ্রান্তি রয়েছে ‘অঙ্গুলি’-র পাশে ‘অঙ্গুরী’ আর ‘কাঁচলি’-র পাশে ‘কাঁচলী’ বানানে।

৩. উ-ঊ ঃ অ-তৎসম বানানে ‘ঊ’ ক্রমশ সরে যাচ্ছে ‘উ’-কে বসিয়ে। দুটি-একটি বিভ্রান্তি ‘চুণ-চূণ’ বা ‘উরস্থল-ঊরু’ বানানে।

৪. ঐ-অই ঃ ‘ওই’-উচ্চারণে ঐ-কারের ঝোঁকটাই বেশি। তবু, বিভ্রান্তি রয়েছে বৈসে-বইসে হৈল-হইল হৈতে-হইতে পৈতা-পইতা বানানে।

৫. ঔ-অউ ঃ ঔ-কার বেশ কম, ‘চৌ’ বানানেই সীমাবন্ধ।

৬. ঙ-ং ঃ ‘ঙ’-র বিকল্পে ‘ং’ প্রয়োগের রেওয়াজ এখনও তৈরি হয় নি।

৭. জ-য ঃ অ-তৎসম বানানে ‘জ’-কে সরিয়ে ক্রমশ ‘য’ আসছে।

৮. ঞ ঃ অসমাপিকা ক্রিয়া ছেড়ে বিশেষ্য-বিশেষণ-সর্বনামে বিস্তৃত হল ঞ (গোসাঞ্রি-মুঞ্রি-তেঞ্রি)।

৯. ণ-ন ঃ অ-তৎসম বানানে ণ-প্রয়োগের ঝোঁক এখনও বেশি।

১০. ত-ৎ ঃ ‘ৎ’-র শুরু এখানে। ‘ত-ৎ’-এর বিচ্যুতি আছে ‘চিৎ’ বানানে, বিভ্রান্তি আছে ‘তাবৎ- তাবত’ বানানে।

১১. শ-ষ-স ঃ ‘শ-ষ-স’-এর বিভ্রান্তি চণ্ডীমঙ্গলে খুব কম।

১২. ক্ষ-খ ঃ ‘ক্ষেণে-ক্ষুদ’ আর ‘খেনে-খুদ’ বানানে ক্ষ-খ-এর বিভ্রান্তি দেখা যাচ্ছে।

১৩. ঃ (বিসর্গ) ঃ ‘ঃ’ প্রয়োগের শুরু এখানেই। অতএব, বিভ্রান্তি থাকছেই দুটি-একটি বানানে (পুনঃ-পুন)।

১৪. হস্‌চিহ্নের প্রয়োগও এখানেই প্রথম। বিভ্রান্তি এখানেও থাকছে (সম্পদ্‌-সম্পদ)।

১৫. রেফের নীচে ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব সর্বত্র (পূর্ব্ব-কর্ম্ম-অর্চ্চনা), কোনও বিভ্রান্তি নেই।

আঠারো শতকের ‘অন্নদামঙ্গল’-এ কবির বানান-চর্চা কী ধরনের, লক্ষ করুন—

১. অ-ও ঃ ও-উচ্চারণে ও-কার প্রয়োগ অনেকক্ষেত্রেই দ্বিধাহীন—আরো-বারো-পারো-এলো, এমনকী ‘আমারো।

২. ই-ঈ ঃ অ-তৎসম বানানে ঈ-কারের ঝোঁক —চুরী-মরীচ-আমীন-বাড়ী, দুটি-একটি বানানে ই-কারের ঝোঁক —‘বাসি’ ‘ঝুরি’।

৩. উ-ঊ ঃ এখানে বিভ্রান্তি —উরু-ঊরু।

৪. অ্যা-এ ঃ অ্যা-উচ্চারণে এ-কারের প্রয়োগ —চেলা-টেঙ্গরা-চেঙ্গ।

৫. ঐ-অই ঃ বিভ্রান্তি এখনও রয়েছে ক্রিয়াপদের বানানে —হৈল-হইল লৈলা-লইল।

৬. ঔ-অউ ঃ দুটি প্রয়োগই পাশাপাশি —‘চৌত্রিশ-হৌক’-এর পাশে ‘মউরী-বউ’।

৭. ঙ-ং ঃ ঙ-প্রয়োগে বিভ্রান্তি নেই —সঙ্কট-অলঙ্কার-সঙ্কল্প। ‘ঙ’-র বদলে ‘ঙ্গ’ লেখার ঝোঁক—ভাঙ্গল-টেঙ্গরা-চেঙ্গ।

৮. জ-য ঃ এ নিয়ে বিভ্রান্তি নেই।

৯. ঞ ঃ 'ঞ'-র একক প্রয়োগ এখন থেকে আর নেই।

১০. ণ-ন ঃ এ নিয়েও বিভ্রান্তি নেই।

১১. শ-ষ-স ঃ বিভ্রান্তি নেই এখানেও।

১২. ক্ষ-খ ঃ তৎসম বানানে 'ক্ষ' (ক্ষণ), অ-তৎসম বানানে 'খ' (খুর)।

১৩. ঃ (বিসর্গ) ঃ 'ঃ' প্রয়োগের ঝোঁক—তৎসম 'বিশেষতঃ স্বভাবতঃ'-এর পাশে অ-তৎসম 'মুজঃফর'। বিভ্রান্তি রয়েছে 'পুনঃ-পুন' বানানেও।

১৪. হস্‌চিহ্ন ঃ তৎসম বানানে বিভ্রান্তি নেই (যত্নবান্-ধীমান্), অ-তৎসম বানানে বিভ্রান্তি (কোন- কোন্)।

১৫. রেফের নীচে ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব ঃ নির্দ্বিধায় এটা চলছে, এমনকী অ-তৎসম বানানেও (আলিবর্দ্দী-মুখুর্য্যা)

১১২.৩.২ অনুশীলনী—১

১. (ক) চর্যাপদ থেকে নীচের বানান-বিভ্রান্তির প্রতিটি ক্ষেত্রের ১টি করে উদাহরণ লিখুন—অ-ও, ই-ঈ, ঐ-অই, ঙ-ং, ণ-ন, শ-ষ-স।

(খ) শ্রীকৃষ্ণকীর্তন থেকে নীচের বানান-বিভ্রান্তির প্রতিটি ক্ষেত্রের ১টি করে উদাহরণ লিখুন—অ-ও, ই-ঈ, উ-ঊ, ঔ-অউ, ণ-ন, শ-স।

(গ) চণ্ডীমঙ্গল থেকে নীচের বানান-বিভ্রান্তির প্রতিটি ক্ষেত্রের ১টি করে উদাহরণ লিখুন—ই-ঈ, উ-ঊ, জ-য, ক্ষ-খ, হস্‌চিহ্নের প্রয়োগ।

(ঘ) অন্নদামঙ্গল থেকে নীচের বানান-বিভ্রান্তির প্রতিটি ক্ষেত্রের ১টি করে উদাহরণ লিখুন—ঐ-অই, ঔ-অউ, হস্‌চিহ্নের প্রয়োগ, বিসর্গ-প্রয়োগ।

২. (ক) নীচের বর্ণ বা বর্ণচিহ্নের প্রথম প্রয়োগ কোন্ কাব্যে, ১টি করে উদাহরণ দিয়ে লিখুন—ক্ষ, ৎ, ঞ, য, ঃ, রেফ (র্), হস্‌চিহ্ন (্)।

(খ) চর্যাপদ-শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-চণ্ডীমঙ্গল কাব্যের মধ্য দিয়ে 'কেহ' বানানের রূপান্তর কীভাবে ঘটেছে, দেখিয়ে দিন।

(গ) শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-চণ্ডীমঙ্গল-অন্নদামঙ্গল কাব্যে ঐ-কার আর ঔ-কার প্রয়োগের বৈশিষ্ট্য উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিন।

(ঘ) চর্যাপদ-শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-চণ্ডীমঙ্গল-অন্নদামঙ্গল কাব্য থেকে অ-তৎসম বানানে ণ-প্রয়োগের ১টি করে উদাহরণ দিন।

(ঙ) অন্নদামঙ্গল কাব্য থেকে অ-তৎসম বানানে রেফের নীচে ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব প্রয়োগের ২টি উদাহরণ দিন।

(চ) প্রাচীন যুগের কাব্যে 'ঞ' বর্ণের একক প্রয়োগের ৫টি উদাহরণ দিয়ে একক বর্ণ হিসেবে এর প্রয়োগ-সীমা নির্দেশ করুন।

৩. (ক) 'ক্ষ'-র বদলে 'খ'-র ৩টি প্রয়োগ চর্যাপদ থেকে দেখান।

(খ) 'ৎ'-প্রয়োগে বানান-বিচ্যুতির ১টি উদাহরণ চণ্ডীমঙ্গল থেকে দিন।

(গ) শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে বানানের কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে কোন্ বর্ণ-প্রয়োগের ঝোঁক দেখা যায়, প্রতিটি ক্ষেত্র থেকে ৩টি করে উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিন।

(ঘ) শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে আর চণ্ডীমঙ্গলে কোন্ কোন্ বর্ণ আর বর্ণচিহ্নের প্রয়োগ শুরু হল, ১টি করে উদাহরণ দিয়ে জানান।

(ঙ) অন্নদামঙ্গলকাব্য থেকে দুটি করে দৃষ্টান্ত উদ্ধৃত করে হস্‌চিহ্ন আর বিসর্গ প্রয়োগের বিভ্রান্তি দেখিয়ে দিন।

৪. শূন্যস্থান পূরণ করুন—

(ক) 'কাহারও' বোঝাতে 'কাহারো' বানান .... থেকেই শুরু।

(খ) .... প্রয়োগের বিভ্রান্তি চর্যাপদে বা শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে নেই।

(গ) বাংলাসাহিত্যে রেফের প্রয়োগ .... কাব্যেই প্রথম।

(ঘ) অ-তৎসম বানানে ঈ-কারের ঝোঁক .... কাব্যে স্পষ্ট।

(ঙ) বিদেশি .... শব্দের বানানে বিসর্গ-প্রয়োগ রয়েছে .... কাব্যে।

৫. দশ থেকে আঠারো শতকের বাংলাভাষা-চর্চায় বানানের বিবর্তন কীভাবে ঘটেছে, চর্যাপদ-শ্রীকৃষ্ণকীর্তন-চণ্ডীমঙ্গল-অন্নদামঙ্গল কাব্য থেকে বানান-বিভ্রান্তি বানান-বিচ্যুতি আর বানান-প্রয়োগে বিশেষ বিশেষ প্রবণতার উল্লেখ করে প্রাসঙ্গিক উদাহরণসহ আলোচনা করুন।

১১২.৪ মূলপাঠ-২ ঃ উইলিয়াম কেরি থেকে বঙ্কিমচন্দ্র

দশ থেকে আঠারো শতক—এই আট-শ বছরের বাংলা বানান-চর্চায় কিছু কিছু বানান-বিভ্রান্তির নমুনা আপনি দেখতে পেলেন এর আগের মূলপাঠে। এবার উনিশ-বিশ শতকের দুই প্রান্তে দাঁড়িয়ে আমরা চিহ্নিত করব বানান-চর্চার এমন কয়েকটি এলাকা, যেখানে একদিকে সংস্কৃত ব্যাকরণের শাসন অন্যদিকে বাঙালিকণ্ঠের উচ্চারণ, একদিকে উৎস-পরিচয়কে ধরে রাখা আর একদিকে খোলস ছেড়ে বেরিয়ে আসা—এই দুটি বিপরীত ঝোঁকের টানাপোড়নে বাংলা বানান আন্দোলিত হচ্ছে। তৎসম বানানের এই দ্বিধা মূলত হ্রস্ব-দীর্ঘ স্বরচিহ্ন ঙ-ং শ-ষ-স নিয়ে, রেফের নীচে ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব বিসর্গ-চিহ্ন আর হস্‌চিহ্নের থাকা বা না-থাকা নিয়ে। অ-তৎসম বানানের এলাকায় এসবের সঙ্গে থাকছে অ-ও ঋ-রি ঙ-ঙ্গ জ-য ণ-ন শ-ষ-স ক্ষ-খ-এর দ্বিধা।

এই প্রাথমিক ধারণাটুকু আশ্রয় করে চলুন এবার একালের বাংলা বানানের সম্ভাব্য বিবর্তনের পথ ধরে। সে পথের একপ্রান্তে উইলিয়ম কেরি, আর-এক প্রান্তে অন্নদাশঙ্কর রায়। চলতি মূলপাঠে দেখা যাক, উইলিয়ম কেরি থেকে বঙ্কিমচন্দ্র—উনিশ শতকের এই পর্বের বাংলা গদ্যলেখায় বানান-প্রয়োগের কিছু কিছু নমুনা।

উইলিয়ম কেরির বাইবেল-অনুবাদ থেকে একটি বাক্য ঃ

তারপরে ঈশ্বর **নির্মাণ** করিলেন দুই বড় দীপ্তি বড়তর দীপ্তি দিবসের **কর্ত্তৃত্ব** করিতে ক্ষুদ্রতর দীপ্তি **রজনির** কৃতিত্ব করিতে তিনিও **নির্ম্মাণ** করিলেন তারাগণ।

তৎসম-বহুল বাক্যটির অন্তর্গত তিনটি শব্দ-বানান আমাদের চিহ্নিত এলাকার মধ্যে পড়ে — 'নির্ম্মাণ' 'কর্ত্তৃত্ব' 'রজনি'। দেখতে পাচ্ছি, 'নির্ম্মাণ' আর 'কর্ত্তৃত্ব' বানানে রেফের নীচে ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব, আর 'রজনি' বানানে ঈ-র বদলে ই-কারই **পছন্দ**। এর পাশে লক্ষ করুন কেরির 'কথোপকথন' থেকে তুলে-আনা দুটি বাক্য ঃ

তোমরা কয় **যা**।

আমি সকলের **বড়** আমার আর তিন **যা** আছে।

(পুরাতন বাংলা গদ্যগ্রন্থ সংকলন—প্রথম খণ্ড : পৃ - ১৬৬)

এসব বাক্যে অ-তৎসম (তদ্ভব) শব্দের প্রাধান্য সহজেই চোখে পড়ছে। এখান থেকে দুটি শব্দ 'যা' আর 'বড়' আমরা বেছে নিতে পারি, যা বানান-বিবর্তনের পথে ক্রমশ বিতর্ক তুলেছে, এদের প্রতিদ্বন্দ্বী

হয়ে উঠেছে ‘জা’ আর ‘বড়ো’। তবে, ‘দেওর-ভাসুরের বউ’ অর্থে সংস্কৃত ‘যাতৃ’ থেকে তদ্ভব হয়ে আসা ‘যা’ তাঁর বানানে উৎস-বানানের উত্তরাধিকারকেই রক্ষা করেছে (যাতৃ > যা)। আর, বানানে শব্দশেষের ও-কারের দাবি তখন ওঠে নি বলে ‘বড়’ অ-কারান্ত হয়েই দেখা দিল।

ফোর্ট উইলিয়ম কলেজের অধ্যক্ষ উইলিয়ম কেরিকে ছেড়ে এবার দেখুন তাঁরই মুন্সি অন্যতম অধ্যাপক **রামরাম বসুর** বানান-প্রয়োগ। ১৮০১ সালে ছাপা তাঁর ‘রাজা প্রতাপাদিত্য চরিত্র’ বইটি থেকে পর পর দুটি অংশ পড়ুন ঃ

১. যেকালে **দিল্লির** তক্তে হোমাঙ বাদসাহ.........তাহার অনেকগুলি সন্তান তাহারদের আপনারদের মধ্যে আত্মকলহ হইয়া বিস্তর **ঝকড়া** লড়াই কাজিয়া উপস্থিত ছিল......।

(পুরাতন বাংলা গদ্যগ্রন্থ সংকলন ঃ প্রথম খণ্ড, পৃ - ৬৫)

২. একটা **চিল্ল পক্ষি তিরেতে** বিদ্ধিত হইয়া শূন্য হইতে মহারাজার সম্মুখে পড়িল। অকস্মাৎ ইহাতে রাজা প্রথমত তটস্থ হইয়া **চমকিৎ** ছিলেন ....।

(পুরাতন বাংলা গদ্যগ্রন্থ সংকলন ঃ প্রথম খণ্ড, পৃ - ৭৮)

প্রথম অংশের অ-তৎসম ‘বাদসাহ’ ‘ঝকড়া’ তার পুরোনো বানানের পোশাক ছেড়ে ক্রমশ পরবর্তীকালে ‘বাদশাহ’ ‘ঝগড়া’ হয়ে উঠেছে। তৎসম শব্দে ভরা দ্বিতীয় অংশে একদিকে আছে অশুদ্ধ বানানের ‘চিল্ল’ ‘পক্ষি’ ‘বিদ্ধিত’, আর-একদিকে বিশুদ্ধ বানানের ‘শূন্য’ ‘মহারাজা’ ‘সম্মুখ’ ‘অকস্মাৎ’ ‘তটস্থ’। ‘চিল্লী পক্ষী বিদ্ধ’ না হয়ে ‘চিল্ল পক্ষি বিদ্ধিত’ হল নেহাত-ই প্রথম বাঙালি গদ্যকারের আকস্মিক অসতর্কতায়। এমনকী ‘প্রথমত’ ‘চমকিৎ’ আর ‘তির’-এর বানান নিয়েও সংশয় থেকে যায়। লেখক সতর্ক থাকলে হয়তো শব্দ তিনটি ‘প্রথমতঃ’ ‘চমকিত’ আর ‘তীর’ হয়ে উঠত, যা ঐ সময়ের স্বাভাবিক বানান। কেননা, সংস্কৃত বানানের শস্-প্রত্যয়ান্ত শব্দের বিসর্গ মুছে দিয়ে ‘প্রথমত’ লেখার রেওয়াজ গড়ে উঠতে অনেক সময় লেগেছে। রামরাম বসুর চিল পাখিটি অবশ্য ধারালো ফারসি ‘তির’-এর খোঁচাই খেয়েছে, নদীর তৎসম ‘তীর’-এর হাওয়া খায় নি। কিন্তু এখানেও ই-ঈর পার্থক্য সম্পর্কে এতটা সতর্কতা লেখকের কাছে আমরা প্রত্যাশা করব না। তবু, রামরাম বসুর বানান-প্রয়োগে অসতর্কতাজনিত বিচ্যুতি মেনে নিয়েও বিশেষ বিশেষ ঝোঁকের কথা ভাবতে পারি। তৎসম ‘পক্ষি’ বানানে বিচ্যুতি বা বানানভুল থাকতে পারে, কিন্তু অ-তৎসম ‘দিল্লি’-র ঈ-কারান্ত হবার দায় নেই। এমনকী ফারসি ‘তির’-ও অশুদ্ধ নয়। ‘পক্ষি-দিল্লি-তির’ বানান প্রমাণ করে, রামরাম বসু যথাসাধ্য ই-কারের দিকেই ঝুঁকে থাকতে আগ্রহী, ঈ-কার তাঁর পছন্দ নয়। তৎসম ‘প্রথমত’ বানানের বিসর্গ (ঃ)-বর্জনে লেখক বানানের বিশুদ্ধি রক্ষায় যতটা অসতর্ক তার চেয়ে বেশি সতর্ক বানানকে সরল আর উচ্চারণমুখী করার প্রতি।

আসুন, এবারে আমরা দেখি ফোর্ট উইলিয়ম কলেজ-গোষ্ঠীর সবচেয়ে নামী লেখক **মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কারের** বানান-প্রয়োগ। ১৮০৮ সালের 'রাজাবলী' থেকে কয়েকটি বাক্য তুলে দিচ্ছি ঃ

এইরূপে রাজা **ভর্ত্তৃহরি** বনপ্রবেশ করিলে পর মালুয়াদেশ অত্যন্ত অরাজক হইল.......পাত্র-মন্ত্রি প্রভৃতিরা অতি উদ্বিগ্ন হইয়া ....এক নিয়ম করিলেন..........প্রত্যহ প্রাতঃকালে এক পুরুষ রাজা হইয়া সমস্ত দিন **কাজকর্ম্ম** করে...........।

তৎসম শব্দে ভরা এসব রচনার প্রায় কোনও বানানই গত দু-শ বছরে পালটায় নি। তবে তৎসম 'মন্ত্রী'-র বদলে অশুদ্ধ বানানের 'মন্ত্রি'-র প্রয়োগ সংস্কৃত জানা মৃত্যুঞ্জয়ের পক্ষে নিতান্তই একটা অঘটন। এখানে কেবল লক্ষ করার বিষয় এই 'ভর্ত্তৃ' আর 'কর্ম্ম' বানানে রেফের নীচে ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব প্রয়োগের বিধি কেরির মতো মৃত্যুঞ্জয়ও মান্য করছেন।

১৮১৩ সালের 'প্রবোধচন্দ্রিকা' থেকে দুটি বাক্য দেখে নিই ঃ

শীলটা ভাল বটে, নোড়াটা যা ইচ্ছা তা। এতে কি **চিকণ** বাটা হয়?

এখানে লক্ষ করুন দুটি অ-তৎসম বানান 'শীল' আর 'চিকণ'। 'শিলা' থেকে তদ্ভব 'শিল' শব্দটির 'শীল' বানানে যে ঈ-কারের বিচ্যুতি, তার মূলে যতটা রয়েছে 'স্বভাব' অর্থে 'শীল' বানানের প্রভাব, তার চেয়েও বেশি রয়েছে ঈ-কারের প্রতি লেখকের ঝোঁক। এমনকী অ-তৎসম হয়ে-যাওয়া **চিকণ'** বানানোর তৎসম উৎস-বানানের 'ণ'-কেও তিনি ধরে রাখছেন, 'ন'-র দিকে ঝুঁকতে চাইছেন না।

এরপর রামমোহন রায়-ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের গদ্য-বানানে পৌঁছনোর আগেই আমরা উনিশ শতকের গোড়ার দিকের কয়েকটি সংবাদপত্রের পৃষ্ঠা থেকে সেই সময়কার বানানের নমুনা সংগ্রহ করে নিই ঃ

১. **দিগ্‌দর্শন, ১৮১৮**

........আটশত আটানব্বই **শালে** আমেরিকা প্রথম জানা গেল তাহার **পূর্ব্বে** আমেরিকা **কোন** লোক **কর্ত্তৃক** জানা ছিল না........।

২. **সমাচার দর্পণ, ১৮১৮**

আমারদের পণ্ডিতগণ **আগামি** সোমবার **পর্য্যন্ত** স্ব স্ব বাটী হইতে প্রত্যাগত হইবেন না, অতএব এই কালের মধ্যে দর্পণে নূতন নূতন **সম্বাদ** প্রকাশ না হওয়াতে পাঠক মহাশয়েরা ত্রুটি **মার্জ্জনা** করিবেন।

৩. **সমাচার চন্দ্রিকা, ৮ মে, ১৮৩০**

সংস্কৃত কলেজের ছাত্রদিগকে **ইঙ্গরেজী** শিক্ষা **করাণ** বিষয়ে **পূর্ব্বে** চন্দ্রিকায় এক পত্র প্রকাশ হইয়াছিল........সংস্কৃত কলেজের যে কএক কেলাস অর্থাৎ শ্রেণী আছে.........তৎ**কর্তৃক** ছাত্র সকল সুশিক্ষিত হইতেছিলেন এক্ষণে সে অধ্যাপক কলেজের **কর্ম্মে** রহিত হইয়াছেন........।

৪. **সমাচার চন্দ্রিকা, ২৬ এপ্রিল, ১৮৩১**

আমরা শুনিলাম সংস্কৃত কলেজের স্মৃত্যাদি শাস্ত্রের ছাত্রেরদিগের মধ্যে যাঁহারা **ইংরাজী** পড়িতেছেন তাঁহারা **সংপ্রতি** এক দরখাস্ত করিয়াছেন........

৫. **সমাচার চন্দ্রিকা, ৫ মে, ১৮৩১**

........শ্রীশ্রী দুর্গোৎসবাদি **দেবার্চনা** এবং পিত্রাদির শ্রাদ্ধ তর্পণাদি **ধর্ম্ম কর্ম্ম** উঠিয়া গেলেই লোকের উপকার........।

৬. **সমাচার চন্দ্রিকা, ২২ সেপ্টেম্বর, ১৮৩১**

বাঙ্গালা ছাপাখানার রীতি এদেশে প্রচার হওয়ানাবধি **বিদ্বান্** মহাশয় **কর্ত্তৃক** অনেক প্রকার গ্রন্থ প্রকাশ হইয়াছে।........।

৭. **সমাচার চন্দ্রিকা, ১৯ অক্টোবর, ১৮৩৩**

বিলাতগামি শ্রীরামরত্ন মুখোপাধ্যায়ের বিষয়। ....এই নাম **বাঙ্গালি** ভিন্ন অন্য দেশীয়র নহে .... নানাস্থানের **জমীদার** প্রভৃতিকে আমরা পত্র লিখিয়াছিলাম যদ্যপি এতাদৃশ **আরজীতে** কেহ স্বাক্ষর করিয়া থাকেন........।

৮. **সমাচার চন্দ্রিকা, ২৫ এপ্রিল, ১৮৩৫**

........বিষয় কর্ম্মাদি করিয়া যে **ধনোপার্জন** করেন তদ্বারা **সর্ব্বদাই** সদ্ব্যয় করা আছে........।

৯. **সমাচার চন্দ্রিকা, ২৬ সেপ্টেম্বর, ১৮৩৫**

........প্রতিমা **বিসর্জ্জনাদি কোন পর্ব্ব** দিনে **সংকীর্ত্তন** বাহির না হইলে ভাল হয়........।

১০. **সমাচার চন্দ্রিকা, ১২ ডিসেম্বর, ১৮৩৫**

সংস্কৃত পাঠশালায় **ইঙ্গরেজী** অধ্যয়ন রহিত। ....সংস্কৃত ভিন্ন অন্য আর **চর্চ্চা** করিতে হইবেক না। এই **সুসম্বাদে** আমরা অত্যন্ত অহ্লাদিত হইলাম........কেবল **গবর্ণমেন্টের**...অর্থ নাশ

হইল........তাহারা না **কেরাণি** হইল না অধ্যাপক........এতদ্দেশীয়দিগকে **জুরীর কর্ম্মে** নিযুক্ত করিয়াছেন........তা **নির্দ্ধারিত** হইলে **সর্ব্ব**সাধারণেই বিশেষ উপকৃত হইবেন........।

১১. জ্ঞানান্বেষণ, ১৮৩১

........এতদ্দেশ**নিবাসি**.....মহাশয়েরা এমত **কর্ম্ম** করেন যে তাহা **কোন** বিশিষ্ট লোকেরই কর্ত্তব্য নহে ইহার কারণ **কি** ইহাও বিবেচনা করিতে হইবেক।

১২. জ্ঞানান্বেষণ, ২১ নভেম্বর, ১৮৩৫

........**সংপ্রতি** এ প্রদেশে......মারক হইয়াছে **বিশেষতঃ** ভগবানগোলায় **সর্ব্ব**স্থানে ঐ পীড়া এমত **সাঙ্ঘাতিক**....**রোগী**....**বাঙ্গালি** কবিরাজেরা তাহার কিছুই করিতে পারে না.....**পূর্ব্বাপেক্ষা** অধিক **দুর্ব্বল** করে........**রোগিরা**....মারা পড়ে অতএব **বাঙ্গালিরা ইঙ্গরেজী**....চিকিৎসায়.....।

১৩. জ্ঞানান্বেষণ, ২৬ শে মার্চ, ১৮৩৬

শ্রীশ্রীযুত **গবর্‌নর** জেনরল বাহাদুর........উপস্থিত ছিলেন। ......তবে **গবর্ণমেন্টের** আনুকূল্যে....মেডিকেল কলেজ স্থাপন হইয়াছে।

১৪. জ্ঞানান্বেষণ, ৩০ মার্চ, ১৮৩৯

......ঐ ছাত্ররা **ইংরেজী** বিদ্যা কিঞ্চিৎমাত্র জ্ঞাত নহেন অতএব কি প্রকারে এতৎ সিদ্ধ হইবে.....।

১৫. সংবাদ পূর্ণচন্দ্রোদয়, ৬ অক্টোবর, ১৮৩৫

দ্বিতীয়ত ঃ আমারদিগের **ধর্ম্মনাশের** প্রধান কারণ....**ধনোপার্জ্জন** নিমিত্ত ....আপন আপন ভাষার **দুর্দশা** করিয়া.........বনের **পক্ষিকে** ধৃত করিয়া........।

১৬. দৈনিক সংবাদপ্রভাকর, ১৮৩৯

ইদানীন্তন বঙ্গভাষা নবযৌবন প্রাপ্ত হইয়াছে, এই সময়ে যাঁহারা অনুশীলনকল্পে **অনুরাগি** হইতেছেন তাঁহারা অনায়াসেই অভিপ্রেত বিষয়ে কৃতকার্য্য হইতে পারিবেন....**সংপ্রতি** মধ্যে মধ্যে দুই একখানি.....ভাষা-পুস্তক প্রকাশিত হইতেছে,.....**ফলবান ও বলবান** হইবে তাহাতে সংশয় **কি?**

বাংলা সাময়িকপত্রের সূচনা ১৮১৮ থেকে। সূচনা থেকে ১৮৪০—এই সময়ের মধ্যে লেখা যে কটি নমুনা সংগ্রহ করা হল, তা থেকে কিছু বানান বাছাই করে কয়েকটি এলাকায় সাজিয়ে দিচ্ছি ঃ

তৎসম বানান ঃ

১. ই-ঈ ঃ আগামি অনুরাগি নিবাসি রোগি/রোগী বিলাতগামি পক্ষি।

২. ম্-ঙ-ং ঃ সম্বাদ সংপ্রতি সংকীর্ত্তন সাঙ্ঘাতিক (‘সঙ্ঘাত’-থেকে)।

৩. শব্দশেষে বিসর্গ ঃ বিশেষতঃ দ্বিতীয়তঃ।

৪. শব্দশেষে হস্‌চিহ্ন ঃ ফলবান বলবান, বিদ্বান্।

৫. রেফের নীচে ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব ঃ পর্য্যন্ত কৃতকার্য্য মার্জ্জনা পুর্ব্বে কর্ত্তৃক/কর্তৃক কর্ম্ম কর্ত্তব্য চর্চ্চা নির্দ্ধারিত সর্ব্ব দুর্ব্বল ধনোপার্জ্জন/ধনোপার্জন সর্ব্বদা সংকীর্ত্তন পূর্ব্বাপেক্ষা দুর্দশা দেবার্চনা।

অ-তৎসম বানান ঃ

৬. ই-ঈ ঃ কি (সর্বনাম এবং বিশেষণ) বাঙ্গালি ইঙ্গরেজী-ইংরেজী-ইংরাজী জুরী জমিদার আরজী।

৭. শব্দশেষে অ-ও ঃ কোন (Some অর্থে), ভাল (good অর্থে)।

৮. ঙ্গ-ঙ-ং ঃ ইঙ্গরেজী/ইংরেজী বাঙ্গালা বাঙ্গালি।

৯. ণ-ন ঃ করাণ (‘করানো’ বোঝাতে) কেরাণি গবর্ণমেন্ট/গবর্‌নর্।

১০. শ-স ঃ শালে (‘বছর’ অর্থে) কেলাস (‘শ্রেণি’ অর্থে)

এবার লক্ষ করুন এই সময়কার বানান-প্রয়োগে বাঙালির বিশেষ বিশেষ ঝোঁক কোন্ কোন্ বর্ণের দিকে ঃ

১. ইন্-প্রত্যয়ান্ত তৎসম শব্দের শেষে ঈ-কার প্রয়োগে অনেকক্ষেত্রেই এঁরা ব্যর্থ, অসতর্ক। ঝোঁকটা ই-কার প্রয়োগের দিকেই। ই-ঈ নিয়ে কিঞ্চিৎ দ্বিধাও দেখতে পাচ্ছি কোনও কোনও বানানে (রোগী/রোগি)।

২. ‘সম্’ উপসর্গের সঙ্গে সন্ধির পরিণামে ‘ম্’ কখনও ং হয়ে যাচ্ছে (‘সংপ্রতি’ ‘সংকীর্ত্তন’), কখনও বর্গের পঞ্চম বর্ণ হয়েই থাকছে (‘সম্বাদ’ ‘সঙ্ঘাত’)। অর্থাৎ বানানে ম্-ং-ঙ-এর দ্বিধা এই সময় থেকেই দেখা যাচ্ছে।

৩. শব্দশেষের বিসর্গ অব্যাহত থাকছে (বিশেষতঃ দ্বিতীয়তঃ)।

৪. শব্দশেষে হস্‌চিহ্ন থাকবে কিনা—এই নিয়ে দ্বিধার লক্ষণ দেখা যাচ্ছে (ফলবান-বিদ্বান্)।

৫. রেফের নীচে ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব প্রয়োগের দিকেই এঁদের ঝোঁক। কেবল দুটি-একটি বানানে (কর্ত্তৃক/কর্তৃক উপার্জ্জন/উপার্জন) এই নিয়ে দ্বিধা ফুটে উঠছে।

৬. অ-তৎসম শব্দের শেষে ঈ-কার প্রয়োগের দিকেই এঁদের প্রবল ঝোঁক। তবে, সর্বনাম বা বিশেষণ হিসেবে 'কী'-র দাবি তখনও পর্যন্ত কেউ অনুভব করতে শুরু করেন নি।

৭. শব্দশেষে ও-উচ্চারণ সত্ত্বেও অ-কারান্ত কোনও শব্দ তখনও পর্যন্ত ও-কারান্ত হয়ে ওঠে নি (কোন ভাল)।

৮. বানানে ঙগ-ং-এর দ্বিধা এসময়ে শুরু হয়ে গিয়েছে (ইঙগরেজী-ইংরেজী), তবে ঝোঁকটা তখনও ঙগ-র দিকেই।

৯. ণ-র প্রতি পক্ষপাত প্রায় সর্বজনীন। 'কেরাণি' ত বটেই, এমনকী 'করানো' বোঝাতে 'করাণ' বানান আজকের চোখে খানিকটা দৃষ্টিকটুই ঠেকছে। ণ-ন এর দ্বিধাও দেখছি 'গবর্ণমেন্ট' আর 'গবর্নর্' বানানে। এ হল ণত্ববিধির বিভ্রান্ত প্রয়োগ।

১০. 'বছর' অর্থে ফারসি 'শাল' আর শ্রেণি অর্থে ইংরেজি 'কেলাস'—বাংলা উচ্চারণে দুটি শ-হ এক, অথচ বাংলা বানানে শ-স এর দ্বিধা তখনও ছিল।

এবার চলুন **রামমোহন রায়ের** কাছে। ১৮২৮ সালে লেখা রামমোহন রায়ের 'ব্রহ্মোপাসনা' থেকে নেওয়া এই অংশটুকু পড়ুন ঃ

প্রশ্ন। তিনি **কি** প্রকার?

উত্তর। তোমাকে **পূর্ব্বেই** কহিয়াছি যে, যিনি এই জগতের কারণ ও **নির্ব্বাহকর্ত্তা** তিনি উপাস্য হন; ইহার অতিরিক্ত তাঁহার **নির্দ্ধারণ** করিতে **কি** শ্রুতি **কি** যুক্তি সমর্থ হয় না।

বানান নিয়ে আজকের দিনে বিতর্ক হতে পারে, এরকম ছ-টি শব্দকে এখানে মোটা হরফে চিহ্নিত করা হল। এদের তিনটি তৎসম (পূর্ব্বে-নির্ব্বাহকর্ত্তা-নির্দ্ধারণ) আর তিনটি অ-তৎসম (কি-কি-কি)। তৎসম তিনটি শব্দেই আছে রেফ, প্রতিটি রেফের নীচেই ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব স্বীকার করেছেন রামমোহন। সংস্কৃত ব্যাকরণে দেওয়া বিকল্পের বিধান (পূর্বে-নির্বাহকর্তা-নির্ধারণ) রামমোহন উপেক্ষা করলেন। আর, তিনটি 'কি'-ই বিশেষণ হিসেবে আজকের বিধানে 'কী' বানান দাবি করছে। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনের মতো পুরোনো সাহিত্যে এর অনুকূলে কিঞ্চিৎ সমর্থনের প্রশ্রয়ও আছে। রেফযুক্ত তৎসম বানানে ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব থাকবে কি থাকবে না, আর তদ্ভব 'কি' কোথায় 'কী' হবে—একালের বিতর্ক এই নিয়ে। দেখতে পাচ্ছি, রামমোহন রেফের নীচে দ্বিত্ব মানেন, আর, বিশেষণ 'কি'-র ঈ-কার মানেন না। অর্থাৎ বানান-প্রয়োগে তিনি প্রথাকেই মেনে নিচ্ছেন।

এরপরে আসুন **ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের** কাছে। বাংলা বানান নির্ধারণে বিদ্যাসাগরের একটি বিশিষ্ট ভূমিকা ছিল উনিশ শতকের দ্বিতীয় অর্ধে। প্রথমে পড়ুন তাঁরই লেখা কয়েকটি বাক্য ঃ

১. এই প্রস্তাব, **প্রথমতঃ** কলিকাতাস্থ **বীটন** সোসাইটি নামক সমাজে পঠিত হইয়াছিল। ....নিতান্ত অনবকাশ**বশতঃ**, এ **পর্য্যন্ত** আমি সে মানস পূর্ণ করিতে পারি নাই; ....এজন্য, **আপাততঃ** এই প্রস্তাব.....প্রচারিত হইল।

২. ......এই ভাষাকে সম্যক **মার্জ্জিত** ও **অলঙ্কৃত** করিয়া গিয়াছেন।

৩. .....**ইরানের** আদিম নিবাসী লোকেরা সময়ে সময়ে, ভারতবর্ষে, **গ্রীস, ইটালি, জর্ম্মানি** প্রভৃতি প্রদেশে বাস করিয়াছেন।

৪. ......**কলসীর** খাপরা দ্বারা তাহার বারি বহন করিব।

(সংস্কৃত ভাষা ও সংস্কৃত সাহিত্য শাস্ত্রবিষয়ক প্রস্তাব)

৫. এতদীয় উপাখ্যানভাগ **বাঙ্গালা**ভাষায় **সঙ্কলিত** হইলে লোকের চিত্তরঞ্জন হইতে পারে।

৬. **বিশেষতঃ** যাঁহারা **ইঙ্গরেজী** জানেন না, তাদৃশ পাঠকগণের পক্ষে বিলক্ষণ বিরক্তিকর হইয়া উঠে। ('ভ্রান্তিবিলাস'-এর বিজ্ঞাপন)

৭. বিধবাবিবাহ **প্রবর্ত্তন** আমার জীবনের **সর্ব্ব**প্রধান সৎ**কর্ম্ম**।

(শম্ভুচন্দ্র বিদ্যারত্নকে লেখা চিঠি)

৮. কোনও কোনও অংশ **পরিবর্ত্তিত** এবং চারিটী নূতন পাঠ **সংকলিত**.....।

('বর্ণপরিচয়, ২য় ভাগে'র ৬২-তম সংস্করণের বিজ্ঞাপন)

৯. কতকগুলি মহানুভবের বৃত্তান্ত **সঙ্কলিত** হইল। ('চরিতাবলী'র বিজ্ঞাপন)

মোটা হরফের শব্দগুলির মধ্যে 'বীটন' 'ইরান' 'গ্রীস' 'ইটালি' 'জর্ম্মনি' 'বাঙ্গলা' 'ইঙ্গরেজী'-এই কটি নাম অ-তৎসম, বাকি পনেরোটি শব্দই তৎসম।

লক্ষ করুন, 'ইরান'-'জর্ম্মনি'তে আজকের লেখকেরাও অনেকে ণ প্রয়োগ করে থাকেন। কিন্তু উনিশ শতকের মাঝখানে দাঁড়িয়েও বিদ্যাসাগর অ-তৎসম বানানে ণ-প্রয়োগের পক্ষপাতী নন। তবে 'বাঙ্গালা' আর 'ইঙ্গরেজী' বানানে 'ঙ্গ' থেকে বেরিয়ে আসা তাঁর পক্ষে সম্ভব হয় নি। ব্রিটেন-গ্রীস-ইটালি-জর্ম্মনি বানানেও দেখছি ই-ঈকারের প্রয়োগ নিয়ে তাঁর দ্বিধার লক্ষণ।

অ-তৎসম বানানে ই-ঈকারের দ্বিধা মূলত বিদেশি শব্দ-বানানেই সীমাবদ্ধ। এর দৃষ্টান্ত পাবেন 'বর্ণপরিচয়ে'র দুটি বাক্যে—'আর **দেরি** করিব না' আর 'যা **খুসী** তাই করে'। 'দেরি' আর 'খুসী' শব্দদুটি ফারসি থেকে পাওয়া। 'বর্ণপরিচয়' থেকে আরও কয়েকটি বাক্য তুলে দিচ্ছি, যেখানে সহজেই লক্ষ করা যাবে অ-তৎসম (তদ্ভব) শব্দে বিদ্যাসাগর ঈ-কার প্রয়োগকেই অনুমোদন করছেন নির্দ্বিধায়—**পাখী** উড়িতেছে। তোমাদের বাড়ী যাইব। খেলিবার **ছুটী**।

তৎসম-বানানে বিদ্যাসাগরের নীতি বেশ স্পষ্ট, কিঞ্চিৎ দ্বিধা কেবল সংকলিত-সঙ্কলিত বানানে—ং-ঙ নিয়ে। তবে তাঁর ঝোঁকটা যে ঙ-প্রয়োগের দিকেই, তা বোঝা যায়। বিদ্যাসাগরের বানান-নীতি সম্পর্কে উদ্ধৃত বাক্যগুলি থেকে যে কটি তথ্য উঠে আসছে তা এইরকম ঃ

১. অ-তৎসম বানানে (মূলত বিদেশি শব্দে) ই-ঈ প্রয়োগে তাঁর দ্বিধা, তবে তদ্ভব বানানে তিনি ঈ-র পক্ষে। এছাড়া, ঙ-র বদলে ঙ্গ আর ণ-র বদলে ন-প্রয়োগের দিকে তাঁর ঝোঁক।

২. তৎসম বানানে ঙ-ং প্রয়োগে তাঁর কিঞ্চিৎ দ্বিধা, তবে রেফের নীচে ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব (পর্য্যন্ত মার্জ্জিত প্রবর্ত্তন সর্ব্ব কর্ম্ম পরিবর্ত্তিত) আর শব্দশেষের বিসর্গ-প্রয়োগে (প্রথমতঃ-আপাততঃ) তিনি কঠোর। ই-ঈ বিকল্পেও ঈ-কারেরই তিনি পক্ষপাতী (কলসী)।

বিদ্যাসাগরের লেখা 'জীবনচরিত' 'বোধোদয়' 'বাঙ্গালার ইতিহাস' 'শব্দ-সংগ্রহ' থেকে বানানের কিছু নমুনা সংগ্রহ করে আজকের বানান-বিতর্কের এলাকায় তাদের সাজিয়ে দিচ্ছি ঃ

১. শব্দশেষে অ-ও ঃ কোন কোন/কোনও কোনও

২. ই-ঈ ঃ ফৌজদারি/ফৌজদারী জমিদার/জমীদার
ইটালি-জর্ম্মনি-ফরাসি/আরবী-পারসী-হিন্দী-ইঙ্গরেজী-দিল্লী

৩. অ্যা-এ ঃ অ্যাস্ট্রনমি/এরিথমেটিক

৪. ঐ-অই ঃ দই-মই

৫. ঔ-অউ ঃ মৌজা/মউ

৬. ঙ্গ-ঙ-ং-ম ঃ বাঙ্গালা-ইঙ্গরেজী অঙ্গুলি-আঙুল-কাঙাল-রঙ সঙ্গীত-সঙ্কেত-সঙ্কলিত-সম্প্রতি

৭. ণ-ন ঃ কর্ণেল-গবর্ণর/রানী-সোনা-কান

৮. শ-স ঃ একুশ/একুস

৯. রেফের নীচে ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব ঃ গর্জ্জন-উপার্জ্জন-কর্দ্দম-কর্ম্ম-নির্ম্মাণ-খর্ব্ব

১০. শব্দশেষের বিসর্গ ঃ প্রথমতঃ-আপাততঃ-বশতঃ-ফলতঃ

১১. শব্দশেষের হস্‌চিহ্ন ঃ যত্নবান্-কোন্-শ্রীমান।

পাশাপাশি হাইফেন-যুক্ত বানান একই নীতিতে তৈরি, '/' চিহ্নে বিচ্ছিন্ন-হওয়া বানান ভিন্ন নীতিতে তৈরি। অতএব, একটু লক্ষ করলেই বোঝা যাবে— কোন্ কোন্ এলাকায় বিদ্যাসাগরের বানান-নীতি কঠোর, কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে তাঁর দ্বিধা। দ্বিধা আছে কমবেশি এই কটি এলাকায়—অ-ও ই-ঈ অ্যা-এ ঔ-অউ ণ-ন শ-স আর শব্দশেষের হস্‌চিহ্ন নিয়ে। অর্থাৎ বিদ্যাসাগরের মতো সংস্কৃতজ্ঞ পণ্ডিত অথচ বাংলাগদ্যের যথার্থ শিল্পীর সতর্ক বানান-প্রয়োগেও এই যে একই শব্দের অন্ততপক্ষে দুরকম বানানের সন্ধান মিলছে, এর মধ্য দিয়েই বাংলা বানানের ক্রমশ কেন্দ্রচ্যুত হবার প্রবণতা দেখতে পাচ্ছি। এর স্বাভাবিক পরিণাম আজকের বানান-বিতর্ক।

বাংলা গদ্যকে আশ্রয় করে বাংলা বানান বিদ্যাসাগরের পর বঙ্কিমচন্দ্রের দিকেই এগিয়ে চলে। কিন্তু বঙ্কিমচন্দ্রের কাছে পৌঁছনোর আগে চলুন আমরা বিদ্যাসাগরের সাধুরীতির পাশে একই সময়ে লেখা চলিতরীতির বানান-প্রয়োগ দেখতে **প্যারীচাঁদ মিত্রে 'আলালের ঘরের দুলাল' (১৮৫৮) আর কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোমপ্যাঁচার নক্‌শা' (১৮৬২)** থেকে তুলে-আনা কিছু কিছু বাক্য আর বাক্যখণ্ড পড়ে নিই। প্রথমে দেখা যাক প্যারীচাঁদ মিত্রের বানান-প্রয়োগ—

প্যারীচাঁদ মিত্র ঃ আলালের ঘরের দুলাল, ১৮৫৮

১. মতিলালের **বাঙ্গালা** সংস্কৃত ও **পারসী** শিক্ষা

২. মতিলালের **ইংরাজী** শিখিবার উদ্যোগ

৩. লোকের **সর্ব্বপ্রকারে** সুখ প্রায় হয় না......বাবুরামবাবু কেবল ধন **উপার্জ্জনেই** মনোযোগ করিতেন। ......**ল্যাখ** রে **ল্যাখ**। ......শিষ্য **কী** করিতেছে......**চুণের** জল ......পান করাইত। ...কিন্তু **কর্ত্তা** ছাড়েন না; ......গুরুমহাশয়**গিরী** অপেক্ষা **সরকারী ভাল**......**পোষাক**....এক **যোড়া** কাপড়....**পূজারি** ব্রাহ্মণকে জিজ্ঞাসা করিলেন......শিখাইবার সময় চক্ষু **রাঙ্গা** করেন...

৪. **বাঙ্গালী** ছোট জাতিরা......কাঁপে, ...দুই **দিক্** দেখিতে দেখিতে বলিতেছেন......ও **বাড়ীটা** কার রে?......খুলে পড়বে **কানের সোনা**....

৫. **সম্প্রতি ইংরাজী** পড়াইতে বাঞ্ছা করি......

৬. **কাহারো** জলের **কলসী ভাঙিগয়া** দেয়।

৭. ক্রমে ক্রমে পাড়ার যত হতভাগা **লক্ষ্মী**ছাড়া—**ঊনপাঁজুরে**—বরখুরে ছোঁড়ারা জুটিতে আরম্ভ হইল।

৮. প্রত্যেক **ক্লাশের** প্রত্যেক বালকের প্রতি সমান তদারক হইত না, **ভারি ভারি** বহি......।

৯. এই আমার **বাহাদুরী**......সরকার **গিরি কর্ম্মটি** বজায় আছে।

১০. ......**ইংরাজি**ওয়ালা দরখাস্ত লিখ্‌ছে......কোথাও বা **সারজনেরা**......বেড়াচ্ছে—কোথাও বা **সর্দ্দার সর্দ্দার কেরাণীরা** বলাবলি কর্‌ছে—

১১. **কাঙ্গালিনী** হইয়া থাকি, সেও **ভাল** ....—।

১২. বাবুরাম বাবু **ভারি** মজলিস করিয়া বসিয়াছেন।...ঠকচাচা একখান **চৌকীর** উপর বসিয়া আছেন।

১৩. **জমীদার**বাবুর বাটীতে একটি......

১৪. **বিশেষতঃ বাঙ্গালীরা**.......**অহঙ্কার** হইতেই করিয়া থাকে......।

১৫. আমরা **পুলিশের** লোক......

এবার আগের মতোই বানান-বিতর্কের এলাকা ধরে ধরে মোটা হরফের শব্দ-বানানগুলি সাজিয়ে দিই ঃ

১. অ-ও ঃ কাহারো ভাল।

২. ই-ঈ ঃ গিরি/গিরী ভারি(ওজনে)-ভারি (খুব)-পূজারি কেরাণী-বাড়ী-পারসী-ইংরাজী-ইংরাজি-বাঙ্গালী-সরকারী-বাহাদুরী-চৌকী-জমীদার-কী-কলসী।

৩. উ-ঊ ঃ চুণ পূজারি-ঊনপাঁজুরে।

৪. অ্যা-এ ঃ ল্যাখ।

৫. ঙ্গ-ঙ-ং-ম ঃ বাঙ্গালা-বাঙ্গালী-কাঙ্গালিনী রাঙ্গা-ভাঙ্গিয়া/ইংরাজী অহঙ্কার-সম্প্রতি।

৬. জ-য ঃ যোড়া।

৭. ণ-ন ঃ কান-সোনা-সারজন/কেরাণী-চুণ।

৮. শ-ষ ঃ ক্লাশ-পুলিশ/পোষাক।

৯. রেফের নীচে ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব ঃ উপার্জ্জন-কর্ত্তা-কর্ম্ম-সর্ব্ব (তৎসম)-সর্দ্দার (অ-তৎসম)।

১০. শব্দের শেষে বিসর্গ ঃ বিশেষতঃ।

১১. শব্দের মাঝখানে-শেষে হস্‌চিহ্ন ঃ দিক্ (তৎসম) লিখ্‌ছে-কর্‌ছে (অ-তৎসম)/পড়্‌বে।

আলালি বানানের এই তালিকাবদ্ধ গুটিকয়েক দৃষ্টান্ত থেকে কয়েকটি জায়গায় বাংলা-বানানকে বিবর্তনের পথে একটুখানি এগিয়ে যেতে দেখছি—

১. বিদ্যাসাগর পর্যন্ত শব্দশেষে ও-বর্ণ প্রয়োগ করার রীতি (কোনও কোনও ক্ষেত্রে) একটুখানি টোল খেল প্যারীচাঁদের ও-কার প্রয়োগে (কাহারো)।

২. ঈ-কারের প্রতি **পক্ষপাত** থাকলেও 'ভারি' আর 'পূজারি' বানানে ই-কার প্রয়োগে বানানকে একধাপ এগিয়ে দিলেন প্যারীচাঁদ। তবে এর পাশে গিরি/গিরী-তে ই-ঈ কারের দ্বিধান্বিত প্রয়োগও দেখছি আমরা। আসলে, পুরোনো ঈ-কারের রীতি থেকে খানিকটা দ্বিধা পেরিয়ে নতুন ই-কারের দিকে এগিয়ে যাবার একটা উদ্যোগ প্যারীচাঁদ এক্ষেত্রে দেখালেন। শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে 'কি-কী' প্রয়োগের কথা মনে রেখেও বলা যায়, পাশাপাশি সর্বনাম 'কী' বানানে ঈ-কার প্রয়োগ উনিশ শতকের একটি বৈপ্লবিক ঘটনা।

৩. উৎস-বানানের প্রতি এতকালের আনুগত্য খানিকটা শিথিল হল 'চুণ' বানানের উ-কারে (চূর্ণ > চুন)। 'পূজারি' বানানের অ-তৎসম অংশে ই প্রয়োগ করাটাও আধুনিকতার লক্ষণ।

৪. বাংলা বানানের উচ্চারণমুখী প্রবণতা একালের। অথচ, সেই প্রবণতাই দেখা গেল প্যারীচাঁদে 'ল্যাখ রে ল্যাখ' কথাটির বানানে। এ-কারের বদলে বিখ্যাতদের মধ্যে '্যা'-লেখার সাহ উইলিয়াম কেরি দেখিয়েছিলেন (ম্যাগ), প্যারীচাঁদও দেখালেন।

৫. 'কান' আর 'সোনা' বানানে উৎস-আনুগত্য পুরোপুরি অমান্য করে ণ-থেকে ন-তে উত্তীর্ণ হতে দেখছি প্যারীচাঁদকে (কর্ণ > কান, স্বর্ণ > সোনা)। তবু খানিকটা দ্বিধার চিহ্ন থেকে গেল 'চুণ' আর কেরাণী-র ণ-প্রয়োগে।

৬. শ-ষ প্রয়োগেও প্যারীচাঁদ দ্বিধাগ্রস্ত (পুলিশ/পোষাক)।

৭. রেফের নীচে ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব (সর্দ্দার) আর শব্দ-বানানে হস্‌চিহ্ন-প্রয়োগের প্রবণতা অ-তৎসম বানানেও সংক্রমিত (কর্‌ছে লিখ্‌ছে)। তবে হস্‌-প্রয়োগে প্যারীচাঁদ যথেষ্ট কঠোর নন (কর্‌ছে/পড়্‌বে)।

লক্ষ করবেন, খানিকটা ঐতিহ্যকে মেনে নেওয়া (যেমন, রেফের নীচে ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব), খানিকটা দ্বিধা-বিভ্রমে জড়িয়ে থাকা (ই-ঈ ণ-ন শ-ষ প্রয়োগ) আর খানিকটা ঐতিহ্যকে অমান্য করে দ্বিধাকে

অতিক্রম করে, এগিয়ে যাওয়া (কাহারো ভারি ল্যাখ ইংরাজী কান-সোনা)—আলালি বানানের এই ত্রিমুখী পরিচয়টাই আপাতত এখানে পাওয়া গেল।

কালীপ্রসন্ন সিংহ 'হুতোমপ্যাঁচার নক্শা' নিয়ে এলেন ১৮৬২-তে, আলালের পরে। একটু আগেই দেখা গেল, বাংলা বানানে প্যারীচাঁদ খানিকটা এগিয়ে গেলেন। কিন্তু, কালীপ্রসন্ন বানানকে বরং একটুখানি পিছনদিকেই টানলেন। প্যারীচাঁদ 'কান-সোনা'য় ণ-ন থেকে বেছে নিলেন ন-কে, অগ্রাহ্য করলেন 'কর্ণ-স্বর্ণের' উৎস-ঐতিহ্যকে—এটা একটু আগেই দেখেছেন। এবার 'হুতোম প্যাঁচার নক্শা' থেকে এই অংশটি পড়ুন—'**সোনার বেণেরা** তহবিল মিলিয়ে কৈফিয়ৎ কাট্চে। শোভাবাজারের ভাঙ্গা বাজারে মেছুনীরা.....**লোণা** ইলিশ নিয়ে......মাতালেরা লাঠি হাতে ক'রে **কাণা** সেজে.....।' দেখুন, কালীপ্রসন্ন কিন্তু 'স্বর্ণ-বণিক-লবণ' থেকে তদ্ভব-হয়ে-আসা 'সোণা-বেণে-লোণা' বানানে উৎস-বানানের ণ-কেই তুলে নিলেন নির্দ্বিধায়। '**চড়কীর** পিঠ' '**জরীর** টুপী' 'ঢাকাই **শাড়ী**' 'বাবুদের **বাড়ী**' 'গির্জার **ঘড়ী**' 'বিধবা **পিসী**' অ-তৎসম বানানে—এসব ঈ-কারের প্রতি হুতোমি পক্ষপাত অত্যন্ত স্পষ্ট। অ-তৎসম বানানে হস্‌চিহ্ন প্রয়োগের তৎপরতায় আলালি আর হুতোমি বানান পাল্লা দিয়ে চলে। হুতোম থেকে এরকম কয়েকটি দৃষ্টান্ত দেখুন—'**চড়কীর** পিঠ **সড়্সড়্** কচ্চে' 'হাসির **গর্‌রা**' ও 'ইংরাজী কথার **ফর্‌রা**' '**ঝম্‌ঝম্ বৃষ্টি**'। 'বাজতে **লাগ্‌লো**' ক্রিয়াপদের শেষে ও-কার প্রয়োগের নজির হুতোমি বানানেই প্রথম বিশেষভাবে লক্ষ করছি—'সহর **জুড়লো**' 'বাজতে **লাগ্‌লো**' 'পুরানো **হলো**' 'ঘনিষ্ঠ **হবো**' 'সং সেজে **আস্‌বো**' 'বৃষ্টি **এলো**'। কিন্তু, এর পাশেই থাকছে কিছু কিছু ও-কারহীন ক্রিয়াপদও—'কেটে **গেল**' 'জানা **ছিল**' 'দেখতে **এল**' 'বেরিয়ে **গেল**'। ক্রিয়া শেষে ও-কার থাক আর না-থাকার এই দ্বিধা-বিভ্রান্তি হুতোমে প্রচুর। তা চলছে একালের বানান-প্রয়োগেও।

সাধুরীতির গদ্যধারায় বিদ্যাসাগরের পর **বঙ্কিমচন্দ্র**। বিদ্যাসাগরী গদ্যের বানান দেখলেন, এবার চলুন বঙ্কিমচন্দ্রের বানান-শিল্পের আঙিনায়। দেখা যাক, এক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র কতটা ঐতিহ্য-অনুসারী আর কতটা ঐতিহ্য-বিরোধী। শব্দ-বানানের কিছু কিছু নমুনা সংগ্রহ করা যাক কেবল কয়েকটি উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধ থেকে।

১. **বাঙ্গালা সাহিত্যে প্যারীচাঁদ মিত্রের স্থান ঃ**

(সৎসাহিত্য গ্রন্থাবলী/১ম খণ্ড ঃ 'আলালের ঘরের দুলাল'-এর ভূমিকা)

আরও ইংরাজি-ইংরাজী কর্ত্তৃক কোন পৃথক্ বাঙ্গালা বাঙ্গালী বিশেষতঃ ভয়ঙ্কর।

২. **সাম্য ঃ**

আসামী উকীল কার্ব্বন জমীদারী বাঙ্গালি বাহাদুরি লীগ সঙ্গত।

৩. **বাঙ্গালীর উৎপত্তি ঃ**

অন্ততঃ আরবী আর্ম্মি আর্য্য কর্ণেল খ্রীষ্টীয়ান গবর্ণর চতুর্থতঃ ফরাশি ফারসী বর্দ্ধমান ব্রিটন রঙ রঙ্গপুর হিন্দি-হিন্দী।

৪. **মুচিরাম গুড়ের জীবনচরিত ঃ**

আফিঙ্গ হলো কাণমলা কীল কেরাণী 'কোন-কোন' গাড়ি গোরু চাকরি-চাকরী চেঙ্গরা ছুটি ঠাঙ্গ ডিপুটি বারো বিপদ্ 'ভারি বিচক্ষণ' 'ভারি বোঝা' ভাল মুন্সী মুহুরিগিরি যোড় রাঙ্গ ল্যাজ সেক্রেটারি হীরা হৌক।

উদ্ধৃত শব্দ-বানানগুলিকে তৎসম-অ-তৎসম বিভাজনে ভাগ করে দিলে তালিকাটি এইরকম হবে—

তৎসম বানান ঃ

১.	ঙ-ং ঃ	ভয়ঙ্কর সঙ্গত রঙ্গপুর।
২.	শব্দশেষে বিসর্গ ঃ	বিশেষতঃ চতুর্থতঃ অন্ততঃ।
৩.	শব্দশেষে হস্‌চিহ্ন ঃ	পৃথক্ বিপদ্।
৪.	রেফের নীচে ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব ঃ	কর্ত্তৃক আর্য্য বর্দ্ধমান।

অ-তৎসম বানান ঃ

১. ই-ঈ ঃ (ক) দ্বিধা—ইংরেজি-ইংরেজী হিন্দি-হিন্দী চাকরি-চাকরী বাঙ্গালি-বাঙ্গালী।

(খ) ই—ফরাশি বাহাদুরি ভারি ছুটি মুহুরিগিরি গাড়ি সেক্রেটারি ডেপুটি।

(গ) ঈ—আরবী ফারসী জমীদারী উকীল লীগ বাড়ী কীল মুন্সী হীরা আসামী।

২. অ-ও ঃ (ক) অ—কোন ভাল।

(খ) ও—আরও।

(গ) ও-কার—হলো গোরু বারো।

৩. ঋ > রি /রী ঃ ব্রিটন খ্রীষ্টীয়ান।

৪. অ্যা-এ ঃ ল্যাজ কেরাণী।

৫. অউ > ঔ ঃ হৌক।

৬. ঙ্গ-ঙ ঃ বাঙ্গালা রাঙ্গা আফিঙ্গ ঠ্যাঙ্গ চেঙ্গরা রঙ।

৭. ণ ঃ গবর্ণর কর্ণেল সোণা কেরাণী কাণ।

৮. রেফের নীচে ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব ঃ কার্ব্বন আর্ম্মি।

এবার দেখে নিন, কোন্ বানান ঐতিহ্য-অনুসারী (উৎসমুখী) আর কোন্ বানান ঐতিহ্য-বিরোধী (উচ্চারণমুখী)—

ঐতিহ্য-অনুসারী বানান ঃ

১. শব্দশেষে ও-উচ্চারণ স্পষ্ট, অথচ তা অগ্রাহ্য করে প্রচলিত বানান মেনে নেওয়া—ভাল 'কোন কোন'।

২. দীর্ঘস্বরের প্রতি অনুগত থেকে প্রচলিত বানান ধরে রাখা—আরবী ফারসী জমীদারী উকিল লীগ বাড়ী কীল মুন্সী হীরা।

৩. ঙ-ঙ্গ-এর বিকল্পে ঙ্গ-র প্রতি ঝোঁক—বাঙ্গালা রঙ্গপুর রাঙ্গা আফিঙ্গ ঠ্যাঙ্গ চেঙ্গরা।

৪. ঙ-ং-এর বিকল্পে ঙ-র প্রতি ঝোঁক—রঙ ভয়ঙ্কর সঙ্গত।

৫. ন-র বদলে ণ-র প্রতি ঝোঁক ঃ

(ক) অ-তৎসম শব্দের বানানে সংস্কৃত ণত্ববিধানের শাসন মেনে চলা—গবর্ণর কর্ণেল হারাণ কেরাণী (র্-এর পর 'ণ')।

(খ) সংস্কৃত উৎস-বানানের ণ-কে ধরে রাখা—সোণা (স্বর্ণ) কাণ (কর্ণ)।

৬. সংস্কৃত ব্যাকরণের শাসন মেনে তস্-প্রত্যয়ের বিসর্গ ধরে রাখা—বিশেষতঃ চতুর্থতঃ অন্ততঃ।

৭. সংস্কৃত ব্যাকরণের শাসন মেনে পদান্ত হস্ ধরে রাখা—পৃথক্ বিপদ্।

৮. জ-য-এর বিকল্পে য-র প্রতি ঝোঁক—যোড়।

ঐতিহ্য-বিরোধী বানান ঃ

১. প্রচলিত রীতি ভেঙে ও-উচ্চারণে ও-কার দেওয়া—হলো গোরু বারো।

২. প্রচলিত রীতি ভেঙে হ্রস্বস্বরচিহ্ন প্রয়োগ করা—ফরাশি বাহাদুরি ভারি ছুটি মুহুরিগিরি গাড়ি সেক্রেটারি ডেপুটি।

৩. প্রচলিত রীতি ভেঙে 'ঋ'-র বদলে 'রি'/'রী' প্রয়োগ করা—ব্রিটন খ্রীষ্টীয়ান।

৪. অ্যা-উচ্চারণে এ-কারের বদলে 'য়া'-চিহ্ন প্রয়োগ করা—ল্যাজ।

ই-ঈ প্রয়োগে দ্বিধা ঃ

১. একই শব্দের বানানে—ইংরাজি-ইংরাজী হিন্দি-হিন্দী চাকরি-চাকরী বাঙ্গালি-বাঙ্গালী।

২. একই গোত্রের শব্দ-বানানে—
'ফরাশি' অথচ 'আরবী-ফারসী', 'মুহুরি' অথচ 'উকীল', 'গাড়ি' অথচ 'বাড়ী', 'সেক্রেটরি-ডেপুটি' অথচ 'লীগ'।

বঙ্কিমচন্দ্রের বানান-নীতিকে আমরা দুদিক থেকে দেখলাম—তৎসম-অতৎসম বানান-প্রয়োগে আর ঐতিহ্যের অনুসারী বা বিরোধী বানান-প্রয়োগে। দেখা গেল, তৎসম বানানে বঙ্কিমচন্দ্র ঐতিহ্যকে পুরোপুরিই মানেন, অ-তৎসম বানানে তিনি মুখ্যত ঐতিহ্য-বিরোধী আর গৌণত ঐতিহ্য-অনুসারী। তবে, হ্রস্বদীর্ঘ স্বরচিহ্ন-প্রয়োগে তিনি অনেকখানি দ্বিধাগ্রস্ত। এর পাশাপাশি একটি বিষয় লক্ষ করুন। রেফের নীচে ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব-প্রয়োগ মূলত ঐতিহ্য-অনুসারী প্রবণতা। তৎসম-বানানের এলাকাতেই এর প্রয়োগ। কিন্তু, বঙ্কিমচন্দ্র একে তৎসম এলাকার বাইরে টেনে এনে অ-তৎসম বানানেও নির্দ্বিধায় প্রয়োগ করেছেন। সেই কারণে, তৎসম কর্ত্তৃক-আর্য্য-বর্দ্ধমানের পাশে ঘটেছে কার্ব্বন-আর্ম্মির মতো অ-তৎসম বিদেশি শব্দেও ব্যঞ্জন-দ্বিত্বের অবাঞ্ছিত প্রয়োগ। অবশ্য প্রাক্-বঙ্কিম বানান-চর্চাতেও এর নজির মেলে। ঐতিহ্য-অনুসরণের আর-একটি নমুনা লক্ষ করুন। ণত্ববিধানের শাসন তৎসম শব্দ-বানানে শিরোধার্য, কিন্তু অ-তৎসম বানানের সে দায় নেই। অথচ, ঐতিহ্য-আনুগত্যে বঙ্কিমচন্দ্রকে একটু বেশিমাত্রাতেই আচ্ছন্ন হতে দেখি, যখন অ-তৎসম গবর্ণর-কর্ণেল থেকে শুরু করে হারাণ-কেরাণী পর্যন্ত র-বাহী প্রতিটি বানান র-এর উপস্থিতিকে সমীহ করে ন-র বদলে ণ-কেই আশ্রয় করেছে।

উইলিয়ম কেরি থেকে বঙ্কিমচন্দ্র পর্যন্ত (প্যারীচাঁদ মিত্র আর কালীপ্রসন্ন সিংহকে এর অন্তর্ভুক্ত ধরে নিয়ে) বানান-প্রয়োগের ধারায় মোটের উপর একটা ঐতিহ্যের ছক যে তৈরি হয়ে উঠেছে, তা আন্দাজ করা যায়। তবে এর পাশাপাশি ঐতিহ্য-বিরোধী প্রবণতাও আমরা লক্ষ করেছি, যদিও তা ঐতিহ্যের জাল ছিঁড়ে বাংলা বানানকে মুক্ত করার মতো ধারালো হয়ে উঠতে পারে নি। ঐতিহ্য-অনুসারী আর ঐতিহ্য-বিরোধী প্রবণতাগুলি এইরকম ঃ

ক. ঐতিহ্য-অনুসারী—

১. শব্দশেষে ও-উচ্চারণ থাকলেও ও-কার না দেওয়া।

২. হ্রস্ব-দীর্ঘ বিকল্পে দীর্ঘস্বরের (ঈ-ঊ) প্রতি ঝোঁক।

৩. অ্যা-উচ্চারণে এ-কারের প্রয়োগ।

৪. ঙ্গ-ঙ বিকল্পে 'ঙ্গ' আর ঙ-ং বিকল্পে 'ঙ'-র প্রতি ঝোঁক।

৫. ণ-ন বিকল্পে ণ-এর প্রতি ঝোঁক।

৬. রেফের নীচে ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব দেওয়া।

৭. শব্দের মাঝখানে বা শেষে বিসর্গ দেওয়ার ঝোঁক।

৮. সংস্কৃত বানানের অনুসরণে হস্ চিহ্ন দেওয়ার ঝোঁক।

৯. তদ্ভব-অর্ধতৎসম বানানে উৎস-বানানের (সংস্কৃত বানানের) প্রতি অনুগত থাকা (স্বর্ণ > সোণা, কর্ণ > কাণ)।

খ. ঐতিহ্য-বিরোধী —

১. ও-উচ্চারণে ও-কার দেওয়া।

২. হ্রস্বস্বরের (ই-উ) প্রতি ঝোঁক।

৩. অ্যা-উচ্চারণে 'অ্যা' 'ে্যা'-র প্রয়োগ।

৪. ঙ্গ-ঙ বিকল্পে 'ঙ' আর ঙ-ং বিকল্পে 'ং'-র প্রয়োগ।

৫. ণ-ন বিকল্পে 'ন' প্রয়োগ।

৬. রেফের নীচে একক ব্যঞ্জন প্রয়োগ।

৭. শব্দের মাঝখানে বা শেষে বিসর্গ না দেওয়া।

৮. হস্‌চিহ্ন না দেওয়া।

৯. উচ্চারণ-মুখী বানান লেখার ঝোঁক।

১১২.৪.১ সারাংশ—২

এবারে দেখুন গত দুশো বছরের প্রথম দফায় বাংলা গদ্যে বানান-বিবর্তনের চেহারাটি—উইলিয়ম কেরি থেকে বঙ্কিমচন্দ্র পর্যন্ত।

উইলিয়ম কেরির গদ্যে উৎসমুখী বানান লেখারই প্রবণতা (কর্ত্তৃত্ব-নির্ম্মাণ, 'যাতৃ' থেকে 'যা')। রামরাম

বসুর বানান-প্রয়োগে উৎসমুখী থাকার তুলনায় উচ্চারণমুখী হবার প্রবণতা প্রবল (দিল্লি-তির-প্রথমত)। অথচ, তাঁর পরবর্তী গদ্যকার মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার উৎস-বানানকেই ধরে রাখতে চান 'ভর্ত্তৃহরি-কাজকর্ম্ম' বানানে ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব-প্রয়োগে বা অ-তৎসম 'চিকণ' বানানে সংস্কৃত 'চিক্কণ'-এর 'ণ'-কে অব্যাহত রেখে।

১৮১৮ থেকে ১৮৪০ সালের মধ্যে প্রকাশিত সাময়িক পত্র-পত্রিকায় গতানুগতিক বানান-অভ্যাস থেকে বেরিয়ে আসার প্রবণতা দেখা গেল এই কটি এলাকায়—

১. তৎসম বানানে ই-কারের ঝোঁক—আগামি-অনুরাগি-নিবাসি-রোগি-পক্ষি। অ-তৎসম বানানে ঈ কারের ঝোঁক—ইংরেজী-জুরী-আরজী-জমিদার।

২. শব্দশেষে হস্‌চিহ্ন বর্জনের ঝোঁক—ফলবান-বলবান।

৩. রেফের নীচে ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব বর্জনের দুটি-একটি উদাহরণ—দুর্দশা-দেবার্চনা।

এর পাশে, কয়েকটি ক্ষেত্রে বিভ্রান্তিও ধরা পড়ছে একই উচ্চারণে দু-রকম বর্ণ প্রয়োগ করার চেষ্টায়—

১. ং-ম-ঙ-ঙ্গ—সম্বাদ-সংপ্রতি (ম-ং), সংকীর্তন-সাংঘাতিক (ং-ঙ) ইংরেজী-ইঙ্গরেজী (ং-ঙ্গ)।

২. ণ-ন— গবর্ণমেণ্ট-গবর্‌নর্‌।

৩. শ-স— শাল-কেলাস।

তবু মোটের উপর এ যুগের বানানে পুরোনো উৎস-বানানের প্রতি অনুগত থাকার আগ্রহটাই যে বেশি, তা বোঝা যায় শব্দশেষে বিসর্গ ধরে রাখায় (বিশেষতঃ-দ্বিতীয়তঃ) রেফের নীচে ব্যঞ্জন-দ্বিত্ব প্রয়োগে (পর্য্যন্ত-মার্জ্জনা....) অ-তৎসম বানানে ণত্ব-বিধান মেনে চলায় (করাণ-কেরাণি)।

রামমোহন রায় বানান-প্রয়োগে ঐতিহ্যকেই মানেন। রেফের নীচে ব্যঞ্জন-দ্বিত্ব প্রয়োগে তাঁর দ্বিধা নেই, বিশেষ্য-বিশেষণ অব্যয় নির্বিশেষে ই-কারান্ত 'কি' প্রয়োগেও তিনি অবিচল।

বিদ্যাসাগরের বানান-নীতি বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে—তৎসম শব্দ-বানানে তাঁর নীতি বেশ কঠোর, তুলনায় অ-তৎসম বানানে তাঁর দ্বিধার এলাকা অনেকখানি প্রসারিত। দ্বিধা রয়েছে ই-ঈ অ্যা-এ ঔ-অউ ঙ-ঙ্গ ণ-ন শ-স বর্ণের প্রয়োগে। তবু এর ফাঁকে 'ঙ'-র বদলে 'ঙ্গ' আর 'ণ'-র বদলে ন-প্রয়োগের ঝোঁকটাও চোখে পড়ে। আবার উল্টোদিকে তৎসম বানানে তাঁর কঠোরতার ফাঁকেও দেখি 'সঙ্কলিত'-র পাশে 'সংকলিত'-র দ্বিধা (ঙ-ং)।

উইলিয়ম কেরি থেকে বিদ্যাসাগর পর্যন্ত দেখলেন সাধুরীতির বানান-প্রয়োগ। এর পাশে দেখা যাক প্যারীচাঁদ মিত্র আর কালীপ্রসন্ন সিংহের সহজ সাধুরীতি আর চলিতরীতির লেখায় বানান-প্রয়োগের আদলটা

কী ধরনের। প্যারীচাঁদের বানানে দেখবেন মূলত তিনটি রূপ—এক, খানিকটা ঐতিহ্যকে মেনে নেওয়া, দুই, খানিকটা পুরোনো আর নতুন বানানের দ্বিধা-বিভ্রমে জড়িয়ে থাকা, তিন, খানিকটা ঐতিহ্যকে এড়িয়ে নতুন বানানের ঝুঁকি নেওয়া। ঐতিহ্যকে মানা হচ্ছে রেফের নীচে ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব-প্রয়োগে (‘কর্ত্ত-কর্ম্ম’ এমনকী ‘সর্দ্দার’), পুরোনো-নতুনের দ্বিধায় জড়ানো হচ্ছে ই-ঈ ণ-ন আর শ-ষ প্রয়োগে (গিরি-গিরী সোনা-চুণ পুলিশ-পোষাক)। আর, নতুন বানানের দিকে এগিয়ে যেতে দেখছি ‘কাহারও’ বদলে ও-কারান্ত ‘কাহারো’ প্রয়োগে, উচ্চারণমুখী ‘ল্যাখ’ বানানে, ‘ইঙ্গরাজী’-র প্রথা ভেঙে ‘ইংরাজী’ লেখায়। হস্‌চিহ্ন-প্রয়োগের পুরোনো প্রথাটিকে চলিতরীতির ক্রিয়াপদে প্রসারিত করাটাও একধরনের আধুনিকতাই (কর্‌ছে-লিখ্‌ছে)। এমনকী, ই-ঈ আর ণ-ন প্রয়োগের দ্বিধাদ্বন্দ্বের ফাঁকেও একজন প্রগতিশীল প্যারীচাঁদকেই খুঁজে পাওয়া যাবে ‘ভারি-পূজারি’-র ই-কারে বা ‘কান-সোনা-সারজন’-এর ন-প্রয়োগে। এসব ক্ষেত্রে প্রথা-ভাঙার সাহসটুকু প্যারীচাঁদই দেখালেন প্রথম।

প্রথা-ভাঙা আলালি বানানের পরবর্তী হয়েও হুতোমি বানান খানিকটা প্রথার দিকেই ঝুঁকে থাকল। প্যারীচাঁদ ‘ই-ঈ’ বা ‘ণ-ন’-র দ্বিধায় ছিলেন, কালীপ্রসন্ন ‘ঈ’ আর ‘ণ’-কেই বরণ করে নিলেন। ‘চড়্‌কী-জরী-টুপী-শাড়ী-বাড়ী-ঘড়ী’-পিসী আর ‘সোণা-বেণে-লোণা’ বানানে দেখছি তাঁর উৎসমুখীনতা। তবে, প্যারীচাঁদের তুলনায় কালীপ্রসন্ন এগিয়ে গেলেন অন্ততপক্ষে দুটি ক্ষেত্রে—এক, হস্‌চিহ্ন-প্রয়োগে (চড়্‌কী-সড়্‌সড়্-গর্‌রা-ফর্‌রা-ঝম্‌ঝম্-বাজ্‌তে-লাগ্‌লো), দুই ক্রিয়াপদের ও-কার প্রয়োগে (লাগ্‌লো-জুড়্‌লো-হলো-আস্‌বো-এলো)।

বঙ্কিমচন্দ্রের বানান-নীতি অনেকটা এইরকম—তৎসম-বানানে উৎস-বানানের ঐতিহ্যকেই মানা হচ্ছে (সঙ্গত বিশেষতঃ পৃথক্ আর্য্য), অ-তৎসম বানানে ঐতিহ্য থেকে বেরিয়ে এসে উচ্চারণ-মুখী বানান-লেখার ঝোঁক (হলো খ্রীষ্টিয়ান ল্যাজ) থাকলেও হ্রস্ব-দীর্ঘ স্বরের প্রয়োগে বঙ্কিমচন্দ্র দ্বিধাগ্রস্ত (ফারসী-ফরাশি জমীদারী-বাহাদুরি উকীল-মুহুরি লীগ-সেক্রেটারি)। এরই পাশে রেফের নীচে ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব আর ‘ণ’-র প্রতি ঝোঁক—ঐতিহ্য-অনুসারী এই দুটি সূত্রকে বঙ্কিমচন্দ্র তৎসম-বানানের সীমানা ছাড়িয়ে অ-তৎসম বানানেও অতি সহজে প্রয়োগ করেছেন (আর্ম্মি-কার্ব্বন, গবর্ণর-কর্ণেল-সোণা-কেরাণী-কাণ)।

কেরি-রামরাম বসু থেকে বিদ্যাসাগর-প্যারীচাঁদ-কালীপ্রসন্ন-বঙ্কিমচন্দ্র পর্যন্ত বানান-প্রয়োগে মুখ্যত ঐতিহ্যকে মেনে চলার ঝোঁক দেখা গেলেও পাশাপাশি ঐতিহ্য-বিরোধী একটা ছকও ক্রমশ তৈরি হয়ে উঠছে বিশেষ করে প্যারীচাঁদ-কালীপ্রসন্নের চলিত রীতির বানানে। ‘ঐতিহ্য’ বলতে বুঝব উচ্চারণের কথা না ভেবে পুরোনো প্রথায় ঈ-ঊ-এ-ঙ্গ-ণ বা রেফের নীচে ব্যঞ্জন-দ্বিত্ব বা তস্-শস্ প্রত্যয়ান্ত শব্দে বিসর্গ

দেওয়া—মূলত সংস্কৃত বানানের দিকে ঝুঁকে থাকা। আর, 'ঐতিহ্য-বিরোধী' বলতে বুঝে নেব ই-উ-ন-এর প্রয়োগ, উচ্চারণ অনুসারে অ্যা-ঙ-এর প্রয়োগ, রেফের নীচে ব্যঞ্জন-দ্বিত্ব বা শব্দশেষে বিসর্গ না দেওয়া—মূলত উচ্চারণমুখী বানান লেখা।

১১২.৪.২ অনুশীলনী—২

১. (ক) ঙ-ং বর্ণ-প্রয়োগে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ঝোঁক কোন্ বর্ণের দিকে, উদাহরণ দিয়ে লিখুন।

(খ) হস্‌চিহ্ন প্রয়োগে বিদ্যাসাগরের দ্বিধা রয়েছে, এমন ১টি উদাহরণ লিখুন।

(গ) প্যারীচাঁদ মিত্র বর্ণ-প্রয়োগের কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে দ্বিধাগ্রস্ত, ১টি করে উদাহরণ দিয়ে দেখিয়ে দিন।

(ঘ) হুতোমি গদ্যে অ-তৎসম বানানে হস্-প্রয়োগের ৫টি উদাহরণ লিখুন।

(ঙ) বঙ্কিমচন্দ্র প্রচলিত বানানরীতি ভেঙেছেন, এরকম ৪টি ক্ষেত্র উল্লেখ করুন এবং প্রতিটি ক্ষেত্রে ১টি করে উদাহরণ লিখুন।

২. বানান-প্রয়োগে বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করে এঁদের সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত টীকা লিখুন—উইলিয়ম কেরি, রামরাম বসু, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রামমোহন রায়।

৩. ১৮১৮ থেকে ১৮৪০—এই সময়ের সাময়িকপত্রে বাংলা বানান-প্রয়োগের যেসব বৈশিষ্ট্য ধরা পড়ে, প্রাসঙ্গিক উদাহরণসহ তা উল্লেখ করুন।

৪. ঐতিহ্যকে মেনে চলা, ঐতিহ্যকে অমান্য করা, আর এ-দুয়ের মধ্যে দ্বিধা—আলালি আর হুতোমি বানানের এই তিনরকম পরিচয় উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিন।

৫. বিদ্যাসাগরের গদ্যরচনায় যে বানাননীতির প্রতিফলন ঘটেছে, যথাযোগ্য উদাহরণ-সহযোগে তা ব্যাখ্যা করুন।

৬. বানান-প্রয়োগে বঙ্কিমচন্দ্র কতটা ঐতিহ্য-অনুসারী, কতটা ঐতিহ্য-বিরোধী আর কতটা দ্বিধাগ্রস্ত, উদাহরণের সাহায্য নিয়ে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৭. উইলিয়ম কেরি থেকে বঙ্কিমচন্দ্র পর্যন্ত—বিশিষ্ট গদ্যলেখকদের গদ্যরচনায় বানান-বিবর্তন কীভাবে ঘটে চলেছে সংক্ষেপে তা বিবৃত করুন।

১১২.৫ মূলপাঠ-৩ ঃ রবীন্দ্রনাথ-প্রমথচৌধুরী-অন্নদাশঙ্কর রায়

আগের মূলপাঠে উইলিয়ম কেরি থেকে বঙ্কিমচন্দ্র—এই কালপর্বের গদ্যবানানের গতিবিধি খানিকটা আন্দাজ করলেন। এবার দেখা যাক, রবীন্দ্রনাথ-প্রমথ চৌধুরী-অন্নদাশঙ্কর রায়ের হাত ধরে বাংলা বানান কোন্ পরিণামে উত্তীর্ণ হল, পৌঁছে গেল একুশ শতকের দোরগোড়ায়।

উনিশ-বিশ শতকের বাংলা ভাষাচর্চা আর সাহিত্যের ক্ষেত্রে যেমন, বাংলা বানানের বিবর্তন-প্রক্রিয়াতেও তেমনি রবীন্দ্রনাথ একটা বড়ো জায়গা দখল করে রেখেছেন। প্রাথমিক ঐতিহ্য-আনুগত্যের শক্ত বাঁধন খুলতে খুলতে ক্রমশ একটি স্থির নীতির মুক্ত অঙ্গনে এসে তিনি কীভাবে স্থির হলেন, এটা বিস্ময়ের। দেখা যাবে, বানান-প্রয়োগেও রবীন্দ্রনাথ সময়ের অগ্রবর্তী।

এবারে আসুন, রবীন্দ্রনাথের প্রথম জীবনের কাব্য বনফুল-কবিকাহিনী-সন্ধ্যাসংগীত-প্রভাতসংগীত আর শেষজীবনের কাব্য জন্মদিনে-শেষলেখা খুলে দেখি, বানান-প্রয়োগে রবীন্দ্রনাথের ঝোঁক কোন্দিকে বাঁক নিচ্ছে তা আন্দাজ করতে চেষ্টা করি।

প্রথমে দেখা যাক তৎসম বানান—

১. ই-ঈ ঃ 'বনফুল' কাব্যের পাতায় পাতায় দেখবেন **'কুটীর'** এর দীর্ঘ ঈ-কার, 'বনফুলে'র দ্বিতীয় সর্গে দেখুন—'কে ওগো **কুটীর**বাসি! দ্বার খুলে দাও আসি!' অথচ, 'গীতমালিকা-২' এর অতি পরিচিত 'যেতে দাও গেল যারা' গানটিতে দেখুন—**'কুটিরে কুটিরে** বন্ধ দ্বার'। দুটি ক্ষেত্রেই কুটিরের দ্বারা বন্ধ, তবে দ্বিতীয় 'কুটির' দীর্ঘ ঈ-কারের দ্বার খুলে মুক্তি পেয়েছে হ্রস্বই-কারে। অবশ্য, কুটির-কুটীর বানানে ই-ঈর দ্বিধা রবীন্দ্রনাথ কাটিয়ে ওঠেন নি ১৯৪১-এর 'সভ্যতার সংকটে'-ও, ফিরে এসেছেন পুরোনো 'কুটীরে'-ই—'আজ আশা করে আছি, পরিত্রাণকর্তার জন্মদিন আসছে আমাদের এই দারিদ্র্যলাঞ্ছিত **'কুটীরের** মধ্যে,' 'ভঙ্গী' তার ঈ-কার বহাল রেখেছে 'জন্মদিনে' কাব্য পর্যন্ত—'শুধু **ভঙ্গী** দিয়ে যেন না ভোলায় চোখ' (১০নং কবিতা) অথবা 'বিচিত্র তাদের ভঙ্গী' (২০নং কবিতা)। অবশেষে 'ভঙ্গী' ঈ-কারের বাঁধন ছিঁড়ে বেরিয়ে এল 'শেষ লেখা' কাব্যের ১৪নং কবিতায়—'কষ্টের বিকৃত ভান, ত্রাসের বিকট **ভঙ্গি** যত'।

তৎসম বানানে ঈ-র প্রতি পক্ষপাত রবীন্দ্রনাথ এড়াতে পারেননি কোনওকালেই। কাকলী-লহরী-বন্দী-নাড়ী-শ্রেণী-অন্তরীক্ষ বানানে বিকল্প ই-র প্রয়োগ প্রায় নেই-ই। তবে পদ্যে ই-ঈর দ্বিধা বা ঈ-কারের দিকে ঝোঁক যতটা ছিল, গদ্যে ততটা নয়। এমনকী, গদ্যে ঝোঁকটা যে ই-কারের দিকেই, এটা বোঝাতে গিয়ে মণীন্দ্রকুমার ঘোষ তাঁর 'বাংলা বানান' বই-এর ৪১-পৃষ্ঠায় জানাচ্ছেন—'রবীন্দ্রনাথের ঝোঁক হ্রস্ব ই-কারের দিকে, ...**'ঘটী'** শব্দ সংস্কৃত কিন্তু রবীন্দ্রনাথ লেখেন **'ঘটি'**। .....একখান চিঠিতে রবীন্দ্রনাথ **'দায়ী'** শব্দের বানান লিখেছিলেন **'দায়ি'**।

২. উ-ঊ ঃ 'বনফুল'-এর 'ওই রে কুমারী **ঊষা** বিলোল চরণে' অথবা 'শুকতারা প্রকাশিবে **ঊষার** কপোলে' থেকে বেরিয়ে-আসা 'ঊষা' ঊ ছেড়ে '**উষায়** পরিণত হল রবীন্দ্র-প্রতিভার উষালগ্নেই—'কবিকাহিনী'র শুরুতেই—'**প্রফুল্ল উষার** ভূষা অরুণকিরণে'। এই উ-কারযুক্ত 'উষা'-ই টিকে রইল 'তুমি উষার সোনার বিন্দু' (গীতবিতান) অথবা 'উষা একা একা আঁধারের দ্বারে ঝংকারে বীণাখানি' (লেখন)-তে।

৩. ঙ-ং ঃ ১৮৭৬-এ লেখা সমালোচনামূলক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ '**আর্যসঙ্গীত**' কথাটি প্রয়োগ-করলেন ('ভুবনমোহিনী, অবসরসরোজিনী ও দুঃখসঙ্গিনী')। ১৮৭৮-এর 'কবিকাহিনী'-তেও শুনতে পেলাম 'আরণ্য বিহঙ্গের স্বাধীন **সঙ্গীত**'। তবে, এর পাঁচ বছরের মধ্যেই তাঁর '**সন্ধ্যাসংগীত**' আর '**প্রভাতসংগীত**' কাব্য লেখা হল—'সঙ্গীত' উত্তীর্ণ হল 'সংগীতে' এবং সেই থেকে শুরু করে 'নিখিলের **সংগীতের স্বাদ**' কবি গ্রহণ করলেন ১৯৪১-এর 'জন্মদিনে' কাব্য পর্যন্ত। এমনি করে প্রথম জীবনের 'সঙ্গীত' 'সঙ্কুচিত' ক্রমশ 'সংগীত' 'সংকুচিত' হয়ে তা প্রসারিত হয়েছে সংকীর্ণ-সংকট-অলংকরণ-সংকেত-ঝংকারে।

৪. রেফের নীচে ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব ঃ সচেতন রবীন্দ্র-স্বভাব চিরকাল রেফের নীচে ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব-প্রয়োগের বিরোধী। আর্য-ঊর্ধ্ব-মুহূর্ত-পর্বত-সৌন্দর্য-সূর্য-মর্ত্য তাঁর লেখায় বারবার একক ব্যঞ্জন নিয়েই হাজির থেকেছে। পাণ্ডুলিপিতে দ্বিত্ব প্রয়োগ করেও প্রুফে নিজে তা সংশোধন করে দিয়েছেন, এমন উদাহরণও প্রচুর।

৫. বিসর্গ-প্রয়োগ ঃ বিসর্গ-প্রয়োগকে রবীন্দ্রনাথ যে বাহুল্য গণ্য করেছিলেন বনফুল-কবিকাহিনী-সন্ধ্যাসংগীত থেকেই, 'নিশ্বাস'-এর বারবার প্রয়োগ থেকেই তা বোঝা যায়। 'বনফুলে'র 'ক্রমশঃ' কিছুকাল বিসর্গান্ত থেকে অবশেষে 'ক্রমশ' হয়ে পৌঁছে গেছে 'সভ্যতার সংকট'-এ।

প্রথমজীবনে 'প্রথমতঃ-দ্বিতীয়তঃ-স্বভাবতঃ' বানান অন্ত্য বিসর্গ দিয়ে শুরু করলেও তা বেশিদিন টেকে নি। ১৮৭৭-এর মেঘনাদবধকাব্য-সমালোচনা প্রবন্ধে 'কার্যত' বানানটি প্রয়োগ করলেন অন্ত্য বিসর্গকে উচ্ছেদ করেই। অন্ত্য বিসর্গ এড়িয়ে যাবার এই স্বাভাবিক ঝোঁকটাই তাঁর লেখায় শেষ পর্যন্ত বহাল থেকেছে।

৬. হস্‌চিহ্ন ঃ শব্দে হস্‌চিহ্ন দেবার ঝোঁকটাই কবির প্রথম জীবনের, এবং খানিকটা দ্বিধা নিয়েই। দ্বিধা ছিল মহান-মহান্ বানানে। 'বিপদ' আর 'সম্পদ' স্বতন্ত্র বানানে হস্‌চিহ্নহীন, সমাসবদ্ধ হলেই হস্‌চিহ্ন নিয়ে হয়ে উঠত 'বিপদ্‌গ্রস্ত' 'সম্পদ্‌বান' (সভ্যতার সংকট)। 'দিক্' বানানটিও গোড়ার দিকের হস্-ঝোঁক কাটিয়ে শেষ পর্যন্ত হস্‌মুক্ত 'দিক' হয়ে উঠেছে শেষজীবনের 'মহাজাতিসদন' 'আরোগ্য' জাতীয় প্রবন্ধে। তবে, 'অবাক্-নির্বাক' বানানকে হস্ থেকে রেহাই দেওয়া কবির পক্ষে অসাধ্যই থেকে গেল। তাঁর 'জন্মদিনে' (১৯৪১) কাব্যেও দেখি—'এসো কবি অখ্যাত জনের/নির্বাক্ মনের....

এবারে চলুন, অ-তৎসম শব্দে রবীন্দ্রনাথের বানান-প্রয়োগ কোন্ নীতিতে চলছে, দেখা যাক।

১. ই-ঈ ঃ অব্যয় হোক বা সর্বনাম-বিশেষণ হোক, 'কি'-শব্দের এই দু-রকম প্রয়োগেই ই-কার যুক্ত হবার প্রথা দীর্ঘকালের। কোনও কোনও প্রাচীন রচনায়, এমনকী 'শ্রীকৃষ্ণকীর্তন' কাব্যে সর্বনাম-বিশেষণ অর্থে 'কী'-র প্রয়োগ থাকলেও আধুনিক যুগের লেখায় কেবলমাত্র 'কি' চলছিল। রবীন্দ্রনাথ নতুন করে পৃথক করলেন কি-কী শব্দদুটি। 'বনফুল'-এর **কি** বলিব বোন' অথবা 'কবিকাহিনী'র 'কি কবিতা লিখেছ যে জ্বলন্ত অক্ষরে'—কিশোর কবির এই সর্বনাম-বিশেষণ 'কি' কিশোর বয়সের 'সন্ধ্যাসংগীতে'-ই 'কী' হয়ে এল বারবার—

'মনে পড়ে—**কী** ছিল, **কী** নাই।'
'মৃদু মৃদু ও **কী** কথা কহিস আপন মনে'
'কেন গো, **কী** হয়েছিল তার।'
'ও **কী** সুরে গান গাস, হৃদয় আমার?'
'**কী** ভাব তোমার মনে জাগে—'

এরপর থেকে সর্বনাম বা বিশেষণ 'কী'-ই রইল চূড়ান্ত হয়ে।

তৎসম বানানে, বিশেষ করে পদ্যলেখার বানানে ঈ-কারের প্রতি কবির পক্ষপাত একটু আগেই দেখলেন। কিন্তু, অ-তৎসম বানানে 'ঈ' থেকে ই-কারের দিকে কবি ঝুঁকে পড়লেন নির্দ্বিধায়।

'কোথায় গাইছে **পাখী**'—বনফুল-কবিকাহিনীর এই 'পাখী' 'সন্ধ্যাসংগীতে' এসে অবলীলায় 'পাখি' হয়ে উঠল, ডানা থেকে ঝেড়ে ফেলল ঈ-কার, ই-কারের ডানা মেলে উড়ে চলল 'শেষলেখা' পর্যন্ত—

'ওরে **পাখি**,
থেকে থেকে ভুলিস কেন সুর,
যাস নে কেন **ডাকি**—'

'বিদেশী' 'তীর' ('বাণ'-অর্থে)-এ ঈ-কার অব্যাহত, আদরিনী-ভিখারিনী-কাঙালিনী-পূজারিনীর ঈ-কার কখনও কখনও দ্বিধাগ্রস্ত, তবে আশি-তাঁতি-শরিক-বাঁশি-বাড়ি-তৈরির মতো অজস্র বানানে ই-কারেরই আধিপত্য। গোড়ার দিকের লেখায় 'নীচে' বানানের ঝোঁক কাটিয়ে অবশেষে 'নিচে'-তেই কবি স্থির থাকলেন জীবনের শেষ লগ্ন পর্যন্ত। 'ফরাসী' শব্দে দ্বিধা থাকলেও নির্দ্বিধায় লিখলেন বাঙালি-ইংরাজি-ইংরেজি।

২. অ-ও ঃ অ-ও প্রয়োগে কিছু কিছু বানানের ক্ষেত্রে কিশোর রবীন্দ্রনাথ দ্বিধাগ্রস্ত, ঝোঁকটা যদিও ও-কারের দিকেই। দ্বিধা ছিল মুখ্যত ভাল-ভালো ভালবাসা-ভালোবাসা মত-মতো কোন-কোনো বানানে।

ও-কারের ঝোঁকটাই যে কবির স্বভাবগত, তার প্রমাণ তো-হয়তো-কারো-বারো-আরো-ছোটো-বড়োর মতো শব্দ-বানানে, বিশেষ করে বনফুল-কবিকাহিনী কাব্যে ক্রিয়াপদের বানানে—হোতে-হোলে-হোলো-হোয়ে-হোয়েছে-রোয়েছে-কোরে-কোরেছে শব্দে। 'সন্ধ্যাসংগীত' থেকে অবশ্য এ ঝোঁক একটি মাত্রাসীমার মধ্যে এসে স্থির হয়েছে। তবে, অতিরিক্ত বোঝাতে ও-বর্ণের বদলে ও-কার প্রয়োগ রবীন্দ্রনাথের একটি লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য—তোমারো-আমারো-তারো-এখনো-তখনো। এর আগে রামমোহন রায়ের রচনায় কিঞ্চিতো (কিঞ্চিৎ + ও) প্রত্যয়ো-লোকো প্রয়োগের উল্লেখ করেছিলেন মণীন্দ্রকুমার ঘোষ। কবি হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের কাব্যেও দেখা গেছে 'আজো-আরো' বানানের প্রয়োগ। তবে, রবীন্দ্ররচনায় এই ঝোঁকটা প্রবল হয়ে উঠেছে বলেই মনে হয়।

৩. ঙ্গ-ঙ-ং ঃ ঐতিহ্য মেনে এই তিনটি বিকল্প থেকে 'ঙ্গ'-বর্ণটি বাছাই করেই কিশোর রবীন্দ্রনাথের হাতেখড়ি হল গদ্য-পদ্য লেখায়। তবে, বনফুল-কবিকাহিনীর **ভাঙ্গিল-ভাঙ্গিব-ভেঙ্গে-ভাঙ্গে** 'সন্ধ্যাসংগীতে'র '**ভাঙে** তো **ভাঙিবে** বাদ্য' আর 'প্রভাতসংগীতে'র '**ভাঙ্রে** হৃদয় **ভাঙ্রে** বাঁধন' বা 'আমি **ভাঙিব** পাষাণকারা'-য় এসে ভেঙে গেছে ঙ-গ এর দুটি টুকরোয়, নিশ্চিহ্ন হয়েছে 'গ'। এই 'ঙ'-কেই কবি টেনে নিয়েছেন শেষ পর্যন্ত। এমনকী, প্রথম গদ্যের বাঙ্গালি-বাঙ্গালাও 'ছিন্নপত্র' থেকেই পরিণত হয়েছে বাঙালি-বাঙলায় এবং অবশেষে 'বাঙলা' হয়েছে 'বাংলা'।

৪. ণ-ন ঃ ণ-প্রয়োগের সংস্কার থেকে রবীন্দ্রনাথ প্রথম থেকেই মুক্ত। তাঁর বানানে বারবার এসেছে কান-সোনা-পরান-বরনের 'ন'। বিশ্বভারতী-প্রকাশিত বই-তে পুজারিণী-পূজারিনী-পূজারিনি বা 'রাজা ও রাণী'-'রাজা ও রানী'-র দ্বিধা থাকলেও কবি নিজে সে দ্বিধাকে অতিক্রম করে 'ন'-র দিকেই ঝুঁকেছিলেন।

এতক্ষণ যেটুকু তথ্য রবীন্দ্রনাথের লেখায় বানান-প্রয়োগ বিষয়ে দেওয়া গেল, তা থেকে রবীন্দ্রনাথের বানান-প্রবণতার এই কটি দিক ধরা পড়ে—

১. তৎসম গদ্য বানানে কবির ঝোঁক খানিকটা ই-কারের দিকে থাকলেও পদ্য বানানে ঝোঁকটা ঈ-কারের দিকেই। অ-তৎসম বানানে অবশ্য ই-কারটাই কবির পছন্দ। উ-ঊর বিকল্পে উ-কেই কবি বেছে নেন।
২. তৎসম বানানে রেফের নীচে ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব কবি চিরকাল এড়িয়ে চলেন।
৩. তৎসম শব্দে বিসর্গ-প্রয়োগ কবি পছন্দ করেন না।
৪. তৎসম বানানে হস্-প্রয়োগে কবি দ্বিধাগ্রস্ত, শেষ দিকে অবশ্য হস্-বর্জনের ঝোঁকটাই দেখা গেছে।
৫. 'ঙ্গ'-র বদলে 'ঙ'-র বদলে 'ং' প্রয়োগের দিকেই কবির ঝোঁক।

৬. অ-তৎসম শব্দের ও-উচ্চারণে অ-কারের বদলে ও-কারের প্রতি কবির পক্ষপাত।

চলে আসি **প্রমথ চৌধুরীর** বানান-রাজ্যে।

১৯৩৫-এ কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান-সংস্কার-সমিতি গড়ে ওঠার আগেকার পর্বে বাংলা বানানকে নতুন কালের রুচি অনুসারে নতুন চেহারা দেবার দায়িত্ব যাঁরা কাঁধে তুলে নিলেন, তাঁদের মধ্যে প্রমথ চৌধুরীকে একজন অগ্রবর্তী গদ্যলেখক হিসেবে গণ্য করা চলে। ১৯৮০ থেকে ১৯৩১—এই কালপর্বে লেখা তাঁর কয়েকটি প্রবন্ধ থেকে কিছু কিছু শব্দ-বানান চয়ন করে বানান-প্রয়োগে প্রমথ চৌধুরীর প্রবণতা কোন্‌দিকে তা ধরার চেষ্টা করা যাক।

১. **জয়দেব (১৮৯০) ঃ** ভালো-কোনো, সংগীত, কান, কার্য-সৌন্দর্য, প্রথমতঃ-বশতঃ-অন্ততঃ।

২. **বঙ্গভাষা বনাম বাবু-বাংলা ওরফে সাধুভাষা (১৯১৩) ঃ** স্বদেশি-ভঙ্গি কোনো বাংলা।

৩. **বর্তমান বঙ্গসাহিত্য (১৯১৫) ঃ** বেশি-তৈরি, ঊনবিংশ, সংকট-সংকুচিত-সংকীর্ণ-ভয়ংকর, মূলতঃ, পৃথক্-সম্যক্।

৪. **আমাদের ভাষা-সংকট (১৯২২) ঃ** বাঙালি-ফরাসি-ইংরেজি-আরবি-ফারসি-জমিদারি-নবাবি-ভালোবাসা-ভালো-কোনো-কখনো বাংলা-সংকর কান-জার্মান কথাবার্তা-কার্য-আর্য-আশ্চর্য-ধর্ম-পূর্ব।

৫. **হর্ষচরিত (১৯৩০) ঃ** ইংরেজি, নামাবলী, সংগত, সোনা, মর্ম-কদর্য, সম্ভবতঃ-ইতস্ততঃ।

৬. **পাঠান বৈষ্ণব রাজকুমার বিজুলি খাঁ (১৯৩১) ঃ** বাঙালি-নবাবি, পীর-সুফী, কোনো, সংগত, কোরান, ধর্ম, বশতঃ-অন্ততঃ-সম্ভবতঃ।

একালের বানান-বিতর্কের জায়গাগুলি ধরে ধরে প্রমথ চৌধুরীর প্রয়োগ থেকে তালিকাবন্ধ ঐ শব্দগুলি নতুন করে সাজিয়ে নিই—

১. ই-ঈ ঃ স্বদেশি ভঙ্গি বেশি তৈরি বাঙালি ফরাসি ইংরেজি ফারসি জমিদারি নবাবি। নামাবলী পীর সুফী।

২. উ-ঊ ঃ ঊনবিংশ।

৩. অ-ও ঃ ভালো কোনো ভালোবাসা কখনো।

৪. ঙ-ং ঃ সংগীত সংকট সংকুচিত সংকীর্ণ ভয়ংকর সংকর সংগত বাংলা।

৫. ণ-ন ঃ কান জার্মান সোনা কোরান।

৬. রেফের নীচে ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব ঃ কার্য সৌন্দর্য কথাবার্তা আর্য আশ্চর্য ধর্ম পূর্ব।

৭. বিসর্গ-প্রয়োগ ঃ প্রথমতঃ বশতঃ অন্ততঃ মূলতঃ সম্ভবতঃ ইতস্ততঃ।

৮. হস্-প্রয়োগ ঃ পৃথক্ সম্যক্।

উপরের বানান-বিন্যাস থেকে এই তথ্যই বেরিয়ে এল যে, প্রমথ চৌধুরী গদ্য-বানানে ঐতিহ্য থেকে বেরিয়ে আসার নজির রাখলেন প্রায় পুরোপুরি। হ্রস্ব-দীর্ঘ বানানের জটিলতা এড়িয়ে কেবল হ্রস্বস্বরচিহ্ন প্রয়োগ, শব্দশেষের ও-উচ্চারণে ও-কার দেওয়া, ঙ-এর বিকল্প থেকে 'ং' (অনুস্বার) বেছে নেওয়া, অ-তৎসম বানানে ণত্ববিধির সংস্কার কাটিয়ে (জার্মান-কোরান) বা উৎস-বানানের আকর্ষণ এড়িয়ে (কান-সোনা) 'ন'-র প্রয়োগ, রেফের নীচে ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব-বর্জন—এর প্রতিটি ঝোঁকই ঐতিহ্য-বিরোধী ঝোঁক। ঐতিহ্যের প্রতি অনুগত থাকার প্রবণতা দেখা গেল কেবল তৎসম শব্দশেষে তস্-প্রত্যয় থেকে পাওয়া বিসর্গের সংযোগে আর 'পৃথক্-সম্যক্' শব্দের শেষে হস্‌চিহ্ন প্রয়োগে। এ ছাড়া, প্রথা মেনে চলার আর একটিমাত্র ব্যতিক্রমী উদাহরণ 'নামাবলী-পীর-সূফী' বানানে ই-কারের বদলে ঈ-কারের দিকে হাত বাড়ানো।

১৯২৭ থেকে ২০০১—এই সময়ের মধ্যে বানান-লেখার ক্ষেত্রে **অন্নদাশঙ্কর রায়ের** অবস্থানটা কী, তা নির্ণয় করতে তাঁর প্রয়োগ থেকে কিছু কিছু শব্দ-বানানের নমুনা সংগ্রহ করা যাক।

ও-উচ্চারণে শব্দশেষে ও-কার লেখার ঝোঁক অন্নদাশঙ্করের লেখায় গত সত্তর বছরেরও বেশি সময় ধরে চলেছে। ১৯২৭-২৯-এ লেখা 'পথে-প্রবাসে'-তে পাওয়া যাচ্ছে ভালো-কোনো-এমনো-এখনো-কারো-মতো-আজো, এমনকী হতো-হলো-জানালো-র মতো ও-কারান্ত ক্রিয়াপদ। ঐ বইটিরই শোভন সংস্করণের ভূমিকায় ১৯৯৭ সালেও দেখছি 'হতো'-র পাশে 'উঠতো'। ১৯৮৮ থেকে ২০০১-এর আকাদেমি পত্রিকার সম্পাদকীয়গুলিতে ছড়ানো রয়েছে-নয়তো-হয়তো পনেরো-ভালো-এলো। গোড়ার দিকের 'এখনো-কারো' অবশ্য শেষের দিকে 'এখনও-কারও' চেহারা নিয়েছে, পাশাপাশি দেখতে পাচ্ছি 'আরও-তারও-আমারও'। 'আরো' ক্রমশ 'আরও'-র দিকে ঝুঁকছে। এর বিপরীত দিকেও ঝুঁকতে দেখছি আগেকার 'বড়'-কে, 'বড়'-ঝুঁকছে ও-কারান্ত 'বড়ো'-র দিকে।

অ-তৎসম শব্দে ঈ-কার প্রয়োগের ঝোঁক থেকে অন্নদাশঙ্কর ক্রমশ ই-কারে সরে এসেছিলেন অনেকখানি। একসময়কার ফরাসী-জার্মানী-সরকারী-চাকরী অথবা বাকী-বাঙালী-বন্দী-হাতীর ঈ-কার ছেড়ে শতকের শেষদিকে তিনি পৌঁছে গিয়েছিলেন ফরাসি-জরুরি-সরকারি-কোম্পানির ই-কারে। এমনকী, তৎসম বানানেও আগেকার 'বিদেশী' শেষের দিকে 'বিদেশি', পাশাপাশি চলছে পদবি-শ্রেণি-কবিতাবলি-পূর্বসূরির মতো ই-কারান্ত বিকল্প।

ঙ-ং প্রয়োগে অন্নদাশঙ্কর মুখ্যত অনুস্বার-পন্থী হলেও কখনও-সখনও কিঞ্চিৎ বিভ্রান্ত। তিরিশের দশকে যেমন দেখি 'সংগীত'-এর পাশে 'সঙ্কট', নব্বই-এর দশকে তেমনি উল্টো করে দেখি 'সঙ্গীত'-এর পাশে 'সংকট'। বিসর্গ-প্রয়োগেও এরকম দ্বিধা লক্ষ করা যাবে 'ক্রমশ'-র পাশে 'অন্ততঃ' বানানে। অবশ্য, 'অ-তৎসম 'তফাৎ' শতকের শেষে 'ৎ'-কে উচ্ছেদ করে 'তফাত' হয়ে গেছে তাঁর লেখায়।

এরকম দুটি-একটি দ্বিধার এলাকা ছেড়ে দিলে বাকি সবক্ষেত্রেই মুখ্যত হ্রস্বস্বর-প্রবণ উচ্চারণ-মুখী সরলীকৃত বানানের পক্ষপাতী থেকেই অন্নদাশঙ্কর পূর্ণ করে গেলেন তাঁর দীর্ঘ লেখক-জীবন।

১১২.৫.১ সারাংশ—৩

বাংলা বানানের তৃতীয় দফায় আমরা দেখব রবীন্দ্রনাথ থেকে অন্নদাশঙ্কর পর্যন্ত বানান-চর্চার ধারাটি।

রবীন্দ্রনাথ বানান-লেখার পাশাপাশি বানান নিয়ে ভাবছেন—অভ্যাসের টানে যে-বানান লিখছেন, সংস্কারের টানে তা সংশোধন করছেন। পাণ্ডুলিপির বানান আর মুদ্রিত বানানে তাই কিছু কিছু ফারাক থাকছেই। মুদ্রিত বানানের উপর নির্ভর করে বলা যায়—অ-তৎসম বানানের এলাকা তো বটেই, এমনকী তৎসম বানানেও তিনি প্রথাগত বানানের দেয়ালটা মাঝে মাঝে টপকে এসেছেন। তৎসম বানানে উ-ঊর বিকল্পে উ-কে (উষা) অথবা রেফের নীচে একক ব্যঞ্জনকেই তিনি বেছে নেন (আর্য-পর্বত-মর্ত্য), শব্দশেষে বিসর্গ প্রয়োগ তিনি এড়িয়ে চলেন (কার্যত ক্রমশ), 'ঙ-ং' থেকে বিকল্প 'ং'-কেই বহাল রাখেন (সংগীত-সংকীর্ণ-সংকুচিত)। তবু দ্বিধা ছিল তাঁর তৎসম-বানানে হস্‌চিহ্ন-প্রয়োগে (মহান-মহান্‌), খানিকটা দ্বিধা দেখালেন ই-ঈ প্রয়োগেও (কুটির-কুটীর)। কিন্তু অ-তৎসম বানানে নির্দ্বিধায় তিনি ঝুঁকেছেন হ্রস্বস্বরের দিকে ('পাখী থেকে 'পাখি', আশি-তাঁতি-শরিক-বাড়ি), শব্দশেষে ও-উচ্চারণে ও-কার লেখার দিকে (তো-হয়তো-তখনো-কারো-আরো-বারো)। সব মিলিয়ে উৎস বানানের প্রতি ঝুঁকে থাকার প্রথাগত প্রবণতা কাটিয়ে উচ্চারণ-অনুসারী বানানের দিকে এগিয়ে আসার আধুনিক প্রবণতাকেই রবীন্দ্রনাথ স্বাগত জানালেন, খানিকটা উস্‌কেও দিলেন।

বাংলা শব্দ-বানানে আধুনিকতার দিশারি রবীন্দ্রনাথ। আর, প্রমথ চৌধুরী তাঁর যোগ্য সহযোগী। তৎসম বানানে শব্দশেষে বিসর্গ (প্রথমতঃ বশতঃ অন্ততঃ সম্ভবতঃ) আর হস্‌চিহ্ন প্রয়োগের (পৃথক্‌ সম্যক্‌) প্রথাগত অভ্যাসটুকু ছাড়া আর সবক্ষেত্রেই প্রমথ চৌধুরী দ্বিধামুক্ত প্রথামুক্ত আধুনিক। তৎসম বানানে 'ঙ'-র বদলে 'ং' (সংকর সংকট সংকীর্ণ) রেফের নীচে একক ব্যঞ্জন (বার্তা কার্য ধর্ম), 'ই-ঈ'র বিকল্পে ই-কারের

প্রয়োগে (ভঙ্গি স্বদেশি) দেখা যায় প্রথা থেকে বেরিয়ে আসার বলিষ্ঠ পদক্ষেপ। একইভাবে অ-তৎসম বানানে নির্দ্বিধায় ই-কারের প্রয়োগ (বাঙালি ফরাসি ফারসি আরবি), শব্দশেষে ও-উচ্চারণ বোঝাতে ও-কার (কোনো ভালো), 'ণ'-কে পুরোপুরি বর্জন করে 'ন'-এর প্রয়োগ (কোরান সোনা কান জার্মান)—এসবই বাংলা বানানকে আধুনিক করে তোলার সাহসিক প্রয়াস। ব্যতিক্রমী প্রয়োগ দুটো-একটা চোখে পড়লেও ('পীর-সুফী'-তে ঈ-কার) প্রমথ চৌধুরী ঐতিহ্যের প্রাচীর পেরিয়ে আধুনিকতাকেই আবাহন করলেন তাঁর বানান-চর্চায়।

প্রায় পঁচাত্তর বছরের গদ্যচর্চায় অন্নদাশঙ্কর অ-তৎসম বানান নিয়ে কখনও এগিয়েছেন, কখনও খানিকটা পিছিয়েছেন, কখনও স্থির থেকেছেন একই বানানে। গোড়ার দিকের ঈ-কার (ফরাসী-জার্মানী-চাকরী-সরকারী বাঙালী-বন্দী-বাকী-হাতী) ক্রমশ শেষদিকে উত্তীর্ণ হয়েছে ই-কারে (ফরাসি-জরুরি-সরকারি-পদবি-কোম্পানি), তাঁর অনুস্বার-পন্থী কলমেও তিরিশের দশকের 'সংগীত' নব্বই-এর দশকে হয়ে পড়ল 'সঙ্গীত'। কিন্তু শব্দশেষের ও-কার থেকে তাঁকে কখনও অ-কারে সরে আসতে দেখা যায় নি (ভালো কোনো মতো), বরং শব্দশেষে ও-কারের ঝোঁক তাঁকে টেনে নিয়ে গেছে ক্রিয়াপদের শেষে ও-কার প্রয়োগের বিতর্কিত এলাকায় (হতো উঠতো এলো)। অবশ্য, অতিরিক্ত বোঝাতে-আজো-এখনো-কারো বানানের ও-কার ক্রমশ বদলে গেছে ও-বর্ণে (আজও-এমনও-কারও)। তৎসম বানানেও ই-কারান্ত বিকল্প প্রয়োগকেই তিনি পছন্দ করলেন (শ্রেণি-কবিতাবলি-পূর্বসূরি), আগেকার অ-তৎসম 'বিদেশী'-ও হয়ে উঠল 'বিদেশি'।

১১২.৫.২ অনুশীলনী—৩

১. তৎসম এবং অ-তৎসম শব্দে রবীন্দ্রনাথের বানাননীতি কী রকম ছিল, উদাহরণসহ বুঝিয়ে দিন।

২. বানান প্রয়োগে রবীন্দ্রনাথের দ্বিধা ছিল, আবার বিশেষ একটি বর্ণের দিকে তাঁর ঝোঁকও ছিল—এরকম তিনটি ক্ষেত্র থেকে উদাহরণ সংগ্রহ করে ক্ষেত্র-তিনটি ব্যাখ্যা করুন।

৩. শব্দ-বানানে ই-ঈ প্রয়োগে রবীন্দ্রনাথের ঝোঁক কোন্‌দিকে, এ বিষয়ে উদাহরণসহ সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৪. প্রমথ চৌধুরীর বানাননীতি উদাহরণ দিয়ে বুঝিয়ে দিন।

৫. প্রমথ চৌধুরীর বানান-প্রয়োগ ঐতিহ্যের প্রতি অনুগত থাকার নজিরগুলি উল্লেখ করুন।

৬. শব্দশেষে ও-উচ্চারণে অ-কার আর ও-কারকে অন্নদাশঙ্কর রায় কোথায় কীভাবে প্রয়োগ করেছেন, দৃষ্টান্ত সহযোগে দেখিয়ে দিন।

৭. অন্নদাশঙ্করের বানান-প্রয়োগের দ্বিধার এলাকাগুলি চিহ্নিত করুন।

৮. ই-ঈর প্রয়োগে রবীন্দ্রনাথ-প্রমথ চৌধুরী-অন্নদাশঙ্করের প্রবণতার মধ্যে কোথায় মিল আর কোথায় গরমিল, দেখিয়ে দিন।

১১২.৬ সহায়ক পাঠ

একক-১ এর মূলপাঠে বানান-প্রয়োগের উদাহরণ দেখাতে গিয়ে যেসব গ্রন্থ ব্যবহার করা হয়েছে তার তালিকা নীচে দেওয়া হল। গ্রন্থনামের সঙ্গে গ্রন্থের লেখক বা সম্পাদকের নাম, সেইসঙ্গে গ্রন্থের সংস্করণ, বা প্রকাশনারও উল্লেখ যথাসম্ভব করা হল।

১. চর্যাপদ ঃ সম্পাদক—মণীন্দ্রমোহন বসু, প্রকাশনা—কমলা বুক ডিপো।

২. শ্রীকৃষ্ণকীর্তন ঃ সম্পাদক—বসন্তরঞ্জন রায় বিদ্বদ্‌বল্লভ, প্রকাশনা—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ, পঞ্চম সংস্করণ (১৩৬১ সাল)।

৩. কবিকঙ্কণ-চণ্ডী (কালকেতু-ফুল্লরা) ঃ কবি—মুকুন্দরাম চক্রবর্তী, সম্পাদক—শ্রীকুমার বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিশ্বপতি চৌধুরী, প্রকাশনা— কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৭৪।

৪. অন্নদামঙ্গল ঃ কবি—রায় গুণাকর ভারতচন্দ্র, প্রকাশনা—বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির।

৫. পুরাতন বাংলা গদ্যগ্রন্থ সংকল (প্রথমখণ্ড) ঃ সম্পাদক—অসিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, সংস্করণ, (২০ জানুয়ারি, ১৯৭৮)।

৬. সাময়িকপত্রে সেকালের কথা ঃ সম্পাদক—ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, প্রকাশনা—বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ, তৃতীয় সংস্করণ (মার্চ ১৩৫৬)।

৭. বিদ্যাসাগর রচনাসংগ্রহ ঃ প্রধান সম্পাদক— গোপাল হালদার, প্রকাশনা— পশ্চিমবঙ্গ নিরক্ষরতা দূরীকরণ সমিতি, তৃতীয় সংস্করণ (১৯৭৪)।

৮. সৎসাহিত্য গ্রন্থাবলী (১ম খণ্ড) ঃ প্রকাশনা—বসুমতী-সাহিত্য-মন্দির।

আলালের ঘরের দুলাল (পৃ - ১৪৭ থেকে ২৬৫) ঃ ভূমিকা (বাঙ্গালা সাহিত্যে প্যারীচাঁদ মিত্রের স্থান/লেখক—বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়)।

হুতোম প্যাঁচার নকশা (পৃ - ১১১ থেকে ১৪৬)

৯. বঙ্কিম রচনাসংগ্রহ ঃ সাক্ষরতা প্রকাশন, প্রথম প্রকাশ (এপ্রিল ১৯৭৩)।

১০. রবীন্দ্র রচনাবলী ঃ প্রকাশনা—পশ্চিমবঙ্গ সরকার, জন্মশতবার্ষিক সংস্করণ (১৯৬১)।

১১. প্রবন্ধ-সংগ্রহ (১ খণ্ড) ঃ লেখক—প্রমথ চৌধুরী,
প্রকাশনা—বিশ্বভারতী, আগষ্ট ১৯৫২।

১২. পথে প্রবাসে ঃ লেখক—অন্নদাশঙ্কর রায়,
প্রকাশনা—বাণীশিল্প, শোভন সংস্করণ, (ফেব্রুয়ারি ১৯৯৮)

১৩. আকাদেমি পত্রিকা ঃ সম্পাদক—বিজিতকুমার দত্ত,
প্রকাশনা—পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি (১-১৩ সংখ্যা)।

মূলপাঠ-১ এর জন্য চর্যাপদ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন কবিকঙ্কণ-চণ্ডী (কালকেতুর উপাখ্যান) আর অন্নদামঙ্গল কাব্যের বানান-প্রয়োগ লক্ষ করুন।

মূলপাঠ-২ এর জন্য দেখুন উইলিয়ম কেরি, রামরাম বসু, মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার, রামমোহন রায়, বিদ্যাসাগর আর বঙ্কিমচন্দ্রের কিছু কিছু রচনা, চোখ বুলিয়ে নিন প্যারীচাঁদ মিত্রের 'আলালের ঘরের দুলাল' আর কালীপ্রসন্ন সিংহের 'হুতোম প্যাঁচার নক্‌শা'-র উপর, সেইসঙ্গে উল্টোতে থাকুন ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত 'সাময়িক পত্রে সেকালের কথা'-র পৃষ্ঠাগুলি।

মূলপাঠ-৩ এর আলোচিত বানানের উদাহরণ সংগ্রহ করা হয়েছে প্রধানত রবীন্দ্রনাথের বনফুল-কবিকাহিনী-সন্ধ্যাসংগীত-প্রভাতসংগীত-মানসী-জন্মদিনে-শেষলেখা কাব্য থেকে, শব্দতত্ত্ব-বাংলাভাষার পরিচয়-সভ্যতার সংকট থেকে। সেইসঙ্গে পড়ে নিন প্রমথ চৌধুরীর প্রবন্ধ-সংগ্রহ আর অন্নদাশঙ্কর রায়ের 'পথে-প্রবাসে'।

উৎসুক শিক্ষার্থী হিসেবে আপনি সুভাষ ভট্টাচার্যের লেখা 'বাঙালির ভাষা' বইটি থেকে ২০৩-৩১ পৃষ্ঠার 'বাংলা বানান সমস্যার সেকাল ও একাল' অংশটিও পড়ে নিতে পারেন।

একক ১১৩ ❑ বাংলা বানানের সমস্যা ও সমাধান-প্রয়াস

গঠন

১১৩.১ উদ্দেশ্য

১১৩.২ প্রস্তাবনা

১১৩.৩ মূলপাঠ ১ ঃ বানান-ভাবনার ইতিবৃত্ত

১১৩.৩.১ সারাংশ-১

১১৩.৩.২ অনুশীলনী-২

১১৩.৪ মূলপাঠ-২ ঃ বানান সমস্যা ও সমাধান-প্রয়াস (১৯২৫ থেকে ১৯৭৯)

১১৩.৪.১ সারাংশ-২

১১৩.৪.২ অনুশীলনী-২

১১৩.৫ মূলপাঠ-৩ ঃ বানান সমস্যা ও সমাধান-প্রয়াস (১৯৮২ থেকে ২০০১)

১১৩.৫.১ সারাংশ-৩

১১৩.৫.২ অনুশীলনী-৩

১১৩.৬ সহায়ক পাঠ

১১৩.১ উদ্দেশ্য

এই এককটির লক্ষ্য, বাংলা বানানের মূল সমস্যা নিয়ে গত ১২৫ বছর ধরে বাংলার বানান-ভাবুকেরা কী ধরনের ভাবনা-চিন্তা করে আসছেন, এবং সেসব সমস্যার সমাধানের কী কী উপায় তাঁরা সুপারিশ করছেন, সেসব তথ্য সম্পর্কে আপনাকে অবহিত করা। আরও লক্ষ্য—আপনি নিজেও বানান-সমস্যার বিষয়ে গুরত্ব দিয়ে ভাবতে শিখুন, সমস্যাটা কমিয়ে আনতে আপনিও আপনার লেখায় **সঠিক** বানান প্রয়োগ করতে থাকুন।

১১৩.২ প্রস্তাবনা

বাংলা বানান-ভাবনারও একটা ইতিহাস আছে এবং সে ইতিহাসের একটা বড়ো অংশ জুড়ে রয়েছে বাংলা বানানের সমস্যা আর তার সমাধান-সন্ধানের ভাবনা। এসব ভাবনা নিয়ে তুমুল তর্ক-বিতর্ক জমে উঠেছিল অন্ততপক্ষে দুবার—একবার বিশ-তিরিশের দশকে, আর-একবার আশি-নব্বই-এর দশকে। প্রথম দফার বানান-ভাবনা থেকে গড়ে উঠেছিল কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান-সংস্কার-সমিতি, ১৯৩৬-৩৭ সালে বেরিয়েছিল 'বাংলা বানানের নিয়ম' নামে বাইশ রকমের নিয়ম বেঁধে-দেওয়া একটি পুস্তিকা। দ্বিতীয় দফার বানান-বিতর্কের চূড়ান্ত পরিণাম ১৯৯৭ সালে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির উদ্যোগে 'আকাদেমি বানান অভিধান' আর 'বানানবিধি'-র প্রকাশ। বলা বাহুল্য, 'বাংলা বানানের নিয়ম' আর 'বানানবিধি' বানান-সমস্যার জটকে খানিকটা আলগা করেছে, পুরোপুরি খুলে দিতে পারে নি। সময়ের সঙ্গে তাল মিলিয়ে এ সমস্যা নতুন নতুন চেহারা নেবে, সময়ের উপযোগী সমাধান খুঁজে নেবার প্রক্রিয়াও চলতেই থাকবে। এর বিরাম নেই, অবসান নেই। বাংলা বানানের সমস্যা আর তার সমাধানের এই বিরামহীন ভাবনা আর আন্দোলনই চলতি এককের বিষয়।

১১৩.৩ মূলপাঠ-১ ঃ বানান-ভাবনার ইতিবৃত্ত

একক-১ থেকে জানলেন বাংলা লেখায় বানান-প্রয়োগের একটা মোটামুটি ইতিহাস। এ-ও জানলেন, বানান-প্রয়োগের ইতিহাসটি প্রায় হাজার বছরের। এবার আমরা ভাবতে চাই বানান নিয়ে আর-একটি ইতিহাসের কথা। সে ইতিহাস বানান-ভাবনার। বাংলা শব্দের কোন্ বানান সঠিক অথবা কোন্‌টি সঠিক নয়, একই শব্দকে নানারকম বানানের হাতছানি থেকে বাঁচিয়ে কীভাবে বানানে সমতা আনা সম্ভব, বানান-লেখার সমস্যাগুলি কী ধরনের আর এর সমাধান খুঁজে পাওয়া যাবে কোন্ পথে—এসব নিয়ে নানাজনের নানারকম বিচার বিশ্লেষণ বিতর্কের যে ধারাটি বানান-প্রয়োগের পাশাপাশি বয়ে চলেছে, তারও একটা ইতিবৃত্ত ক্রমশ তৈরি হয়ে উঠছে। এ ইতিহাসের শতবর্ষ পূর্ণ হয়েছে প্রায় ২৫ বছর আগে।

১৮৭৭ খ্রিস্টাব্দে Bengali Spoken and Written নামের এক দীর্ঘ প্রবন্ধে চলিত বাংলার বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করতে গিয়ে শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় লক্ষ করলেন—বাংলা উচ্চারণে দীর্ঘ স্বর নেই, ঞ-ণ-য-ষ নেই, ম-ফলা য-ফলা নেই, বিসর্গ নেই, অথচ বানানে এ বর্ণগুলির প্রয়োগ দিব্যি চলছে।

তখন থেকেই বানানে এসব বর্ণের প্রয়োগ নিয়ে প্রশ্ন উঠল, অন্ততপক্ষে অ-তৎসম শব্দে এসব বর্ণ বাদ দিয়ে উচ্চারণ মেনে বর্ণ-প্রয়োগের কথাও উঠল। বাংলা বানান নিয়ে ভাবনা-চিন্তার শুরু এখান থেকেই। এর পর এলেন রবীন্দ্রনাথ, ১৮৮৫ খ্রিস্টাব্দে তাঁর 'শব্দতত্ত্ব' বইখানা শুরু হল 'বাংলা উচ্চারণ' প্রবন্ধটি দিয়ে, ১৯০৪-এ তা সম্পূর্ণ হল 'ভাষার ইঙ্গিত' প্রবন্ধে। আর ১৯৩৮-৩৯-এ বেরোল তাঁর 'বাংলাভাষার পরিচয়' বইটি। ১৮৮৫ থেকে ১৯৩৯—এই ৫৪টি বছর ধরে রবীন্দ্রনাথের নানারকম সারস্বত ভাবনার অন্যতম হয়ে উঠেছিল বানান-ভাবনা।

বানান-ভাবনার ১২৫ বছরের ইতিহাসে স্মরণীয় দুটি বছর ১৯৩৭ আর ১৯৯৭। ১৯৩৭-এ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বানান-সংস্কার-সমিতি 'বাংলা বানানের নিয়ম' পুস্তিকার তৃতীয় এবং সর্বশেষ সংস্করণটি প্রকাশ করে। আর ১৯৯৭-এ পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি থেকে বের হয় 'আকাদেমি বানান অভিধান' আর 'আকাদেমি গৃহীত বানানবিধি'। অর্থাৎ, ১৮৭৭ থেকে যে ভাবনার শুরু তার একটি পরিণাম ১৯৩৭-এ। এরপর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানানবিধির প্রয়োগ-প্রচলন নিয়ে নতুন করে যেসব বিতর্ক দেখা দিল, তার পরিণাম ১৯৯৭-এ। ১৮৭৭ থেকে ১৯৩৬—'বাংলা বানানের নিয়ম' পুস্তিকা প্রকাশের আগেকার এইপর্বে বানান নিয়ে যা-কিছু ভাবনা, তার কেন্দ্রে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ, একথা বলাই বাহুল্য। অতএব, সেই ভাবনার চেহারাটাই প্রথমে প্রত্যক্ষ করার চেষ্টা করা যাক।

বাংলা উচ্চারণ নিয়ে রবীন্দ্রনাথের ভাবনা ১৮৮৫-তে লেখা 'বাংলা উচ্চারণ' প্রবন্ধ থেকেই শুরু হল এইভাবে—'বাংলায়.....কেবল একটিমাত্র শব্দের মধ্যে একটা দুষ্ট অক্ষর নিঃশব্দ পদসঞ্চারে প্রবেশ করিয়াছে, তীক্ষ্ণ সঙিন ঘাড়ে করিয়া শিশুদিগকে ভয় দেখাইতেছে, সেটা আর কেহ নয়—গবর্ণমেণ্ট শব্দের মূর্ধন্য ণ। ওটা বিদেশের আমদানি নতুন আসিয়াছে, বেলা থাকিতে ওটাকে বিদায় করা ভালো।' তবে বাংলা বানান নিয়ে তাঁর সুনির্দিষ্ট ভাবনা শুরু হয় ১৯০০ সালে লেখা 'উপসর্গ-সমালোচনা' প্রবন্ধে, 'নিশ্বাস' শব্দে বিসর্গের থাকা বা না-থাকা নিয়ে তাঁর মন্তব্য থেকে—'স যখন কোনো ব্যঞ্জনবর্ণের পূর্ব যুক্ত হইয়া থাকে তখন তৎপূর্বে বিসর্গ লিখিলেও চলে, না লিখিলেও চলে; যথা নিস্পন্দ, নিস্পৃহ, প্রাতস্নান।' প্রায় একই সময়ে লেখা আর-একটি প্রবন্ধে (বিবিধ/শব্দতত্ত্ব) রবীন্দ্রনাথ লিখলেন—

'বানান লইয়া কয়েকটি কথা বলিতে ইচ্ছা করি। রাঙা, ভাঙা, ডাঙা, আঙুল প্রভৃতি শব্দ ঙগ অক্ষরযোগে লেখা নিতান্তই ধ্বনিসংগতিবিরুদ্ধ। গঙ্গা শব্দের সহিত রাঙা, তুঙ্গ শব্দের সহিত ঢ্যাঙা তুলনা করিলে একথা স্পষ্ট হইবে। মূল শব্দটিকে স্মরণ করাইবার জন্য ধ্বনির সহিত বানানের বিরোধ ঘটানো কর্তব্য নহে। সে নিয়ম মানিতে হইলে চাঁদকে চান্দ, পাঁক-কে পঙ্ক, কুমার-কে কুম্ভার লিখিতে হয়। অনেকে মূলশব্দের সাদৃশ্যরক্ষার জন্য সোনা-কে সোণা, কান-কে কাণ বানান করেন, অথচ

EBG (P-8 M 30-33)—8

শ্রবণশব্দজ শোনা-কে শোণা লেখেন না। যে-সকল সংস্কৃত শব্দ অপভ্রংশের নিয়মে পুরা বাংলা হইয়া গেছে সেগুলির ধ্বনি-অনুযায়িক বানান হওয়া উচিত। প্রাকৃতভাষার বানান ইহার উদাহরণস্থল। জোড়া, জোয়ান, জাঁতা, কাজ প্রভৃতি শব্দে আমরা স্বাভাবিক বানান গ্রহণ করিয়াছি, অথচ অন্য অনেক স্থলে করি নাই।'

দেখা গেল, বাংলা বানানে ঙ্গ-ঙ ণ-ন আর জ-য বর্ণের প্রয়োগে বানান-লেখকদের অস্থিরতা রবীন্দ্রনাথ লক্ষ করেছিলেন বিশ শতক শুরু হতে-না-হতেই, এবং তা নিয়ে প্রশ্নও তুলেছেন সরাসরি। এসব প্রশ্ন আর দ্বিধার মধ্য থেকে বেরিয়ে আসার জন্য রবীন্দ্রনাথের আগ্রহেই ১৯৩৫ সালে গঠন হল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বানান-সংস্কার-সমিতির, ১৯৩৬-এ-বেরিয়ে এল বাংলা বানানের ২২-দফা নিয়ম। এর আগে যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি, সুধীর মিত্র, জ্যোতির্ময় ঘোষ থেকে শুরু করে ক্রমশ বানান-ভাবনার সঙ্গে যুক্ত হলেন সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রমথ চৌধুরী, বিজনবিহারী ভট্টাচার্য, প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ এবং পরে ডক্টর মুহম্মদ শহিদুল্লাহ, দেবপ্রসাদ ঘোষের মতো বিদগ্ধ জন।

এইরকম বিশিষ্ট পণ্ডিতজনের বিতর্কে বাংলা বানান নিয়ে বাঙালির ভাবনা যথেষ্ট উচ্চতা পেয়েছিল। এরই রেশ টেনে চল্লিশ থেকে আশির দশকের মধ্যে উল্লেখযোগ্য কয়েকখানি বই-ও লেখা হয়ে গেল বাংলা বানান নিয়ে। অধ্যক্ষ দেবপ্রসাদ ঘোষ নিজেই লিখলেন 'বাঙ্গালা ভাষা ও বাণান' (১৯৪০), মণীন্দ্রকুমার ঘোষ লিখলেন 'বাংলা বানান' (১৯৭৮), বের হল অধ্যাপক পরেশচন্দ্র মজুমদারের 'বাঙলা বানানবিধি' (১৯৮২) আর অধ্যাপক পবিত্র সরকারের 'বাংলা বানান সংস্কার : সমস্যা ও সম্ভাবনা (১৯৮৭)। ১৯৩৬-৩৭ এর 'বাংলা বানানের নিয়ম' নতুন করে বিতর্কের ঢেউ তুলল, এবং ঢেউয়ে ঢেউয়ে বানান-ভাবনা ভেসে এল আশি-নব্বই-এর দশক পর্যন্ত। এর মাঝখানে ষাটের দশকে যুক্তাক্ষর ভেঙে দেবার বিষয়টি নিয়ে বিতর্ক তৈরি করেছিল আনন্দবাজার পত্রিকা। ১৯৭৮ সালে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আর-একটি বানান-সমিতি গঠন করল, তবে তা বিশেষ কোনও কাজে লাগেনি। অবশেষে ১৯৮৫-তে বাংলা আকাদেমির প্রতিষ্ঠা এবং এই প্রতিষ্ঠানকে ঘিরে চলল আরও উত্তেজক আরও প্রসারিত তর্ক-বিতর্ক, দুই বাংলার বানান-ভাবুকদের অভিজ্ঞতা আর অভিমতের বিনিময়ে শেষ পর্যন্ত একটা কালানুগ পরিণাম পেল সেসব বিতর্ক। ১৯৯৭ সালে বেরিয়ে এল আকাদেমি গৃহীত ২০-দফা বানানবিধি, সেইসঙ্গে প্রায় ১৫,০০০ শব্দের একখানি বানান অভিধান। ক্রমশ সর্বশেষ বানান-বিবেচনার কিছু কিছু চিহ্ন নিয়ে ২০০১ সালের ডিসেম্বরে বের হল তার তৃতীয় সংস্করণ। এবার এর শব্দ-সংখ্যা বেড়ে দাঁড়াল প্রায় তিনগুণ (৪৩,০০০-এর মতো)।

এমনি করে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় আনন্দবাজার পত্রিকা পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির মতো

প্রতিষ্ঠান আর শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়-রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর থেকে শুরু করে আজকের বানান-ভাবুকেরা পর্যন্ত বাংলা বানানে সমতা 'আর সরলতা বিধানের উপায় সন্ধান করার পথে যেভাবে ভেবে চলেছেন, তারও একটা ইতিহাস তৈরি হয়ে গেল এরই মধ্যে, সে ইতিহাস প্রায় ১২৫ বছরের (১৮৭৭ থেকে ২০০১)।

১১৩.৩.১ সারাংশ—১

বাংলা বানানের সমস্যা, তার সমাধানের উপায়, বানানে সমতা আনার পদ্ধতি—এসব নিয়ে বানান-ভাবনার একটি ইতিহাস তৈরি হয়ে উঠছে প্রায় ১২৫ বছর ধরে। এ ইতিহাসের এক প্রান্তে শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায়, অন্য প্রান্তে একালের বানান-ভাবুকেরা। ১৮৭৭ সালে শ্যামাচরণ গঙ্গোপাধ্যায় বাংলা বর্ণ আর উচ্চারণের অসংগতি নিয়ে প্রথম প্রশ্ন তুললেন। ১৮৮৫ সালের 'বাংলা উচ্চারণ' আর ১৯০০ সালের 'উপসর্গ-সমালোচনা' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথও উত্থাপন করলেন এই ধরনের আরও কিছু অসংগতির কথা। ক্রমশ বানান নিয়ে এসব ভাবনায় অংশ নিতে থাকলেন যোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি-সুধীর মিত্র-জ্যোতির্ময় ঘোষ-সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়-প্রমথ চৌধুরী-বিজনবিহারী ভট্টাচার্য-প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ-মুহম্মদ-শহিদুল্লাহ-দেবপ্রসাদ ঘোষের মতো বিদগ্ধ পণ্ডিত। ১৯৩৬-এ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় বানান-সংস্কার-সমিতির তত্ত্বাবধানে বাংলা বানানের ২২-দফা নিয়ম বেরোনোর আগে আর পরে বানান নিয়ে নানারকম বিতর্কের অংশীদার এই ভাবুকেরা।

চল্লিশ থেকে আশির দশকে বের হল অধ্যক্ষ দেবপ্রসাদ ঘোষের 'বাঙ্গালা ভাষা ও বাণান', মণীন্দ্রকুমার ঘোষের 'বাংলা বানান', অধ্যাপক পরেশচন্দ্র মজুমদারের 'বাঙলা বানানবিধি' আর অধ্যাপক পবিত্র সরকারের 'বাংলা বানান সংস্কার, সমস্যা ও সম্ভাবনা'—বানান-ভাবনা নিয়ে এই ধরনের কয়েকখানি বই। ১৯৮৫-তে বাংলা আকাদেমির প্রতিষ্ঠা, শুরু হল দুই বাংলার বানান-ভাবুকদের নানারকম বিতর্ক-বিবেচনা। ১৯৯৭ সালে বের হল 'আকাদেমি গৃহীত বানানবিধি' আর 'আকাদেমি বানান অভিধান।' ২০০১-এর ডিসেম্বরে প্রকাশ পেল এর তৃতীয় সংস্করণ—বাংলা বানান-বিবেচনার সর্বশেষ চিহ্ন নিয়ে। এমনি করে তৈরি হতে চলেছে বাংলা বানান-ভাবনার ১২৫ বছরের ইতিহাস।

১১৩.৩.২ অনুশীলনী—১

১. বাংলা বানান নিয়ে শতাধিক বছরের ভাবনা-চিন্তার ইতিহাসটি সংক্ষেপে বিবৃত করুন।

২. বাংলা বানান নিয়ে কীভাবে ভাবনা শুরু হয়েছিল, লিখুন।

৩. বাংলা বানান নিয়ে রবীন্দ্রনাথের ভাবনার রূপরেখাটি তৈরি করুন।

৪. ১৯৩৫ থেকে ১৯৮৫—এই পঞ্চাশ বছরে বাংলা বানান নিয়ে বাঙালির ভাবনা-চিন্তার প্রতিফলন কীভাবে ঘটেছে, সংক্ষেপে বিবৃত করুন।

১১৩.৪ মূলপাঠ—২ ঃ বাংলা বানান-সমস্যা ও সমাধান-প্রয়াস (১৯২৫ থেকে ১৯৭৯)

গত শতকের বিশের দশক থেকে শুরু করে সত্তরের দশক, অথবা আরও নির্দিষ্ট করে ১৯২৫ থেকে ১৯৭৯—পঞ্চাশ বছরেরও বেশি সময় ধরে বাংলা বানানের সমস্যা আর তার সমাধান-সূত্র নিয়ে যেসব ভাবনা-চিন্তা হয়েছে, তা থেকে কিছু কিছু অংশ বাছাই করে চলতি এককের এই মূলপাঠে তুলে ধরা যাক।

১. ১৪ এপ্রিল ১৯৩৬-এর আনন্দবাজার পত্রিকায় লেখা 'বাংলা বানান সমস্যা' প্রবন্ধে অধ্যাপক বিজনবিহারী ভট্টাচার্য জানিয়েছিলেন—'বাংলা বানান সমস্যা আজিকার সমস্যা নয়। বহুদিন পূর্ব্ব হইতেই এ আলোচনার সূত্রপাত হইয়াছে। অধ্যাপক বিজয়চন্দ্র মজুমদার, কবি রবীন্দ্রনাথ, অধ্যাপক যোগেশচন্দ্র বিদ্যানিধি, স্বর্গীয় ললিতকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, চলন্তিকা-কার রাজশেখর বসু প্রমুখ পণ্ডিতগণ কেহ প্রত্যক্ষ এবং কেহ বা পরোক্ষভাবে বাঙ্গালার এই গুরুতর সমস্যা লইয়া আলোচনা করিয়াছেন। বৎসর দশেক পূর্বে শ্রীযুক্ত প্রশান্তকুমার মহলানবিশ মহাশয় কয়েকজন পণ্ডিতের সাহায্যে একটি খসড়া বানান পদ্ধতি প্রস্তুত করিয়াছিলেন।'

বিজনবাবুর দেওয়া তথ্য থেকে আন্দাজ করা যায়, বাংলা বানানের বেশ কিছু জটিল সমস্যা তখনও ছিল, তার আগেও ছিল, এবং তার সমাধানের চেষ্টাও অনেকদিন ধরেই চলছিল। বিজনবাবুর এই লেখার 'বছর দশেক পূর্ব্বে' অর্থাৎ ডিসেম্বর ১৯২৫-এর (অগ্রহায়ণ ১৩৩২) 'প্রবাসী' পত্রিকায় অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ প্রকাশ করেছিলেন 'চলতি ভাষার বানান' নামে ১১-দফা বিধান নিয়ে তৈরি একটি খসড়া বানানপদ্ধতি। বানান-সমস্যা সমাধানের জন্য এটাই প্রথম সক্রিয় উদ্যোগ। এ উদ্যোগে সামিল ছিলেন সুনীতিকুমার

চট্টোপাধ্যায় আর চারুচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, এ পদ্ধতি অনুমোদন করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ নিজে। সমাধানের মূল সূত্রগুলি এইরকম—

ক. তৎসম শব্দের বানানে প্রচলিত বানান বজায় থাকবে।

খ. তদ্ভব ও বিদেশি শব্দের বানান যথাসম্ভব উচ্চারণ-অনুযায়ী হবে।

গ. সাধুভাষার ক্রিয়ায় প্রচলিত বানান আর চলতিভাষার ক্রিয়ায় উচ্চারণ-অনুযায়ী বানান হবে।

২. সেপ্টেম্বর ১৯৩১-এ (ভাদ্র ১৩৩৮) রবীন্দ্রনাথকে লেখা শ্রীমণীন্দ্রকুমার ঘোষের এক চিঠিতে রবীন্দ্রনাথেরই বানান প্রয়োগে কিছু কিছু বিশৃঙ্খলা দেখবার চেষ্টা আছে—

ক. 'বস্তুতঃ অন্ততঃ প্রথমতঃ ইতস্ততঃ প্রায়শঃ প্রভৃতি শব্দগুলিতে আপনি বিসর্গ যোজনা করেন না; কিন্তু 'ক্রমশঃ'র ডাম্‌বেল্‌টা (অর্থাৎ 'ঃ') 'বিচিত্রা'র পৃষ্ঠায়-ও ঝুলিতেছে, আপনার লেখার নীচেই।'

খ. 'ও-কার ব্যবহারে আপনার লেখায় কোনো শৃঙ্খলা আবিষ্কার করিতে পারিতেছি না। হ'ল, ছিল, কিন্তু—এলো।'

গ. 'আপনার শব্দতত্ত্বে আপনি বাংলায় কোথা-ও দীর্ঘ-ঈ স্বীকার করেন নাই, এমনকি স্ত্রীলিঙ্গেও না; সর্ব্বত্রই হ্রস্ব-ই—মাসি, খুড়ি, বুড়ি, মালিনি......কিন্তু আপনার (আধুনিক) লেখায়ই বহুস্থলে, 'কালী (Ink) , পাখী, গাড়ী, আমদানী পাইয়াছি;

ধ্বনি আর বর্ণের অসংগতি যে বানানের এই বিশৃঙ্খলার জন্য দায়ী, একথাও মণীন্দ্রবাবু এ চিঠিতে উল্লেখ করেছেন—

ক. 'ভাষার অসংখ্য উচ্চারণ, কিন্তু বাংলাভাষায় তাহা প্রকাশ করিবার জন্য তার অর্দ্ধেক চিহ্ন বা অক্ষর নাই।'

খ. 'শব্দতত্ত্বে আপনি জ-য, ণ-ন, শ-ষ-স প্রভৃতি সম্পর্কে প্রসঙ্গ তুলিয়াছেন মাত্র। বিচার বা মীমাংসা করে নাই।'

রবীন্দ্রনাথ এর উত্তরে জানান—

ক. 'চলতি বাংলার বানান সম্বন্ধে প্রশান্ত বিধান নিয়েছিলেন সুনীতির কাছ থেকে। নিয়মগুলো মনে রাখতে পারি নে, অন্যমনস্ক হয়ে হাজারবার লঙ্ঘন করি। সেইজন্য অসঙ্গতি সর্ব্বদাই দেখা যায়।'

খ. ‘যেহেতু বাংলা অক্ষরে বিদেশী কথা সর্ব্বদাই লিখতে হচ্ছে সেইজন্যে অনেক নতুন অক্ষর রচনা করা আবশ্যক।’

৩. মার্চ ১৯৩৪-এর (ফাল্গুন ১৩৪০) ‘বিচিত্রা’-য় লেখা ‘বাংলাভাষার বানান ও মুদ্রণ’ প্রবন্ধে সুধীর মিত্র যেকোনো ভাষার বানান-সমস্যার মূল কারণ হিসেবে দায়ী করেন বর্ণ-ধ্বনির অসমতাকে—‘হয় একই বর্ণের সাহায্যে বিভিন্ন ধ্বনিকে রূপ দিতে হয়, আর না হয় কয়েকটি বর্ণ বিভিন্ন স্থলে একই ধ্বনির বাহন হইয়া থাকে—ফলে, বানান প্রক্রিয়া ভাষায় জটিলতর হইয়া উঠে।’ আর, বাংলা বানানের জটিল হয়ে ওঠার কারণ তাঁর কথায় ‘বিভিন্ন বর্ণের সাহায্যে একই ধ্বনি’-র উচ্চারণ। দৃষ্টান্ত হিসেবে তাঁর উল্লেখ—ণ-ন শ-ষ-স ই-ঈ উ-ঊ জ-য অন্তস্থ ব-ফলার ব।

অতএব, বানান-সমস্যার সমাধানের জন্য সুধীরবাবুর সুপারিশ এইরকম—‘উপরিউক্ত প্রত্যেকটি জোড়া হইতে এক একটি বর্ণ রাখিয়া অতিরিক্তগুলিকে বাদ দিতে পারিলে বানানসমস্যা অনেকাংশে সহজ হইয়া উঠে। ....আমাদের মনে হয়, উপরিউক্ত বর্ণগুলির মধ্য হইতে ন স ই উ এবং জ-কে রাখিয়া বাকীগুলিকে........বর্ণমালা হইতে বাদ দেওয়া যাইতে পারে।’

বর্ণ-ধ্বনির অসমতা থেকে তৈরি বানান-সমস্যা রবীন্দ্রনাথ-শরৎচন্দ্রের মতো বড়ো লেখককেও কীভাবে জর্জরিত করেছে, তার কিছু কিছু দৃষ্টান্ত সুধীরবাবু তুলে ধরেছেন—

ক. ‘রবীন্দ্রনাথ তাঁহার ‘শেষের কবিতা’য় কয়েকটি বানান এইরূপ করিয়াছেন; যথা—যতো ততো কতো ছিলো গেলো হলো করবো বলবো ইত্যাদি—অথচ তৎপরবর্তী বহু রচনায় দেখিলাম........‘হলো’র পরিবর্তে ‘হোলো’, ‘ছিলো’র পরিবর্তে ‘ছিল’, ‘কতো’র পরিবর্তে ‘কত’; ‘করবো’-র স্থলে ‘করব’ ইত্যাদি এইরূপ বহু বানানের অসামঞ্জস্য ঘটিয়াছে।’

খ. ‘রবীন্দ্রনাথ শরৎচন্দ্র বুদ্ধদেব বসু........অনেক সময় দেশজ ও বৈদেশিক শব্দে স্ব স্ব রুচি অনুযায়ী বানান চালাইয়া থাকেন—কেহ কেহ লেখেন—খুসী গাড়ী সিল্ক শাড়ী জিনিস মুখোস........কেহ কেহ লেখেন—খুশী গাড়ি শিল্ক সাড়ী জিনিষ মুখোশ’......

৪. ৮ মার্চ ১৯৩৬-এর আনন্দবাজার পত্রিকায় ‘বাংলা বানান সমস্যা’ প্রবন্ধে অধ্যাপক জ্যোতির্ময় ঘোষ (ছদ্মনাম ‘ভাস্কর’) লিখলেন ঃ ‘বাংলাভাষায় বিভিন্ন লেখক যাহা লিখিয়া থাকেন

এবং একই লেখক বিভিন্ন সময়ে যাহা লেখেন, তাহার বানান ঠিক একরূপ নহে। ইহার অনেকগুলি কারণ আছে। প্রথমতঃ বহু শব্দ সংস্কৃত হইতে বাংলায় আসিয়াছে, সংস্কৃত ব্যাকরণের দুরূহতার জন্য এই সকল শব্দের শুদ্ধ বানান সংস্কৃতাভিজ্ঞ ব্যক্তি ব্যতীত অন্যের নিকট অতিশয় কঠিন। বানান শুদ্ধ না হইলে অশুদ্ধতা যে বহুপ্রকার হইবে, তাহাতে আর আশ্চর্য কি? দ্বিতীয়তঃ প্রায় সমান উচ্চারণযুক্ত বর্ণের বাহুল্যও একটি প্রধান কারণ। শ, ষ,স,ণ,ন,ই,ঈ প্রভৃতির পার্থক্যরক্ষা সংস্কৃতানভিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে সহজ নহে। তৃতীয়তঃ সংস্কৃত নয় এরূপ বহু এদেশীয় ও বিদেশীয় শব্দ ভাষায় প্রবেশলাভ করিয়াছে, তাহাদের বানান সম্বন্ধে কোন ব্যাকরণ রচিত হয় নাই, সুতরাং যখন যাঁহার যাহা খুসী, তখন তিনি তাহাই লিখিতেছেন। ....এরূপ বিশৃঙ্খলা ভাষা ও সাহিত্যের উন্নতির পক্ষে বাঞ্ছনীয় নহে।'

অধ্যাপক ঘোষ এখানে বাংলা বানানের দু-রকম সমস্যার কথা জানালেন—তৎসম আর অ-তৎসম শব্দ-বানানের সমস্যা। তৎসম এসেছে সরাসরি সংস্কৃত চেহারা নিয়ে। সংস্কৃত ব্যাকরণের সূত্র এসব বানানকে নিয়ন্ত্রণ করে। সংস্কৃত বানান যার অজানা, তৎসম বানানে তার ভুল হবেই। আর, এ ভুল নানারকম চেহারায় লেখা হতে থাকবে। কেননা, বাংলায় একই ধ্বনির জন্য তৈরি রয়েছে একাধিক বর্ণ—শ-ষ-স ণ-ন ই-ঈ এইরকম। 'সবিশেষ' লিখতে গিয়ে লেখা হতে পারে ষবিসেশ-শবিষেস-সবিষেশ, 'বর্ননা' অথবা 'বর্ণনা' এই নিয়ে দ্বিধা, 'পৃথিবী' আর 'পৃথীবী'-র মধ্যে বিভ্রান্তি। অ-তৎসম শব্দের একটি ভাগ এসেছে সংস্কৃত থেকে চেহারা বদল করে (অর্ধ-তৎসম আর তদ্ভব), আর একটি ভাগ এসেছে এদেশেরই কোনো ভাষামূল থেকে (দেশি), তৃতীয় ভাগ এসেছে বিদেশের কোনো উৎস থেকে (বিদেশি)। এসব শব্দ-বানান নিয়ন্ত্রণ করার মতো কোনো ব্যাকরণ বা সূত্র নেই। অতএব, যেমন-খুশি বানানের যথেচ্ছাচার চলছে অ-তৎসম বানানে। তৎসম শব্দ-বানানে বিভ্রান্তি আর অ-তৎসম শব্দ-বানানে যথেচ্ছার—মূলত এই দুটি সমস্যার উল্লেখ এখান থেকে পাওয়া গেল।

সমস্যা-দুটির সমাধান কী হতে পারে, এ নিয়ে দীর্ঘ আলোচনার পর শেষ পর্যন্ত অধ্যাপক ঘোষের মনে হয়েছে—'একখানি মাঝারি আকারের অভিধান প্রণয়নই এ সমস্যার একমাত্র সমাধান....। রাজশেখর বাবুর 'চলন্তিকা' বা ঐ প্রকার কোন একখানি অভিধান অবলম্বন করিয়া এই কার্য্য আরম্ভ হইতে পারে। প্রত্যেকটি শব্দ ধরিয়া তাহার বানান এবং লিখন-রীতি বাঁধিয়া দিতে হইবে।' এর সঙ্গে আর-একটি পররামর্শ তিনি যোগ করেছেন—'এইরূপ

অভিধান প্রণীত হইলে, তাহারও সংস্কারের আবশ্যক হইবে। দশবছর অন্তর একবার সংস্কার করিলেই চলিতে পারে।'

কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান-সংস্কার-সমিতির অন্যতম সদস্য অধ্যাপক বিজনবিহারী ভট্টাচার্য ১৪ এপ্রিল ১৯৩৬-এর আনন্দবাজার পত্রিকায় 'বাংলা বানান সমস্যা' প্রবন্ধে অধ্যাপক জ্যোতির্ময় ঘোষের প্রস্তাব সমর্থন করে লিখলেন—'তিনি যে মাঝারি আকারের একটি অভিধান রচনার প্রস্তাব করিয়াছেন তাহাই এ সমস্যা সমাধানের শ্রেষ্ঠ উপায় বলিয়া মনে হয়।'

৫. ১৩৩৯-এর 'বিচিত্রা'-য় রবীন্দ্রনাথ বর্ণ-ধ্বনির অনুপাতের সমস্যা নিয়ে বলেছিলেন—'তিনটে 'শ', দুটো 'ন' ও দুটো 'জ' শিশুদিগকে বিপাকে ফেলিয়া থাকে........এ ছাড়া দুটো 'ব'-য়ের মধ্যে একটা ব কোনো কাজে লাগে না। ঋ, ৯, ঙ, ঞ এগুলো কেবল সং সাজিয়া আছে। ....সকলের চেয়ে কষ্ট দেয় হ্রস্বদীর্ঘ স্বর।'

এই সমস্যার সমাধান নির্দেশ করতে গিয়ে চৈত্র ১৩৪২-এর 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার 'চলিত ভাষার সংস্কার' প্রবন্ধে রাধারানি দেবী-নরেন্দ্র দেব লিখলেন—'চলিত ভাষার সংস্কার তথা বানান নিরূপণে নিযুক্ত হয়েছেন যাঁরা, তাঁদের সর্ব্বাগ্রে প্রয়োজন বাংলা বর্ণমালা সংক্ষেপ করা। কারণ, বানানের ভিত্তি বর্ণমালার উপরই নির্ভর করে।' বর্ণ-সংক্ষেপের নমুনা হিসেবে এঁরা 'বর্ণপরিচয়'-এর মোট ৫৪টি বর্ণ থেকে বাছাই করলেন ৩৬টি (স্বরবর্ণ ৬, ব্যঞ্জনবর্ণ ৩০), ছাঁটাই করলেন ৩০টি যুক্তবর্ণ, ২১টি স্বর-ব্যঞ্জন-চিহ্নের বদলে ১০টি চিহ্ন বরাদ্দ করলেন।

৬. এরপর ৮মে ১৯৩৬-এ 'বাংলা বানানের নিয়ম' পুস্তিকার ভূমিকায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তখনকার উপাচার্য শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় লিখলেন—

'বাংলাভাষায় প্রচলিত শব্দসমূহের মধ্যে যেগুলি সংস্কৃত ভাষা হইতে অপরিবর্তিতভাবে আসিয়াছে তাহাদের বানান প্রায় সুনির্দিষ্ট। কিন্তু যেসকল শব্দ সংস্কৃত নহে, অর্থাৎ যেগুলি দেশজ বা অজ্ঞাতমূল, বিদেশাগত, অথবা সংস্কৃত বা বিদেশী শব্দের অপভ্রংশ তাহাদের বানানে বহুস্থলে বিভিন্নতা দেখা যায়। ইহার ফলে লেখক, পাঠক, শিক্ষক ও ছাত্র—সকলকেই কিছু কিছু অসুবিধা ভোগ করিতে হয়।' দেখা যাচ্ছে, অধ্যাপক জ্যোতির্ময় ঘোষ বাংলা বানানের যে মূল সমস্যার উল্লেখ করেছিলেন, উপাচার্যের কণ্ঠে শুনি তারই প্রতিধ্বনি।

এই সমস্যার সমাধান-সূত্র বের করার দায়িত্ব দেওয়া হল বানান-সংস্কার-সমিতিকে, যার কাজ হবে উপাচার্য মুখোপাধ্যায়ের কথায়—'যে সকল বানানের মধ্যে ঐক্য নাই সেসকল যথাসম্ভব নির্দিষ্ট করা এবং যদি বাধা না থাকে তবে কোন কোন স্থলে প্রচলিত বানান সংস্কার করা।'

বানান-সংস্কার-সমিতির প্রতিবেদনে বলা হল ঃ

১) বানান যথাসম্ভব সরল উচ্চারণসূচক হওয়া বাঞ্ছনীয়।

২) উচ্চারণ বোঝানোর জন্য অক্ষর বা চিহ্নের বাহুল্য, এবং প্রচলিত রীতির অত্যধিক পরিবর্তন উচিত নয়। কেননা, প্রচলিত শব্দের উচ্চারণ অর্থ থেকেই বুঝে নেওয়া সম্ভব। গণ-বন-ঘন-অশ্ব-হ্রস্ব একদা-একটা চেনা-দেখা—এসব শব্দের বানানে আর উচ্চারণে মিল না থাকলেও বানান নিয়ে সমস্যা নেই।

৩) নবাগত বা অল্প-পরিচিত বিদেশি শব্দের বাংলা রূপ এখনও নির্ধারিত হয় নি। এসব শব্দের বানানের সরল সহজ নিয়ম গঠন করা আবশ্যক।

৪) সংস্কৃত শব্দের বানানে হস্তক্ষেপ ঠিক নয়।

৫) কেবল বর্তমান লেখক-পাঠকের কথা নয়, ভবিষ্যৎ শিক্ষার্থীদের সুবিধার কথা ভেবে নিয়ম গঠন করা আবশ্যক।

৬) শব্দকোষ ভিন্ন বাংলা শব্দের বানান নির্দেশ অসম্ভব।

৭) ভাদ্র ১৩৪৩-এর 'ভারতবর্ষ' পত্রিকার 'বাংলা বানানের নিয়ম' প্রবন্ধে শ্রীগোবর্ধনদাস শাস্ত্রী তিনটি বানান-সমস্যার উল্লেখ করলেন—

১) একই উচ্চারণের অর্থভেদে নানাপ্রকারের বানান। যথা—বিনা-বীণা দুর-শূর কৃত-ক্রীত বৈ-বই-শণ-সন বিশ-বিষ শাল-সাল।

২) একই বানানের অর্থভেদে বিভিন্ন প্রকারের উচ্চারণ। যথা—বল ভাল কাল মত করান।

৩) একই বর্ণের শব্দভেদে বিভিন্ন প্রকারের উচ্চারণ। যথা—মোট-ছোট, গরিব-করিব।

তিনটি সমস্যাই মূলত বর্ণ-ধ্বনির অনুপাতের সমস্যা। প্রথমটিতে একই ধ্বনির জন্য একাধিক বর্ণ, দ্বিতীয় আর তৃতীয়টিতে একই বর্ণের উচ্চারণে একাধিক ধ্বনি। প্রথম সমস্যাটি দূর হতে পারে একটি বর্ণ রেখে বাকি বর্ণ ছাঁটাই করে, অথবা প্রতিটি পৃথক বর্ণের সংস্কৃত ব্যাকরণসম্মত উচ্চারণ ঠিক ঠিক শিখে নিয়ে। যতদিন এর কোনওটিই

কার্যকর হচ্ছে না, ততদিন সমস্যাটি সহ্য করতে পরামর্শ দিচ্ছেন লেখক। দ্বিতীয় আর তৃতীয়টি আসলে শব্দশেষে হস্-অ-ও উচ্চারণের সমস্যা। লেখকের মতে এর সমাধান হতে পারে এইভাবে ঃ

১) হ এবং যুক্তবর্ণ ছাড়া অন্য কোনওখানেই শেষের অ-কার উচ্চারিত হবে না, অর্থাৎ এসব ক্ষেত্রে শব্দশেষে হস্ উচ্চারণ হবে বল্-ভাল্-কাল্-মত্-করান্-মোট্-গরিব্।

২) হ এবং যুক্তবর্ণ ছাড়া অন্য কোনওখানে শেষের অ-কার উচ্চারণ করতে হলে শেষে ও-কার দিয়ে লিখতে হবে। অর্থাৎ, বানানে বলো-ভালো-কালো-মতো-করানো-ছোটো-করিবো লিখলে তবেই তার উচ্চারণ হবে বল-ভাল-কাল-মত-করান-ছোট-করিব।

৩) শব্দশেষে হ এবং যুক্তবর্ণ থাকলে তার সঙ্গে স্বাভাবিকভাবেই অ-এর উচ্চারণ হবে (দেহ-অহরহ-রক্ত-কাণ্ড-গঞ্জ)। তবে অ-এর উচ্চারণ না চাইলে বানানে হস্‌চিহ্ন দিতে হবে (বাদশাহ্ আর্ট্ বণ্ড্ স্পঞ্জ্)।

৮. অগ্রহায়ণ, ১৩৪৩-এর 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় লেখা 'বাঙ্গালা বানান-সমস্যা' প্রবন্ধে মুহম্মদ শহিদুল্লাহ বর্ণ-ধ্বনির অনুপাতের সমস্যাটি উদাহরণসহ তুলে ধরলেন এইভাবে ঃ

ক. 'সংস্কৃতের বর্ণমালা বাঙ্গালায় চালাইতে গিয়া, আমরা সকল স্থানে ধ্বনিগত বানান রাখিতে পারি নাই এবং কোথায় কোথায় অনর্থক জটিলতা সৃষ্টি করিয়াছি।......একই এ-কার দ্বারা দুই পৃথক্ ধ্বনি সূচিত করিতেছি—এক-এস কেন-বেশ। অন্যদিকে জল-যম শব্দে জ-য; গণ-বন শব্দে ণ-ন, বিশ-মেষ-দাস শব্দে শ-ষ-স-এর একই ধ্বনি, অথচ আমরা সংস্কৃতের অনুসরণে বিভিন্ন বর্ণদ্বারা এই শব্দগুলির বানান করি।'

খ. 'অনেক সংস্কৃত শব্দের বাঙ্গালায় উচ্চারণ বিকৃতি ঘটিয়াছে; কিন্তু আমরা সংস্কৃত বানানের ফাঁক দিয়া আমাদের ভ্রষ্ট উচ্চারণ ঢাকিয়া রাখি। উদাহরণ......জ্ঞান ক্ষার লক্ষ্মণ পদ্ম।'

গ. 'যে সকল সংস্কৃতভব শব্দ বাঙ্গালায় আছে, তাহাদের বানান সম্বন্ধে নানা মুনির নানা মত দেখা যায়। কেহ লিখেন কাণ, কেহ, কান; কেহ সোণা, কেহ সোনা; কেহ কাজ, কেহ কার্য........।'

ঘ. 'দেশী ও বিদেশী শব্দেও একরূপ বানান নাই। কেহ বানান করেন জিনিষ, কেহ জিনিস; কেহ সহর, কেহ শহর; কেহ খ্রিষ্ট, কেহ খ্রীষ্ট, আবার কেহ লিখেন খৃষ্ট।'

ড. শহিদুল্লাহ দেখালেন, এক-এস কেন-বেশ শব্দ-বানানে একই এ-কার দিয়ে দুটি পৃথক ধ্বনি নির্দেশ করা হচ্ছে। অর্থাৎ বর্ণ-ধ্বনির অনুপাত এখানে ১:২। অন্যদিকে

জ-য দুটি বর্ণ দিয়ে একই ধ্বনি বোঝানো হচ্ছে। অর্থাৎ, জল-যম বানানে এই অনুপাত ২:১, গণ-বন বানানেও ২:১, বিশ-মেষ-দাস বানানে ৩:১। তাঁর মতে, তৎসম শব্দের (জ্ঞান-ক্ষার-লক্ষ্মণ-পদ্ম) উচ্চারণ বদলে গেছে, অথচ বানান সংস্কৃত ব্যাকরণকেই মেনে চলছে। সংস্কৃতভব বা তদ্ভব শব্দের বানানে চলছে যথেচ্ছাচার—কাণ-কান সোণা-সোনা কাজ-কায। এটাও মূলত বর্ণ-ধ্বনির অনুপাতের সমস্যা (ণ-ন : ন, জ-য : জ)। একই সমস্যা দেশি-বিদেশি শব্দের বানানেও—জিনিষ-জিনিস (ষ-স : ষ), সহর-শহর (স-শ : শ), খ্রিষ্ট-খ্রীষ্ট-খৃষ্ট (ই-ঈ : ই, রি-রী-ঋ : রি)।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'বাংলা বানানের নিয়ম' পুস্তিকাটিতে দেওয়া সমাধান-সূত্রগুলি ড. শহিদুল্লাহ সাধারণভাবে সমর্থন করলেন। তবে সেইসঙ্গে নির্দিষ্ট প্রস্তাবও তার পাশাপাশি রাখলেন। এ বিষয়ে তাঁর মতামত এইরকম ঃ

১) কোনও শব্দ-বানানেই বিকল্প থাকবে না, প্রতিটি শব্দের বানান হবে একটিমাত্র নির্দিষ্ট বানান।

২) তৎসম শব্দ-বানান উচ্চারণ মেনে হওয়াই উচিত, তবে বাস্তব কারণে কার্যত সংস্কৃত বানানকেই মেনে চলতে হবে।

৩) অ-তৎসম শব্দ-বানানে কেবল ই উ ন থাকবে (পাখি-উনিশ-কান), শ-ষ-স-এর বদলে কেবল শ থাকবে, দুটি-একটি বানানে বড়োজোর স-ও থাকবে (আশে-বশে-সোয়)। তবে, বিদেশি শব্দে শ-স থাকতে পারে।

৪) বিদেশি শব্দে Z ধ্বনির জন্য য ব্যবহার চলতে পারে। তবে, তদ্ভব শব্দে কেবল জ থাকবে (জাওয়া-জা-জে-জিনি-জুঁই)।

৫) তদ্ভব শব্দে ঐ ঔ থাকবে না (খই-দই-বউ-মউ)।

৬) তদ্ভব শব্দে ক্ষ থাকবে না (খুর-খেত-খুদ-খেপা)।

অর্থাৎ ড. শহিদুল্লাহ্-র মতে যেকোনও বাংলা শব্দের বানান হবে যথাসম্ভব সুনির্দিষ্ট, বর্ণ-ধ্বনির আদর্শ অনুপাত হবে ১ : ১—প্রতিটি ধ্বনির জন্য একটি নির্দিষ্ট বর্ণ। আর, বানান হবে যথাসাধ্য উচ্চারণ-অনুসারী।

৯. পৌষ ১৩৪৩-এর 'ভারতবর্ষ' পত্রিকায় 'বাংলা বানানের নিয়ম' প্রবন্ধে বানান-সংস্কার-সমিতির সভাপতি রাজশেখর বসু বাংলা বানানের নতুন নিয়ম প্রচলনের সমস্যা নিয়ে দু-চার কথা জানালেন। তাঁর ধারণা—

১) ‘যাঁরা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীন নন তাঁরা অপ্রিয় নিয়ম মানবেন না, অভ্যস্ত বানানই চলাবেন।’

২) ‘যুক্তি-তর্কের সময় যাঁরা বৈজ্ঞানিক জেদ অবলম্বন করেন, ব্যবহারক্ষেত্রে তাঁরাই স্বচ্ছন্দে নানারকম অসংগতি মেনে নিয়ে চলেন। ......যিনি মাসী পিসী লিখতে চান তিনি দিদী ঝী লিখতে রাজি নন....।’

এসব সমস্যার সমাধান তিনি নির্দেশ করছেন এইভাবে—‘বানানের সমস্যা কেবল বৈজ্ঞানিক যুক্তির সাহায্যে মিটবে না। সাধারণের অভ্যাস আর রুচি দেখতে হবে, বহু অসংগতি মেনে নিতে হবে।’ বানান-সমিতির সদস্যরাও নিজেদের মতভেদ সরিয়ে রেখে সমস্যা-সমাধানের এই পথ বেছে নিলেন—

১) বানানের সংস্কার যত হোক না হোক, নির্ধারণ আবশ্যক।

২) বানান যতটুকু সরল করা সম্ভবপর, তা করা উচিত।

৩) প্রথম উদ্যমে সমস্ত শব্দের বানান নির্ধারণ করা অনুচিত, এ চেষ্টা ক্রমে ক্রমে করাই ভালো।

এঁরা বুঝেছিলেন, সমকক্ষ বিরুদ্ধ মতামতকে সমান মূল্য দিতে গিয়ে কিছু কিছু বিকল্প বানান মানতেই হবে (কুমির-কুমীর উনিশ-ঊনিশ), এমনকী দুটি-একটি অসংগত ব্যবস্থাও মেনে নিতে হবে সমাধানের কথা ভেবে—ণ-বর্জিত কান-সোণার পাশে শ-ষ-স অব্যাহত থাকছে মশা-সরিষা-মিনসে বানানে।

১০. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান-সংস্কার-সমিতির ২২ দফা বানান-সূত্রকে মাঝখানে রেখে রবীন্দ্রনাথ আর অধ্যাপক দেবপ্রসাদ ঘোষের মধ্যে বাংলা বানান নিয়ে একটি বিতর্ক জমে উঠেছিল চিঠিপত্র লেখালেখির মাধ্যমে। সময়টা ১৯৩৭-এর জুন থেকে আগস্ট। তা থেকে বাংলা বানানের সমস্যা আর তার সমাধান বিষয়ে রবীন্দ্রনাথ আর অধ্যাপক দেবপ্রসাদ ঘোষের দুটি-একটি নির্দেশ আপনি পেয়ে যাবেন। রবীন্দ্রনাথের কথায় পরে আসছি। দেখা যাক, এ বিষয়ে দেবপ্রসাদবাবুর নির্দেশ কীরকম। অধ্যাপক ঘোষ লিখলেন—

১) বাংলা বানান মোটামুটি উচ্চারণ মেনেই চলছে। এদিক থেকে বানানে তেমন বিশৃঙ্খলা নেই, সমস্যাও নেই।

২) বানান-সমস্যার মূল কারণ একাধিক বর্ণের একই ধ্বনি, একবর্ণের একাধিক ধ্বনি নয়। সংস্কৃত বর্ণমালার ধ্বনি বিকৃত উচ্চারণ নিয়ে বাংলাভাষায় ঢুকেই এ গোলমাল

ঘটিয়েছে। দুই ন, তিন শ, দুই জ, দুই ব, ই-ঈ, উ-ঊ—এদের উচ্চারণ বাংলায় একই। সংস্কৃত স্বরবর্ণ 'ঋ-ঌ' বাংলা উচ্চারণে ব্যঞ্জনধ্বনি 'রি-লি'।

৩) তবু, সাধু বাংলায় এ বিষয়ে কোনো অরাজকতা নেই,......কেবল যেসব শিষ্টপ্রয়োগ দু-রকম বানান দেখা যায় (সাদা-শাদা সহর-শহর জিনিষ-জিনিস), সেক্ষেত্র বড়োজোর একরকম বানান সুপারিশ করলেই এ সমস্যার সমাধান হতে পারে।

৪) যেসব নিয়ম বহুপ্রচলিত তাকে বাতিল না করে বরং আরও যথাসম্ভব 'extend' করলে, এমন-কী নিয়মের বাইরেও কোনও সুপ্রচলিত বানানকে 'disturb' না করলে বানান-সমস্যা অনেকটাই কমে যাবে।

৫) সাধু বাংলায় সমস্যাটা কম হলেও মৌখিক বা কথ্য বাংলায় বিশৃঙ্খলা একটা বাস্তব সমস্যা। কালভেদে দেশভেদে পাত্রভেদে উচ্চারণ নানারকম, অতএব সেসব উচ্চারণকে বানানে ধরতে গেলে বানানও হবে নানারকম। এর সমাধানের প্রথম ধাপ কথ্যভাষার 'রূপগুলি যথাসম্ভব 'Standardise' করা'—করলাম-করলেম-করলুম অথবা করান-করানো পাঠান-পাঠানো থেকে একটি রূপ বেছে নেওয়া।

১১. এবার রবীন্দ্রনাথের কথা শুনুন। রবীন্দ্রনাথের দুর্ভাবনাও মূলত কথ্যভাষার (রবীন্দ্রনাথের ভাষায় 'প্রাকৃত বাংলা') শব্দের বানান নিয়ে। ১৯৩৭-এর জুন মাসে অধ্যাপক দেবপ্রসাদ ঘোষকে লেখা একটি চিঠিতে তিনি জানাচ্ছেন—'প্রাকৃত বাংলার ব্যবহার সাহিত্যে অবাধে প্রচলিত হয়ে চলেছে কিন্তু এর সম্বন্ধে বানান স্বেচ্ছাচার ক্রমশই প্রবল হয়ে উঠ্‌চে দেখে চিন্তিত হয়েছিলুম।' 'বানান স্বেচ্ছাচার' নিয়ে তাঁর এই দুশ্চিন্তা তৎসম সম্পর্কে ততটা নয়, যতটা অ-তৎসম শব্দ-বানান সম্পর্কে। তৎসম শব্দ বানানে সংস্কৃত হলেও উচ্চারণে প্রাকৃত (যেমন, বানানে 'বৃক্ষ' উচ্চারণে 'ব্রিক্‌খ'), এই স্ব-বিরোধ অনিচ্ছা সত্ত্বেও রবীন্দ্রনাথ মেনে নিচ্ছেন। কেননা, 'প্রাচীন ব্যাকরণকর্তাদের সাহস ও অধিকার' তাঁর নেই, যা দিয়ে এ অসংগতি দূর করা তাঁর নিজের পক্ষেই সম্ভব হত। কিন্তু, তদ্ভব শব্দ-বানান সম্পর্কে তাঁর বক্তব্য অত্যন্ত স্পষ্ট—'প্রাকৃত বাংলায় তদ্ভবশব্দবিভাগে উচ্চারণের সম্পূর্ণ আনুগত্য যেন চলে এই আমার একান্ত ইচ্ছা ছিল।'

কথ্য বাংলার বানান-সমস্যা আর তার সমাধান-নির্দেশ অধ্যাপক দেবপ্রসাদ ঘোষকে লেখা আর-একটি চিঠিতে (২৬ জুন ১৯৩৭) আরও স্পষ্ট হল—'প্রাকৃত বাংলার সংস্কৃত অংশের বানান সম্বন্ধে বেশি দুশ্চিন্তার কারণ নেই—যাঁরা সতর্ক হতে চান হাতের কাছে একটা নির্ভরযোগ্য অভিধান রাখলেই তাঁরা বিপদ এড়িয়ে চলতে পারেন। কিন্তু, প্রাকৃত

বাংলার প্রামাণ্য অভিধান এখনো হয় নি,...... কিন্তু এই বানানের ভিৎ পাকা করার কাজ সুরু করবার সময় এসেছে।'

রবীন্দ্রনাথ বলতে চান, বানান-সমস্যার এলাকা সাধু বাংলা ত নয়-ই, এমনকী কথ্য বা প্রাকৃত বাংলার অন্তর্গত 'সংস্কৃত অংশ' বা তৎসম শব্দও নয়, কেননা বানান এখানে সংস্কৃত ব্যাকরণ মেনে এখনও চলছে। বানান নিয়ে যেকোনও সংশয় দূর করতে 'হাতের কাছে একটা নির্ভরযোগ্য অভিধান'-ও রয়েছে। বানান-সমস্যার মূল এলাকা অবশ্যই কথ্য বা প্রাকৃত বাংলার অ-তৎসম (বিশেষ করে তদ্ভব) শব্দ। এর সমাধানের দুটি ধাপ—প্রথম ধাপে অ-তৎসম শব্দে বানানসাম্যের প্রতিষ্ঠা করে প্রতিটি শব্দ-বানানকে প্রামাণিক করে তোলা, দ্বিতীয় ধাপে সেইসব শব্দ-বানানকে অভিধানের অন্তর্ভুক্ত করা। প্রথম ধাপের কাজটি শুরু হওয়ার ইঙ্গিত রবীন্দ্রনাথের প্রাসঙ্গিক চিঠিতে আমরা পাচ্ছি। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান-সংস্কার-সমিতি সেই কাজটিই করেছে।

১২. দেখা গেল, ১৯৩৬-৩৭-এর সময়টা বানান নিয়ে নানারকম বিতর্ক জমে ওঠার সময়। বাংলা বানানের সমস্যা আর তার সমাধানের সূত্র খুঁজে বের করার উদ্যোগ থেকেই এ সময় বেরিয়ে এল বানান-সংস্কার-সমিতির ২২-দফা নিয়ম। কিন্তু তবু বাংলা বানানের সমস্যা চিরকালের জন্য মিটে যায় নি। এসব চিন্তাভাবনার রেশ চলতে চলতে দু-তিন দশক পেরিয়ে গেল। বিশ শতকের ছ-সাতের দশকে এ নিয়ে দুটি মূল্যবান প্রবন্ধ লিখলেন শ্রীমণীন্দ্রকুমার ঘোষ—একটি নভেম্বর ১৯৬৫-তে লেখা 'বানান-সমস্যা', আর-একটি অক্টোবর ১৯৭৯-এ লেখা 'বাংলা বানান-সমস্যা'।

বানান-সমস্যা নিয়ে মণীন্দ্রবাবুর প্রথম বক্তব্য সরাসরি তাঁর কথাতেই জেনে নিন—'সমস্যা প্রধানতঃ চলিতভাষার বানান নিয়ে। অনেকের ধারণা......মুখের উচ্চারণকে লেখার বানানে রূপ দেওয়াই বানানের চূড়ান্ত সার্থকতা।' কিন্তু, মুখের সব উচ্চারণকে বানানে রূপ দেওয়া বাংলা বর্ণমালার পক্ষে অসাধ্য। কেননা, বাংলা বর্ণের সংখ্যা নির্দিষ্ট, মুখের উচ্চারণ অসংখ্য, অনির্দিষ্ট। সেই কারণে, বানান-সমস্যার সমাধানের জন্য মণীন্দ্রবাবুর পরামর্শ—'মুখের উচ্চারণকে লেখার বানানে রূপ দেওয়াই বানানের চূড়ান্ত সার্থকতা'—এই ভুল ধারণাটা গোড়াতেই ভেঙে দেওয়া হোক, অর্থাৎ বানানকে উচ্চারণমুখী করার প্রবণতা থেকে যাক।

মণীন্দ্রবাবুর দ্বিতীয় বক্তব্য—'বানান দিয়েই শব্দার্থ প্রকাশ করতে হবে। তার সঙ্গে যদি শব্দের ধ্বনি-প্রকাশও করতে পারি তা হবে বানানের অন্যতম গৌরব।' মণীন্দ্রবাবু বলতে চান, ধ্বনির উচ্চারণ মেনে শব্দের বানান তৈরি অনাবশ্যক, তবে অর্থের ভেদ মেনে

শব্দের বানান তৈরি হলে অর্থবোধেও সুবিধে, বানান-সমস্যাও এড়ানো সম্ভব। তাঁর কথায়—'মত' আর 'মতো'র দুই বানান থাকলে অর্থের জন্য ভাবতে হয় না।' (এ যে আমার **মত**। এ যে আমার **মতো**।)

এ প্রসঙ্গে মণীন্দ্রবাবু সবচেয়ে বেশি চিন্তিত 'কি-কী' বানান নিয়ে। তাঁর কথায়—'তুমি কি খাবে? ....বাক্যে অর্থ স্পষ্ট নহে। তুমি খাবে কিনা, কিংবা কোন্ বস্তু খাবে........দুই প্রকার অর্থই হইতে পারে। কিন্তু বানানে হ্রস্ব-দীর্ঘ পার্থক্য ঘটাইলে অর্থবোধে কোন বাধা থাকে না।'

মণীন্দ্রবাবুর প্রথম বক্তব্যে রয়েছে বাংলা বানানে বর্ণ-ধ্বনির প্রতিসাম্যের সমস্যার ইঙ্গিত, দ্বিতীয় বক্তব্যে আছে সমধ্বনির উচ্চারণে অর্থভেদে পৃথক বানান-প্রয়োগ বানান-সমস্যা এড়াতে কতটা কার্যকর তা নিয়ে ভাবনা। এর পাশে বানান-সমস্যা নিয়ে মণীন্দ্রবাবুর তৃতীয় বক্তব্যটি এইরকম—'ব্যক্তিভেদে স্থানভেদে উচ্চারণ-বৈলক্ষণ্য সর্বত্র দেখা যায়। কালের পরিবর্তনেও উচ্চারণ পরিবর্তিত হয়।......আদর্শ উচ্চারণ বলে যখন কিছু নেই, উচ্চারণ-অনুযায়ী বানান দিতে গেলে যথেচ্ছাচার আসবেই।....বানান স্থিতিশীল হবে না। বানান স্থিতিশীল রাখার একমাত্র উপায় শব্দের উৎস-সন্ধান।'

সমস্যাটা বোঝাতে গিয়ে উদাহরণ টেনে টেনে মণীন্দ্রবাবু বলছেন, ঢাকা-বরিশাল-মেদিনীপুর -পুরুলিয়া তো বটেই, এমনকী শান্তিপুর-শান্তিনিকেতন-বাগবাজার-কালীঘাটের ছোট্ট ভূখণ্ডেও উচ্চারণ নানারকম। একই কলকাতার বাসিন্দা হয়েও রবীন্দ্রনাথ-সুনীতিকুমার-চারু বন্দ্যোপাধ্যায় বা দানিবাবু-তিনকড়ি চক্রবর্তী-তারাসুন্দরীর উচ্চারণেও বিস্তর অসামঞ্জস্য। একই ব্যক্তির উচ্চারণও কালে কালে বদলায়। উচ্চারণ মেনে বানান লিখতে গেলে ব্যক্তি-স্থান-কালের বদলের সঙ্গে সঙ্গে বানানের অজস্র রূপান্তরে যথেচ্ছাচার আর বিশৃঙ্খলা অনিবার্য হয়ে উঠবে। এই অস্থিরতার মধ্যে বানানে সাম্য আনা হবে অসাধ্য।

এ সমস্যার একমাত্র সমাধান হিসেবে মণীন্দ্রবাবুর পরামর্শ—শব্দের উৎস সন্ধান করে সেই উৎস বা ব্যুৎপত্তি অনুযায়ী প্রতিটি শব্দের বানান নির্দিষ্ট করে দেওয়া আবশ্যক।

অতএব দেখা গেল, সাধারণভাবে মণীন্দ্রবাবু বানানকে উচ্চারণ-অনুযায়ী করার বিরোধী, ব্যুৎপত্তি-অনুযায়ী করার পক্ষপাতী। তবে বিশেষ বিশেষ ক্ষেত্রে অর্থ-পার্থক্য বোঝার সহায়ক হলে বানানকে উচ্চারণ-অনুযায়ী করতে তাঁর আপত্তি নেই (মত-মতো কি-কী)।

১১৩.৪.১ সারাংশ—২

১৯২৫ থেকে ১৯৭৯, এই সময়ের মধ্যে প্রশান্তচন্দ্র মহলানবিশ-রবীন্দ্রনাথ থেকে শুরু করে মণীন্দ্রকুমার ঘোষ পর্যন্ত বানান-ভাবুকেরা বাংলা বানানের সমস্যা এবং তার সমাধানের উপায় নিয়ে যেসব চিন্তাভাবনা করেছেন, তা থেকে এই কটি তথ্য বেরিয়ে আসে, এক এক করে লক্ষ করুন—

১. সাধু বা শিষ্ট বাংলা ভাষার শব্দ-বানান নিয়ে রবীন্দ্রনাথের বিশেষ মাথাব্যথা ছিল না। অধ্যাপক জ্যোতির্ময় ঘোষ দেখিয়েছেন, তৎসম বানানভুলের কারণ মূলত সংস্কৃত-জ্ঞানের অভাব। তৎসম বানান নিয়ে যেটুকু সমস্যা, তার সমাধানে দেবপ্রসাদ ঘোষ সুপারিশ করেছেন সুপ্রচলিত বানানকে অব্যাহত রাখার।

২. কথ্যবাংলার অ-তৎসম শব্দ-বানানের মূল সমস্যা তার নানারকম চেহারা, একথা বলেছেন রবীন্দ্রনাথ এবং শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। এর সমাধানে তাঁদের সুপারিশ—বানানের অসমতা দূর করে বানানকে নির্দিষ্ট করা, আর ঐ নির্দিষ্ট বানানকে অভিধানের অন্তর্ভুক্ত করা।

৩. অধ্যাপক জ্যোতির্ময় ঘোষ অ-তৎসম বানানের আর-একটা সমস্যার কথা বলেছেন—তা হল অ-তৎসম বানানের ব্যাকরণের অভাব। এর সমাধানে তিনি সুপারিশ করলেন ব্যাকরণের বিকল্প হিসেবে আপাতত নির্দিষ্ট বানানের এমন একখানি মাঝারি আকারের অভিধান, যা দশবছর অন্তর সংস্কারযোগ্য।

৪. বানানের নতুন নিয়ম প্রচলনের সমস্যার কথা বলেছেন রাজশেখর বসু। এর সমাধানে তাঁর সুপারিশ—বানান নির্দিষ্ট হবে, বানানের নির্ধারণ হবে ক্রমশ ধাপে ধাপে, আর কিছু কিছু অসংগতি মেনেও নিতে হবে।

৫. বাংলা বানানের মূল সমস্যাই যে ধ্বনি-বর্ণের অসমতা আর অসংগতি এটা মেনে নিয়েছেন বানান-ভাবুকেরা সবাই। ধ্বনি-বর্ণের অসমতা প্রধানত দু-ধরনের—

(ক) একই বর্ণের একাধিক উচ্চারণ ঃ 'এ' বর্ণের উচ্চারণ 'অ্যা' আর 'এ'।

(খ) একাধিক বর্ণের একই ধ্বনি ঃ ই-ঈ, উ-ঊ, ঞ-ণ-ন, জ-য, শ-ষ-স বর্গীয় ব-অন্তস্থ-ব।

ক-চিহ্নিত অসমতা দূর হতে পারে নতুন ধ্বনির জন্য নতুন বর্ণ রচনা করে। খ-চিহ্নিত অসমতা দূর করার জন্য আবশ্যক অতিরিক্ত বর্ণগুলির উচ্ছেদ—ধরা যাক, ঈ-ঊ-ঞ-ণ-য-ষ-অন্তস্থ ব-এর উচ্ছেদ।

ধ্বনি-বর্ণের অসংগতি মূলত অ-ও, ঐ-অই, ঔ-অউ রেফের নীচে ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব, শব্দশেষে

বিসর্গ (তস্‌-শস্‌ প্রত্যয় থেকে) নিয়ে। এর সমাধান নিয়ে অবশ্য এ-পর্বের ভাবুকদের মধ্যে বিতর্ক ছিল।

১১৩.৪.২ অনুশীলনী—২

১. ১৯২৫ থেকে ১৯৭৯—এই সময়ের মধ্যে বাংলা বানানের সমস্যা আর তার সমাধানের উপায় নিয়ে যেসব প্রস্তাব তোলা হয়েছে, সংক্ষেপে সেগুলি সংকলন করুন।

২. সমকালীন বানান-ভাবুকদের সঙ্গে বিতর্কে আলোচনায় রবীন্দ্রনাথ বানান-সমস্যা আর তার সমাধান প্রসঙ্গে যেসব মতামত প্রকাশ করেছিলেন, সংক্ষেপে তা বিবৃত করুন।

৩. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'বাংলা বানানের নিয়ম' প্রকাশিত হবার পরে বাংলা বানানের সমস্যা আর তার সমাধান নিয়ে ভাবনা-চিন্তায় যাঁরা অংশ নিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্য থেকে যেকোনও একজনের বক্তব্য সংক্ষেপে পরিবেশন করুন এবং আজকের প্রেক্ষিতে তার মূল্যায়ন করুন।

৪. বাংলা বানানের অন্যতম সমস্যা হিসেবে ধ্বনি-বর্ণের অসংগতির প্রসঙ্গটি কীভাবে আলোচিত হয়েছে, বিবৃত করুন।

১১৩.৫ মূলপাঠ—৩ ঃ বাংলা বানান-সমস্যা ও সমাধান-প্রয়াস (১৯৮২ থেকে ২০০১)

বানান-সমস্যা আর তার সমাধান-সূত্র নিয়ে প্রথমে বিশের দশক থেকে সত্তরের দশক পর্যন্ত যেসব ভাবনা চলছিল, তার খানিকটা হদিস এতক্ষণে পেলেন। এবারে এগিয়ে যাব আশি-নব্বই-এর দশকের বানান-ভাবনায়। এই সময়ের মধ্যে বানান-সমস্যার ভাবনা আর তার সমাধানের পথ খুঁজে বের করার উদ্যোগকে ক্রমশ একটি প্রাতিষ্ঠানিক পরিণামে উত্তীর্ণ হতে দেখছি। তিরিশের দশকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধানে বানান-সংস্কার-সমিতি যে দায়িত্ব নিয়েছিল, আশি-নব্বই-এর দশকে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের তত্ত্বাবধানে বাংলা আকাদেমির বানান সমিতি অনেকটা সেইরকম ভূমিকাই নিল, এমনকী তার চেয়ে একটু বেশি কাজই করল। কেননা, বিশ্ববিদ্যালয় বের করেছিল কেবল 'বাংলা বানানের নিয়ম' পুস্তিকাটি, আর বাংলা আকাদেমি 'বানানবিধি'-র সঙ্গে বের করে দিল বিধিসম্মত বানানের একটি গোটা অভিধান'—'আকাদেমি বানান অভিধান'।

বাংলা বানানের সমস্যার দিকটা চিহ্নিত করার কাজে ১৯৩৬-৩৭-এর কলিকাতা-বিশ্ববিদ্যালয় অনেকটাই এগিয়েছিল, কিন্তু সংস্কার-করা বানানের প্রচলনে ততটা এগোতে পারে নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের

বিধান বানানকে সরল করেছে, কিন্তু বেশিমাত্রায় বিকল্পের সুযোগ রেখে কিছু কিছু সমস্যাকে জিইয়েও রেখেছে। অর্থাৎ অনেকক্ষেত্রেই একই শব্দের একের বেশি রকম বানান লেখার অধিকার এখনও থাকছেই, যেমন-খুশি লেখার সুযোগ খানিকটা কমলেও পুরোপুরি মুছে যায়নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান-সংস্কার-সমিতির এই অসম্পূর্ণ কাজটিকে সম্পূর্ণ করা না গেলেও অন্ততপক্ষে খানিকটা এগিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব নিয়ে এগিয়ে এল বাংলা আকাদেমির বানান সমিতি।

বাংলা আকাদেমি বানান-সমস্যার সমাধানে কাজ শুরু করল ১৯৮৬ সালে। এর ঠিক আগের কয়েকটি বছরে এ নিয়ে যেসব লেখালেখি হয়েছে, তা থেকে কিছু কিছু প্রসঙ্গ তুলে আনছি আপনার সামনে, লক্ষ করুন—

১৯৮২ থেকে ১৯৮৫ সালের মধ্যে বানান-সমস্যা বিষয়ে লেখা কিছু প্রবন্ধের সঞ্চয় নিয়ে বিশিষ্ট ভাষাবিদ অধ্যাপক পবিত্র সরকার বের করলেন 'বাংলা বানান সংস্কার : সমস্যা ও সম্ভাবনা' নামে দু-শ পৃষ্ঠার একখানি বই। বইটির গোড়াতেই অধ্যাপক সরকার দেখিয়েছেন, বাংলা বর্ণমালা আর তার বানান-পদ্ধতির সঙ্গে বাংলা উচ্চারণের অসংগতি পাঁচ রকমের এবং তা থেকে বানান-সমস্যাও তৈরি হয় পাঁচ রকমের—

(১) ধ্বনি আছে কিন্তু তা লেখার মতো কোনও বর্ণ নেই (অ্যা)।

(২) বর্ণ আছে কিন্তু তার উচ্চারণ লুপ্ত, ফলে একই ধ্বনির একাধিক প্রতীক (ই-ঈ উ-ঊ ঋ-রি ণ-ন ঙ-ং জ-য শ-ষ-স)।

(৩) একই বর্ণের যৌগিক বা একাধিক ধ্বনির সম্মিলিত উচ্চারণ (ঐ=ও-ই্, ঔ=ও-উ্)।

(৪) একই বর্ণের একাধিক উচ্চারণ—যেমন, 'অজয়' শব্দে 'অ'-এর উচ্চারণ 'অ', কিন্তু 'অরুণ' শব্দে 'অ'-এর উচ্চারণ 'ও'।

(৫) একই ধ্বনি-চিহ্নের একাধিক রূপ (Allograph)। যেমন একই উ-ধ্বনিচিহ্নের পাঁচটি রূপ—উ, কু (ক্ + উ), রু (র্ + উ), হু (হ্ + উ), শু (শ্ + উ)।

১-নং অসংগতির একটি উদাহরণ অ্যা-ধ্বনি। বাংলা শব্দে এই-ধ্বনিটি আছে। কিন্তু এর নিজস্ব কোনও বর্ণ নেই বলে অন্য ধ্বনির প্রতীক চিহ্নকে এর বর্ণ হিসেবে ব্যবহার করতে হয়। এর ফলে একদিকে যেমন একই অ্যা-ধ্বনির জন্য একাধিক বর্ণ বানানে এসে যায় (এমন-ব্যস্ত-জ্ঞান—এই তিনটি শব্দ-বানানে অ্যা-ধ্বনির জন্য তিনটি চিহ্ন এ-্য-া লক্ষ করুন), অন্যদিকে তেমনি একই বর্ণের বা বর্ণচিহ্নের একাধিক ধ্বনিও মেনে নিতে হয় (এখন-এক্ষুনিতে 'এ', ব্যয়-অব্যয়-ব্যক্তিতে '্য' আর জ্ঞান-গান-এ 'া' চিহ্নের দুই বা তিনরকমের ধ্বনির উচ্চারণ লক্ষ করুন)।

২ নং অসংগতির কারণ সংস্কৃত বর্ণমালার ছাঁচকে প্রায় অবিকল রেখে বাংলা বর্ণমালা সাজানো হয়েছে, অথচ অনেক বর্ণের উচ্চারণ তার মূল আদল থেকে সরে এসেছে। বাংলা তৎসম শব্দকে সাধারণভাবে সংস্কৃত থেকে সরাসরি বাংলায় নেওয়া হয়েছে, ফলে এসব শব্দের বানান অক্ষতই থেকে গেছে। কিন্তু এদের উচ্চারণ প্রায় সব ক্ষেত্রেই বাঙালি ধরনের। সংস্কৃত বর্ণমালায় ই-ঈ বা উ-ঊর পৃথক হ্রস্ব-দীর্ঘ উচ্চারণ ছিল, বাঙালি উচ্চারণে এই পার্থক্য নেই। সংস্কৃতে জ-য ণ-ন বা শ-ষ-স—এর পৃথক স্পষ্ট উচ্চারণ ছিল, বাংলায় তা এক হয়েছে গেছে। এর ফলে, বাংলা বানানে একই ধ্বনির জন্য দুটি বা তিনটি বর্ণচিহ্ন দাঁড়িয়ে গেছে। একটি ধ্বনির জন্য একাধিক প্রতীকের এই সম্পর্ককে অধ্যাপক সরকার বলছেন ‘এক-বহু প্রতিসম্পর্ক’। উদাহরণ দেখুন—

একটি ধ্বনি	**একাধিক প্রতীক বা বর্ণচিহ্ন**	**বানান**
ই	ই, ঈ	যদি, নদী (দি-দী)
উ	উ, ঊ	মধু, বধূ (ধু-ধূ)
ঋ	ঋ, রি	ঋতু, রিপু (ঋ-রি)
ঙ	ঙ, ং	অঙ্ক, অংশ (ঙ-ং)
জ	জ, য	জগৎ, যজ্ঞ (জ-য)
ত	ত, ৎ	শ্রীযুত, শ্রীমৎ (ত-ৎ)
ন	ণ, ন	জন, গণ (ন-ণ)
শ	শ, ষ, স	সবিশেষ (শ-ষ-স)

৩ নং অসংগতি ‘ঐ’ আর ‘ঔ’-কে নিয়ে। দুটি ক্ষেত্রেই পাশাপাশি দুটি ধ্বনির মিলিত উচ্চারণ ‘ও-ই্’ আর ‘ও-উ্’। অর্থাৎ প্রতিটি ক্ষেত্রেই ধ্বনি দুটি অথচ চিহ্ন একটিই। অধ্যাপক সরকারের ভাষায় এটি ‘বহু-এক সম্পর্ক’, আগেকার সম্পর্কের বিপরীত। এক-বহু সম্পর্কের মতো বহু-এক সম্পর্কও বাংলা বানান-সমস্যার অন্যতম কারণ। বহু-এক সম্পর্কিত ‘ঐ’ থেকে ক্রমশ বিভ্রান্তি তৈরি হয়েছে বৈ (ছাড়া) আর বই (পুথি)-এর বানানে, ‘ঔ’ থেকে ক্রমশ সংশয় এসেছে বৌ-মউ মৌ-মউ-এর বানান নিয়ে।

খেয়াল করুন, ৩-নং অসংগতির প্রসঙ্গে ঐ বা ঔ-তে ধ্বনি দুটি, কিন্তু উচ্চারণ একটিই-এবং তা মিলিত বা যৌগিক উচ্চারণ। অর্থাৎ, ৩নং অসংগতি মূলত একটি বর্ণচিহ্নের একটি প্রয়োগেই একাধিক ধ্বনির মিলিত উচ্চারণ নিয়ে। কিন্তু, ৪-নং অসংগতির কারণ একটি বর্ণের একাধিক উচ্চারণ। অর্থাৎ, ৪নং অসংগতি আসলে একটি বর্ণচিহ্নের পৃথক পৃথক প্রয়োগে একাধিক বা পৃথক পৃথক উচ্চারণ নিয়ে। উদাহরণ দেখুন—

বর্ণচিহ্ন	**প্রথম প্রয়োগে উচ্চারণ**	**দ্বিতীয় প্রয়োগে উচ্চারণ**
অ	অত (অ)	অতি (ও)
	অজয় (অ)	অরুণ (ও)
এ	এখন (অ্যা)	এক্ষুনি (এ)
	দেখা (অ্যা)	দেখি (এ)

দেখা গেল, পাশে অন্য ধ্বনি (ই, উ) এসে গেলে অ-বর্ণটির উচ্চারণ 'ও' হতে পারে, আর, অন্য ধ্বনি না এলে এ-বর্ণটির উচ্চারণ 'অ্যা' হতে পারে। তবে, এ ধরনের অসংগতি থেকে বানান-ভুলের আশঙ্কা খুবই কম—'ওতি' বা 'ওরুণ' উচ্চারণের দাবি মেনে 'অতি'-র বদলে 'ওতি' বা 'অরুণ'-এর বদলে 'ওরুণ' লেখার মতো বানান-সমস্যা সাক্ষর বাঙালির পক্ষে স্বাভাবিক নয়। অবশ্য 'দেখা'-র বদলে 'দ্যাখা' লেখার ঝোঁক তৈরি হতেই পারে।

এই চারটি সমস্যাকে অধ্যাপক সরকার বলছেন বাংলা বর্ণমালার উপাদানের (Content) সমস্যা। ৫নং অসংগতি থেকে আসছে কোনও কোনও বর্ণের রূপের (Form) সমস্যা—একই ধ্বনিচিহ্নের একাধিক রূপের (Allograph) সমস্যা। উদাহরণ দেখুন—

ধ্বনিচিহ্ন	**বর্ণে প্রয়োগ**	**বানানে প্রয়োগ**
উ	পু	পুণ্য
	রু	গরু
	শু	পশু
	হু	বহু

অধ্যাপক সরকার অবশ্য মনে করেন, 'বানান-সমস্যার সঙ্গে Allograph-এর সংখ্যাধিক্যের সম্পর্ক প্রত্যক্ষ নয়, যদিও এ ঘটনাটি শিশুর বর্ণপরিচয় প্রক্রিয়াকে কঠিন করে তোলে।'

বর্ণ-ধ্বনি-উচ্চারণ-বর্ণরূপের অসংগতি থেকে তৈরি যে পাঁচরকম সমস্যার উল্লেখ করা হল, তার সমাধান-সূত্রও খুঁজে দেখা যাক পবিত্রবাবুর ভাবনাচিন্তার পথ ধরেই। একটু আগেই দেখলেন, ঐ পাঁচটি সমস্যার মধ্যে প্রথম চারটি বর্ণমালার উপাদানের সমস্যা, শেষেরটি বর্ণচিহ্নের রূপভেদের সমস্যা। এও জানলেন, বর্ণমালার উপাদানের সঙ্গেই বানান-সমস্যার সরাসরি সম্পর্ক। সেই কারণে, সেই উপাদানের সংস্কারই হবে বানান-সমস্যার সমাধানের পক্ষে সবচেয়ে জরুরি কাজ। 'উপাদানের সংস্কার'—এর অর্থ, ধ্বনি আর বর্ণচিহ্নের সম্পর্কে যেসব অসংগতি পাওয়া গেল সেগুলিকে হয় দূর করে, না-হয় কমিয়ে এনে মান্য চলিত বাংলার ধ্বনি আর বর্ণচিহ্নের মধ্যে সরাসরি সহজ সম্পর্ক তৈরি করা। অর্থাৎ আমাদের কাজ হবে ধ্বনি আর বর্ণের অনুপাতকে যথাসম্ভব ১:১ ('এক ধ্বনি, একটি প্রতীক') বা তার কাছাকাছি পৌঁছে দেওয়া।

তাহলে, একটি ধ্বনির জন্য একটি বর্ণকে যথাসম্ভব নির্দিষ্ট করে দেওয়াই হবে বানান-সমস্যার সমাধানের অন্যতম পথ। এর জন্য আবশ্যক, যেসব বাংলা শব্দে এখনও পর্যন্ত বিকল্প বানানের সংস্থান রয়েছে, তা থেকে কেবল একটি করে বানান বেছে নেওয়া। কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান-সংস্কার-সমিতি রেফের নীচে ব্যঞ্জনবর্ণের দ্বিত্ব লোপ করার বিধান দিয়ে সেপথে খানিকটা এগিয়েছিলও। কিন্তু তবু যেসব বিকল্প বানানের সমস্যা আজও পর্যন্ত থেকে গিয়েছে, তার চেহারাটা এইরকম—

তৎসম শব্দের ক্ষেত্রে ঃ (১) ি - ী—অঙ্গুলি-অঙ্গুলী, কুটির-কুটীর, ভঙ্গি-ভঙ্গী।

(২) উ-ঊ—উর্ণা-ঊর্ণা, উর্ণনাভ-ঊর্ণনাভ।

(৩) ু ূ—চঞ্চু-চঞ্চূ, ভ্রু-ভ্রূ, ইন্দুর-ইন্দূর।

(৪) শ-ষ-স—কিশলয়-কিসলয়, উশীর-উষীর, শরণি-সরণি।

তদ্ভব শব্দের ক্ষেত্রে ঃ (১) ি - ী—কুমির-কুমীর, পাখি-পাখী, বাড়ি-বাড়ী।

(২) উ-ঊ—উনিশ-ঊনিশ।

(৩) ু ূ—চুন-চূন, পুব-পূব।

(৪) ঙ-ং—বাঙলা-বাংলা, রঙ-রং, সঙ-সং।

বিদেশি শব্দের ক্ষেত্রে ঃ শ-স—শহর-সহর, শয়তান-সয়তান, পুলিশ-পুলিস।

প্রতিটি জোড়াশব্দের দুটি বানানই অনুমোদিত। এই একাধিক বিকল্পের কোন্‌টিকে আমরা গ্রহণ করব, তৎসম-তদ্ভব-বিদেশি শব্দের বানানে এটা বড়ো সমস্যা। এরপাশে তদ্ভব আর অর্ধ-তৎসম শব্দের বানানের বিশেষ সমস্যা—'এদের বানান মূল সংস্কৃত বানানকে স্মরণ করবে কি করবে না, করলে কতটা এবং কোথায় করবে?' দেশি আর বিদেশি শব্দে, বিশেষ করে বিদেশি শব্দের বানানেও 'ব্যুৎপত্তি আর উচ্চারণের মধ্যে টেন্‌শন চলে।' হিশেব-হিসেব শাবান-সাবান শাদা-সাদা—কোন্‌ বানানটি লিখব, এই নিয়ে দ্বিধা, সংশয়।

তৎসম অর্ধতৎসম তদ্ভব দেশি বিদেশি—এই পাঁচ রকমের শব্দ নিয়ে তৈরি এমন বিচিত্র চরিত্র যে ভাষার শব্দভাণ্ডারের, তার বানান-নীতিও বিচিত্র হতে বাধ্য। অর্থাৎ 'কিছু শব্দের বানান এক নীতিতে হবে, কিছু শব্দের বানান হবে অন্য নীতিতে।' একথা মাথায় রেখে বাংলাভাষার বানান-সমস্যার সমাধান-সূত্র হিসেবে অধ্যাপক সরকারের সুপারিশ এইরকম—

(ক) তৎসম শব্দের মূল বানান যথাসম্ভব বজায় রাখতে হবে। তবে মূল বানানের একাধিক বিকল্প থেকে একটিকে বেছে নিয়ে বাংলায় গ্রহণ করতে হবে।

(খ) অর্ধতৎসম আর তদ্ভব শব্দের বানানে কতটা তৎসম বানানের অনুসরণ থাকবে, আর কতটা ধ্বনিসংবাদী হবে (অর্থাৎ উচ্চারণ মেনে চলবে)—তার স্থায়ী মীমাংসা করতে হবে।

(গ) দেশি-বিদেশি শব্দের বানান ধ্বনিসংবাদী করতে হবে।

(ঘ) বানান-পদ্ধতিকে সরল করার জন্য বর্ণমালার উপাদানের যেটুকু সংস্কার প্রয়োজন তা করতে হবে।

১৯৮৫ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে বাংলাভাষাপ্রসঙ্গে একটি আলোচনা-চক্রের আয়োজন হয়েছিল। এ আলোচনাচক্রের অন্যতম আলোচ্য বিষয় ছিল বাংলা বানান সংস্কার। বিষয়টি ঘিরে যেসব কথাবার্তা হয়েছিল, তা থেকে বানান-সমস্যা আর তার সমাধান নিয়ে কিছু কিছু টুকরো কথা পরপর সাজিয়ে দিই—

১. প্রবোধচন্দ্র সেন বললেন, 'আমরা যা করতে চাই তা হল বানানের uniformity বা সমতা। একই শব্দের নানা জনে বিভিন্ন ধরনের বানান লিখছেন। সেখানে একটা নির্দিষ্ট নিয়ম বেঁধে দেওয়া চাই।......সর্বাপেক্ষা গ্রহণযোগ্য রূপটিকেই সবার মানা উচিত।'

তিনি আরও বললেন, 'বানানের ক্ষেত্রে সমতা আনা যেমন খুব দরকার তেমনি সেই অনুযায়ী অভিধান লেখাও চাই।'

প্রবোধচন্দ্র সেনের কথা থেকে সহজেই আন্দাজ করতে পারবেন, **বাংলা-বানানের মূল সমস্যা সমতার অভাব**—'নানা জনে বিভিন্ন ধরনের বানান' লেখার প্রবণতা থেকেই সমস্যাটি তৈরি হয়েছে। এর সমাধান হতে পারে দুভাবে—এক, বানানের 'একটা নির্দিষ্ট নিয়ম বেঁধে'; দুই, বানানে সমতা এনে সেই অনুযায়ী একটি অভিধান লিখে।

২. অধ্যাপক রামেশ্বর শ' তিনরকম বানান-সমস্যার কথা জানালেন—

(ক) একাধিক ধ্বনিকে একটিমাত্র বর্ণ দিয়ে লেখা। 'অ্যাকটা-অ্যাখন' শব্দের 'অ্যা' আর 'এরা- এসব' শব্দের 'এ' পৃথক দুটি ধ্বনি। অথচ, একটিমাত্র বর্ণ 'এ' দিয়েই ধ্বনিদুটিকে রূপায়িত করতে হয়।

(খ) একই ধ্বনিকে একাধিক বর্ণ দিয়ে লেখা। 'পণ' শব্দের 'ণ' আর 'মন' শব্দের 'ন' একই ধ্বনি। অথচ, একই ধ্বনির জন্য রয়েছে দুটি বর্ণ (ণ-ন)। বাংলা বর্ণমালায় সংস্কৃতের অনুসরণ চলছে বলেই এই সমস্যা।

(গ) অনেক সময় অন্যভাষার উচ্চারণকে ঠিক ঠিক লিখে ফেলার মতো বর্ণ বাংলায় পাওয়া যায় না। ইংরেজি J-র উচ্চারণ 'জ' দিয়ে লেখা যায়, কিন্তু Z-এর উচ্চারণ লেখার মতো বর্ণ বাংলায় নেই। এক ভাষার ধ্বনি অন্যভাষায় লিখতে গেলে এ সমস্যাটা এসে যায়।

এই তিনটি সমস্যার সমাধান হিসেবে অধ্যাপক শ'-র সুপারিশ, ভাষার প্রত্যেক ধ্বনিকে উপস্থাপিত করার জন্য একটিমাত্র স্বতন্ত্র বর্ণচিহ্ন থাকবে। যেহেতু আন্তর্জাতিক ধ্বনিমূলক বর্ণমালা এই নীতির উপরে প্রতিষ্ঠিত, সেই কারণে ঐ বর্ণমালার মূল নীতিটি আমরা অনুসরণ করতে পারি, এবং আমাদের প্রচলিত বর্ণমালা থেকেই আবশ্যকমতো বর্ণ বাছাই করে নিতে পারি। এই বাছাই করতে গিয়ে কিছু বর্ণ বাদ যাবে (যেমন, ই-ঈ থেকে একটি উ-ঊ থেকে একটি, ঋ-র বদলে আসবে 'রি'), আবার দুটি একটি নতুন বর্ণ তৈরিও করতে হবে (যেমন 'আ'-র জন্য)। এমনি করে ধ্বনি অনুযায়ী বর্ণমালা তৈরি করে ধ্বনিভিত্তিক বানান-পদ্ধতি প্রচলন করলে তা হবে বানান-সমস্যা সমাধানের পক্ষে এক বৈজ্ঞানিক পদক্ষেপ।

অধ্যাপক শ'র-মূল বক্তব্য এইরকম—'প্রত্যেক ধ্বনির জন্য একটি বর্ণ অপরিহার্য, কোনো ধ্বনির জন্যে একের বেশি বর্ণ থাকবে না এবং বানান **লিখিত** হবে ধ্বনির উচ্চারণ অনুযায়ী—এই মূল তিনটি নীতি গৃহীত হলে বাংলা বানানের সব সমস্যার সমাধানে সঙ্গতি থাকবে।'

৩. বাংলা বানানে, বিশেষ করে শিশুপাঠ্য বই-এর বানানে সমতার অভাবটাই অমিতাভ মুখোপাধ্যায়ের কাছে বড়ো সমস্যা বলে মনে হয়েছে। এর সমাধান-প্রয়াসে তাঁর দেওয়া প্রস্তাবগুলি এইরকম—

(ক) তৎসম শব্দে মূল বানান অনুসৃত হবে। তবে সেইসঙ্গে মেনে নিতে হবে রেফ-যুক্ত-ব্যঞ্জনে দ্বিত্ববর্জন (ধর্ম কর্ম মূর্ছনা), হ্রস্ব-দীর্ঘের বিকল্প বিধান থেকে কেবল হ্রস্বযুক্ত বানান ('সূচী-সুচী' থেকে কেবল 'সূচি', তেমনি 'পল্লি' 'আবলি'), পূর্বপদের শেষে 'ম্' আর পরপদের শেষে 'ক-খ-গ-ঘ' এর সন্ধিতে 'ঙ'-র বদলে 'ং' (অহংকার, সংগীত), পদান্তে বিসর্গ লোপ (ক্রমশ, সাধারণত, ইতস্তত), হস্‌চিহ্ন বর্জন (দিক বিরাট শ্রীমান আশিস)।

(খ) তদ্ভব-অর্ধতৎসম শব্দে কেবল হ্রস্বযুক্ত বানান, দীর্ঘত্ব থাকবে না (বাড়ি গরিব শাশুড়ি পুর পুজো), য-জ থেকে কেবল জ থাকবে (কাজ জাদু), ণ-ন থেকে কেবল ন থাকবে (রানি দরুন অঘ্রান), ক্ষ-খ থেকে কেবল খ থাকবে (খেত খ্যাপা খুদিরাম), চন্দ্রবিন্দু থাকবে না (ইট কাচ), ক্ষেত্রবিশেষে যুক্তাক্ষর ভেঙে লেখা (হালকা আলপনা), ঙ্গ-র বদলে ঙ (ভাঙা রঙিন ঠোঙা), ঐ-ঔ এর বদলে অই-অউ থাকবে (হইচই বউ)।

(গ) শ ষ স র ক্ষেত্রে সুনির্দিষ্ট বানান-রীতি। তদ্ভব-অর্ধতৎসম-দেশি শব্দে প্রচলিত বানান (মশা পিসি মিনসে শাঁস), বিদেশি শব্দে যথাসম্ভব মুলানুগ বানান (শহর মুশকিল)।

(ঘ) নতুন বর্ণ তৈরি না হওয়া পর্যন্ত 'অ্যা'-দিয়ে লেখা (অ্যাসিড ল্যাজ ঢ্যাঙা)।

(ঙ) ও-কার আর ঊর্ধ্বকমার বাহুল্যবর্জন (কলকাতা)। ক্রিয়াপদের ক্ষেত্রে কেবল ভবিষ্যৎ অনুজ্ঞা আর অসমাপিকা ক্রিয়ায় ঊর্ধ্বকমা (ক'রো ব'লো ক'রে ব'লে) এবং নামধাতুর বেলায় ও-কার চলবে।

(চ) স্বরসংগতি আর অভিশ্রুতির ফলে তৈরি উচ্চারণ অনুযায়ী বানান মেনে নেওয়া যেতে পারে (ওপর ভেতর হিসেব নৌকো সুতো)।

৪. অধ্যাপক ক্ষেত্র গুপ্ত বর্ণ আর উচ্চারণের অসংগতির সমস্যা লক্ষ করে এর সমাধানের পথ খোঁজেন এইভাবে—'যতটা সম্ভব উচ্চারণের কাছে বানানকে নেওয়া এবং প্রচলিত বানান সরল হলে উচ্চারণের নাম করে সেখানে নতুন কোন জটিলতা ডেকে না আনা।' অধ্যাপক গুপ্ত-র সুপারিশ এইরকম—

(ক) বাংলা স্বরবর্ণের সংখ্যা অনায়াসে কমিয়ে আনা যায় ৬য়ে—অ আ ই উ এ ও।

(খ) ব্যঞ্জনবর্ণের সংখ্যাও বেশ কমিয়ে আনা সম্ভব। বাদ যেতে পারে ঙ ঞ ণ, শ ষ, অন্তস্থ-ব, ঃ।

(গ) য-কে জ-এর সঙ্গে মিলিয়ে দিয়ে ফলা হিসেবে রাখতে হয়।

(ঘ) যুক্তব্যঞ্জনের যেগুলির উচ্চারণ বাংলায় নেই সেগুলি ত্যাগ করাই উচিত (ক্ষ = ক্‌খ = খ্‌খ)। 'ত্ন' 'ণ্ড'-র মতো যুক্তাক্ষরকে ভেঙে দেওয়া যায় ('যত্ন'-র বদলে 'যত্‌ন', 'লণ্ডন'-এর বদলে 'লন্‌ডন')।

৫. বাংলা বানানের সমস্যার ভাবনায় অধ্যাপক ক্ষুদিরাম দাসের বক্তব্য এইরকম—'বাঙ্‌লা বানানের সংস্কার প্রয়োজন হয়ে পড়েছে, কারণ, ভিন্ন ভিন্ন লেখকের হাতে একই শব্দের বিভিন্ন বানান বিভ্রান্তিকর হচ্ছে, চোখে হোঁচট খেতে হচ্ছে, আর শিশুদের ভাষাশিক্ষার বিভ্রাট ঘটছে।......বিগত বিশ-পঁচিশ বৎসরের মধ্যে যা-খুশি-তাই এর অনাচার এমনিই প্রবল হয়েছে যে আজ ভাবতে হচ্ছে বানান নিয়ে কী করা যায়।.....১৯৩৭-এর বানান সংস্কার সমিতির অনুমোদনে বহু বিকল্প রাখা হয়েছিল....বিকল্প বিধানের জন্য ভিন্ন ভিন্ন বইয়ে তো বটেই, এমনকি এক বইয়ের মধ্যেও একই শব্দের দুরকম বানান দেখা যায়।

........একই বানানের দ্বিত্ব, ত্রিত্ব—করছি-করচি-কোরছি, হল-হোল-হলো, গেল-গেলো প্রভৃতি তো চলা ঠিক নয়। সুতরাং একটা নীতি স্থির করে নিয়ে বই-লেখক এবং সাংবাদপাত্রিকদের বলে দেওয়া যে এর অন্যথা চলবে না।'

সঠিক নীতি স্থির করে তা মান্য করে তোলার এই আহ্বান থেকে অধ্যাপক দাসের দেওয়া সমাধান-সূত্রগুলি এইভাবে বেরিয়ে আসে—

(ক) সংস্কৃত শব্দের বানান যথেচ্ছভাবে বদলানো যাবে না।

(খ) যেসব বানান প্রচলিত ও প্রতিষ্ঠিত, তা জোর করে বদলানো যাবে না।

(গ) বিশ্ববিদ্যালয় বানান সংস্কার সমিতির দেওয়া বিকল্পের অবকাশ কমিয়ে আনা যেতে পারে।

(ঘ) কলকাতার অঞ্চলবিশেষে যে-রীতির উচ্চারণসহ বানান ছাপার অক্ষরে বের হচ্ছে, তা সারা বাংলায় চালানো যাবে না।

(ঙ) উচ্চারণ-অনুযায়ী সব বানান-এর স্লোগান কার্যকর করা যাবে না।

এছাড়া, এ সমস্যার সমাধান-সূত্র হিসেবে দুটি-একটি লিপি-সংস্কারের প্রস্তাবও তিনি দিয়েছেন—যেমন 'এ্যা' চিহ্নকে স্বরবর্ণের তালিকায় যুক্ত করা, ই-কারের দাঁড়িটা বাদ দেওয়া, ং-চিহ্নকে বাদ দেওয়া ইত্যাদি।

১৯২৫ থেকে ১৯৮৫ —এই ষাট বছরে বাংলা বানানের নানা সমস্যা আর তার সমাধান নিয়ে যে-ধরনের ভাবনাচিন্তা হয়েছে, তার খানিকটা আন্দাজ অবশ্যই করলেন। সেইসঙ্গে এসব ভাবনাচিন্তার মধ্যে যেমন বৈচিত্র্য দেখছেন, তেমনি একই ধরনের ভাবনা বার বার নানাজনের বক্তব্যে ঘুরে ফিরে আসতেও দেখছেন। তবে যেসব সমস্যা একালের লেখালেখিতে অত্যন্ত প্রকট এবং খানিকটা উৎকট, তাদের চিহ্নিত করে ১৯৯৭ সালে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট সমাধান-সূত্র তৈরি করে দিল পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। আকাদেমির 'বানানবিধি' যেকটি সমস্যা সংকলন করল, তা এইরকম —

তৎসম শব্দ ঃ
১. হ্রস্ব-দীর্ঘ স্বরচিহ্ন, বিশেষত ই-ঈ, উ-ঊ
২. বিসর্গ (ঃ) চিহ্নের রক্ষা/বর্জন
৩. হস্‌চিহ্নের সমস্যা
৪. রেফের নীচে ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব
৫. ঙ আর ং
৬. শ ষ স

অ-তৎসম শব্দ ঃ
১. হ্রস্ব-ই কার দীর্ঘ ঈ-কারের সমস্যা
২. কি আর কী
৩. হ্রস্ব উ-কার দীর্ঘ ঊ-কার নিয়ে
৪. শব্দান্তে ও-কার
৫. ঙ বনাম ঙ্গ
৬. জ এবং য
৭. ণ এবং ন
৮. য-ফলা
৯. শ ষ স

১০. ক্ষ এবং খ

১১. নি আর নে

বিদেশি শব্দ ঃ ১. শ স

(বিশেষ সমস্যা) ২. র-ফলা

৩. ব্যঞ্জনপূর্ব র্-রেফ

এই কুড়িটি সমস্যার সমাধান করতে কুড়িটি নিয়ম তৈরি করে দিল বাংলা আকাদেমি, এবং এইসব নিয়মনীতি যাঁরা 'জানতে এবং মানতে চান, তাঁদের হাতে সেটা পৌঁছে দিতে এবং সেই নিয়মের চেয়ে বানানটাই তাঁদের চোখের সামনে তুলে ধরতে আকাদেমি বের করল প্রায় ৪৩,০০০ শব্দ-বানানের একটি সংকলন—আকাদেমি বানান অভিধান (তৃতীয় সংস্করণ, ২০০১)।

১১৩.৫.১ সারাংশ–৩

১৯৮২ থেকে ২০০১ সময়ের মধ্যে বাংলা বানানের সমস্যা আর সমাধান নিয়ে যেসব ভাবনা-চিন্তা আর কাজ হয়েছে, তার মূলত তিনটে ভাগ। প্রথম ভাগে (১৯৮২ থেকে ১৯৮৫) অধ্যাপক পবিত্র সরকারের লেখা কিছু প্রবন্ধ, দ্বিতীয় ভাগে (১৯৮৫) পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে বাংলা-বানান-সংস্কার বিষয়টি নিয়ে আয়োজিত একটি আলোচনাচক্র, তৃতীয়ভাগে (১৯৯৭ থেকে ২০০১) বাংলা আকাদেমির কুড়ি দফা বানানবিধি আর 'আকাদেমি বানান অভিধান'-এর পরপর তিনটি সংস্করণের প্রকাশ।

প্রথম ভাগ (১৯৮২-১৯৮৫) ঃ অধ্যাপক পবিত্র সরকারের প্রবন্ধ

অধ্যাপক পবিত্র সরকার জানিয়েছেন, বাংলা বর্ণমালা আর বানান-পদ্ধতির সঙ্গে বাংলা উচ্চারণের অসংগতি পাঁচ রকমের এবং তা থেকে তৈরি বানান-সমস্যাও পাঁচরকমের—

(১) ধ্বনি আছে, বর্ণ নেই (অ্যা)।

(২) ধ্বনি একটি, প্রতীক বা বর্ণ একের বেশি (ই-ঈ ণ-ন শ-ষ-স)।

(৩) বর্ণ একটি, উচ্চারণ একইসঙ্গে একাধিক ধ্বনির (ঐ = ও-ই, ঔ = ও-উ্)

(৪) বর্ণ একটি, উচ্চারণ পৃথক ক্ষেত্রে পৃথক রকমের (অ-বর্ণের উচ্চারণে 'অজয়' শব্দে 'অ', 'অরুণ' শব্দে 'ও')

(৫) ধ্বনি একটি, রূপ একের বেশি (উ-ধ্বনির নানরকম রূপ—হু = হ্ + উ, কু = ক্ + উ, শু = শ + উ, রু = র্ + উ)

প্রথম চারটি সমস্যা বর্ণমালার উপাদানের, শেষেরটি রূপের। বানান-সমস্যার সঙ্গে-উপাদানের সমস্যার সরাসরি সম্পর্ক। অতএব বানান-সমস্যার সমাধানে সবচেয়ে জরুরি কাজ বর্ণমালার উপাদানের সংস্কার, অর্থাৎ ধ্বনি আর বর্ণচিহ্নের অসংগতি দূর করে বা কমিয়ে এনে এদের মধ্যে সহজ সম্পর্ক তৈরি করা। এটা করা সম্ভব একটি ধ্বনির জন্য একটিমাত্র বর্ণকে নির্দিষ্ট করে, বিকল্প বানান থেকে একটিমাত্র বানান বেছে নিয়ে। কিন্তু, বিকল্প বানান থেকে একটিকে বাছাই করার সমস্যা উৎস-কে মানব না উচ্চারণকে মানব এই নিয়ে। বাংলা শব্দভাণ্ডার তৎসম-অর্ধতৎসম- তদ্ভব-দেশি-বিদেশি এই পাঁচরকম শব্দে তৈরি বলে বাংলা শব্দের বানানও তৈরি হবে একাধিক নীতিতে।

অতএব, বানান-সমস্যার সমাধান-সূত্র হতে পারে এইরকম—

(ক) তৎসম শব্দের মূল বানান বজায় রাখা, মূল বানানের একাধিক বিকল্প থেকে একটি বানান বেছে নেওয়া।

(খ) অর্ধতৎসম আর তদ্ভব বানান কতটা তৎসম বানানকে অনুসরণ করবে, আর কতটা উচ্চারণ মেনে চলবে, তার মীমাংসা করা।

(গ) দেশি আর বিদেশি শব্দের বানানকে উচ্চারণ-অনুসারী করা।

(ঘ) বানান-পদ্ধতিকে সরল করার জন্য বর্ণমালার উপাদানের আবশ্যক সংস্কার করা।

দ্বিতীয় ভাগ (১৯৮৫) ঃ বাংলা-বানান-সংস্কার বিষয়ে আলোচনা-চক্র

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের উদ্যোগে আয়োজিত আলোচনা-চক্রে যাঁরা অংশ নিয়েছিলেন, তাঁদের মধ্য থেকে পাঁচজন বক্তার বক্তব্য সংক্ষেপে তুলে ধরা হল। প্রতিটি বক্তব্যেই থাকছে বাংলা বানানের সমস্যা আর তার সমাধানের সূত্র।

১. প্রবোধচন্দ্র সেনের বক্তব্য, বাংলা বানানের মূল সমস্যা সমতার অভাব—একই শব্দের নানারকম লেখার প্রবণতা। এর সমাধান, বানানকে নির্দিষ্ট নিয়মে বেঁধে দেওয়া আর সেই অনুযায়ী একটি অভিধান তৈরি করা।

২. অধ্যাপক রামেশ্বর শ’-র মতে বাংলায় বানান-সমস্যা তিনরকম—

(ক) একাধিক ধ্বনিকে একটিমাত্র বর্ণ দিয়ে লেখা (**একটা-এরা**)।

(খ) একই ধ্বনিকে একাধিক বর্ণ দিয়ে লেখা (**পণ-মন**)।

(গ) অন্যভাষার উচ্চারণ লেখার জন্য আবশ্যক বাংলা বর্ণের অভাব (Z)।

এর সমাধান করতে গেলে কিছু বর্ণ বাদ যাবে (যেমন, ই-ঈ থেকে একটি), দুটি-একটি নতুন বর্ণ তৈরি হবে (যেমন, 'অ্যা'-র জন্য)। এমনি করে প্রতিটি ধ্বনির জন্য থাকবে একটিমাত্র বর্ণ আর বানান লেখা হবে উচ্চারণ মেনে।

৩. শিশুপাঠ্য বই-এর বানানে সমতার অভাব অমিতাভ মুখোপাধ্যায়ের মতে বাংলা বানানের বড়ো সমস্যা। এর সমাধানে তিনি এমন কয়েকটি সূত্র নির্দেশ করলেন (তৎসম বানানে রেফ-যুক্ত ব্যঞ্জনে দ্বিত্ব না-দেওয়া, হ্রস্ব-দীর্ঘ বিকল্প থেকে হ্রস্বযুক্ত বানান বেছে নেওয়া, তদ্ভব-অর্ধতৎসম শব্দে কেবল হ্রস্বযুক্ত বানান, য-ণ-ক্ষ-চন্দ্রবিন্দুর উচ্ছেদ, ঙ্গ-র বদলে ঙ আর ঐ-ঔ-এর বদলে অই-অউ লেখা, আপাতত 'অ্যা' দিয়ে লেখা, ও-কার আর ঊর্ধ্বকমার বাহুল্যবর্জন ইত্যাদি), যার ফলে প্রতিটি শব্দের বানান যথাসম্ভব নির্দিষ্ট হতে পারে।

অধ্যাপক ক্ষেত্র গুপ্ত বর্ণ আর উচ্চারণের অসংগতির সমস্যা লক্ষ করলেন বাংলা বানানে। তাঁর মতে, এর সমাধানের পথ বানানকে যথাসম্ভব উচ্চারণ-মুখী করা আর প্রচলিত সরল বানানকে যথাসাধ্য বজায় রাখা। এর জন্য আবশ্যক বর্ণ-সংখ্যা সম্ভবমতো কমিয়ে আনা আর দুটি-একটি যুক্তব্যঞ্জন ভেঙে দেওয়া (ত্ন = ত্‌ন, ণ্ড = ন্‌ড)।

৫. অধ্যাপক ক্ষুদিরাম দাসের বক্তব্য, বাংলা বানানের সমস্যা হল ভিন্ন ভিন্ন লেখকের হাতে একই শব্দের বিভিন্ন বানান। বিকল্প বানানের বিধান থাকার কারণে ভিন্ন ভিন্ন বই-য়ে, এমনকী একই বই-য়েও একই শব্দের দু-রকম বানান বিভ্রান্তিকর, শিশুশিক্ষার পক্ষেও ক্ষতিকর। এর সমাধান হিসেবে তাঁর সুপারিশ, বানানের একটা সঠিক নীতি স্থির করে লেখক-সাংবাদিকদের তা মানতে বাধ্য করা। সমাধান-সূত্রগুলি এইরকম হতে পারে—সংস্কৃত এবং অন্যান্য প্রচলিত শব্দের বানান খুশিমতো না বদলানো, বিকল্প বানান কমিয়ে আনা, উচ্চারণ-অনুযায়ী বানান কার্যকর না করা। এ ছাড়া, দুটি-একটি লিপি সংস্কারের প্রস্তাবও তিনি রেখেছেন ('এ্যা' চিহ্নকে স্বরবর্ণের তালিকায় আনা, ং-চিহ্নের উচ্ছেদ ইত্যাদি)।

তৃতীয় ভাগ (১৯৯৭-২০০১) ঃ বানানবিধি আর বানান অভিধান

প্রথম আর দ্বিতীয়ভাগে বানানের যেসব সমস্যা আর তার সমাধান-সূত্র বানান-ভাবুকদের ভাবনা থেকে বেরিয়ে এল, তাদের চিহ্নিত করে ১৯৯৭ সালে কয়েকটি সুনির্দিষ্ট সমাধান-সূত্র তৈরি করল পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি। বাংলাভাষার শব্দভাণ্ডারকে তৎসম আর অ-তৎসম ভাগে ভাগ করে কুড়িটি সমস্যা নির্দিষ্ট করা হল। তার সমাধানের জন্য কুড়িটি নিয়ম তৈরি করে বের করা হল কুড়ি দফার 'বানানবিধি'। আর সেই কুড়িটি নিয়মে বেঁধে

দেওয়া বানান আগ্রহী এবং জিজ্ঞাসু মানুষের হাতে তুলে দেবার জন্য সংকলিত হল ৪৩ হাজার শব্দ-বানান, বেরিয়ে এল ‘আকাদেমি বানান অভিধান’ (প্রথম প্রকাশ ১৯৯৭ সালে, তৃতীয় সংস্করণ ২০০১ সালে)।

১১৩.৫.২ অনুশীলনী–৩

১. বাংলা বানানের সমস্যা আর সমাধান প্রসঙ্গে অধ্যাপক পবিত্র সরকারের চিন্তা-ভাবনা আর সুপারিশ সংক্ষেপে বিবৃত করুন।

২. বাংলা বানান-সমস্যা ও সমাধান বিষয়ে প্রবোধচন্দ্র সেন-ক্ষেত্র গুপ্ত-ক্ষুদিরাম দাসের বক্তব্য সংকলন করুন।

৩. কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২২-দফা ‘বাংলা বানানের নিয়ম’ থেকে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির ২০-দফা ‘বানানবিধি’-তে পৌঁছতে কোন্ কোন্ বিধিনিয়মের বর্জন সংযোজন সংশোধন ঘটল, উদাহরণসহ সেসব উল্লেখ করুন।

১১৩.৬ সহায়ক পাঠ

একক ২-এর তিনভাগে ভাগ-করা মূলপাঠের বক্তব্য বুঝতে সহায়তা করবে এই পাঁচটি বই-এর অন্তর্গত কয়েকটি বিষয়—

১. নেপাল মজুমদার সম্পাদিত ‘বানান বিতর্ক’ (বানান-সমস্যা নিয়ে লেখা আলোচনাগুলি) ঃ দ্বিতীয় সংস্করণ, মে ১৯৯৭, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি।

২. পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির ‘প্রসঙ্গ বাংলাভাষা’ (প্রবোধচন্দ্র সেন-ভূদেব চৌধুরী-ক্ষেত্র গুপ্ত-রামেশ্বর শ’-ক্ষুদিরাম দাস-অমিতাভ মুখোপাধ্যায়ের লেখা আলোচনাগুলি) ঃ

৩. পবিত্র সরকারের লেখা ‘বাংলা বানান সংস্কার : সমস্যা ও সম্ভাবনা’ (পৃ. ৫৪-৯৯ আর ১৬২-৬৯) ঃ দ্বিতীয় সংস্করণ, জানুয়ারি ১৯৯২।

৪. মণীন্দ্রকুমার ঘোষের লেখা ‘বাংলা বানান’ ‘বাংলা বানান-সমস্যা’, ‘বানান-সমস্যা’ অধ্যায়-দুটি ঃ দে’জ তৃতীয় সংস্করণ, পৌষ ১৪০০।

৫. আকাদেমি বানান অভিধানের ‘পরিশিষ্ট-১’ থেকে ২০-দফা ‘আকাদেমি গৃহীত বানানবিধি’ ঃ তৃতীয় সংস্করণ, ডিসেম্বর ২০০১।

একক ১১৪ ❑ বাংলা বর্ণমালা ও তাদের উচ্চারণ

গঠন

১১৪.১ উদ্দেশ্য

১১৪.২ প্রস্তাবনা

১১৪.৩ মূলপাঠ ১ ঃ বাংলা বর্ণমালার প্রয়োগে বিবর্তন

১১৪.৩.১ সারাংশ-১

১১৪.৩.২ অনুশীলনী-২

১১৪.৪ মূলপাঠ-২ ঃ বাংলা বর্ণ-উচ্চারণের সম্পর্ক

১১৪.৪.১ সারাংশ-২

১১৪.৪.২ অনুশীলনী-২

১১৪.৫ সহায়ক পাঠ

১১৪.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি মন দিয়ে পড়লে ধ্বনি-উচ্চারণের সঙ্গে আপনার চেনা বাংলা বর্ণমালার সম্পর্কটি ঠিক কী ধরনের, সে বিষয়ে আপনি আরও বেশি কৌতূহলী হয়ে উঠতে পারবেন। উপলব্ধি করবেন—বর্ণ-ধ্বনির সম্পর্কের মাঝখানে ফাঁক কোথায়, তা নিয়ে বিশেষজ্ঞরা কী ভাবছেন, প্রতিকারের উপায় কী। এই কৌতূহল আর উপলব্ধি আপনাকে উত্তীর্ণ করবে বাংলা বানান-সমস্যার মূল কারণটি খুঁজে নেবার দায়িত্বে।

১১৪.২ প্রস্তাবনা

একক-২-এ বাংলা বানানের যেসব সমস্যার উল্লেখ করা হল, তার মধ্যে সবচেয়ে বড়ো সমস্যা বাংলা বর্ণমালার উপাদানের সমস্যা। একে বলতে পারি বর্ণ আর ধ্বনির অনুপাতের সমস্যা, অর্থাৎ বর্ণ আর ধ্বনির সম্পর্কের সমস্যা। বর্ণের বিন্যাসই যখন বানান, তখন বর্ণ-ধ্বনির যথাযথ সম্পর্কেই

গড়ে উঠবে শব্দের সঠিক বানান। যেখানে এই সম্পর্কে ফাঁক থাকবে, সেখানেই তৈরি হবে বানান-সমস্যা। আর, বাংলা বানানের মূল সমস্যা যখন বাংলা বর্ণমালার সঙ্গে ধ্বনি-উচ্চারণের অসংগতিরই সমস্যা, তখন দেখা যাক, বর্ণমালা আর ধ্বনি-উচ্চারণের সঠিক সম্পর্কটা কী হতে পারত এবং এই মুহূর্তে সম্পর্কটা কোন্ অবস্থানে রয়েছে। চলতি এককের মূলপাঠটিতে এটাই হবে আমাদের বিবেচনার বিষয়।

১১৪.৩ মূলপাঠ-১ ঃ বাংলা বর্ণমালার প্রয়োগে বিবর্তন

প্রথমে শুনুন বাংলা বর্ণমালার কথা। দশ-এগারো শতকের চর্যাপদ থেকে শুরু করে উনিশ শতকের গোড়া পর্যন্ত বাংলা লেখায় যেসব বর্ণের প্রয়োগ চলে আসছিল, ১৮৩৩-এ তাকেই তালিকাবদ্ধ করলেন রামমোহন রায় তাঁর 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ'-এ। ১৮৫৫ সালে 'বর্ণপরিচয় প্রথমভাগে'-র প্রথম সংস্করণে এবং তার কুড়ি বছর পরে 'বর্ণপরিচয় প্রথমভাগে'-র ষষ্টিতম সংস্করণে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর বাংলা উচ্চারণের কথা মাথায় রেখে একটি নতুন বর্ণমালা বাঙালি শিশুদের জন্য তৈরি করে দিলেন। বিশ শতকের তিরিশের দশকে বর্ণমালার সংস্কার নিয়ে কিছু কিছু বিতর্ক উঠলেও, ১৯৩৬-এর 'বাংলা বানানের নিয়ম' আর ১৯৯৭-এর বাংলা আকাদেমির 'বানানবিধি' পেরিয়ে বিদ্যাসাগরের 'বর্ণপরিচয়'-এর বর্ণমালা এখনও পর্যন্ত প্রায় অব্যাহত, বদলেছে সামান্যই। নীচের অঙ্কগুলি লক্ষ করুন, তা থেকে বর্ণ-বদল খানিকটা আন্দাজ করে নিতে পারবেন—

সাল	বই	স্বরবর্ণ	ব্যঞ্জনবর্ণ	মোট বর্ণ-সংখ্যা
১৮৩৩	গৌড়ীয় ব্যাকরণ	১৬	৩৪	৫০
১৮৫৫	বর্ণপরিচয়-প্রথমভাগ (প্রথম সংস্করণ)	১২	৩৯	৫১
১৮৭৫	ঐ (ষষ্টিতম সংস্করণ)	১২	৪০	৫২
১৯৫২	চলন্তিকা	১১ (+১)	৩৯	৫০ (+১)
২০০১	আকাদেমি বানান অভিধান (৩য় সংস্করণ)	১১ (+১)	৩৯	৫০ (+১)

এবারে দেখুন কোন্ বই-য়ে কী ধরনের বর্ণমালার নির্ধারণ হয়ে অবশেষে একুশ শতকের গোড়ায় কোন্ বর্ণমালা আমাদের হাতে পৌঁছেছে—

১. **রামমোহন রায়ের ‘গৌড়ীয় ব্যাকরণ’ (১৮৩৩)**

অ	আ	ই	ঈ			
উ	ঊ	ঋ	ৠ	ঌ	ৡ	
এ	ঐ	ও	ঔ	অং	অঃ	স্বরবর্ণ = ১৬
ক	খ	গ	ঘ	ঙ		
চ	ছ	জ	ঝ	ঞ		
ট	ঠ	ড	ঢ	ণ		
ত	থ	দ	ধ	ন		
প	ফ	ব*	ভ	ম		* বর্গীয় ব
য	র	ল	ব**	শ		** অন্তঃস্থ ব
ষ	স	হ	ক্ষ			ব্যঞ্জনবর্ণ = ৩৪
						মোট বর্ণসংখ্যা = ৫০

২. **ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের ‘বর্ণপরিচয়-প্রথমভাগ’ (১৮৫৫, ১৮৭৫)**

অ	আ	ই	ঈ		
উ	ঊ	ঋ	ঌ		
এ	ঐ	ও	ঔ		স্বরবর্ণ = ১২
ক	খ	গ	ঘ	ঙ	
চ	ছ	জ	ঝ	ঞ	
ট	ঠ	ড	ঢ	ণ	
ত	থ	দ	ধ	ন	

প	ফ	ব*	ভ	ম	* বর্গীয় ব
য	র	ল	ব**	শ	** অন্তঃস্থ ব
ষ	স	হ	ড়	ঢ়	*** ১৮৫৫-র প্রথম সংস্করণে ছিল না।
য়	ং	ঃ	ঁ	ৎ***	ব্যাঞ্জনবর্ণ = ৪০

মোট বর্ণসংখ্যা = ৫২

৩. **রাজশেখর বসুর 'চলন্তিকা' (১৯৫২)/পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির 'আকাদেমি বানান অভিধান' (৩য় সং-২০০১)**

অ (+অ্যা)		আ	ই	ঈ		+ প্রকাশ্যে বর্ণ নয়, অথচ স্বতন্ত্র প্রয়োগ
উ		ঊ	ঋ			
এ		ঐ	ও	ঔ		স্বরবর্ণ = ১১ (+১)
ক		খ	গ	ঘ	ঙ	
চ		ছ	জ	ঝ	ঞ	
ট		ঠ	ড	ঢ	ণ	
ত		থ	দ	ধ	ন	
প		ফ	ব	ভ	ম	
য		র	ল	শ		
ষ	স	হ	ড়	ঢ়		
য়	ৎ	ং	ঃ	ঁ		ব্যঞ্জনবর্ণ = ৩৯

মোট বর্ণসংখ্যা ৫০ = (+১)

পুরোনো বাংলার ৫০টি বর্ণকে অবিকল রেখেই রামমোহন যখন তালিকাবদ্ধ করলেন, তখন বদলে-যাওয়া উচ্চারণের কথা তিনি ভাবেন নি। তবে তিনি লক্ষ করেছিলেন—'ণ য ব ষ ঋ ৠ ৯ ঐ অং অঃ—এই কয় অক্ষর সংস্কৃত পদ ব্যতিরেকে গৌড়ীয় ভাষায় প্রাপ্ত হয় না।' এর পর বিদ্যাসাগর যখন ঐ ৫০টি বর্ণে কিছু বর্জন স্থানান্তরণ সংযোজন করে ৫২টি বর্ণ সাজালেন, তখন বাঙালির উচ্চারণের

কথা মাথায় রেখেই তিনি সেসব করলেন। ১৮৫৫ আর ১৮৭৫ এর 'বর্ণপরিচয়—প্রথমভাগে'র বিজ্ঞাপন দুটির অংশবিশেষ পড়ে দেখুন—

প্রথম সংস্করণ (এপ্রিল ১৮৫৫) ঃ

'বাঙ্গালা ভাষায় দীর্ঘ ঋৃকার ও দীর্ঘ ৯ কারের প্রয়োগ নাই; এই নিমিত্ত ঐ দুই বর্ণ পরিত্যক্ত হইয়াছে। আর, সবিশেষ অনুধাবন করিয়া দেখিলে, অনুস্বর ও বিসর্গ স্বরবর্ণমধ্যে পরিগণিত হইতে পারে না; এজন্য ঐ দুই বর্ণ ব্যঞ্জনবর্ণের মধ্যে পঠিত হইয়াছে। আর চন্দ্রবিন্দুকে ব্যঞ্জনবর্ণস্থলে এক স্বতন্ত্র বর্ণ বলিয়া গণনা করা গিয়াছে। ড, ঢ, য এই তিন ব্যঞ্জনবর্ণ, পদের মধ্যে অথবা পদের অন্তে থাকিলে, ড়, ঢ়, য় হয়;.....যখন আকার ও উচ্চারণ উভয়ের পরস্পর ভেদ আছে, তখন উহাদিগকে স্বতন্ত্র বর্ণ বলিয়া উল্লেখ করাই উচিত;....ক ও ষ মিলিয়া ক্ষ হয়, সুতরাং সংযুক্ত বর্ণ; এজন্য, অসংযুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ গণনাস্থলে পরিত্যক্ত হইয়াছে।'

ষষ্টিতম সংস্করণ (ডিসেম্বর ১৮৭৫) ঃ

'বাঙ্গালা ভাষায় ত-কারের ত, ৎ এই দ্বিবিধ কলেবর আছে; দ্বিতীয় কলেবরের নাম খণ্ড ত-কার। ঈষৎ, জগৎ, প্রভৃতি সংস্কৃত শব্দ লিখিবার সময়, খণ্ড ত-কার ব্যবহৃত হইয়া থাকে।'

এবার লক্ষ করুন, উপরের তিনটি বর্ণমালায় বর্ণ-বদল কীভাবে কতটুকু ঘটেছে গত ১৭০ বছরে। 'গৌড়ীয় ব্যাকরণে'-র যে ৫০টি বর্ণ (স্বরবর্ণ ১৬টি আর ব্যঞ্জনবর্ণ ৩৪টি) বিদ্যাসাগরের হাতে এল, বিদ্যাসাগর তা থেকে বর্জন করলেন ২টি স্বরবর্ণ (ঋৃ, ৯ৣ) আর ১টি ব্যঞ্জনবর্ণ (ক্ষ), ব্যঞ্জন-তালিকায় স্থানান্তর করলেন ২টি স্বরবর্ণ (অং, অঃ), আর ১৮৫৫ সালে সংযোগ করলেন ৪টি ব্যঞ্জনবর্ণ (ড়, ঢ়, য়, ঁ), ১৮৭৫ সালে আরও একটি বর্ণ (ৎ)। এর ফলে 'বর্ণপরিচয়ের' বর্ণসংখ্যা হল ৫২ (স্বরবর্ণ ১২টি আর ব্যঞ্জনবর্ণ ৪০টি)।

রাজশেখর বসুর 'চলন্তিকা' অভিধান ১৯৫২ সালের সংস্করণে বিদ্যাসাগরী বর্ণমালার অর্ন্তগত ২টি বর্ণকে ছাঁটাই করেছে—স্বরবর্ণ '৯' আর ব্যঞ্জনবর্ণ 'অন্তঃস্থ ব'। সেই সঙ্গে স্বরবর্ণ-তালিকার সঙ্গে পরোক্ষে যুক্ত করেছে আর-একটি বর্ণ—'অ্যা'। ১৯৯৭-তে বাংলা আকাদেমির 'আকাদেমি বানান অভিধান' 'চলন্তিকা'-র বর্ণ-প্রয়োগকেই অনুসরণ করেছে। তবে 'অ্যা'-কে স্বতন্ত্র স্বরবর্ণ হিসেবে গণ্য করা আর 'অন্তঃস্থ ব' কে বাংলা বর্ণমালা থেকে বহিষ্কার করা নিয়ে একটা দ্বিধা থাকছেই 'চলন্তিকা'য় আর 'আকাদেমি বানান অভিধানে'। 'অ্যা একটি স্বতন্ত্র স্বর'—'ভূমিকায় একথা মেনে নিয়েও 'চলন্তিকা'-কার অ্যা-বর্ণটিকে অ-বর্ণের অর্ন্তগত করে দেখিয়েছেন (অ + ্য + া)। ১৯৯৭-এর প্রথম সংস্করণে 'আকাদেমি বানান অভিধান' অ্যা-কে প্রকাশ্যে স্বতন্ত্র বর্ণের মর্যাদা দিল 'অ' আর 'আ' র

মাঝখানে রেখে। কিন্তু ১৯৯৮-এর দ্বিতীয় সংস্করণে 'অ্যা' সে মর্যাদা হারিয়ে অ-বর্ণের অর্ন্তগত হল। 'অন্তস্থ ব' দুটি অভিধান থেকেই বাদ পড়েছে, কিন্তু অভিধান-রচয়িতাদের ভাবনা থেকে বাদ পড়ে নি। তাই, দুটি অভিধানেই 'বর্গীয় ব' আর 'অন্তস্থ ব'-কে একই সঙ্গে প-বর্গের অর্ন্তগত বর্ণ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। অবশেষে 'চলন্তিকা' আর 'বানান অভিধানে' বর্ণসংখ্যা দাঁড়াল ৫০ ('অ্যা'-কে ধরে ৫১)—এর মধ্যে স্বরবর্ণ ১১টি ('অ্যা'-কে ধরে ১২টি) আর ব্যঞ্জনবর্ণ ৩৯টি।

১১৪.৩.১ সারাংশ-১

১৮৩৩ সালে রামমোহন রায় তাঁর 'গৌড়ীয় ব্যাকরণ'-এ মোট ৫০টি বাংলা বর্ণের তালিকা তৈরি করেছিলেন (স্বরবর্ণ ১৬টি আর ব্যঞ্জনবর্ণ ৩৪টি)। দশ-এগারো শতকের চর্যাপদ থেকে উনিশ শতকের গোড়া পর্যন্ত যা-কিছু লেখা, তাতে ঐ ৫০টি বর্ণেরই প্রয়োগ ছিল। ১৮৫৫ সালে 'বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগে'-র প্রথম সংস্করণে ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর ঐ ৫০টি বর্ণ থেকে বাদ দিলেন ২টি স্বরবর্ণ (ৠ, ৡ) আর ১টি ব্যঞ্জনবর্ণ (ক্ষ), ব্যঞ্জন-তালিকায় সরিয়ে দিলেন ২টি স্বরবর্ণ (অং, অঃ), যোগ করলেন ৪টি ব্যঞ্জনবর্ণ (ড়, ঢ়, য়, ঁ)। ১৮৭৫ সালের সংস্করণ যুক্ত হল আরও ১টি ব্যঞ্জনবর্ণ (ৎ)। অতএব, বর্ণপরিচয়ের বর্ণ-সংখ্যা দাঁড়াল ৫২ (স্বরবর্ণ ১২টি আর ব্যঞ্জনবর্ণ ৪০টি)। ১৯৫২ সালের 'চলন্তিকা' অভিধানে রাজশেখর বসু ১টি স্বরবর্ণ (ঌ) আর ১টি ব্যঞ্জনবর্ণ (অন্তঃস্থ ব) ছাঁটাই করলেন, আর পরোক্ষে যুক্ত করলেন ১টি স্বরবর্ণ (অ্যা)। এবারে বর্ণ-সংখ্যা আবার নেমে এল ৫১-তে (স্বরবর্ণ ১২টি, ব্যঞ্জনবর্ণ ৩৯টি)। ১৯৯৭-র 'আকাদেমি বানান অভিধান' চলন্তিকা-কেই' অনুসরণ করল। তবে ১৯৯৮ দ্বিতীয় আর ২০০১-এর ৩য় সংস্করণে 'অ্যা' পৃথক বর্ণের মর্যাদা হারিয়ে 'অ'-র অর্ন্তগত হল। বর্ণসংখ্যা আবার নেমে এল ৫০-এ (স্বরবর্ণ ১১টি আর ব্যঞ্জনবর্ণ ৩৯টি)। 'অ্যা'-কে ধরে অবশ্য স্বরবর্ণ ১২টি, বর্ণ-সংখ্যা ৫১।

১১৪.৩.২ অনুশীলনী-১

১. ১৮৩৩ থেকে ২০০১—এই সময়ের মধ্যে বাংলা বর্ণমালার বিবর্তন কীভাবে ঘটেছে, বুঝিয়ে দিন।

২. রামমোহন রায়ের পরিকল্পিত বাংলা বর্ণমালার ত্রুটি আর অসম্পূর্ণতা ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর কীভাবে এবং কী কী কারণে সংশোধন করলেন, দেখিয়ে দিন।

৩.(ক) রামমোহন রায়ের তৈরি বাংলা বর্ণমালা থেকে কোন্ কোন্ বর্ণ এ যাবৎ বর্জন করা হয়েছে, কারণসহ উল্লেখ করুন।

(খ) রামমোহন রায়ের তৈরি বাংলা বর্ণমালার সঙ্গে পরবর্তীকালে কোন্ কোন্ বর্ণ সংযোজিত হয়েছে, কারণসহ উল্লেখ করুন।

১১৪.৪ মূলপাঠ—২ ঃ বাংলা বর্ণ-উচ্চারণের সম্পর্ক

'বর্ণপরিচয়'-এর বর্ণমালায় খণ্ড ৎ-সংযোগের (১৮৭৫) পর এক-শ বছরের বেশি সময় কেটে গেছে। বর্ণ আর উচ্চারণের সম্পর্ককে সহজ করার কথা নানাজনে নানাভাবে ভেবেছেন, এখনও ভাবছেন। তবু এ বিষয়ে অগ্রগতি সামান্যই ঘটেছে, বর্ণমালা থেকে উচ্ছেদ হয়েছে কেবল প্রয়োগহীন 'ঌ' আর উচ্চারণহীন 'অন্তস্থ ব'-এর। 'সহজ সম্পর্ক' বলতে আমরা বুঝব একটি বর্ণের একটিই নির্দিষ্ট উচ্চারণ। অথবা বিপরীত দিক থেকে বুঝব, একটি ধ্বনির উচ্চারণ বোঝাতে একটি নির্দিষ্ট বর্ণ বা প্রতীক-চিহ্নের প্রয়োগ। রাজশেখর বসুর 'চলন্তিকা' আর বাংলা আকাদেমির 'বানান অভিধান' যে সর্বশেষ বর্ণমালার নির্দেশ দিচ্ছে, তাকে আশ্রয় করেই দেখা যাক, বর্ণ আর উচ্চারণের চলতি সম্পর্কটি কী ধরনের—

বর্ণ	উচ্চারণ	সম্পর্ক
অ	অ (অমন), ও (অমনি)	১টি বর্ণের ২টি উচ্চারণ
আ	আ (গোন), অ্যা (জ্ঞান)	১টি বর্ণের ২টি উচ্চারণ
ই, ঈ	ই (যদি, নদী)	২টি বর্ণের ১টি উচ্চারণ
উ, ঊ	উ (মধু, বধূ)	২টি বর্ণের ১টি উচ্চারণ
ঋ	রি (ঋতু = রিতু)	স্বরবর্ণের ব্যঞ্জন উচ্চারণ
x	অ্যা (অ্যাসিড)	উচ্চারণ আছে, বর্ণ নেই।
এ	অ্যা (এক), এ (একটি)	১টি বর্ণের ২টি উচ্চারণ।
ঐ	ও-ই্	১টি বর্ণে ২টি ধ্বনির সম্মিলিত উচ্চারণ।

বর্ণ	উচ্চারণ	সম্পর্ক
ও	ও	১টি বর্ণের ১টি উচ্চারণ
ঔ	ও-উ্	১টি বর্ণে ২টি ধ্বনির সম্মিলিত উচ্চারণ
ক, খ, গ, ঘ	ক, খ, গ, ঘ	প্রতিটি বর্ণের ১টি করে উচ্চারণ।
ঙ, ং	ঙ (অঙ্ক, শংকর)	২টি বর্ণের ১টি উচ্চারণ
চ, ছ	চ, ছ	প্রতিটি বর্ণের ১টি করে উচ্চারণ
জ, য	জ (জখম, যখন)	২টি বর্ণের ১টি উচ্চারণ
ঝ	ঝ	১টি বর্ণের ১টি উচ্চারণ
ঞ, ণ, ন	ন (রঞ্জিত, রণিত, রন্ধন)	৩টি বর্ণের ১টি উচ্চারণ
ট, ঠ, ড, ঢ	ট, ঠ, ড, ঢ	প্রতিটি বর্ণের ১টি করে উচ্চারণ
ত, ৎ	ত (ঝনাত, ঝনাৎ)	২টি বর্ণের ১টি উচ্চারণ
থ, দ, ধ	থ, দ, ধ	প্রতিটি বর্ণের ১টি করে উচ্চারণ
প, ফ, ব, ভ, ম	প, ফ, ব, ভ, ম	প্রতিটি বর্ণের ১টি করে উচ্চারণ
র, ল	র, ল	প্রতিটি বর্ণের ১টি করে উচ্চারণ
শ, ষ	শ (পোশাক, পোষা)	২টি বর্ণের ১টি করে উচ্চারণ
স	স, শ (বস্তি, বসতি)	১টি বর্ণের ২টি উচ্চারণ
হ, ঃ	হ (বাদশাহ, বাঃ)	২টি বর্ণের ১টি উচ্চারণ
ড়, ঢ়, য়, ঁ	ড়, ঢ়, য়, ঁ	প্রতিটি বর্ণের ১টি করে উচ্চারণ

চলতি বর্ণমালার অর্ন্তগত ৫০টি বর্ণের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট উচ্চারণের সম্পর্ক যেভাবে দেখানো হল, তা থেকে এই কটি তথ্য আপনি পাবেন—

১. বর্ণ-উচ্চারণের সহজ সম্পর্ক (একটি বর্ণের একটিই উচ্চারণ) তৈরি আছে ২৬টি বর্ণের ক্ষেত্রে (ও, ক, খ, গ, ঘ ইত্যাদি)।

২. বর্ণ-উচ্চারণে সহজ সম্পর্ক নেই বাকি যে ২৪টি (বা 'অ্যা' ধরে ২৫টি) ক্ষেত্রে, তার বিভাজন এইরকম ঃ

(ক) একাধিক (২টি বা ৩টি) বর্ণের একই উচ্চারণ = ১৭টি বর্ণের ক্ষেত্রে (ই-ঈ, উ-ঊ, ঙ-ং, জ-য, ত-ৎ, শ-ষ, হ-ঃ, ঞ-ণ-ন)।

(খ) একটি বর্ণের একাধিক উচ্চারণ (অ, আ, এ, স) = ৪টি বর্ণের ক্ষেত্রে।

(গ) একটি বর্ণে দুটি ধ্বনির সম্মিলিত উচ্চারণ (ঐ, ঔ) = ২টি বর্ণের ক্ষেত্রে।

(ঘ) স্বরবর্ণে ব্যঞ্জনধ্বনির উচ্চারণ (ঋ) = ১টি বর্ণের ক্ষেত্রে।

(ঙ) ধ্বনির উচ্চারণ আছে অথচ স্বতন্ত্র বর্ণ নেই, এমন ক্ষেত্রও ১টি রয়েছে (অ্যা)।

এখানে খেয়াল করতে হবে, স্বরচিহ্ন (া ি ী ু ূ ৃ ......), যুক্ত ব্যঞ্জনবর্ণ, ব্যঞ্জনচিহ্ন (্য ......) এখনও পর্যন্ত আমাদের বিবেচনার বাইরে।

২-নং তথ্য থেকে বর্ণ আর উচ্চারণের অসংগতির যে ক্ষেত্রগুলি বেরিয়ে এল, বাংলা বানান-সমস্যার মূলে সেগুলি কাজ করে চলেছে আজও পর্যন্ত। আর, এই অসংগতি বা অসাম্য ক্রমশ দানা বেঁধে উঠছে শতাধিক বছর ধরে। এর কারণ, বাংলা বর্ণমালার গোটাটাই সংস্কৃত বর্ণমালা থেকে নেওয়া, সংস্কৃত বর্ণমালার আদলেই তৈরি। বাংলাভাষার শব্দভাণ্ডারের একটা বড়ো অংশ তৎসম শব্দ এবং এসব শব্দের বানানের পুরো দায় এই বর্ণমালা এখনও বহন করে চলছে। অথচ সংস্কৃতের অনেক ধ্বনি আর তার উচ্চারণ বাংলায় এখন নেই। আসলে বাংলার বর্ণমালা সংস্কৃতের, আর ধ্বনিগুলি বাংলার। সংস্কৃতে বর্ণ আর ধ্বনির অসাম্য ছিল না, প্রতিটি বর্ণেরই ছিল স্বতন্ত্র ধ্বনি, স্বতন্ত্র উচ্চারণ। কিন্তু সংস্কৃতের সেসব বর্ণ বাংলায় এসে বাংলার নিজস্ব ধ্বনির সঙ্গে অংশত মিলছে, অনেকটাই মিলতে পারছে না। ২(ক) থেকে ২(ঘ)-এর অসংগতিগুলি তারই ফল। অন্যদিকে সংস্কৃতে অ্যা-ধ্বনির উচ্চারণ না থাকার কারণে বাংলা বর্ণমালাও বাংলাভাষার গুরুত্বপূর্ণ এই ধ্বনিটির পক্ষে যোগ্য কোনও বর্ণের বরাদ্দ করে উঠতে পারে নি। ২(ঙ) এর অসংগতি এটাই। এর পাশাপাশি আরও কিছু বিদেশি ধ্বনির (Z) কথাও ভাবতে পারি, বাংলাভাষার অর্ন্তভুক্ত হয়েও যাদের যথাযোগ্য বর্ণ জোটে নি এখনও। Z-এর উচ্চারণ বোঝাতে পরশুরামকে লিখতে হল—'হয় হয়, Zা নতি পার না'। রবীন্দ্রনাথ তো অনেক আগেই (১৯৩১)-এ নিয়ে তাঁর উদ্বেগের কথা জানিয়েছিলেন—'যেহেতু বাংলা অক্ষরে বিদেশী কথা সর্ব্বদাই লিখতে হচ্ছে সেইজন্যে অনেক নূতন ধ্বনির জন্যে নূতন অক্ষর রচনা করা আবশ্যক।' এর সঙ্গে একটুখানি নৈরাশ্যও ধ্বনিত হল তাঁর কণ্ঠে—'আমাদের মনটা সাবেককেলে বলে শীঘ্র এর কোনো কিনারা হবে বলে বোধ হয় না।'

বর্ণ আর ধ্বনি-উচ্চারণের এসব অসংগতি দূর করে বাংলা বানানকে আরও সরল এবং বিজ্ঞানসম্মত করার জন্য মূলত এইরকম প্রস্তাব এসেছে বলে অধ্যাপক পবিত্র সরকার জানিয়েছেন—

ক. বর্জনের প্রস্তাব ঃ

যেসব বর্ণ বাংলায় উচ্চারিত হয় না সেগুলি বর্জন করা হোক, যেমন ঈ ঊ ঋ ঌ ণ য অন্তঃস্থ-ব ষ। আর ৎ বর্জিত হোক, কারণ শুধু ত দিয়েই কাজ চালানো যায়......। অনুস্বার বা ঙ-এর যেকোনো একটি বর্জিত হোক।

খ. সংযোজনের প্রস্তাব ঃ

'অ্যা' ধ্বনিটির নিজস্ব একটি বর্ণ তৈরি এবং সংযোজিত হোক।

গ. সরলীকরণের প্রস্তাব ঃ

ঐ ঔ যুক্তস্বর। বাংলায় আরও অন্তত পনেরোটি এ ধরনের যুক্তস্বর আছে—আয়, আই, অয়্ ইত্যাদি। সেগুলি যদি ভেঙে লেখা যায় ঐ ঔ-কে ওই ওউ ....লেখা যাবে না কেন?'

ক-প্রস্তাবের অর্ন্তগত ঌ আর অন্তঃস্থ-ব সম্পর্কে পবিত্রবাবুর বক্তব্য—'ঌ বাদ দেব এই কারণে যে, কোনো বাংলা শব্দ লেখায় ঌ-এর ব্যবহার নেই....সংস্কৃত অন্তঃস্থ ব ছিল 'ওয়' বা ইংরেজি w-এর মতো উচ্চারণে। বাংলায় 'ব' লিখে সে উচ্চারণ আমরা কখনোই করি না। তার সঙ্গে প ফ ব-এর যে ব—তার কোনো তফাতই নেই। তাহলে এই অবান্তর বর্ণটিকে রাখি কেন বর্ণমালায় খামোখা। একটি ব দিয়েই আমাদের দিব্যি কাজ চলে যাবে।'

অধ্যাপক সরকারের এই বক্তব্যের আগেই 'চলন্তিকা' থেকে এবং পরে 'বানান অভিধান' থেকে ঌ আর অন্তঃস্থ ব বাদ পড়ে গেছে, এটা নিশ্চয় লক্ষ করেছেন। কেবল কোনও কোনও শিশুপাঠ্য বই-এর পাতায় বর্ণদুটি এখনও জ্বলজ্বল করছে। বাংলা উচ্চারণে অন্তঃস্থ ব যেমন নেই, তেমনি নেই ঈ-ঊকারের দীর্ঘতা, ঋ-কারের স্বরত্ব। সার্থকতা নেই একই উচ্চারণে দুটি বা তিনটি বর্ণকে পাশাপাশি ধরে রাখার (ঙ-ং জ-য ত-ৎ শ-ষ-হ ঃ ঞ-ণ-ন)। অতএব, সংগত কারণেই মান্য করা যায় ক-চিহ্নিত 'বর্জনের প্রস্তাব', একই কারণে বর্জন করা যায় 'ঃ'-কেও।

লক্ষ করুন, ক-চিহ্নিত 'বর্জনের প্রস্তাব' (ঃ-কে যুক্ত করে) মান্য হলে মুছে যাবে ২(ক)-এর অর্ন্তগত একাধিক বর্ণের একই উচ্চারণের অসংগতি, একটি বর্ণ নির্দেশ করবে একটি নির্দিষ্ট উচ্চারণকে, বর্ণসংখ্যা ১৭ থেকে নেমে আসবে ৮টিতে (ই, উ, ঙ, জ, ত, শ, হ, ন)। সেই সঙ্গে মুছে যাবে ২(ঘ)-এর অর্ন্তগত, অবান্তর ঋ-বর্ণটি।

খ-চিহ্নিত ‘সংযোজনের প্রস্তাব’ গ্রাহ্য হলে মিটে যাবে ২(ঙ)-র অর্ন্তগত বর্ণহীন অ্যা-উচ্চারণের নিজস্ব বর্ণের অভাব। আর, গ-চিহ্নিত ‘সরলীকরণের প্রস্তাব’ কার্যকর হলে ২(গ)-র অর্ন্তগত ঐ আর ঔ তাদের ‘একটি বর্ণে দুটি ধ্বনির সম্মিলিত উচ্চারণের’ অনাবশ্যক দায় থেকে মুক্ত হতে পারে, পরিবর্তে দুটি করে বর্ণের প্রয়োগ চলতে পারে দুটি ধ্বনির উচ্চারণে (ও-ই, ও-উ)। অর্থাৎ, ক খ গ-চিহ্নিত প্রস্তাব তিনটি গৃহীত হওয়ার অর্থ আমাদের ২(ক) ২(গ) ২(ঘ) আর ২(ঙ)-র অর্ন্তগত বর্ণ-উচ্চারণের অসংগতির সঙ্গে জড়ানো ২০-টি বর্ণের মুক্তিলাভ। কেবল বাকি থাকে ২(খ)-এর অর্ন্তগত ‘একটি বর্ণের একাধিক উচ্চারণ (অ, আ, এ, স)’। তবে এই তুচ্ছ অসংগতি আমরা সহজেই দূর করতে পারি উচ্চারণ-অনুযায়ী বর্ণ প্রয়োগ করে। যেমন ধরুন, আমরা লিখব ‘অমনি’-র বদলে ‘ওমনি’, ‘এক’-এর বদলে ‘অ্যাক’, ‘বসতি’-র বদলে ‘বশতি’।

ধরা যাক, পবিত্রবাবুর উল্লেখ থেকে পাওয়া তিনটি প্রস্তাবই বাংলাভাষী মানুষ গ্রহণ করলেন, এবং বাংলাভাষার বর্ণ আর উচ্চারণের মধ্যে সামগ্রিকভাবেই একটি সহজ সম্পর্ক তৈরি হল। সংস্কৃতভাষার বর্ণ-উচ্চারণে যে সমতা ছিল, বাংলা-বর্ণ-উচ্চারণেও তাই ঘটল। তাহলে আমাদের বর্ণমালার চেহারাটা হবে এই রকম—

অ	আ	অ্যা			
ই	উ	এ	ও		স্বরবর্ণ = ৭
ক	খ	গ	ঘ	ঙ	
চ	ছ	জ	ঝ		
ট	ঠ	ড	ঢ		
ত	থ	দ	ধ	ন	
প	ফ	ব	ভ	ম	
র	ল	শ	স	হ	
ড়	ঢ়	য়	ঁ		ব্যঞ্জনবর্ণ = ৩২
					মোট বর্ণসংখ্যা = ৩৯

বাংলা বানান-সংস্কারের প্রসঙ্গে বর্ণমালার পরিবর্তনের প্রস্তাব বারে বারেই উঠেছে। কিন্তু বর্ণমালার পরিবর্তনের ব্যাপারে আমরা রক্ষণশীলতা কাটিয়ে উঠতে পারি নি। সেইকারণে, শতাধিক বছরের পুরোনো বিদ্যাসাগরী বর্ণমালা থেকে কেবলমাত্র ২টি বর্ণের (ঌ আর অন্তঃস্থ-ব) উচ্ছেদ ঘটিয়েই বাংলা আকাদেমিকেও থামতে হল। অতএব, এইমাত্র যে বর্ণমালার ছকটি দেখতে পেলেন,

তা যতই বাঞ্ছিত হোক, অদূর ভবিষ্যতে প্রকাশ্য হয়ে ওঠা তার পক্ষে অসাধ্য। বাংলা বর্ণ আর উচ্চারণের অসাম্য যতদিন থাকবে, বাংলা বানানের সমতাবিধানও ততদিন দুঃসাধ্যই থেকে যাবে।

১১৪.৪.১ সারাংশ—২

বানান-সমস্যার সমাধান করতে বর্ণ আর উচ্চারণের সম্পর্ককে সহজ করার ভাবনা চলছে দীর্ঘকাল ধরে। বর্ণ-উচ্চারণের সহজ সম্পর্ক বলতে বুঝব একটি বর্ণের একটিই নির্দিষ্ট উচ্চারণ অথবা একটি ধ্বনির উচ্চারণ বোঝাতে একটি নির্দিষ্ট বর্ণের প্রয়োগ। চলতি বর্ণমালার অর্ন্তগত ৫০টি বর্ণের সঙ্গে প্রচলিত উচ্চারণের সম্পর্ক মিলিয়ে দেখলে আপনি জানতে পারবেন, ২৬টি ক্ষেত্রে বর্ণ-উচ্চারণের সহজ সম্পর্ক তৈরি হয়েই আছে। বাকি ২৪টি ক্ষেত্রে বর্ণ-উচ্চারণের সম্পর্কে অসংগতি এখনও রয়েছে। এর প্রথম কারণ, বাংলা বর্ণমালা সংস্কৃত বর্ণমালার আদলেই তৈরি। অথচ, সংস্কৃতের অনেক ধ্বনি বা উচ্চারণ বাংলায় এখন নেই। দ্বিতীয় কারণ, সংস্কৃতে ছিলই না এমন ধ্বনিও (অ্যা) বাংলায় এসেছে। এমনকী, দুটি-একটি বিদেশি ধ্বনি বাংলাভাষার অর্ন্তভুক্ত হয়েও যথাযোগ্য বর্ণ পায় নি (Z)।

বর্ণ-উচ্চারণের এসব অসংগতি দূর করে বানানকে সরল করার পক্ষে মূলত তিনটি প্রস্তাবের উল্লেখ অধ্যাপক পবিত্র সরকার করছেন—

(ক) বর্জিত হোক অনুচ্চারিত ঈ ঊ ঋ ৯ ঞ ণ য অন্তঃস্থ-ব ষ, অনাবশ্যক ৎ আর ং-ঙ-এর যেকোনো একটি।

(খ) যুক্ত হোক ‘অ্যা’ ধ্বনিটির নিজস্ব একটি বর্ণ।

(গ) সরলীকরণ হোক ঐ ঔ-এর মতো যুক্তস্বরগুলির, লেখা হোক ওই ওউ ইত্যাদি।

ক-চিহ্নিত বর্জনের প্রস্তাব মেনে নিলে একাধিক বর্ণের একই উচ্চারণ থাকার সমস্যাটি মুছে যাবে। খ-চিহ্নিত প্রস্তাব গ্রাহ্য হলে বর্ণহীন ‘অ্যা’-ধ্বনিটি পাবে একটি নির্দিষ্ট বর্ণ। গ-চিহ্নিত সরলীকরণের প্রস্তাব কার্যকর হলে যুক্তস্বরের জন্য পৃথক বর্ণ অনাবশ্যক হয়ে পড়বে, বানান সহজ হবে। এই তিনটি উপায়ে বর্ণ-উচ্চারণের অসংগতি দূর হতে পারে ২০টি বর্ণের ক্ষেত্রে। এছাড়া, বাকি ৪টি বর্ণের (অ, আ, এ, স) একাধিক উচ্চারণের সমস্যাটিও সহজেই দূর করা সম্ভব উচ্চারণ-অনুযায়ী বর্ণ প্রয়োগ করে (‘অমনি-র বদলে ‘ওমনি’, ‘এক-এর বদলে ‘অ্যাক’, ‘বসতি’-র বদলে ‘বশতি’ লিখে)। এমনি করে বর্ণ-উচ্চারণের সম্পর্কটি যখন সহজ হয়ে আসবে, বাংলা বর্ণমালার বর্ণ-সংখ্যাও তখন ৫০ থেকে নেমে আসবে মাত্র ৩৯-এ। বাংলা বানানে সমতা আনতে এই প্রক্রিয়া এখন জরুরি হয়ে পড়েছে।

১১৪.৪.২ অনুশীলনী—২

১. বাংলা বর্ণ আর উচ্চারণের সংগতি আর অসংগতির নির্দিষ্ট ক্ষেত্রগুলি পরপর দেখিয়ে দিন।

২. বাংলা বর্ণের সঙ্গে বাংলা উচ্চারণের অসংগতির কারণগুলি বিশ্লেষণ করুন।

৩. বাংলা বর্ণ আর উচ্চারণের অসংগতি দূর করার পক্ষে বানান-ভাবুকদের কাছ থেকে কী ধরনের প্রস্তাব উঠে আসছে এবং সেসব প্রস্তাব কার্যকর হলে অসংগতি কীভাবে কতটা দূর হতে পারে, এ বিষয়ে আলোচনা করুন।

৪. (ক) নীচের বর্ণগুলির সঙ্গে উচ্চারণের সম্পর্ক কী ধরনের, ১টি করে উদাহরণ দিয়ে দেখান—অ, ঋ, এ, ঔ, ঝ, স।

(খ) নীচের উচ্চারণগুলির জন্য বাংলায় কোন্ কোন্ বর্ণ প্রয়োগ করা হয়, ১টি করে উদাহরণ দিয়ে দেখান—ই, অ্যা, জ, ত, ন, শ, হ।

(গ) বাংলায় কোন্ কোন্ বর্ণের ২টি করে উচ্চারণ, বানানের উদাহরণ দিয়ে দেখান।

(ঘ) বাংলায় কোন্ কোন্ উচ্চারণের জন্য ২টি করে বর্ণের প্রয়োগ ঘটে, বানানের উদাহরণ দিয়ে দেখান।

১১৪.৫ সহায়ক পাঠ

একক-৩-এর আলোচ্য বিষয় বুঝতে সুবিধে হবে নীচের বইগুলি থেকে প্রাসঙ্গিক লেখাগুলি পড়ে নিলে—

১. মণীন্দ্রকুমার ঘোষের লেখা 'বাংলা বানান' থেকে 'বর্ণ-বিভ্রান্তি'। (দে'জ তৃতীয় সংস্করণ, পৌষ ১৪০০)।

২. 'প্রসঙ্গ বাংলাভাষা'-য় সংকলিত জগন্নাথ চক্রবর্তীর লেখা 'বাংলা লিপিসংস্কার' প্রবন্ধটি। (প্রথম প্রকাশ, মে ১৯৮৬, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি)।

৩. পবিত্র সরকারের লেখা 'বাংলা বানান সংস্কার : সমস্যা ও সম্ভাবনা' বইটি থেকে পৃ. ৩১-৪৪ (দ্বিতীয় সংস্করণ : জানুয়ারি ১৯৯২, চিরায়িত প্রকাশন)।

এছাড়া, উৎসাহী শিক্ষার্থী হিসেবে আপনি সুভাষ ভট্টাচার্যের লেখা 'বাঙালির ভাষা' (আনন্দ পাবলিশার্স) বই থেকে 'বাংলা বর্ণমালা ও লিখনরীতি' আর 'বাংলা উচ্চারণের নানান প্রবণতা ও বৈশিষ্ট্য' অংশদুটিও পড়ে নিতে পারেন।

একক ১১৫ ❑ বাংলা বানানের সরলীকরণ ও তার সীমা

গঠন

১১৫.১ উদ্দেশ্য

১১৫.২ প্রস্তাবনা

১১৫.৩ মূলপাঠ-১ ঃ সরলীকরণ নিয়ে ভাবনা।

১১৫.৩.১ সারাংশ-১

১১৫.৩.২ অনুশীলনী-১

১১৫.৪ মূলপাঠ-২ ঃ সরলীকরণের প্রয়োগ

১১৫.৪.১ সারাংশ-২

১১৫.৪.২ অনুশীলনী-২

১১৫.৪ মূলপাঠ-৩ ঃ সরলীকরণের উদাহরণ।

১১৫.৫.১ সারাংশ-৩

১১৫.৫.২ অনুশীলনী-৩

১১৫.৬ সহায়ক পাঠ

১১৫.১ উদ্দেশ্য

এই এককটির লক্ষ্য আপনাকে জানানো যে, যেমন-খুশি বানান-লেখা যেমন দোষের, সঠিক নীতির বাইরে গিয়ে বানানের যেমন-খুশি সরলীকরণ করা তেমনটাই বিপদের। সেইসঙ্গে এককটি আপনাকে দেখিয়ে দেবে, বানানকে সহজ সরল করা কীভাবে সম্ভব, কোথায় তার সীমাবদ্ধতা। এককটির মাধ্যমে বানানে সমতা আনবার প্রয়োজনে যেসব সূত্র প্রয়োগের পদ্ধতি তুলে ধরা হল, সেদিকে মনোনিবেশ করলে আপাতত কোন্ শব্দে নতুন বানান আর কোন্ শব্দে প্রচলিত বানান লিখবেন—এ নিয়ে সব রকমের সংশয় ক্রমশ কেটে যাবে।

১১৫.২ প্রস্তাবনা

একক-২ এ দেখলেন, বাংলা বানানের মূল সমস্যা আসলে বানানে সমতাবিধানের সমস্যা। একক-৩ এ দেখা গেল, বানানে সমতা আনা সম্ভব বর্ণ আর ধ্বনি-উচ্চারণে সহজ সম্পর্ক তৈরি করে—প্রতিটি বর্ণের নির্দিষ্ট একটিমাত্র উচ্চারণ মেনে নিয়ে। আমাদের আসল লক্ষ্য অবশ্যই বাংলা বানানকে ক্রমশ সরল থেকে আরও সরল এবং স্বচ্ছ করে তোলা। বর্ণ-ধ্বনির সহজ সম্পর্ক তৈরি করে বানানে সমতা আনা বানানের সরলীকরণের পক্ষে আবশ্যিক শর্ত। কিন্তু, সরলীকরণের কাজটা মোটেই সরল সহজ নয়। এটা একটা দীর্ঘকালীন আন্দোলন, এ আন্দোলনে এগোতে হয় ধাপে ধাপে এবং এর প্রতিটি পদক্ষেপ হবে সতর্ক।

চলতে চলতে ক্রমশ এটাও বোঝা যাবে যে, চলার পথ অনন্ত নয়, এর একটা সুনির্দিষ্ট সীমা আছে। সেই সীমানায় এসে থামতেই হবে, অন্ততপক্ষে কিছু সময়ের জন্য হলেও। আসুন, চলতি এককে, বাংলা বানানে সরলীকরণের প্রক্রিয়া কতদূর পর্যন্ত প্রযোজ্য, উদাহরণের সাহায্য নিয়ে এই ব্যাপারটা বোঝার চেষ্টা করি।

১১৫.৩. মূলপাঠ—১ ঃ সরলীকরণ নিয়ে ভাবনা

ধরুন, একটা সময় ছিল (উনিশ শতকে) যখন ‘সঙ্গ্রহ’ ‘সম্বাদ’ বানানই চালু ছিল। ক্রমশ তা সরল হয়ে ‘সংগ্রহ’ ‘সংবাদ’ বানানে আজকের চেহারা নিল। অথচ, এই সংগ্রহ-সংবাদের পাশাপাশি সঙ্গীত-সঙ্কেত এখনও চলছে। বিকল্প বিধানে সঙ্গীত-সংগীত সঙ্কেত-সংকেত দুটোই লিখছি খুশিমতো। এখানেই সমতার অভাব। ধরা যাক, একটা সময় এল যখন সবাই বানানবিধি মেনে সংগ্রহ-সংবাদের মতো সংগীত-সংকেতও লিখছি। কিন্তু ক্রমশ ঙ্গ-ঙ্ক ভেঙে ‘ং’ লেখার হুজুগে সংগী-অংগ-বংগ-শংকার জোয়ারে ‘ঙ’ যদি ভেসে যায়, তাহলে একটা বিধির বাঁধ বেঁধে বলতেই হবে, ‘ম্-এর সন্ধি-পরিণাম হিসেবেই ং-কে আসতে হবে, নইলে নয়।’ অর্থাৎ, বানানে সমতা অবশ্য চাই, সেইসঙ্গে তার সীমানাটাও বোঝা চাই। ঙ্ক ঙ্গ— এসব যুক্তবর্ণের বদলে ‘ং’ দিয়ে লেখায় বানান অবশ্যই সরল হবে, কিন্তু তার সীমানা সংগ্রহ-সংগীত-সংকেত পর্যন্তই, সংগী-অংগ-বংগ-শংকা তার বাইরে। ছন্দতত্ত্ববিদ প্রবোধচন্দ্র সেন অবশ্য ‘সংগী’ ‘বংগ’ বানানের সরলীকরণকেও অনুমোদন করেছিলেন। আর-একটি উদাহরণ দেখুন বর্ণ-ধ্বনির সহজ সম্পর্কের, দেখুন বানানের সরলীকরণ এবং

তার সীমা। মান্য চলিত বাংলা উচ্চারণে 'ষ' নেই, 'স' আছে নির্দিষ্ট কয়েকটি ক্ষেত্রে, 'শ'র দাবি প্রায় সর্বত্র। ধরা যাক, সেই দাবি মেটাতে গিয়ে 'ষ' আর 'স'কে উচ্ছেদ করে তার জায়গাটিতে 'শ' বসিয়ে দেবার ছাড়পত্র বানান-লেখকেরা পেয়ে গেলেন। 'সবিশেষ' বানানের জটিলতা কেটে শব্দটি 'শবিশেশ' হল। 'শবুজ ঘাশের' পাশে হলুদ 'শরশে' ফুল দেখতে দেখতে 'শোজা' পথে হেঁটে 'শহরে' পৌঁছনো গেল। কিন্তু, বাঙালির অভ্যস্ত চোখ 'সবুজ ঘাস' আর হলুদ 'সর্ষে' ফুলই দেখতে চাইবে। অবশ্য 'শহরে' তার আপত্তি নেই, যদি পথ 'শোজা' না হয়ে 'সোজা'ই থাকে। আর 'সবিশেষ' বানানটিও তৎসম-মর্যাদা বজায় রাখতে গিয়ে 'শ'-কে তার প্রাপ্য জায়গাটুকুর বাইরে বাড়তি প্রশ্রয় দিতে চাইবে না।

এবার দেখা যাক, বাংলা বানানের সরলীকরণ আর তার সীমা নিয়ে বিশেষজ্ঞগণ কে কী বলছেন—

১. **প্রবোধচন্দ্র সেন ঃ** 'সঙ্গ্রহ' বানানটি যেকালে 'সংগ্রহ' লেখা হতে শুরু হয় তখন কিন্তু পূর্ব্ব নির্ম্মল সূর্য্য এসব রেফাক্রান্ত শব্দে দ্বিত্বের ব্যবহার অব্যাহত থাকে। এরও আগে গর্ভ সর্প তর্ক শব্দগুলি গর্ধ সর্প্প তর্ক্ক রূপে লেখা হত। ক্রমে বানান সরল হতে থাকে। বানানের এসব সরলীকরণ বৈয়াকরণেরা মেনে নেন।....সঙ্গী বঙ্গ এসব শব্দও সংগী বংগ হিসাবে লেখা হতে লাগল।....আমার কিন্তু মত হল যে, এইসব বানান স্বীকার করে নেওয়া উচিত। এতে ভ্রান্তি কম হবে এবং যুক্তাক্ষরের ব্যবহারও কিছু কমবে।'

২. **ভূদেব চৌধুরী ঃ** 'সুশৃঙ্খল সরলীকরণের উদ্যম অল্পদিনেই এলোমেলো হয়ে গেল অজ্ঞানকৃত সাদৃশ্য-analogy-রচনার কপোলকল্পিত স্বেচ্ছাচারে। 'পূর্ণ'-তে ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব ছিল না, 'সর্ব্ব'তে ছিল—নতুন সরলীকরণে সে দ্বিত্ব ঘুচেছে। সেই যুক্তিতে 'গুরুত্ব' 'ঘনত্ব'-র কপোলকল্পিত সাদৃশ্য বিবেচনায় 'বৃহত্ব', 'মহত্ত্ব'রও অঙ্গচ্ছেদ হল 'বৃহত্ব', 'মহত্ব'। কিংবা কোনো কোনো স্থলে 'ঙ্গ'-র বদলে 'ং' বিহিত হতেই ঝোঁক দেখা দিল ঐ অজ্ঞানকৃত সাদৃশ্য সাধনের—'সংগতি' এবং 'সংগীত' যদি হয়, তবে 'সংগ' নয় কেন?—এ ভ্রান্তি 'বংকিম' 'শংখ' পর্যন্ত ছুটেছে। কারণ একটাই ভাষা-চরিত্র, তার ব্যাকরণের কোনোরূপ জ্ঞান না রেখেই অনুমতি সাদৃশ্য সূত্রে যথেচ্ছ সরলীকরণের নির্বিচার উদ্যম। বিভ্রাটও তাতে কম হয় না। 'তৎসম' শব্দে সরলীকরণের অজুহাতেই 'ৎ' আজ লুপ্ত হয়ে পড়েছে। 'ভাত' তদ্ভব শব্দ; বাংলা ভাষায় পদান্ত 'অ' অনুচ্চারিত থাকে, তাই 'ভাৎ' না লিখে লিখি 'ভাত'-ই। কিন্তু সেই সাদৃশ্যের যুক্তিতে তৎসম 'জগৎ'কে লিখি 'জগত'। আর তারই অনুসরণে 'পথিকৃৎ'-কে 'পথিকৃত' লিখি যদি, অর্থই এলোমেলো হয়ে যায়। 'পথিকৃৎ' বলতে বুঝি 'পথের রচয়িতা' কিন্তু 'পথিকৃত' হল 'পথে যা করে রাখা হয়েছে।' এমন সব উদাহরণ অবশেষ হতে পারে।'

৩. **ক্ষেত্র গুপ্ত ঃ** ‘বাংলা বানানকে বৈজ্ঞানিক সরলতা দেবার জন্য একটা সংস্কার আন্দোলন প্রয়োজন। ....উচ্চারণকে ভিত্তি করেই বানান।......আমার প্রস্তাব....যতটা সম্ভব উচ্চারণের কাছে বানানকে নেওয়া, এবং প্রচলিত বানান সরল হলে উচ্চারণের নাম করে সেখানে নতুন কোন জটিলতা ডেকে না-আনা। ......সর্ব্ব খর্ব্ব কার্য্য বদলে সর্ব-খর্ব-কার্য হয়েছে। পাখী হয়েছে পাখি, বাড়ী—বাড়ি। ‘দারিদ্র্য’-র ‘য’ কখন খসে গিয়েছে য্য প্রত্যয়ের ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে। ‘বৌ’ হল ‘বউ’, ‘দৈ’ থেকে ‘দই’। ......বানানের ব্যাপারে ক্রমিক সরলতার দিকেই কালের গতি। লেখকেরা এবং ভাষাবিদ-ব্যাকরণবিশেষজ্ঞরা সচেতন ভাবনায় বাংলা বানানকে সরল সহজ করে আনছেন। লেখকদের যুক্তি প্রায়ই উচ্চারণের কাছাকাছি থাকা, ভাষাবিদরা তত্ত্বগত কারণ দেখান। সে যাই হোক বানানের জটিলতা কমাতে এটা সকলেই মানেন। পেছন ফিরে এই শিক্ষাটাই পাওয়া যায়। কিন্তু প্রশ্ন হল কতদূর যাব?........লেখাকে সহজ করার জন্য, বানানের জটিলতা কমাবার জন্য এদের (ই-ঈ এবং উ-ঊ) একটিকে রাখা চলে। ই, উ প্রবণতা বানানে তো প্রবল হয়ে উঠছে। তৎসম পূজা পূর্ব-এর স্থানে তদ্ভব-পুজো পুব চলছেই। হস্তী থেকে হাতি, পক্ষী থেকে পাখি তো হয়ে বসে আছে।........তৎসমের কুসংস্কার চলে গেলে পূর্ব পুজা হস্তি লিখতে হাত কাঁপবে না। ....ঋ বাংলায় একটা বাড়তি বোঝা। সবাই জানেন, ঋণ = রিন। বৃক্ষ = ব্রিক্‌খ। ...রাণী এখন রানী হয়েছেন।...বাংলার সব ণ-ই ন হয়ে যেতে পারে।...যুক্তব্যঞ্জনের যেগুলির উচ্চারণ বাংলায় নেই সেগুলি ত্যাগ করাই সঙ্গত। ক্ষ = ক্‌ষ = ক্‌খ = খ্‌খ। অন্যগুলি নয়। কিন্তু ‘যত্ন’-কে ‘যত্‌ন’ লেখা গেলে যুক্তাক্ষরের বিষদাঁত ভেঙে দেওয়া যায়।....‘লণ্ডন’-এর থেকে ‘লন্‌ডন’ অনেক বৈজ্ঞানিক। ‘ণ্ড’ বলে একটি নতুন বর্ণ ও নতুন উচ্চারণ শিখতে হয় না। অথচ কাম্য ধ্বনিটি অলভ্য থাকে না।

জনশিক্ষা যদি সর্বজনীন করতে হয়, মাতৃভাষার রূপকে সরলতম করতেই হবে। বানান বর্ণমালায় অকারণ জটিলতা তৈরি করে শিক্ষার আকর্ষণ যেন কমিয়ে ফেলা না হয়। ....ভবিষ্যৎ প্রজন্মের কথাও ভাবতে হয়।’

আমরা দেখলাম, বিশেষজ্ঞ তিনজনই বাংলা বানানে সরলীকরণে বিশ্বাসী। বানান জটিলতা পেরিয়ে ক্রমশ সরল হোক, এ ব্যাপারে সবাই একমত হলেও সেই সরলীকরণ কতদূর পর্যন্ত এগোবে, সেই সীমারেখাটা নিয়ে এঁদের মতভেদ রয়েছে। প্রবোধচন্দ্র সরলীকরণের কোনও সীমানা চিহ্নিত করেননি, সাধারণভাবেই একে স্বাগত জানিয়েছেন।

অধ্যাপক ক্ষেত্র গুপ্তও সরলীকরণের পক্ষে অনেকদূর পর্যন্ত এগিয়ে যেতে চান। তাঁর বিবেচনায় বানানকে জটিল করার জন্য দায়ী যেসব বর্ণ (ঈ-ঊ-ঋ-ঐ-ঔ, ঙ-ঞ-ণ-শ-ষ অন্তঃস্থ ব-ঃ-ৎ) তাদের উচ্ছেদ করে সরলীকরণের গণ্ডিটাকে অনেকখানি বিস্তার দেওয়া সম্ভব। এমনকী, অনাবশ্যক 'ক্ষ'-কে বর্জন করা আর অন্যসব যুক্তব্যঞ্জনের 'বিষদাঁত ভেঙে' দেবারও পক্ষে তিনি। তবে, উচ্চারণ-অনুসারী বানানের প্রতি পক্ষপাত নিয়েও অধ্যাপক গুপ্ত সরলীকরণের এই প্রক্রিয়ায় একটি সূক্ষ্ম সীমারেখা চিহ্নিত করে দিচ্ছেন—'আমার প্রস্তাব........যতটা সম্ভব উচ্চারণের কাছে বানানকে নেওয়া, এবং প্রচলিত বানান সরল হলে উচ্চারণের নাম করে সেখানে নতুন কোন জটিলতা ডেকে না-আনা।'

অধ্যাপক ভূদেব চৌধুরী চান 'সুশৃঙ্খল সরলীকরণ'। ব্যাকরণ আর বিধিনিয়মের বাইরে সরলীকরণের যে অসতর্ক ঝোঁক, সেদিকে তিনি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। 'সর্ব্ব' থেকে 'সর্ব' সুশৃঙ্খল সরলীকরণ, কিন্তু 'গুরুত্ব-ঘনত্ব'-র দেখাদেখি 'বৃহত্ব-মহত্ব' তাঁর দৃষ্টিতে স্বেচ্ছাচার। তাঁর বিবেচনায় 'সঙ্গতি-সঙ্গীত' থেকে 'সংগতি-সংগীত' সুশৃঙ্খল সরলীকরণের দৃষ্টান্ত, 'সঙ্গ-বঙ্কিম-শঙ্খ' থেকে 'সংগ-বংকিম-শংখ' আসলে 'যথেচ্ছ সরলীকরণের নির্বিচার উদ্যম।' তদ্ভব 'ভাত'-এর দেখাদেখি তৎসম 'জগৎ-পথিকৃৎ'-এর বদলে যদি সরলীকরণের যুক্তিতে 'জগত-পথিকৃত' হয়, তবে এটিও হবে একইরকম বিশৃঙ্খলা। অর্থাৎ ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব দেওয়া বা না-দেওয়া (সর্ব-গুরুত্ব-ঘনত্ব, কিন্তু-বৃহত্ত্ব, মহত্ত্ব), ঙ বা ং-এর প্রয়োগ (সংগতি-সংগীত, কিন্তু সঙ্গ-বঙ্কিম-শঙ্খ, ত বা ৎ-এর প্রয়োগ (তদ্ভব 'ভাত', কিন্তু তৎসম 'জগৎ-পথিকৃৎ')—এসব ক্ষেত্রে সীমানাটা জানা চাই, বিধিনিয়মের তৈরি সীমানা। অধ্যাপক চৌধুরী সরলীকরণের সীমা-নির্দেশ করতে চান এইভাবেই।

এবার এই প্রসঙ্গটি নিয়ে 'বাংলা বানান সংস্কার : সমস্যা ও সম্ভাবনা' বইটিতে অধ্যাপক পবিত্র সরকারের পরামর্শ শোনা যাক। তাঁর মতে বাংলা বানানের সরলীকরণের জন্য দুটি জিনিসের সংস্কার জরুরি—প্রথমটি বর্ণমালার উপাদানের সংস্কার, দ্বিতীয়টি লিখন-পদ্ধতির সংস্কার। 'বর্ণমালার উপাদানের সংস্কার' বলতে বুঝে নিন বর্ণচিহ্নের সঙ্গে মান্য চলিত বাংলার উচ্চারণের সহজ সম্পর্ক তৈরি করে দেওয়া, অর্থাৎ 'এক ধ্বনি, একটি প্রতীক'—এই নীতিতে যথাসাধ্য পৌঁছে যাওয়া। একক-৩-এ এ বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। এর ফলে বর্ণসংখ্যাও যে কমে গিয়ে ৫২ থেকে ৩৯-এ নেমে যাওয়া সম্ভব, তা-ও লক্ষ করেছেন। এর সরাসরি সুবিধা এই, এখনকার বানানে ই-ঈ-উ-ঊ-য শ-ষ-স ণ-ন নিয়ে

যে জটিলতা রয়েছে, তা অনেকখানি কেটে যাবার সম্ভাবনা। কেননা, এ ব্যবস্থায় কোনও উচ্চারণেই একটির বেশি বর্ণ নেই, কোনও বর্ণেরই একটির বেশি উচ্চারণ নেই।

এরপর আসছে লিখন-পদ্ধতির কথা। বাংলা শব্দের বানান লেখার পদ্ধতিতে মুখ্যত তিন ধরনের জটিলতার দিকে অধ্যাপক সরকার দৃষ্টি দিতে বলছেন—

১. ধ্বনিগুলিকে পরপর যেভাবে উচ্চারণ করে চলি, লেখায় তাদের বর্ণচিহ্নগুলি সব সময় পরপর সেভাবে সাজাই না। যেমন, 'কে তিনি' কথাটিকে উচ্চারণ করছি এইভাবে—ক-এ-ত-ই-ন-ই, লিখছি অন্যভাবে—ে-ক-ি-ত-ি-ন। আরও দেখছি, ই-কার এ-কার ঐ-কার ব্যঞ্জনের বাঁদিকে (কি-কে-কৈ)

আ-কার ডানদিকে (কা),-ঈ-কার ডানদিক থেকে এসে ব্যঞ্জনের মাথার উপরে (কী), উ-ঊ-ঋ-কার ব্যঞ্জনের তলায় (কু-কূ-কৃ), ও-ঔ-কার ব্যঞ্জনের ডান-বাঁ দুদিকেই (কো-কৌ)।

২. কোনও কোনও বর্ণচিহ্নের দেখছি নানারকম চেহারা। একই উ-কারের অন্ততপক্ষে চার রকমের রূপান্তর কীভাবে ঘটছে দেখুন—ক্ + উ = কু, র্ + উ = রু, হ + উ = হু, শ্ + উ = শু।

৩. এমন কয়েকটি যুক্তব্যঞ্জন বাংলায় রয়েছে, যেখানে কোন্ কোন্ ব্যঞ্জন যুক্ত হয়েছে তা স্পষ্ট নয়। যেমন, ক্ষ (= ক + ষ), ঙ্গ (= ঙ + গ), হ্ম (= হ + ম), ক্ত (= ক + ত), দ্ধ (= দ + ধ), ব্ধ (= ব + ধ), ট্ট (= ট + ট), গ্ধ (= গ + ধ), ন্ধ (= ন + ধ)।

উপরের এই জটিল পদ্ধতি থেকে বাঁচিয়ে বাংলা বানানকে সরল করা যাবে কীভাবে, এ সম্পর্কে অধ্যাপক সরকার বললেন—'এই মুহূর্তে মনে করি, বাংলা বর্ণমালায় হ্রস্ব ই-কার, এ-কার ইত্যাদি চিহ্ন ব্যঞ্জনের পরে লেখার ব্যবস্থা করলে.........., বর্ণের রূপভেদ বা অ্যালোগ্রাফের সংখ্যা কমালে,.......এবং কিছু 'অস্বচ্ছ' যুক্তব্যঞ্জনকে 'স্বচ্ছ' করে আনলে........বাংলা বর্ণমালা ও লিখন-পদ্ধতির সংস্কারে কয়েকটা বড় ধাপ অগ্রসর হওয়া যাবে।'

লক্ষ করুন, জটিল লিখন-পদ্ধতিকে সরল করার উপরের তিনটি ধাপ এইরকম হওয়া সম্ভব—

১. বর্ণচিহ্ন-বিন্যাসের জটিলতা ঃ

জটিল বিন্যাস (উচ্চারণ-বিরুদ্ধ)	**সরল বিন্যাস (উচ্চারণ-সংগত)**
কে তিনি (ে-ক-ি-ত-ি-ন)	কতেনি (ক-ে-ত-ি-ন-ি)

২. বর্ণরূপ-ভেদের জটিলতা ঃ

জটিল রূপভেদ	**সরল একটিমাত্র রূপ**
কু, রু, হু, শু	কু, রু, হু, শু

৩. অস্বচ্ছ যুক্তব্যঞ্জনের জটিলতা ঃ

অস্বচ্ছ যুক্তব্যঞ্জন (জটিল)	**স্বচ্ছ যুক্তব্যঞ্জন (সরল)**
ঙ্গ, হ্ম, ক্ত, ন্ধ, ট্ট,	ঙ্গ, হ্ম, ক্ত, ন্ধ, ট্ট

২-নং আর ৩-নং ধাপে জটিল বানান থেকে সরল বানানে অগ্রসর হবার প্রক্রিয়াটি ইতিমধ্যেই ক্রমশ চালু হতে দেখা যাচ্ছে। তবে ১-নং ধাপটিতে আগে প্রয়োজন ই-কার এ-কারের চেহারা বদল করে এদের ব্যঞ্জনের ডানদিকে বসানোর যোগ্য করে তোলা—আ-কার ঈ-কার (া - ী) যেমন বাঁ-এ ব্যঞ্জনের দিকে একটুখানি হেলে থাকে, সেইরকম কিছু-একটা করা।

ধরা যাক, বর্ণমালার উপাদান আর বাংলা লিখন-পদ্ধতির সংস্কার (বর্ণচিহ্নবিন্যাস বাদে) যথাসম্ভব করা গেল। বাংলা বানানের সব রকমের জটিলতা থেকে বানানকে সরল করার সব পথ খুলে গেল। বাংলা বর্ণমালা এখন ৩৯টি বর্ণ নিয়ে (স্বরবর্ণ ৭টি আর ব্যঞ্জন বর্ণ ৩২টি) সংহত এবং সম্পূর্ণ, অবান্তর বর্ণ একটিও নেই অথচ আবশ্যক বর্ণ সবগুলিই রয়েছে এই বর্ণমালায়। ধরে নিন, কোনও বর্ণচিহ্নের বাড়তি রূপভেদ (Allograph) নেই, প্রতিটি যুক্তব্যঞ্জন স্বচ্ছ। অর্থাৎ, উচ্চারণ-মেনে-চলা সরল সহজ বানান লেখার পক্ষে সবচেয়ে উপযোগী একটি বর্ণমালা নিয়ে বাংলা ভাষা এখন তৈরি। এবার দেখা যাক, সরলীকরণের এই সার্বিক আয়োজন বাংলা শব্দ-বানানকে কতদূর পৌঁছে দিতে পারে এবং বানান-পাঠকের কাছে তা কতটা গ্রহণীয় হতে পারে।

বর্ণচিহ্নের রূপভেদ কমিয়ে আনা আর যুক্তব্যঞ্জনকে স্বচ্ছ করে তোলা যে সরল সহজ বানান তৈরির পক্ষে সহায়ক, এ নিয়ে মতবিরোধ নেই। এমন কী, মান্য চলিত বাংলার নির্দিষ্ট উচ্চারণে নির্দিষ্ট বিকল্পহীন বর্ণ প্রয়োগ করাও যে বানানকে সহজ করার একটা উপায়, একথাও অনেকেই মানতে চান। এক্ষেত্রে তফাতটা কেবল ঐ প্রয়োগের সীমানা নিয়ে। এই সীমানাটাই আমরা এখন যথাসম্ভব খুঁজে বের করতে চাই।

১১৫.৩.১ সারাংশ—১

বানান নিয়ে যা-কিছু ভাবনা-চিন্তা, তার মূল লক্ষ্য বানানের সরলীকরণ ও সমতাবিধান। এটা সম্ভব হবে বর্ণ-ধ্বনির সহজ সম্পর্ক তৈরি করতে পারলে। কাজটা অবশ্য সহজ নয়, এবং এর একটা সীমাও আছে। 'সঙ্গ্রহ' যেমন ক্রমশ 'সংগ্রহ' হয়েছে, তেমনি সঙ্গীত-সংগীত বা সঙ্কেত-সংকেত এই দুরকম বানানের দ্বিধা কাটিয়ে 'সংগীত' 'সংকেত' নির্দিষ্ট হলে বানানে সমতা আসবে, সরলীকরণ হবে। কিন্তু সংগী-অংগ-শংকা এখনই চলবে না। 'সবিশেষ' বানানের 'শ-স-ষ' এর জটিলতা কাটাতে গিয়ে উচ্চারণ-অনুসারী 'শবিশেশ' লিখতে গেলে বানান নতুন জটিলতায় জড়িয়ে পড়বে। অতএব, সরলীকরণের সীমানা বেঁধে দিতেই হয়।

প্রবোধচন্দ্র সেন-ভূদেব চৌধুরী-ক্ষেত্র গুপ্তর মতো বিশেষজ্ঞ তিনজনই বাংলা বানানে সরলীকরণের পক্ষে। তবে এর সীমা নিয়ে এঁরা ভিন্নমত। প্রবোধচন্দ্র সরলীকরণের সীমানা চিহ্নিত করেন নি। তাঁর মনে 'সঙ্গ্রহ' থেকে 'সংগ্রহ' বা 'তর্ক্ক' থেকে 'তর্ক' যেমন করে মানা হয়েছে, তেমন করেই স্বীকার করে নেওয়া ভালো সঙ্গী-বঙ্গ থেকে 'সংগী-বংগ'-র মতো সরলীকরণ। ভূদেব চৌধুরী চান নির্দিষ্ট সীমারেখা। নইলে 'গুরুত্ব-ঘনত্ব'-র সাদৃশ্যে 'বৃহত্ব-মহত্ব' বা 'ভাত'-এর সাদৃশ্যে 'জগত-পথিকৃত' বানানের নতুন স্বেচ্ছাচার বাংলা বানানে নেমে আসতে পারে। অধ্যাপক ক্ষেত্র গুপ্ত উচ্চারণ-অনুসারী বানানের পক্ষপাতী হয়েও সরলীকরণের প্রক্রিয়ায় একটি সূক্ষ্ম সীমারেখা চিহ্নিত করছেন, সরল প্রচলিত বানানকে উচ্চারণের নাম করে বদলাতে নিষেধ করছেন। তিনি কেবল চান, বানানকে জটিল করার জন্য দায়ী বর্ণগুলির উচ্ছেদ করতে আর যুক্তব্যঞ্জনকে ভেঙে দিতে।

বানান-সরলীকরণের পক্ষে অধ্যাপক পবিত্র সরকারের পরামর্শ বর্ণমালার উপাদানের সংস্কার আর লিখন-পদ্ধতির সংস্কার। প্রথমটির অর্থ বর্ণ-উচ্চারণের সহজ সম্পর্ক তৈরি; দ্বিতীয়টির অর্থ ধ্বনিগুলিকে যেভাবে উচ্চারণ করি লেখায় সেভাবেই পরপর সাজিয়ে দেওয়া, বর্ণের রূপভেদ কমিয়ে আনা আর অস্বচ্ছ যুক্তব্যঞ্জনকে স্বচ্ছ করে তোলা।

বানান-সরলীকরণ সবাই চান, সরলীকরণের উপায় নিয়েও তেমন মতভেদ নেই। তফাতটা কেবল এর সীমানা নিয়ে।

১১৫.৩.২ অনুশীলনী—১

১. বাংলা বানানে সরলীকরণ কীভাবে সম্ভব তা বুঝিয়ে দিন এবং সরলীকরণের সীমা সম্পর্কে বানান-ভাবুকদের মতামত উল্লেখ করে ঐ সীমা কতদূর পর্যন্ত প্রসারিত করা সম্ভব, ব্যাখ্যা করুন।

২. 'বাংলা বানানের সরলীকরণের জন্য দুটি জিনিসের সংস্কার জরুরি'—কী কী জিনিসের সংস্কার জরুরি বলে প্রাসঙ্গিক ভাবুক ভাবছেন এবং এই সংস্কার-প্রক্রিয়া কীভাবে বানান সরলীকরণকে সম্ভব করে তুলতে পারে, আলোচনা করে বুঝিয়ে দিন।

৩. বাংলা বানানের লিখন-পদ্ধতিতে কী কী ধরনের জটিলতা রয়েছে এবং সেসব জটিলতা থেকে বানান কীভাবে মুক্ত হতে পারে, বিশ্লেষণ করে বুঝিয়ে দিন।

১১৫.৪ মূলপাঠ—২ ঃ সরলীকরণের প্রয়োগ

উচ্চারণ মেনে বানান লেখা ততক্ষণ পর্যন্তই সংগত, যতক্ষণ তা প্রচলিত বানানের তুলনায় সরল সহজ হচ্ছে। কিন্তু, যদি দেখি, উচ্চারণ মানতে গিয়ে প্রচলিত বানানকে আরও জটিল করে তোলা হচ্ছে, তাহলে অবশ্যই থামতে হবে। আপাতত পাঁচটি শব্দ হাতে নিয়ে কথাটা বুঝে নেওয়া যাক—সৈন্য, অভ্যেস, দৈ, ডাঙ্গা, গভর্ণর। এই পাঁচটিই প্রচলিত বানান। এদের উপর উচ্চারণ-অনুসারী বর্ণপ্রয়োগ করলে চেহারাটা এইরকম হবে—শোইন্নো (ঐ > ওই, ন্য > ন্নো), ওব্‌ভেশ্‌ (অ > ও, ভ্য > ব্ব, স > শ), দোই (ঐ > ওই), ডাঙা (ঙ্গ > ঙ), গভর্নর (ণ > ন)। লক্ষ করুন, প্রথম তিনটি বানানের পরিবর্তনে চেনা শব্দ-তিনটি আমাদের কাছে অনেকটাই অচেনা হয়ে যাচ্ছে। সৈন্য-দৈ-অভ্যেস লেখার চেয়ে শোইন্নো-দোই-ওব্‌ভেশ্‌ লেখার শ্রমও খানিকটা বেশিই, অন্ততপক্ষে নতুন বানান-তিনটি যে চলতি বানানের চেয়ে সরল সহজ হল—একথা এই মুহূর্তে কেউ মানবেন না। অথচ, ডাঙ্গা-গভর্ণর বর্ণবদল করে যখন ডাঙা-গভর্নর হল, তখন তা মেনে নিতে কোনও বাধা রইল না। উচ্চারণটা জানা আছে বলে বানান-লেখায় কোনও সংশয়ও নেই। তবে 'দৈ' থেকে 'দোই' বানানে জটিলতার নালিশ থাকলেও 'দই' বানানটি দিয়ে আজকের বাঙালি একটা আপস-রফা করতেই পারেন। অতএব, শব্দ-পাঁচটির গ্রহণযোগ্য সরলীকৃত বানান হতে পারে এইরকম—সৈন্য অভ্যেস দই ডাঙা গভর্নর। অর্থাৎ, 'সৈন্য' আর 'অভ্যেস' প্রচলিত বানান বহাল রাখল। 'দৈ' বানানটির সরলীকররের সীমা 'দই' পর্যন্ত (ঐ >

অই), উচ্চারণ-অনুসারী বর্ণবদলের প্রক্রিয়া এখানে অংশত সফল, পুরোপুরি সফল হত কিন্তু গ্রহণযোগ্য হত না 'দোই' (ঐ > ওই) হলে। 'ডাঙ্গা' আর 'গভর্ণর' নির্দ্বিধায় উচ্চারণ-মানা নতুন বানান স্বীকার করে নিয়ে 'ডাঙা' (ঙ্গ > ঙ) আর 'গভর্নর' (ণ > ন) হল। এই দুটি ক্ষেত্রেই বর্ণবদলের প্রক্রিয়া পুরোপুরি সফল।

লক্ষ করুন, নির্বাচিত পাঁচটি শব্দ বাংলা শব্দভাণ্ডারের এক-একটি শ্রেণি থেকে নেওয়া—'সৈন্য' তৎসম, 'অভ্যেস' অর্ধ-তৎসম, 'দৈ' তদ্ভব, 'ডাঙ্গা' দেশি আর 'গভর্ণর' বিদেশি। উচ্চারণের ইশারায় বর্ণবদল মেনে নেবার ক্ষমতা সব শব্দের একরকম নয়। তৎসম 'সৈন্য' আর অর্ধ-তৎসম 'অভ্যেস' বর্ণবদলে পুরোপুরি অক্ষম। এই মুহূর্তে জবরদস্তি করলে বানান সরল হবার বদলে আরও জটিল হতে পারে। তদ্ভব 'দৈ'-এর ঝোঁক বদলের দিকেই, অবশ্য একটুখানি দ্বিধা নিয়ে। এর ক্ষেত্রে বানানের সরলীকরণ অবাধ নয়, একটা সীমানা মানতেই হয়। দেশি 'ডাঙ্গা' আর বিদেশি 'গভর্ণর' নির্দ্বিধায় সরলীকরণের তত্ত্ব পুরোপুরি মেনে নেয়। এ থেকে আন্দাজ করে নিন, বাংলা শব্দের ভাণ্ডারটি যেহেতু নানারকম শব্দের মিশ্রণে তৈরি, সেইকারণে সরলীকরণের সম্ভাব্যতা আর পদ্ধতিও নানারকমই হবে। অন্ততঃপক্ষে উচ্চারণ-অনুযায়ী বর্ণপ্রয়োগের প্রক্রিয়া সব শ্রেণির শব্দ-বানানে যে প্রযোজ্য নয়, এটা বোঝা গেল। উপরের পাঁচটি শব্দে যে দু-তিন রকমের ঝোঁক দেখছি, সাধারণভাবে তা সত্য হলে দেখা যাবে, তৎসম আর অর্ধ-তৎসম বানানে সরলীকরণের প্রক্রিয়া প্রায় অচল, তদ্ভব বানানে সরলীকরণ সম্ভব একটি নির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে আর দেশি-বিদেশি শব্দের বানানে সরলীকরণ অবাধ।

'সরলীকরণের সীমা' নির্দেশ করতে গিয়ে তিনটি কথা আমরা ব্যবহার করব—'সফল' 'ব্যর্থ' আর 'অংশত সফল'। এই কথা-তিনটে ঠিক কী অর্থে প্রয়োগ করতে হচ্ছে, তা প্রথমেই বুঝে নিন। সেই সঙ্গে বুঝে নিন, সরলীকরণের প্রক্রিয়াটি কী ধরনের। ধরা যাক, প্রচলিত 'শ্রেণী' বানানে সরলীকরণের সম্ভাবনা নিয়ে আমরা ভাবছি। অর্থাৎ, 'শ্রেণী' বানানটিকে উচ্চারণ-অনুযায়ী বানানে কতদূর পৌঁছে দেওয়া সম্ভব, দেখছি। 'শ্রেণী' শব্দের উচ্চারণ 'শ্রেনি'। এর অর্থ, প্রচলিত 'শ্রেণী' বানানটিকে উচ্চারণ-অনুযায়ী 'শ্রেনি'-বানানে পৌঁছতে দু-রকম বর্ণবদল করতে হয়—'ঈ > ই' আর 'ণ > ন'। কিন্তু, তৎসম 'শ্রেণী' বানানকে সংস্কৃত ব্যাকরণের শাসন থেকে বের করে আনা এই মুহূর্তে অসাধ্য। তাই, ব্যাকরণসম্মত বিকল্প বানানের পথ ধরে 'শ্রেণি' পর্যন্তই এগোনো সম্ভব, তার বেশি নয়। অর্থাৎ, বর্ণবদলের 'ঈ > ই' ধাপটি পেরোনো গেল (শ্রেণী > শ্রেণি), 'ণ > ন' ধাপটি পেরোনো গেল না। বর্ণবদলের এইরকম এক-একটি ধাপকে আমরা বলব 'সরলীকরণের সূত্র'। এই পাঠে বাংলা শব্দভাণ্ডারের

পাঁচটি শ্রেণি থেকে (তৎসম অর্ধ-তৎসম তদ্ভব দেশি বিদেশি) ১১১টি প্রচলিত শব্দ-বানান বেছে নিয়ে তাদের উপর সরলীকরণের ১৯টি সূত্র প্রয়োগ করে দেখব, কোন্ সূত্র কোন্ প্রচলিত বানানে কতটা পরিমাণ সরলীকরণ সম্ভব অথচ গ্রহণযোগ্য করতে পারে। আমরা দেখতে চাই, একটি প্রচলিত বানানে কোনও একটি সূত্র প্রয়োগ করে উচ্চারণ-অনুসারী সরলীকৃত যে বানানটি পাওয়া গেল, তা এখনকার বাংলাভাষার গ্রহণযোগ্য কিনা। যদি তা গ্রহণযোগ্য হয়, তবে সরলীকরণ সেখানে 'সফল'; গ্রহণযোগ্য না হলে সরলীকরণ ব্যর্থ; আর, বানানটিকে সরলীকৃত অথচ গ্রহণযোগ্য করে তুলতে গিয়ে অংশত উচ্চারণ অনুসারী করা সম্ভব হলে সরলীকরণ হবে 'অংশত সফল।'

এবার দেখুন, প্রচলিত 'শ্রেণী' বানানের সরলীকরণে 'ঈ > ই' সূত্রটি প্রয়োগ করে উচ্চারণ-অনুসারী 'শ্রেণি' বানানটি পাওয়া গেল ('উচ্চারণ-অনুসারী' বলতে এখানে কেবল হ্রস্ব-দীর্ঘ উচ্চারণই বুঝতে হবে)। তৎসম এই বানানটি সংস্কৃত ব্যাকরণের শাসন মেনে সহজেই বাংলাভাষাতেও গ্রহণযোগ্য বলে বিবেচিত হল, 'শ্রেণি' বানানটি আমরা মেনে নিলাম। অতএব, সরলীকরণ-প্রক্রিয়া (ঈ > ই সূত্রের প্রয়োগ) এখানে সফল'। কিন্তু, এরপর ঐ 'শ্রেণী' বানানটিরই সরলীকরণে 'ণ > ন' সূত্রটি প্রয়োগ করলে তার অন্যরকম ফল উঠে আসবে। সেক্ষেত্রে উচ্চারণ-অনুসারী সরলীকৃত 'শ্রেনি' বানানটি পাব ('উচ্চারণ-অনুসারী' বলতে এখানে কেবল মূর্ধন্য-দন্ত্য উচ্চারণই বুঝব), কিন্তু সংস্কৃত ব্যাকরণের অনুমোদন না-পাবার কারণে 'শ্রেনি' বানানটি গ্রাহ্য হবে না। সেইকারণে সরলীকরণ-প্রক্রিয়া (ণ > ন সূত্রের প্রয়োগ) এখানে 'ব্যর্থ'। সরলীকরণ-প্রক্রিয়ার সফলতা' আর 'ব্যর্থতা' এই নির্দিষ্ট অর্থেই আপনাকে বুঝে নিতে হবে। এবার আর- একটি উদাহরণে বুঝে ন 'অংশত সফল' কথাটির তাৎপর্য। ধরা যাক, প্রচলিত তদ্ভব 'দৈ বানানটিতে 'ঐ > ওই' সূত্রটি প্রয়োগ করে পাওয়া গেল 'দোই' বানানটি। এ বানান উচ্চারণ-অনুসারী নিঃসন্দেহে, কিন্তু একে সরলীকৃত বলব না, বরং ঐ-কার চিহ্নের (ৈ) তুলনায় ও-কার চিহ্নটি (ে া) খানিকটা জটিলই। এই ও-কার চিহ্নটিকে সরিয়ে দিয়ে দোই' থেকে 'দই' পর্যন্ত পৌঁছতে পারলেই বানানটি সরল হতে পারে (দৈ > দোই > দই)। 'দই' বানানটি সরল এবং সেইকারণেই গ্রহণযোগ্য, আর পুরোপুরি না হলেও অবশ্যই অংশত উচ্চারণ-অনুসারী। অতএব, ঐ > ওই সূত্রটির প্রয়োগ এখানে ব্যর্থ নয়, পুরোপুরি 'সফল'ও নয়, 'অংশত সফল'।

অতএব, বাংলা শব্দভাণ্ডারের এক-একটি শ্রেণি ধরে ধরে বানান-সরলীকরণের প্রক্রিয়া প্রয়োগ করে দেখা যাক, কোন্ শ্রেণির শব্দ-বানানে কতদূর পর্যন্ত সরলীকরণ সম্ভব। দেখা যাক, সরলীকরণ-প্রক্রিয়া কোথায় 'সফল', কোথায় ব্যর্থ, কোথায় 'অংশত সফল।'

১. **তৎসম শব্দ-বানান ঃ**

সরলীকরণের সূত্র (উচ্চারণ-অনুসারী বর্ণপ্রয়োগ)	**প্রচলিত বানান**	**উচ্চারণ-অনুসারী বানান**	**গ্রহণযোগ্য/সরলীকৃত বানান**	**সরলীকরণের সীমা (ব্যর্থ/সফল)**
ঈ > ই	শ্রেণী	শ্রেনি	শ্রেণি	সফল
	ফণী	ফোনি	ফণী	ব্যর্থ
ঊ > উ	ঊষা	উশা	উষা	সফল
	ঊর্মি	উর্মি	ঊর্মি	ব্যর্থ
ঙ > ং	শঙ্কর	শংকর	শংকর	সফল
	শঙ্কা	শংকা	শঙ্কা	ব্যর্থ
ষ > শ	কোষ	কোশ	কোশ	সফল
	দোষ	দোশ	দোষ	ব্যর্থ
স > শ	সরণী	শরোণি	শরণি	সফল
	সরসী	শরোশি	সরসী	ব্যর্থ
বিসর্গ (ঃ) বর্জন	অন্ততঃ, ক্রমশঃ	অন্তোতো, ক্রমোশো	অন্তত, ক্রমশ	সফল
	দুঃস্থ	দুস্থো	দুস্থ	সফল
	দুঃখ	দুক্‌খো	দুঃখ	ব্যর্থ
রেফের নীচে ব্যঞ্জন-দ্বিত্ব > দ্বিত্ব বর্জন	বর্দ্ধমান	বর্ধোমান	বর্ধমান	সফল
যুক্ত ব্যঞ্জনে য-ফলা > য-ফলা বর্জন	দারিদ্র্য, ঈর্ষ্যা	দারিদ্‌দ্রো, ইর্শা	দারিদ্র, ঈর্ষা	সফল

তৎসম শব্দ-বানানে সরলীকরণ-প্রক্রিয়ার যে ছকটি তৈরি হল, তা থেকে এই কটি তথ্য আমরা পেলাম—

১. সরলীকরণের মোট ৮টি সূত্র তৎসম বানানে প্রয়োগ করতে গিয়ে দেখা গেল, সামগ্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে এর মধ্যে ৬টি ক্ষেত্রে সরলীকরণ অংশত সফল। ক্ষেত্রগুলি হল ঈ > ই, ঊ > উ, ঙ > ং, ষ > শ, স > শ আর বিসর্গ-বর্জন। জেনে রাখুন, এসব ক্ষেত্রে মূল সংস্কৃত শব্দে সংস্কৃত ব্যাকরণই বিধান দিয়ে রেখেছে বিকল্প বানানের। বাঙালির কৃতিত্ব কেবল এইটুকু, তাঁরা দুটি বিকল্পের মাঝখান থেকে উচ্চারণ-অনুসারী সরল বানানটিকে বাছাই করে নিতে পেরেছে প্রতিটি ক্ষেত্র থেকেই, এবং এই বাছাই করার কাজটি এসব বানানের সরলীকরণের পক্ষে প্রাসঙ্গিক এবং উপযোগী হয়ে উঠেছে। নইলে দু-রকম বানান-লেখার সমস্যা আরও খানিকটা বেড়েই যেত। নির্দিষ্ট উদাহরণের সাহায্য নিয়েই কথাটা ভেবে নিন। যে ৬টি ক্ষেত্রের কথা উঠল, সেখানকার প্রাসঙ্গিক শব্দ-বানান শ্রেণি, উষা, শংকর, কোশ, শরণি, দুস্থ। এদের ব্যাকরণসম্মত বিকল্প বানান শ্রেণী, ঊষা, শঙ্কর, কোষ, সরণি, দুঃস্থ। বানানে সমতা আনতে গেলে বিকল্পের সুযোগ না রাখাটাই জরুরি হয়ে পড়ে। সেই কারণে, যথাসম্ভব উচ্চারণ-সংগত সরল সহজ বানানটিকে বেছে নিয়ে বিকল্প তৎসম বানানের উচ্ছেদ ঘটানো হল বাংলা শব্দভাণ্ডার থেকে। পরোক্ষে সরলীকরণের কাজটাও মেটানো গেল।

সরলীকরণের এই ৬টি ক্ষেত্রের সফলতাকে 'অংশত' বলার কারণটা এবার ভাবা যাক। লক্ষ করুন, ঈ > ই সূত্রটি ধরে 'শ্রেণি'-তে পৌঁছনো গেল, কিন্তু 'ফণী' থেকে 'ফণি'-তে পৌঁছনো অসাধ্য হল। তেমনি, 'ঊষা' থেকে 'উষা' পেলাম, অথচ 'ঊর্মি'-তে 'ঊ' বহাল থাকল। একইভাবে 'শঙ্কর' থেকে 'শংকর' স্বাগত, 'শঙ্কা' অবাঞ্ছিত। 'কোষ-সরণি-দুঃস্থ' থেকেও 'কোশ-শরণি-দুস্থ'-তে উত্তীর্ণ হতে ব্যাকরণের ছাড়পত্র মেলে, মেলে না 'দোষ-সরসী-দুঃখ'-এর বেলায়।

২. সরলীকরণ-প্রক্রিয়ার প্রায় পুরোপুরি সাফল্য কেবল ২টি ক্ষেত্রে—রেফের নীচে একক ব্যঞ্জনের স্বীকৃতি আর যুক্তবর্ণে অনুচ্চারিত য-ফলার লোপ। এ দুটি ক্ষেত্রেও বিকল্পের বিধান সংস্কৃত ব্যাকরণেরই। আর সেই ব্যাকরণসম্মত বিধানটা কাজে লাগিয়েই সহজ সরল বানানটিকে একমাত্র গ্রহণযোগ্য বানান হিসেবে গণ্য করা হল সরলীকরণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে। অতএব, বাংলা শব্দ-বানানে উঠে এল 'বর্দ্ধমান'-এর জটিল ব্যঞ্জন-দ্বিত্ব এড়িয়ে সরলীকৃত 'বর্ধমান' আর 'ঈর্য্যা'-র যুক্তবর্ণ ('র্য') থেকে য-ফলাকে সরিয়ে সরলীকৃত 'ঈর্ষা'। এ সাফল্যকে 'পুরোপুরি' বলার কারণ, রেফের নীচে ব্যঞ্জন-দ্বিত্ব আর যুক্তবর্ণের সংলগ্ন য-ফলা তৎসম শব্দের পরিবার থেকে পুরোপুরিই মুছে গেল।

অধ্যাপক পবিত্র সরকারের প্রত্যাশা মাথায় রেখে তৎসম বানানে সরলীকরণের সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও বলা যায়, বিকল্প বিধানের ফাঁক দিয়ে যেটুকু সাফল্য গড়িয়ে পড়ল 'শ্রেণি' 'উষা' 'শংকর' 'কোশ' 'শরণি' 'দুস্থ' 'বর্ধমান' ঈর্ষা'-র মতো সরলীকৃত বানানে, তা ক্রমশ ছড়িয়ে পড়বে আরও বেশি মানুষের আরও বেশি শব্দ-লেখায়। ফণী-ঊর্মি-শঙ্কা-দোষ-সরসী-দুঃখ-র মতো অজস্র তৎসম শব্দ, যারা এই মুহূর্তে সরলীকরণের সূত্র অগ্রাহ্য করে বানানে সমতাবিধানের প্রক্রিয়ায় ধরা দিল না, বাংলা লেখায় ক্রমশ তারাও উঠে আসবে সরলীকৃত বাংলা বানানের সুষম মূর্তি নিয়ে।

২. অর্ধ-তৎসম শব্দ-বানান ঃ

সরলীকরণের সূত্র	**প্রচলিত বানান**	**উচ্চারণ-অনুসারী বানান**	**গ্রহণযোগ্য/সরলীকৃত বানান**	**সরলীকরণের সীমা (ব্যর্থ/সফল)**
অ > ও	অবিশ্যি, অভ্যেস	ওবিশ্‌শি, ওব্‌ভেশ্‌	অবিশ্যি, অভ্যেস	ব্যর্থ
ষ > জ	সুয্যি	শুজ্জি	সুয্যি	ব্যর্থ
ণ > ন	গণ্যি, পুণ্যি	গোন্নি, পুন্নি	গন্যি, পুন্যি	সফল
ষ > শ	কেষ্ট, তেষ্টা	কেশ্‌টো, তেশ্‌টা	কেষ্ট, তেষ্টা	ব্যর্থ
স > শ	মিন্‌সে, দস্যি	মিন্‌শে, দোশ্‌শি	মিন্‌সে, দস্যি	ব্যর্থ
ক্ষ > ক্‌খ	সাক্ষি, তক্ষুনি	শাক্‌খি, তোক্‌খুনি	সাক্ষি, তক্ষুনি	ব্যর্থ
জ্ঞ > গ্‌গ	জিজ্ঞেস	জিগ্‌গেশ	জিগ্‌গেস	সফল
য-ফলা > ব্যঞ্জন-দ্বিত্ব	মিথ্যে, সত্যি	মিত্থে, শোত্তি	মিথ্যে, সত্যি	ব্যর্থ

অর্ধ-তৎসম বানানে সরলীকরণ-প্রক্রিয়ার ছকটি থেকে পাওয়া তথ্য এইরকম—

১. প্রচলিত অর্ধ-তৎসম বানানে ঈ ঊ ঋ ঐ ঔ নেই, ব-ফলা ম-ফলা নেই, রেফযুক্ত ব্যঞ্জন নেই, (ঃ) নেই, ঙ-ং, ত-ৎ নিয়ে বানান-ভাবুকের মাথাব্যথা নেই। সরলীকরণের ক্ষেত্র এখানে অনেক কম।

২. ৮টি ক্ষেত্রের মধ্যে ৬টিতেই সরলীকরণ অসাধ্য থাকছে, প্রচলিত বানান বহাল থাকছে।

৩. 'ণ'-কে সরিয়ে 'ন'-কে বসানো পুরোপুরি সম্ভব হচ্ছে, ণ-ন র মধ্য থেকে কোন্‌টি লিখব, এই দ্বিধার সংকট থেকে বানান রক্ষা পেল।

৪. জ্ঞ-বর্ণ থেকে কিছু বানান রেহাই পেলেও বর্ণটির পুরোপুরি উচ্ছেদ হল না। প্রচলিত 'জিজ্ঞেস' ক্রমশ 'জিগ্‌গেস' বানানে জনপ্রিয় হয়ে উঠছে বটে, কিন্তু 'আজ্ঞে' 'অভিজ্ঞ' তাদের অর্ন্তগত জটিল 'জ্ঞ'-বর্ণটিকেই আঁকড়ে রইল, সরলীকরণের সূত্র এদের কাছে এসে থমকে দাঁড়াল।

দেখতে পাচ্ছি, প্রচলিত অর্ধ-তৎসম বানানে স্বরবর্ণের প্রয়োগে গোড়া থেকেই তেমন জটিলতা নেই, সরলীকরণ তাই স্বরবর্ণের ক্ষেত্রে অনাবশ্যক। 'অবিশ্যি' 'অভ্যেস' বানানের অ-বর্ণকে সরিয়ে 'ও' বসালেও বানান যথেষ্ট সরল হত না, বরং চেনা শব্দকে অচেনা করে ফেলার দায় লেখকের কাঁধে এসে পড়ত। বানানকে জটিল করার জন্য দায়ী যে কটি ব্যঞ্জনবর্ণ (ঞ-ণ-য-স-ষ-ঃ-যুক্তব্যঞ্জন), তার মধ্যে ঞ-ঃ অর্ধ-তৎসম বানানে নেই-ই, 'ণ'-কে সরিয়ে 'ন'-কে বহাল করা সম্ভব হয়েছে, যুক্তব্যঞ্জন 'জ্ঞ'-কে অংশত সরানো গেছে, কিন্তু বাকি য-স-ষ-ক্ষ বর্ণগুলির সামনে এসেই সরলীকরণের সূত্র পরাভব মেনে নিচ্ছে। 'ণ' আর 'ষ' নিয়ে রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধে পবিত্রবাবুর অনুযোগ শুনুন—'যে রবীন্দ্রনাথ দন্ত ন-কে মূর্ধন্য ণ-র আসনে বসাতে এত ব্যস্ত ছিলেন, তিনি যে কেন মূর্ধন্য ষ-র জায়গায় বাঙালির নিজস্ব ও স্বাভাবিক তালব্য শ-কে স্থাপনের বিষয়ে এত উদাসীন রইলেন তা ভেবে বিস্ময় লাগে।' আজকের সরলীকরণের সূত্র 'ণ'-কে অতি সহজে বাগে আনলেও 'ষ'-কে ঘায়েল করতে পারছে না, সে কারণে রবীন্দ্রনাথের কাছে বাঙালি তার অভিমান জানাতেই পারে। তাই বলে রবীন্দ্রহীন একুশ শতক বানানের এই ছোট্ট এলাকাতেও রবীন্দ্র-নির্ভর হয়েই থাকবে, এটা মানতে কষ্ট হয়।

৩. তদ্ভব শব্দ-বানান ঃ

সরলীকরণের সূত্র (উচ্চারণ-অনুসারী বর্ণপ্রয়োগ)	প্রচলিত বানান	উচ্চারণ-অনুসারী বানান	গ্রহণযোগ্য/সরলীকৃত বানান	সরলীকরণের সীমা (ব্যর্থ/সফল)
অ > ও	ভাল, কাল, মত	ভালো, কালো, মতো	ভালো, কালো, মতো	সফল
	এত, কত, যত	অ্যাতো, কতো, জতো	এত, কত, যত	ব্যর্থ
ঈ > ই	হীরা, সীসা, নীলা পিসী, পাখী, বাড়ী	হিরা, শিশা, নিলা পিশি, পাখি, বাড়ি	হিরা, সিসা, নিলা পিসি, পাখি, বাড়ি	সফল
ঊ > উ	ঊনিশ, চূণ, পূব	উনিশ, চুন, পুব	উনিশ, চুন, পুব	সফল

সরলীকরণের সূত্র (উচ্চারণ-অনুসারী বর্ণপ্রয়োগ)	প্রচলিত বানান	উচ্চারণ-অনুসারী বানান	গ্রহণযোগ্য/সরলীকৃত বানান	সরলীকরণের সীমা (ব্যর্থ/সফল)
এ > অ্যা	এখন, এমন, কেমন	অ্যাখোন, অ্যামোন ক্যামোন	এখন, এমন কেমন	ব্যর্থ
ঐ > ওই	দৈ, খৈ, বৈ	দোই্, খোই্, বোই্	দই, খই, বই	অংশত সফল
ঔ > ওউ	বৌ, মৌ	বৌউ্, মোউ্	বউ, মউ	অংশত সফল
	নৌকা, চৌপদী	নোউ্কা, চৌউ্পদি	নৌকা, চৌপদী	ব্যর্থ
ঙ > ং	ব্যাঙ, রঙ	ব্যাং, রং	ব্যাং, রং	সফল
ঙ্গ > ঙ	রাঙ্গা, কাঙ্গাল	রাঙা, কাঙাল	রাঙা, কাঙাল	সফল
য > জ	যো, যোগাড়	জো, জোগাড়	জো, জোগাড়	সফল
	যা, যখন	জা, জখোন	যা, যখন	ব্যর্থ
ণ > ন	কাণ, চূণ, সোণা	কান, চুন, শোনা	কান, চুন, সোনা	সফল
ষ > শ	মোষ, ষাঁড়, মানুষ	মোশ, শাঁড়, মানুশ	মোষ, ষাঁড়, মানুষ	ব্যর্থ
স > শ	উপোস, কাঁসা, মাসী	উপোশ, কাঁশা, মাশি	উপোস, কাঁসা, মাসি	ব্যর্থ
ক্ষ > খ	ক্ষুদ, ক্ষেত, ক্ষ্যাপা	খুদ, খেত, খ্যাপা	খুদ, খেত, খ্যাপা	সফল

এবার দেখা যাক, তদ্ভব বানানের ছক থেকে কী পেলাম—

১. প্রচলিত তদ্ভব বানানে ঋ নেই, য-ফলা ব-ফলা ম-ফলা নেই, রেফযুক্ত ব্যঞ্জন নেই, বিসর্গ নেই, ত-ৎ এর দুর্ভাবনা নেই। তাই, তৎসম-র তুলনায় সরলীকরণের ক্ষেত্র এখানেও বেশ কম।

২. ১৩টি ক্ষেত্রের মধ্যে কেবল ৩টিতে সরলীকরণ পুরোপুরি বাধা পেল (এ > অ্যা, ষ > শ, স > শ)।

৩. ৬টি ক্ষেত্রে সরলীকরণ পুরোপুরি সম্ভব হয়েছে। এই সফল ক্ষেত্রগুলি হল : ঈ > ই > ঊ > উ, শব্দশেষের ঙ > ং, বিকল্প উচ্চারণে ঙ্গ ঙ, ণ > ন আর শব্দের শুরুতে থাকা ক্ষ > খ। এর ফলটা দাঁড়াল এই—তদ্ভব বানান থেকে দীর্ঘ স্বর (ঈ আর ঊ) মুছে গেল,

ণ-র উচ্ছেদ হল। বেশকিছু শব্দ-বানানে 'ঙ্গ'-র বদলে 'ঙ' আর 'ক্ষ'-র বদলে 'খ' এসে সেসব বানানকে সরল করে তুলল।

৪. ৪টি ক্ষেত্রে সরলীকরণ অংশত সফল (অ > ও, ঐ > ওই, ঔ > ওউ, য > জ)। ভাল (good)-ভাল (কপাল), কাল(Black)-কাল (সময়), মত (like)-মত (opinion)—প্রচলিত একই বানানের পৃথক শব্দে অর্থের ফারাক বানানের তফাত দিয়ে বোঝানো জরুরি হয়ে উঠছে বলেই এদের কালো-কাল ভালো-ভাল মতো-মত করতে হল। অনাবশ্যক ক্ষেত্রে ও-কার সরলীকরণের সহায়ক নয় বলে এত-কত-তত-যত যেমন ছিল তেমনই থাকল। ঐ আর ঔ দুটিই যৌগিক স্বর, উচ্চারণ অনুযায়ী এদের দুটি করে বর্ণে ভেঙে নিলে তা হবে 'ওই' আর 'ওউ'। কিন্তু এক্ষেত্রেও ও-কারের জটিল চেহারা (ে া) সরলীকরণের পক্ষে বাধা হয়ে দাঁড়ায়। সেই কারণেই ঐ > অই আর ঔ > অউ পর্যন্ত এগিয়ে দৈ-খৈ-বৌ-মৌ-এর বানানকে যথাসম্ভব সরল করা গেল দই-খই-বউ-মউ-এর চেহারা দিয়ে। 'জাঁতা-জো-জোগাড়'-এর মতো বেশকিছু তদ্ভব শব্দ 'য'-কে সরিয়ে 'জ' মেনে নিল। কিন্তু, সরলীকরণ-প্রক্রিয়া ব্যর্থ হল 'যে-যখন-যেমন'-এর মতো এমন কিছু শব্দের বানানে, যারা তদ্ভব হয়েও সংস্কৃত উৎস-বানানের দিকেই ঝুঁকে থাকতে চায়।

আমরা দেখলাম, তদ্ভব বানানের যে ১৩-টি ক্ষেত্র যাচাই করা হল, তার মধ্যে ৬টিতে পুরোপুরি আর ৪টিতে অংশত কার্যকর হয়েছে সরলীকরণের সূত্র। দেখা গেল, হ্রস্ব-দীর্ঘ স্বর প্রয়োগে তদ্ভব-র ঝোঁক পুরোপুরি হ্রস্ব-র দিকে। এর ফলে ঈ-ঊ তদ্ভব বানান থেকে প্রায় নিশ্চিহ্ন হল। 'ণ'-কে তদ্ভব থেকে অনায়াসে সরিয়ে দিল 'ন'। শব্দের প্রথমে 'ক্ষ'-র মতো জটিল অস্বচ্ছ যুক্ত ব্যঞ্জনও আর রইল না। ঐ-ঔ-ঙ্গ-য বর্ণের প্রয়োগ অনেকটাই কমে গেল। এরই পাশে অনড় হয়ে রইল এ-ষ-স। কোনও কোনও উচ্চারণে 'অ্যা'-র দাবি জোরদার হলেও (এত-এখন-এমন) 'এ' স্থানচ্যুত হল না। 'শ'-র শক্ত দাবিও নস্যাৎ হল 'ষ' আর 'স'-এর কাছে (মোষ-মানুষ-ষাঁড়, উপোস-কাঁসা-মাসি)।

শ্রেণি	**সরলীকরণের সূত্র**	**প্রচলিত বানান**	**গ্রহণযোগ্য/সরলীকৃত বানান**	**সরলীকরণের সীমা (ব্যর্থ/সফল)**
৪. দেশি ঃ	ঈ > ই	চটী	চটি	সফল
	ঙ্গ > ঙ	ডাঙ্গা, ডিঙ্গা, ঝিঙ্গা, চোঙ্গা	ডাঙা, ডিঙা ঝিঙা, চোঙা	সফল

শ্রেণি	সরলীকরণের সূত্র	প্রচলিত বানান	গ্রহণযোগ্য/সরলীকৃত বানান	সরলীকরণের সীমা (ব্যর্থ/সফল)
	স > শ	ফরসা, উসখুস, ডাঁসা	ফরসা, উসখুস, ডাঁসা	ব্যর্থ
৫. বিদেশি ঃ	ঈ > ই	ঈগল, ঈদ, কাজী জানুয়ারী, লেডী	ইগল, ইদ, কাজি, জানুয়ারি, লেডি	সফল
	ঋ > রি	খৃস্ট, বৃটিশ	খ্রিস্ট, ব্রিটিশ	সফল
	এ > অ্যা	এসিড	অ্যাসিড	সফল
	ণ > ন	কোরাণ, পরগণা, ইরাণ গভর্ণর, কর্ণেল	কোরান, পরগনা, ইরান গভর্নর, কর্নেল	সফল
	ষ > শ	পোষাক	পোশাক	সফল
	স > শ	পুলিস, মেসিন, নোটিস	পুলিশ, মেশিন, নোটিশ	সফল
		ফারসি, সাদা, সাবান	ফারসি, সাদা, সাবান	ব্যর্থ
	ক্ষ > ক্‌খ	মোক্ষম	মোক্ষম	ব্যর্থ
	রেফের নীচে ব্যঞ্জন-দ্বিত্ব বর্জন	পর্দ্দা, সর্দ্দার, ফর্দ্দ কর্জ্জ, জার্ম্মাণী, গির্জ্জা	পর্দা, সর্দার, ফর্দ কর্জ, জার্মানি, গির্জা	সফল

'দেশি-বিদেশি বানানের ছক থেকে এটুকু আন্দাজ সহজেই করা যায়, দুটি শ্রেণিই সরলীকরণের সূত্রগুলি সহজেই মেনে নিচ্ছে। তবে, সরলীকরণ দুটি শ্রেণির কাছেই বাধা পাচ্ছে মূলত একটি জায়গায়—স > শ-এর ক্ষেত্রে। দেখা যাচ্ছে, অন্য সব বর্ণ সরলীকরণের দাবি মেনে নিলেও 'স' তার নিজের জায়গাটুকু শ-কে ছেড়ে দিতে রাজি নয়। সেইকারণে, দেশি ফরসা-উসখুস-ডাঁসা বা বিদেশি ফারসি-সাদা-সাবান যেমন ছিল, তেমনি রইল। বিদেশি শব্দ অবশ্য আর-একটি এলাকায় 'মোক্ষম' বাধা দিয়েছে সরলীকরণ-প্রক্রিয়াকে। 'মোক্ষম' বানানের অর্ন্তগত যুক্তব্যঞ্জন 'ক্ষ'-কে ভেঙে 'ক্‌খ' করার পক্ষপাতী সে নয়। এটুকু ছেড়ে দিল এককথায় বলা যায়, দেশি-বিদেশি শব্দ-বানানের প্রায় গোটা এলাকায় বানান-সরলীকরণ অনেকটাই সম্ভব হয়েছে। এমনকী, উচ্চারণের শক্ত দাবি নিয়েও যে 'অ্যা' বর্ণ হিসেবে তদ্ভব শব্দেও মান্যতা পায় নি, বিদেশি শব্দের বানানে ঘটল তার অবাধ অনুপ্রবেশ, অ্যাসিড অ্যান্টেনা অ্যালোপ্যাথি ইত্যাদি বানানে। তৎসম বানানের অন্ধ অনুকরণে ণত্ব-ষত্ব (ইরাণ-কোরাণ গবর্ণর পোষাক) আর রেফের নীচে ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব (পর্দ্দা সর্দ্দার কর্জ্জ জার্ম্মাণ) চলছিল যেসব বিদেশি শব্দের বানানে,

সেসব বানান-ও-সরল সহজ হতে পারল সরলীকরণের সূত্র মেনেই (ইরান কোরান গভর্নর পোশাক পর্দা সর্দার কর্জ জার্মান)।

বানান-সরলীকরণের প্রক্রিয়া, নানা শ্রেণির শব্দ-বানানে তার প্রয়োগ এবং সে প্রয়োগের ব্যর্থতা সফলতা নিয়ে এতক্ষণ কথা হল। সবশুদ্ধ ২১টি সূত্র প্রয়োগ করে ১১১টি শব্দ-বানানে তার ফলাফল দেখা গেল এইরকম—সাফল্য ৬৩টি বানানে, ব্যর্থতা ৪৩টি বানানে আর আংশিক সাফল্য ৫টি বানানে। এবার ঐ ২১টি সূত্র থেকে বেছে নেব কেবল 'অ > ও' সূত্রটিকে। বিশেষ করে এই সূত্রটি নিয়ে বাড়তি যাচাই-এর কারণ, বাঙালির কণ্ঠে বানানের অ-কার বা অ-বর্ণকে ও-ধ্বনিতে উচ্চারণ করার ঝোঁকটা অত্যন্ত ব্যাপক। বাংলা শব্দভাণ্ডারের প্রতিটি শ্রেণিতে, বাংলা শব্দের প্রতিটি অবস্থানে (শুরুতে মাঝখানে বা শেষে) এর অবাধ বিস্তার। আমাদের বিবেচনার অন্তর্গত ১১১টি শব্দের মধ্য থেকে মোট ২৭টি প্রচলিত শব্দ-বানানের উপর 'অ > ও' সূত্রটি প্রয়োগ করা সম্ভব। করলে দেখা যাবে, এর মধ্যে মাত্র ৩টি বানানে সরলীকরণ-প্রক্রিয়া সফল, বাকি ২৪টি ক্ষেত্রেই তা ব্যর্থ। এর অর্থ, প্রচলিত বানানের অর্ন্তগত অ-বর্ণ বা অ-কার (অন্য বর্ণে নিহিত অবস্থায়) উচ্চারণে 'ও' হলেও তেমন উচ্চারণ-অনুসারী বানান এখনও পর্যন্ত গ্রহণযোগ্য হয়ে ওঠে নি। উদাহরণগুলি পরপর দেখে নিন—

শ্রেণি	**'অ' এর অবস্থান**	**প্রচলিত বানান**	**উচ্চারণ-অনুসারী বানান**	**গ্রহণযোগ্য বানান**	**সরলীকরণের সীমা (ব্যর্থ/সফল)**
তৎসম	শব্দের শুরুতে	ফণী	ফোনি	ফণী	ব্যর্থ
	শব্দের মাঝখানে	সরণী	শরোনি	শরণি	ব্যর্থ
		সরসী	শরোশি	সরসী	ব্যর্থ
		বর্দ্ধমান	বর্ধোমান	বর্ধমান	ব্যর্থ
	শব্দের শেষে	দুঃস্থ	দুস্থো	দুস্থ	ব্যর্থ
		দুঃখ	দুক্খো	দুঃখ	ব্যর্থ
		দারিদ্র্য	দারিদ্দ্রো	দারিদ্র	ব্যর্থ
অর্ধ-তৎসম	শব্দের শুরুতে	অবিশ্যি	ওবিশ্শি	অবিশ্যি	ব্যর্থ
		অভ্যেস	ওব্ভেশ্	অভ্যেস	ব্যর্থ
		গণ্যি	গোন্নি	গন্নি	ব্যর্থ

শ্রেণি	'অ' এর অবস্থান	প্রচলিত বানান	উচ্চারণ-অনুসারী বানান	গ্রহণযোগ্য বানান	সরলীকরণের সীমা (ব্যর্থ/সফল)
		দস্যি	দোশ্‌শি	দস্যি	ব্যর্থ
		সত্যি	শোত্তি	সত্যি	ব্যর্থ
		তক্ষুনি	তোক্‌খুনি	তক্ষুনি	ব্যর্থ
	শব্দের শেষে	কেষ্ট	কেশ্‌টো	কেষ্ট	ব্যর্থ
তদ্ভব	শব্দের মাঝখানে	এখন	অ্যাখোন	এখন	ব্যর্থ
		এমন	অ্যামোন	এমন	ব্যর্থ
		কেমন	ক্যামোন	কেমন	ব্যর্থ
		যখন	জখোন	যখন	ব্যর্থ
	শব্দের শেষে	এত	অ্যাতো	এত	ব্যর্থ
		কত	কতো	কত	ব্যর্থ
		যত	জতো	যত	ব্যর্থ
		ভাল	ভালো	ভালো	সফল
		কাল	কালো	কালো	সফল
		মত	মতো	মতো	সফল
দেশি	শব্দের শুরুতে	চটী	চোটি	চটি	ব্যর্থ
বিদেশি	শব্দের শেষে	ফৰ্দ্দ	ফর্দো	ফর্দ	ব্যর্থ
		কৰ্জ্জ	কর্জো	কর্জ	ব্যর্থ

দেখা গেল, 'অ > ও' সূত্রের ২৭টি প্রয়োগের ২৪টি ক্ষেত্রেই ব্যর্থতা। কিন্তু এ নিয়ে এই মুহূর্তে হতাশ হবার কোনও কারণ নেই। প্রথমত, তৎসম শব্দের ক্ষেত্রে এ ধরনের বর্ণবদল ব্যাকরণসম্মত নয় বলে গ্রহণযোগ্য হবার পক্ষে বাধা আছে। দ্বিতীয়ত, প্রতিটি অ-বর্ণ বা অ-কারকে উচ্চারণমুখী ও-কারে বদল করতে গেলে বানান সরল হবার পরিবর্তে জটিল হবার আশঙ্কা থেকেই যায়। প্রচলিত সরণী-বৰ্দ্ধমান-দুঃস্থ-দারিদ্র্য যথাসম্ভব সরলীকৃত বানানে শরণি-বর্ধমান-দুস্থ হবার পরও যদি না থামি,

‘অ > ও’ সূত্র প্রয়োগে আরও বেশি উচ্চারণ-অনুসারী করতে গিয়ে যদি এদের শরোণি-বর্ধোমান-দুস্থো-দারিদ্‌দ্রো’ বানানের জটিল চেহারা এনে দিই, তবে সরলীকরণের মূল উদ্দেশ্যটাই তখন ব্যর্থ হবে। অতএব এসব ক্ষেত্রে বানানের ‘অ’ লেখায় থাকুক, আর উচ্চারণের ‘ও’ কণ্ঠে থাকুক, জবরদস্তির দরকার নেই। অবিশ্যি-এমন-চটি-ফর্দ জাতীয় বানানের ক্ষেত্রে একই কথা। তবে, ‘ভাল-কাল-মত’ থেকে ‘ভালো-কালো-মতো’ যে গ্রহণযোগ্য সরলীকৃত বানান হিসেবে বিবেচিত হল, তার একটি নির্দিষ্ট কারণ আছে। কপাল অর্থে ‘ভাল’ আর মন্দ-র বিপরীতে ‘ভালো’, সময়-অর্থে ‘কাল’ আর রং বোঝাতে ‘কালো’, ধারণা-অর্থে ‘মত’ আর একইরকম বোঝাতে ‘মতো’—অর্থের ফারাকটিকে উচ্চারণ দিয়ে ধরিয়ে দেবার রেওয়াজ এতদিন ছিলই। এবার পৃথক বানান দিয়ে সেই কাজটি করার সুযোগ তৈরি হল বলেই ‘অ > ও’ সূত্রের প্রয়োগ এই তিনটি শব্দ-বানানে (এবং এ-রকম আরও কিছু শব্দ-বানানে) স্বচ্ছন্দে মেনে নেওয়া গেল। বাকি ২৪টি শব্দ-বানানে পৃথক অর্থ বোঝানোর দায় নেই, বাস্তবে সরলীকরণও সেসব ক্ষেত্রে সম্ভব হয়ে উঠছে না। সেই কারণে ‘অ > ও’ সূত্রের প্রয়োগ সেখানে ব্যর্থ হল।

১১৫.৪.১ সারাংশ—২

বানানকে যথাসাধ্য সরল করাই যেহেতু আমাদের লক্ষ্য, সেই কারণে উচ্চারণ মেনে বানান-লেখা ততক্ষণই চলবে, যতক্ষণ তা আরও সহজ হবে। এটা করতে গিয়ে দেখতে পাবেন, উচ্চারণ অনুসারে বর্ণবদল মেনে নেবার ক্ষমতা এক-এক শ্রেণির শব্দের এক-একরকম। তৎসম ‘সৈন্য’ বা অর্ধ-তৎসম ‘অভ্যেস’ উচ্চারণ-অনুসারী বর্ণবদল মানবে না, করতে গেলে বানান আরও জটিল হবে (শোইন্নো, ওব্‌ভেশ), তদ্ভব ‘দৈ’ বর্ণবদল মানবে ‘দই’ পর্যন্ত (‘দোই’ চলবে না), দেশি ‘ডাঙ্গা’ আর বিদেশি ‘গভর্ণর’ অবাধে মেনে নেবে ‘ডাঙা’ আর গভর্নর’-এর বদলে-যাওয়া বানান। অর্থাৎ সাধারণভাবে ধরে নিন, তৎসম আর অর্ধ-তৎসম বানানে সরলীকরণের প্রক্রিয়া প্রায় অচল, তদ্ভব বানানে সরলীকরণ সম্ভব একটা নির্দিষ্ট সীমানার মধ্যে, দেশি-বিদেশি বানানে সরলীকরণ অনেকটাই অবাধ।

১৭টি তৎসম শব্দে সরলীকরণের সূত্র প্রয়োগ করে দেখা গেল—৬টি শব্দ প্রচলিত বানান বহাল রাখছে ১১টি শব্দে সরলীকরণ সফল হচ্ছে বিকল্প বানানের সুযোগে। তবে, বিকল্প বিধানের ফাঁক দিয়ে শ্রেণি-উষা-শংকর-কোণ-শরণি-অন্তত-দুস্থ-ঈর্ষা বানানের এই সরলীকৃত চেহারা তৎসম বানানের সরলীকরণের সীমানাকে ক্রমশ বাড়িয়ে দেবে, এটা আশা করা যায়।

১৪টি অর্ধ-তৎসম শব্দের ১১টিতেই সরলীকরণ ব্যর্থ, প্রচলিত বানান বহাল। বাকি ৩টি ক্ষেত্রে 'ণ'-র বদলে 'ন' (গণ্যি > গন্নি) বা 'জ্ঞ'-র বদলে 'গ্‌গ' (জিজ্ঞেস > জিগ্‌গেস)—এইটুকু বর্ণবদলে সরলীকরণের সাফল্য দেখা যাচ্ছে।

তদ্ভব বানানের ১৩টি ক্ষেত্রে সরলীকরণ-সূত্র প্রয়োগ করতে গিয়ে ৬টিতে পুরোপুরি আর ৪টিতে অংশত সাফল্য পাওয়া গেল, ব্যর্থতা ৩টিতে। অর্থাৎ, তদ্ভব বানানের ঝোঁক সরল হবার দিকে, তবু দ্বিধা থাকছে অনেকটাই। সরলীকরণের বিরুদ্ধে অনড় হয়ে থাকছে এ-ষ-স। দেশি-বিদেশি শব্দে সরলীকরণ প্রায় পুরোপুরিই সফল। উচ্চারণ মেনে বর্ণবদলে প্রায় সব শব্দই আগ্রহী। বাধা আসে কেবল 'স' (দেশি ফরসা-উসখুস-ডাঁসা, বিদেশি ফারসি-সাদা-সাবান) আর 'ক্ষ' (মোক্ষম)-এর তরফ থেকে।

১১৫.৪.২ অনুশীলনী-২

১. তৎসম অর্ধ-তৎসম তদ্ভব দেশি বিদেশি শব্দের বানানে সরলীকরণ-প্রক্রিয়া কতদূর প্রযোজ্য, উদাহরণসহ দেখিয়ে দিন।

২. (ক) সূত্র উল্লেখসহ নীচের প্রচলিত বানানগুলির সরলীকরণ করুন—ঊষা, শঙ্কর, কোষ, সরণী, ক্রমশঃ, বৰ্দ্ধমান, দারিদ্র্য, ঊৰ্ব্বশী, শুভঙ্কর, পরিবেষণ, অন্ততঃপক্ষে ঊর্দ্ধ, ভ্রুকুটী, বৈশিষ্ট্য, পুণ্যি, জিজ্ঞেস, মফঃসল, হিস্যা, খৃষ্টাব্দ, সৰ্দ্দার, ঊনিশ, বৌ, ক্ষ্যাপা, এসিড, লস্যি, পোষাক, গভর্ণর, পুলিস, ব্যানার্জ্জি, চতুর্দ্দিক্।

(খ) সূত্র উল্লেখসহ নীচের প্রচলিত বানানগুলি থেকে সরলীকরণযোগ্য বানান বাছাই করে যথাসম্ভব সরলীকরণ করুন—

ঈদ, মোক্ষম, কোরাণ, ফরাসী, ডিঙ্গা, দাঙ্গা, রাঙ্গা, কোষ, দোষ, মোষ, মৌ, নৌকা, মৌলবী, মৌলানা, কোণাকুণি, গণ্য, দুঃস্থ, দুঃখ, অতঃপর, ঋষি, ঋক্‌থ, ঊর্ম্মি, ঊষা, শ্রেণী, ফণী, বেণী, ননী, সরসী।

(গ) নীচের সূত্রগুলি প্রয়োগ করে ২টি করে প্রচলিত বানানের সরলীকরণ করুন—
ঋ > রি ঙ > ং ক্ষ > খ জ্ঞ > গ্‌গ ঐ > অই
এ > অ্যা ষ > শ ঈ > ই ণ > ন স > শ।

EBG (P-8 M 30-33)—12

১১৫.৫ মূলপাঠ—৩ ঃ সরলীকরণের উদাহরণ

এর আগের দুটি মূলপাঠে সরলীকরণের ভাবনা আর প্রয়োগের কিছু নমুনা দেখতে পেলেন। সেইসঙ্গে এও দেখলেও, সরলীকরণ বাংলা বানানের সবক্ষেত্রেই অবাধ নয়, সার্বিক গ্রহণযোগ্যতার পক্ষে এর নির্দিষ্ট কিছু বাধা আছে, আর সেই কারণে এ প্রক্রিয়ায় কিছু কিছু সীমাবদ্ধতাও মেনে নিতে হচ্ছে। সময় যত এগোবে, গ্রহণীয়তার পরিধিও তত বাড়বে। বানান সরলীকরণের এখনকার সীমানা আন্দাজ করার জন্য কিছু কিছু উদাহরণ এই মূলপাঠে তুলে ধরা হচ্ছে।

বানান সরলীকরণের প্রক্রিয়া থেকে এটা অবশ্যই দেখতে পাবেন, বেশির ভাগ প্রচলিত বানানই বদল চায় না, কেননা, উচ্চারণ-অনুসারী বদলে তার চেনা চেহারাটি সরল না হয়ে আরও জটিল হতে পারে। এই সম্ভাবনাটি তৎসম আর অর্ধ-তৎসম শব্দের ক্ষেত্রেই বেশি, তদ্ভব-দেশি-বিদেশির ক্ষেত্রে তুলনায় কম। সরলীকরণের অংশ নিতে চায় যেসব শব্দ, তাদের তিনটি ভাগে ভাগ করা সম্ভব—

১. উচ্চারণ-অনুসারী সরলকীকৃত বানান পুরোপুরি মেনে নেয় এমন শব্দ;

২. প্রচলিত বানান বজায় রেখে বিকল্পে উচ্চারণ-অনুসারী সরলীকৃত বানান মেনে নেয় এমন শব্দ;

৩. নিজেরা উচ্চারণ-অনুসারী সরলীকৃত বানান পুরোপুরি মেনে নিলেও একই শ্রেণির বা একই গোত্রের অন্য কিছু শব্দকে ব্যতিক্রম হিসেবে এ প্রক্রিয়ার বাইরে ঠেলে দেয় এমন শব্দ।

ভাগ-১ এর উদাহরণ তৎসম অর্চনা কর্ম সূর্য, অ-তৎসম ফর্দ আর্মানি গির্জা—এইরকম রেফযুক্ত শব্দ, যারা রেফের নীচে ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব কাটিয়ে এখন একক ব্যঞ্জনকে পুরোপুরি মেনে নিতে পারছে। ভাগ-২-এর উদাহরণ তৎসম দেশি-দেশী ঋক্‌থ-রিক্‌থ, অ-তৎসম বৈঠা-বইঠা, যুঁই-জুঁই সড়াত-সড়াৎ ব্যাংক-ব্যাঙ্ক-এর মতো কিছু জোড়া বানানের শব্দ, যারা ‘এক শব্দ এক বানান’ লক্ষ্যের দিকে খানিকটা এগিয়ে এসেও থমকে দাঁড়িয়েছে ‘এক শব্দ দুই বানান’-এর শক্ত দেয়ালটার সামনে। ভাগ-৩-এর উদাহরণ পদবি উষা অহংকার কোশ শরণি—এইরকম কিছু তৎসম শব্দ, যারা ই-ঈ, উ-ঊ, ঙ-ং, ষ-শ, স-শ-এর দ্বিধায় দোল খেতে খেতে ক্রমশ সরলীকৃত বানানের দিকে ঝুঁকতে শুরু করেছে। কিন্তু এদের পাশে ব্যাকরণের শক্ত শাসন মেনে প্রচলিত বানানে আটকে রইল আরও অজস্র শব্দ (ফণী মাধবী উর্মি অঙ্ক ভঙ্গ দোষ সরসী ইত্যাদি), যারা এদেরই সগোত্র। ভাগ-৩ এর আরও উদাহরণ আরবি-ইংরেজি-জাপানি-তুরকি-ফরাসির মতো অ-তৎসম শব্দ, যারা অবাধে ঈ-কারের ফাঁস ছিঁড়ে বেরিয়ে এসে ই-কারকে বরণ

করে নিলেও তাদেরই সগোত্র অস্ট্রেলীয়-ইতালীয়-কানাডীয় কেবল তৎসম 'ঈয়' প্রত্যয় মেনে নেবার দোষে ঈ-কার থেকে রেহাই পেল না। একইভাবে তৎসম অন্তত-ক্রমশ-দুস্থ বিসর্গের বাঁধন কেটে বেরিয়ে এলেও অতঃপর-মনঃপূত-দুঃখ বানানে বিসর্গ বহাল থাকলই।

সরলীকৃত বানানের যে তিনটি ভাগের কথা বলা হল, তার মধ্যে ভাগ-১ এর অর্ন্তগত হবে রেফের নীচে ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব অমান্য করার প্রতিটি উদাহরণ, সেইসঙ্গে থাকবে 'ণ'-র বদলে 'ন' আর 'ঋ' র বদলে 'রি'কে মেনে নেবার আরও কিছু উদাহরণ। ভাগ-২ এর উদাহরণে দেখা যাবে সরলীকৃত বানানের পাশাপাশি প্রচলিত বানানকে বিকল্প হিসেবে মেনে নেবার কারণে সরলীকরণ-প্রক্রিয়ার একধরনের সীমাবদ্ধতা, ভাগ-৩ এর উদাহরণে পাবেন সরলীকৃত বানানের পাশাপাশি ব্যতিক্রম হিসেবে কিছু কিছু প্রচলিত বানানকে মেনে নেবার কারণে সরলীকরণের আর-এক ধরনের সীমাবদ্ধতা।

এবারে আমরা একটি একটি করে প্রতিটি ভাগের কিছু কিছু উদাহরণকে তালিকাবদ্ধ করার দিকে এগোই—

ভাগ-১. বাংলা বানানের সার্বিক সরলীকরণ

ক. তৎসম শব্দ ঃ

সরলীকরণের সূত্র ঃ রেফের নীচে ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব-বর্জন

প্রচলিত বানান	সরলীকৃত বানান	প্রচলিত বানান	সরলীকৃত বানান
অর্চ্চনা	অর্চনা	গর্জ্জন	গর্জন
অর্জ্জন	অর্জন	গর্ব্ব	গর্ব
অর্জ্জুন	অর্জুন	ঘর্ম্ম	ঘর্ম
অর্দ্ধ	অর্ধ	চর্চ্চা	চর্চা
অর্ব্বাচীন	অর্বাচীন	চর্ব্বণ	চর্বণ
আর্ত্ত	আর্ত	চর্ম্ম	চর্ম
আর্য্য	আর্য	চর্য্যা	চর্যা
আবর্ত্ত	আবর্ত	জর্জ্জরিত	জর্জরিত
ঊর্দ্ধ	ঊর্ধ্ব	তর্জ্জন	তর্জন
ঊর্ব্বর	উর্বর	তূর্য্য	তূর্য
ঊর্ম্মি	ঊর্মি	দুর্দ্দম	দুর্দম

প্রচলিত বানান	সরলীকৃত বানান	প্রচলিত বানান	সরলীকৃত বানান
ঊর্ম্মিলা	ঊর্মিলা	দুর্দ্দশা	দুর্দশা
ঐশ্বর্য্য	ঐশ্বর্য	দুর্দ্দিন	দুর্দিন
কর্ত্তব্য	কর্তব্য	দুর্দ্দৈব	দুর্দৈব
কর্ত্তা	কর্তা	দূর্ব্বা	দূর্বা
কর্ম্ম	কর্ম	দুর্ব্বোধ	দুর্বোধ
কার্ত্তিক	কার্তিক	দুর্ম্মতি	দুর্মতি
খর্ব্ব	খর্ব	দুর্য্যোগ	দুর্যোগ
ধূর্ত্ত	ধূর্ত	বর্ব্বর	বর্বর
ধৈর্য্য	ধৈর্য	বার্দ্ধক্য	বার্ধক্য
নর্ত্তক	নর্তক	বীর্য্য	বীর্য
নর্ম্মদা	নর্মদা	ভর্ত্তা	ভর্তা
নির্জ্জন	নির্জন	ভট্টাচার্য্য	ভট্টাচার্য
নির্দ্দয়	নির্দয়	মর্ম্ম	মর্ম
নির্ব্বাক	নির্বাক	মর্ত্ত	মর্ত
নির্ব্বাচন	নির্বাচন	মর্য্যাদা	মর্যাদা
নির্ব্বাধ	নির্বাধ	মূর্ত্তি	মূর্তি
নির্ব্বোধ	নির্বোধ	মূর্চ্ছনা	মূর্ছনা
পর্ব্ব	পর্ব	শর্ত্ত	শর্ত
পর্য্যটন	পর্যটন	শর্ম্মা	শর্মা
পূর্ব্ব	পূর্ব	শৌর্য্য	শৌর্য্য
বর্জ্জন	বর্জন	সর্ব্ব	সর্ব
বর্ত্তমান	বর্তমান	সূর্য্য	সূর্য
বর্দ্ধমান	বর্ধমান	হর্ম্ম্য	হর্ম্য

খ. অ-তৎসম শব্দ ঃ

সরলীকরণের সূত্র	প্রচলিত বানান	সরলীকৃত বানান
১. রেফের নীচে	আর্দ্দালী	আর্দালি
ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব-বর্জন	আর্ম্মানী	আর্মানি
	উর্দ্দি	উর্দি
	উর্দ্দু	উর্দু
	গর্দ্দান	গর্দান
	চার্জ্জ	চার্জ
	চ্যাটার্জ্জি	চ্যাটার্জি
	জর্দ্দা	জর্দা
	জর্জ্জ	জর্জ
	জার্ম্মাণ	জার্মান
	পর্দ্দা	পর্দা
	ব্যানার্জ্জি	ব্যানার্জি
	মুখার্জ্জি	মুখার্জি
	সর্দ্দার	সর্দার
২. ঋ > রি	খৃষ্টান	খ্রিস্টান
	খৃষ্টাব্দ	খ্রিস্টাব্দ
	বৃটিশ	ব্রিটিশ
	বৃটেন	ব্রিটেন
৩. ণ > ন	অঘ্রাণ	অঘ্রান
	কাণ	কান
	চুণ	চুন
	ঝরণা	ঝরনা
	ঠাকরুণ	ঠাকরুন

সরলীকরণের সূত্র	**প্রচলিত বানান**	**সরলীকৃত বানান**
	দরুণ	দরুন
	পুরাণ	পুরোনো
	রাণী	রানি
	সোণা	সোনা
	প্যাণ্ট	প্যান্ট
	লণ্ঠন	লন্ঠন
	ঠাণ্ডা	ঠান্ডা

ভাগ-২. বানান-সরলীকরণের সীমা ঃ বিকল্প প্রচলিত বানান পাশাপাশি

	সরলীকরণের সূত্র	**প্রচলিত বানান**	**সরলীকৃত বানান/গৃহীত বানান**
তৎসম শব্দ ঃ	ঈ > ই	দেশী	দেশি, দেশী
	ঋ > রি	ঋ ক্থ	রিক্থ, ঋক্থ
অর্ধ-তৎসম শব্দ ঃ	ঊ > উ	ঊনত্রিশ	উনতিরিশ, ঊনত্রিশ
	য > জ	ভটাচায্যি	ভটচাজ্জি, ভটচায্যি
তদ্ভব শব্দ ঃ	অ > ও	বড়	বড়ো, বড়
		কোন	কোনো, কোনও
	ঐ > অই	বৈঠা	বইঠা, বৈঠা
	ঔ > অউ	চৌকো	চউকো, চৌকো
		চৌকি	চউকি, চৌকি
		মৌমাছি	মউমাছি, মৌমাছি
	য > জ	যুঁই	জুঁই, যুঁই
	স > শ	সজারু	শজারু, সজারু
দেশি শব্দ ঃ	ঈ > ই	কাহিনী	কাহিনি, কাহিনী
	এ > অ্যা	ভেংচানো	ভ্যাংচানো, ভেংচানো
	অ > ও	সড়গড়	সড়োগড়ো, সড়গড়

	সরলীকরণের সূত্র	প্রচলিত বানান	সরলীকৃত বানান/গৃহীত বানান
	ৎ > ত	সড়াৎ	সড়াত, সড়াৎ
		ধ্যাৎ	ধ্যাত, ধ্যাৎ
বিদেশি শব্দ ঃ	ঈ > ই	ঈদ	ইদ, ঈদ
		চীনা	চিনা, চীনা
	এ > অ্যা	খেসারত	খ্যাসারত, খেসারত
	অ > ও	পর্তুগীজ	পোর্তুগিজ, পর্তুগিজ
		পরটা	পরোটা, পরটা
	ঙ > ং	ব্যাঙ্ক	ব্যাংক, ব্যাঙ্ক
	য > জ	যিশু	জিশু, যিশু

ভাগ-৩, বানান-সরলীকরণের সীমা ঃ ব্যতিক্রমী প্রচলিত বানান পাশাপাশি

'আকাদেমি বানান অভিধানে'র পরিশিষ্ট-৩-এ (তৃতীয় সংস্করণ, ডিসেম্বর ২০০১) ৩৩০টি **তৎসম** শব্দের একটি বর্ণাক্রমিক তালিকা দেখতে পাবেন। তালিকাভুক্ত প্রতিটি শব্দেরই একাধিক ব্যাকরণসম্মত বানান পাশাপাশি দেওয়া আছে। প্রতিটি জোড়া বানানের প্রথমটি আজকের বাংলাভাষার পক্ষে গ্রহণযোগ্য আকাদেমি-সমর্থিত বানান, দ্বিতীয়টি প্রচলিত কিন্তু বর্জনীয় বানান। ঐ তালিকা থেকে কয়েকটি উদাহরণ নীচে দেওয়া হল, লক্ষ করুন—

সরলীকরণের সূত্র	প্রচলিত /বর্জনীয় বানান	সরলীকৃত/গ্রহণযোগ্য বানান
১. ঈ > ই	অঙ্গুলী	অঙ্গুলি
	অন্তরীক্ষ	অন্তরিক্ষ
	আবীর	আবির
	উত্তরসূরী	উত্তরসূরি
	কুটীর	কুটির
	চীৎকার	চিৎকার
	ঝিল্লী	ঝিল্লি
	তুলী	তুলি
	পদবী	পদবি

সরলীকরণের সূত্র	প্রচলিত /বর্জনীয় বানান	সরলীকৃত/গ্রহণযোগ্য বানান
	পদাবলী	পদাবলি
	পল্লী	পল্লি
	দেবী	দেবি
	ভঙ্গী	ভঙ্গি
	শ্রেণী	শ্রেণি
	সূচী	সূচি
২. ঊ > উ	আকৃতি	আকুতি
	ঊর্ণা	উর্ণা
	ঊর্বর	উর্বর
	ঊর্বশী	উর্বশী
	ঊষা	উষা
	ভ্রূ	ভ্রু
৩. ঙ > ং	অলঙ্কার	অলংকার
	অহঙ্কার	অহংকার
	ওঙ্কার	ওংকার
	কিঙ্কর	কিংকর
	কিঙ্কিণি	কিংকিণি
	ঝঙ্কার	ঝংকার
	টঙ্কার	টংকার
	প্রলয়ঙ্কর	প্রলয়ংকর
	শুভঙ্কর	শুভংকর
	সঙ্কলন	সংকলন
	সঙ্কীর্তন	সংকীর্তন
	সঙ্কেত	সংকেত

সরলীকরণের সূত্র	প্রচলিত /বর্জনীয় বানান	সরলীকৃত/গ্রহণযোগ্য বানান
	সঙ্গত	সংগত
	সঙ্গীত	সংগীত
	সঙ্ঘ	সংঘ
	সঙ্ঘাত	সংঘাত
	হুঙ্কার	হুংকার
	হৃদয়ঙ্গম	হৃদয়ংগম
৪. ষ > শ	কোষ	কোশ
৫. স > শ	কিসলয়	কিশলয়
৬. য-ফলা > য-ফলা বর্জন	ঈর্ষ্যা	ঈর্ষা
	উপলক্ষ্য	উপলক্ষ
	দারিদ্র্য	দারিদ্র
৭. ঃ > বিসর্গ বর্জন	দুঃস্থ	দুস্থ
	নিঃশ্বাস	নিশ্বাস
	নিঃস্পৃহ	নিস্পৃহ
	নিঃস্পন্দ	নিস্পন্দ
	বক্ষঃস্থল	বক্ষস্থল

সরলীকরণের ৭টি সূত্র প্রয়োগ করে উপরের ৫০টি তৎসম শব্দের বানানে, সব মিলিয়ে তালিকাবদ্ধ ৩৩০টি বানানেই সরলীকরণ করা সম্ভব। সংস্কৃত ব্যাকরণে এই কটি শব্দের জন্য বিকল্প বানানের বিধান রয়েছে বলেই এটা সম্ভব হল। কিন্তু, এই ছোট্ট তালিকার বাইরে যে অসংখ্য তৎসম বানান প্রচলিত রয়েছে, সরলীকরণের সূত্র তাদের সবার কাছে পৌঁছতেই পারছে না। দেখা যাক, প্রচলিত তৎসম বানানে সরলীকরণ আর কতটা সম্ভব।

উপরের ৭নং সূত্রে দুঃস্থ-নিঃশ্বাস-নিঃস্পৃহ-নিঃস্পন্দ-বক্ষঃস্থল থেকে মাঝখানে থাকা বিসর্গকে মুছে যেতে দেখেছেন, এবং এটা সংস্কৃত ব্যাকরণের বিধান মেনেই ঘটছে। কিন্তু, অতঃপর-মনঃপূত-দুঃখ বানান তাদের মাঝখানটার বিসর্গ-কে বহাল রাখছে। তবে সংস্কৃত ব্যাকরণের বেড়া ডিঙিয়ে সরলীকরণের

আরও জোরদার একটি সূত্রের সহায়তায় শব্দের শেষে-থাকা বিসর্গকে সহজেই সরিয়ে দেওয়া গেছে অন্ততঃ-প্রথমতঃ-ফলতঃ-বস্তুতঃ-ক্রমশঃ-প্রায়শঃ থেকে, পাওয়া গেছে বিসর্গহীন অন্তত-প্রথমত-ফলত-বস্তুত-ক্রমশ-প্রায়শ।

৩নং সূত্র প্রয়োগ করে অলংকার-সংগীত-সংঘাতের মতো ঙ-হীন সরলীকৃত কিছু-সংখ্যক বানান আমাদের হাতে এলেও অঙ্ক-শঙ্খ-বঙ্গ-জঙ্ঘা এবং এই রকমের ঙ-যুক্ত বেশ কিছু শব্দই প্রচলিত বানান আঁকড়ে থেকে গেল।

এবারে ঐ ৭টি সূত্রের বাইরে আরও একটি সূত্র প্রয়োগ করা যাক হস্-যুক্ত বানানের উপর। শব্দের শেষে-থাকা হস্‌চিহ্ন-বর্জনের এই উদ্যোগে আশিস্-দিক্-ধিক্-পরিষদ্-বণিক্ বা শ্রীমান্-জ্ঞানবান্-ভগবান্-এর মতো কিছু শব্দ হস্‌চিহ্নহীন আশিস-দিক-ধিক-পরিষদ-বণিক বা শ্রীমান-জ্ঞানবান-ভগবান বানানেই আজকের বানানভাবুকদের কাছে গ্রহণীয় হয়ে উঠল। তবু, সরলীকরণের সুযোগ থেকে বঞ্চিত রইল সন্ধিজাত শব্দের মাঝখানে থাকা হস্‌চিহ্নের দাবিদার বানান দিগ্‌ভ্রান্ত-পৃথক্‌করণ-বাগ্‌ধারা।

অতএব, এটা বোঝা গেল, বাংলা শব্দের ভাণ্ডারে যে অজস্র পরিমাণ তৎসম শব্দ রয়েছে, তার মধ্য থেকে গুটিকতক শব্দের বানানেই সরলীকরণ সম্ভব। কেননা, সংস্কৃত ব্যাকরণের বিধিনিয়মের চৌহদ্দির বাইরে তাদের টেনে আনা এই মুহূর্তে অসাধ্য। তৎসম বানানের ক্ষেত্রে সরলীকরণের এই সীমাবদ্ধতা আপাতত মানতেই হবে।

অ-তৎসম বানানে সরলীকরণের সূত্র কতটা সফল হতে পারে, 'আকাদেমি গৃহীত বানানবিধি'-র (আকাদেমি বানান অভিধান ঃ পরিশিষ্ট -১) পথ ধরে দেখা যাক।

সরলীকরণের সূত্র	প্রচলিত বানান	গ্রহণযোগ্য বানান
১. ঈ > ই	কুমীর-দিঘী-পাখী-বাড়ী	কুমির-দিঘি-পাখি-বাড়ি
	বাঁশী-হাতী-হীরা-পশমী	বাঁশি-হাতি-হিরা-পশমি
	কাকী-খুকী-পিসী-মামী	কাকি-খুকি-পিসি-মামি
	বাঘিনী-বামনী-ছুঁড়ী-রাণী	বাঘিনি-বামনি-ছুঁড়ি-রানি
	জমিদারী-ডাক্তারী-পণ্ডিতী	জমিদারি-ডাক্তারি-পণ্ডিতি
	মারাঠী-মৈথিলী-হিন্দী	মারাঠি-মৈথিলি-হিন্দি
	অসমীয়া-ওড়িশী-বাঙালী	অসমিয়া-ওড়িশি-বাঙালি

সরলীকরণের সূত্র	প্রচলিত বানান	গ্রহণযোগ্য বানান
	দরদী-সরকারী-জানুয়ারী	দরদি-সরকারি-জানুয়ারি
	গোলামী-চালাকী-কেরামতী	গোলামি-চালাকি-কেরামতি
	ঢাকী-মালী-কাঁসারী	ঢাকি-মালি-কাঁসারি
ব্যতিক্রম ঃ	অস্ট্রেলীয়-ইতালীয়-কানাডীয়	
	ইউরোপীয়-এশীয়-জর্জীয়	
	(-ঈয় প্রত্যয়ের জোরে)	
২. ঊ > উ	ধূলা-পূরা-ঊনিশ	ধুলো-পুরো-উনিশ
ব্যতিক্রম	ঊনত্রিশ-মূর্খামি-ভূতুড়ে-পূজারি	
	(তৎসম উপসর্গ বা তৎসম শব্দের জোরে)	
৩. অ > ও	কাল-ভাল-এগার-বার	কালো-ভালো-এগার-বার
	তের-চোদ্দ-পনের	তেরো-চোদ্দো-পনেরো
	ত-হয়ত-মত	তো-হয়তো-মতো
ব্যতিক্রম ঃ	এত-কত-তত-যত	
৪. ঐ > অই ঃ	কৈ-খৈ-থৈ-দৈ	কই-খই-থই-দই
	পৈতে-হৈচৈ-থৈথৈ	পইতে-হইচই-থইথই
ব্যতিক্রম ঃ	কৈফিয়ত-তৈরি-নৈবিদ্যি-বৈঠক	
৫. ঔ > অউ ঃ	মৌ-বৌ-ফৌজ-মৌজ-মৌলবী	মউ-বউ-ফউজ-মউজ-মউলবি
ব্যতিক্রম ঃ	মৌজা-মৌলানা-কৌটা	
	দৌড়-মৌরি-পৌনে-চৌঠা	

সরলীকরণের সূত্র	প্রচলিত বানান	গ্রহণযোগ্য বানান
৬. ঙ্গ > ঙ	ভাঙ্গা-কাঙ্গাল-গ্যেঙ্গানি-ঝিঙ্গা	ভাঙা-কাঙাল-গোঙানি-ঝিঙা
	ড্যঙ্গা-ডিঙ্গি-ঢ্যাঙ্গা-রাঙ্গা	ডাঙা-ডিঙি-ঢ্যাঙা-রাঙা
	লাঙ্গল-রঙ্গীন-নোঙ্গর-ধাঙ্গর	লাঙল-রঙিন-নোঙর-ধাঙর
ব্যতিক্রম ঃ	জঙ্গুলে-জঙ্গি-লুঙ্গি-হাঙ্গামা	('ঙ্গ' উচ্চারণের জোরে)
৭. য > জ	যাঁতি-যাঁতা-যুতসই	জাঁতি-জাঁতা-জুতসই
	যো-যোগাড়-যোড়া-যোড়	জো-জোগাড়-জোড়া-জোড়
ব্যতিক্রম ঃ যখন-যদ-যন্তর-যাওয়া-যিনি (প্রচলনের জোরে)		
৮. ক্ষ > খ	ক্ষুদ-ক্ষেত-ক্ষ্যাপা	খুদ-খেত-খ্যাপা
ব্যতিক্রম ঃ	মোক্ষম, তক্ষুনি (প্রচলনের জোরে)	
৯. য-ফলা > ব্যঞ্জন দ্বিত্ব	হিস্যা-লস্যি	হিস্‌সা-লস্‌সি
ব্যতিক্রম ঃ	কাব্যি-মান্যি-গণ্যি	
১০. স > শ	আপাসোস-তহসিল	আপশোশ-তহশিল
	নোটিশ-মেসিন	নোটিশ-পালিশ
ব্যতিক্রম ঃ	সাবান-সাদা-জিনিস (প্রচলনের জোরে)	

উপরে যে ১০টি সূত্র প্রয়োগ করা হল, তার প্রতিটি ক্ষেত্রেই কিছু বানান যেমন সরলীকৃত হল, কিছু বানান তেমনি এসব সূত্র এড়িয়ে ব্যতিক্রম হিসেবেই প্রচলিত চেহারা নিয়ে পড়ে রইল। সরলীকরণের প্রক্রিয়া এসব শব্দ-বানানের কাছে এসে ব্যর্থ। সেইসঙ্গে অসম্পূর্ণ থেকে গেল বানানে সমতাবিধানের উদ্যোগ।

১৯৩৬-৩৭ এর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২২-দফা বানানের নিয়ম আর ১৯৯৭-২০০১ এর বাংলা আকাদেমির ২০-দফা বানানবিধি—এই দুবারের দুই কিস্তি নির্দেশ-নামা থেকে একটি বিষয় বোঝা গেল, অ-তৎসম বানান থেকে 'ঋ' আর 'ণ' মুছে দেওয়া আর সব রকমের বানান থেকে রেফযুক্ত ব্যঞ্জন-দ্বিত্ব বর্জন করার নির্দেশে কোনও ব্যতিক্রম নেই, বিকল্পের ব্যবস্থা নেই। অন্য সব বিধানেই প্রচলিত বানানকে

অন্ততপক্ষে অংশত বাঁচিয়ে রাখার মতো কোনও-না-কোনও রকম ফাঁক থাকছেই, যা গলিয়ে অনেক বানান সমতাবিধানের মূল শর্তকে অমান্য করতে পারছে এখনও পর্যন্ত। অথচ, সেসব বিকল্প বা ব্যতিক্রম না মেনে নিয়েও এখনই কোনও উপায় বানান-ভাবুকদের হাতে নেই। বানান-সরলীকরণের সীমাবদ্ধতা এখানেই। সীমানাটা মানতে হচ্ছে বলেই 'দেশি'র পাশে 'দেশী' বা 'বইঠা'র পাশে 'বৈঠা' সমান প্রশ্রয়ে বহাল থাকছে, আশিস-বিপদ-ভগবান হস্‌মুক্ত হলেও পৃথক্‌করণ-বাগ্‌দেবী-দিক্‌ভ্রান্ত বানানে হস্‌চিহ্ন থাকছেই, অনুজ্ঞায় বলো-বোলো-হোক ও-কার পেলেও বলল-বলব-বলত প্রচলিত বানানেই আটকে পড়ছে, 'হিস্যা' থেকে 'হিস্‌সা' বা 'লস্যি' থেকে 'লস্‌সি' হলেও 'কাব্যি' থেকে 'কাব্বি' বা মান্যিগন্যি থেকে 'মান্নিগন্নি' হতে পারছে না।

১১৫.৫.১ সারাংশ—৩

বাংলা বানানে সমতা আনতে গিয়ে 'এক শব্দ এক বানান' নীতির দিকে এগোতে গিয়ে—অর্থাৎ বানানে সরলীকরণ করতে গিয়ে দেখা যাচ্ছে, সরলীকরণ প্রক্রিয়ার মধ্যে চলে আসছে তিন রকমের শব্দ। কিছু শব্দ উচ্চারণ-মুখী বানান পুরোপুরি মেনে নিচ্ছে, কিছু শব্দ উচ্চারণ-মুখী সরলীকৃত বানানের পাশাপাশি প্রচলিত বানানকেও বিকল্প হিসেবে রেখে দিচ্ছে, আর কিছু শব্দ সরলীকরণে এগিয়ে এলেও একই গোত্রের অন্য কিছু শব্দ ব্যতিক্রম হিসেবে প্রচলিত বানানেই থেকে যাচ্ছে। প্রথম ভাগের শব্দ রেফের নীচে ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব প্রয়োগ পুরোপুরি বর্জন করে (অর্চনা-গর্ব-সূর্য, জর্দা-জার্মান-জর্জ), অ-তৎসম শব্দ 'ণ'-র বদলে 'ন' আর 'ঋ'-র বদলে 'রি' মেনে নেয় ('কাণ-সোণা-রাণী'র বদলে 'কান-সোনা-রানি', 'খৃষ্টান-বৃটিশ-বৃটেন'-র বদলে 'খ্রিস্টান-ব্রিটিশ-ব্রিটেন')। দ্বিতীয় ভাগের উদাহরণ সরলীকৃত 'দেশি'র পাশে প্রচলিত 'দেশী', রিক্‌থ'-র পাশে 'ঋক্‌থ', এইরকম— উনতিরিশ-ঊনত্রিশ, চউকো-চৌকো, জুঁই-যুঁই, কাহিনি-কাহিনী, খ্যাসারত-খেসারত, ব্যাংক-ব্যাঙ্ক। তৃতীয় ভাগে প্রচলিত তৎসম শব্দ 'ঝিল্লী-ভঙগী-শ্রেণী-পদাবলী' সরলীকৃত হয়ে 'ঝিল্লি-ভঙিগ-শ্রেণি-পদাবলি' হলেও 'প্রতিযোগী-মায়াবী-পৃথিবী' শেষের ঈ-কার নিয়ে প্রচলিত বানানেই থেকে গেল। একইভাবে, 'আকূতি-ঊর্ণা-ভ্রূ' থেকে 'আকুতি-উর্ণা-ভ্রু 'ঊষা-প্রত্যূষ' হল, ব্যতিক্রম হয়ে রইল 'শূন্য-পূর্ণ-দূর-পূরণ'; 'অলঙ্কার-ঝঙ্কার-সঙ্গীত-সঙ্ঘাত' থেকে 'অলংকার-ঝংকার-সংগীত-সংঘাত' গৃহীত হল সরলীকৃত বানান নিয়ে, ব্যতিক্রমী প্রচলিত বানানেই আত্মরক্ষা করতে হল 'অঙ্ক-শঙ্খ-বঙ্গ-জঙ্ঘা-বঙ্কিম'-কে। অ-তৎসম 'কুমীর-জমিদারী-দরদী-গোলামী-মালী' শেষের ঈ-কার ছেড়ে 'কুমির-জমিদার-দরদি-গোলামি-মালি' হতে পারল, 'অস্ট্রেলীয়-কানাডীয়-ইউরোপীয়' বিচ্ছিন্ন হয়ে রইল প্রচলিত বানানে। এমনকী, 'কৈ-খৈ-দৈ' অনায়াসে 'কই-খই-দই' হলেও 'কৈফিয়ত-তৈরি-বৈঠক'-এর ঐ-কার ঘুচল না কিছুতেই।

এমনি করে প্রথম ভাগের বানানে সরলীকরণ অবাধ হল বটে, তবে দ্বিতীয় আর তৃতীয় ভাগের বানান-সরলীকরণের অনেকক্ষেত্রেই সীমাবদ্ধতা যে মেনে নিতেই হল এখনকার বানান-ভাবুকদেরও—কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'বাংলা-বানানের নিয়ম' আর বাংলা আকাদেমির 'বানানবিধি' থেকে তা আন্দাজ করা যায়। বাংলা বানানের এই পাওয়া আর না-পাওয়ার টানাপোড়েনের মধ্য দিয়েই বিশ শতক সম্পূর্ণ হল।

১১৫.৫.২ অনুশীলনী—৩

১. সরলীকৃত বানানের বাংলা শব্দকে কটি শ্রেণিতে কীভাবে ভাগ করা সম্ভব, উদাহরণসহ ব্যাখ্যা করুন।

২. 'সার্বিক সরলীকরণ' কথাটির তাৎপর্য ব্যাখ্যা করুন এবং এরকম প্রতিটি ক্ষেত্র থেকে ২টি করে শব্দ-বানান সংগ্রহ করে এদের সরলীকরণ-প্রক্রিয়া বুঝিয়ে দিন।

৩. বাংলা শব্দভাণ্ডারের প্রতিটি শ্রেণি (তৎসম অর্ধ-তৎসম...) থেকে দুটি করে শব্দ সংগ্রহ করে তাদের সরলীকরণ করুন এবং ঐ সরলীকৃত বানানের পাশাপাশি বিকল্প শব্দ বানান হিসেবে প্রচলিত বানানও দেখিয়ে দিন।

৪. ২টি তৎসম এবং ২টি অ-তৎসম শব্দের উপর ঈ > ই আর ঊ > উ সূত্র দুটি প্রয়োগ করে প্রতিটি ক্ষেত্র থেকে সরলীকৃত ২টি করে বানান দেখিয়ে দিন এবং সেইসঙ্গে প্রতিটি সূত্রের ক্ষেত্রেই ব্যতিক্রমের উল্লেখ করুন।

৫. কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে সার্বিক সরলীকরণ সম্ভব তা লিখুন এবং প্রতিটি সূত্রের প্রয়োগে ২টি করে উদাহরণ দেখিয়ে দিন।

৬. (ক) নীচের বানানগুলির মধ্যে কোন্‌টি সার্বিকভাবে সরলীকৃত, কোন্‌টির পাশে বিকল্প বা ব্যতিক্রমী বানান রয়েছে, লিখুন (বিকল্প বা ব্যতিক্রমী বানান থাকলে তা পাশাপাশি লিখে দেখান)—বইঠা কাহিনি খ্রিস্টান শ্রেণি ভর্তি দেশি রানি নিশ্বাস সূর্য মউ।

(খ) নীচের প্রচলিত বানানগুলির পাশে সরলীকৃত বানান লিখুন (সরলীকরণের সূত্র উল্লেখসহ) এবং প্রাসঙ্গিক ক্ষেত্রে পাশাপাশি বিকল্প বা ব্যতিক্রমী বানান উল্লখ করুন—লাঙ্গল ঊষা ঈর্ষ্যা মারাঠী ঝিল্লী ঈদ পৈতা।

(গ) নীচের সূত্রগুলি প্রয়োগ করে ২টি করে সার্বিক সরলীকরণের উদাহরণ লিখুন—রেফের নীচে ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব বর্জন, ঋ > রি, ণ > ন।

(ঘ) নীচের সূত্রগুলি প্রয়োগ করে সরলীকৃত বানানের পাশে বিকল্প প্রচলিত বানান লিখুন—ঈ > ই, ঊ > উ, ঐ > অই, এ > অ্যা, ঙ > ং, অ > ও, য > জ।

(ঙ) নীচের সূত্রগুলি প্রয়োগ করে সরলীকৃত বানানের পাশে ব্যতিক্রমী প্রচলিত বানান লিখুন—ষ > শ, য > জ, ঐ > অই, ঈ > ই (তৎসম), ঈ > ই (অ-তৎসম) ঔ > অউ, অ > ও।

১১৫.৬ সহায়ক পাঠ

একক-১১৫-এর বক্তব্যের পরিপূরক হিসেবে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির 'প্রসঙ্গ বাংলাভাষা' (মে ১৯৮৬) বইটি থেকে প্রবোধচন্দ্র সেন, ভূদেব চৌধুরী আর ক্ষেত্র গুপ্তর লেখা প্রবন্ধ-তিনটি পড়ে নিন। সেইসঙ্গে পড়ুন পবিত্র সরকারের লেখা 'বাংলা বানান সংস্কার : সমস্যা ও সমাধান' বইটির দ্বিতীয় সংস্করণ থেকে আরও দুটি অংশ (পৃ. ৫৮-৬১, পৃ. ৬৬-৭৬)। এরপর মণীন্দ্রকুমার ঘোষের 'বাংলা বানান' বই-এর 'কতিপয় শব্দের বানান' অধ্যায়টি পড়ে নিতে পারেন (৩য় সংস্করণ, পৌষ ১৪০০)।

উত্তর-সংকেত

[এই পর্যায়ের ৪টি এককে ছড়ানো মোট ১১টি অনুশীলনীতে দেওয়া প্রশ্নাবলির উত্তর-সংকেত পরপর সাজিয়ে দেওয়া হল। লক্ষ্য রাখবেন, এর মধ্যে কেবল সংকেতটুকুই দেওয়া থাকবে, পুরো প্রশ্নোত্তর অবশ্যই নয়। মূলপাঠের কোন্ অংশে আপনার তৈরি-করা মাঝারি আর বড়ো প্রশ্নের উত্তর মিলিয়ে দেখবেন, পৃষ্ঠার উল্লেখ করে সরাসরি তার হদিস দেবে এই সংকেতগুলি। বিষয়মুখী বা ছোটো মাপের প্রশ্নের উত্তর অনেকটা অবশ্য সংকেত থেকেই পেয়ে যাবেন। সেই কারণে তার পাশে মূলপাঠের পৃষ্ঠার উল্লেখ থাকবে না।]

১১২.৩.২ অনুশীলনী—১

১.	(ক)	অ-ও ঃ	করিও-কোরিঅ	ই-ঈ ঃ	পুচ্ছি-চাপী
		ঐ-অই ঃ	তৈলোএ-পইঠা	ঙ-ং ঃ	সাঙগ-লাংগ
		ণ-ন ঃ	শূণ-শূন	শ-ষ-স ঃ	শবর-সবর-ষবরালী

(খ) অ-ও ঃ জাঅ-জাঁও ই-ঈ ঃ দুই-দুঈ
উ-ঊ ঃ উঠ-ঊঠ ঔ-অউ ঃ চৌঠ-চউঠ
ণ-ন ঃ আগুণ-আগুন শ-স ঃ শুন-সুন।

(গ) ই-ঈ ঃ কাঁচালি-কাঁচলী উ-ঊ ঃ চুণ-চূণ
জ-য ঃ জোগাব-যোগব ক্ষ-খ ঃ ক্ষুদ-খুদ
হস্‌চিহ্ন ঃ সম্পদ্‌-সম্পদ।

(ঘ) ঐ-অই ঃ হৈল-হইল ঔ-অউ ঃ হৌক-বউ
হস্‌চিহ্ন ঃ কেন্‌-কোন বিসর্গ ঃ পুনঃ-পুন।

২. (ক) ক্ষ ঃ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন (ক্ষমা) ৎ ঃ চণ্ডীমঙ্গল (চিৎ)
ঞ ঃ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন (অনিঞা) য ঃ চর্যাপদ (যোগী)
বিসর্গ (ঃ) চণ্ডীমঙ্গল (পুনঃ) রেফ ঃ শ্রীকৃষ্ণকীর্তন (গর্জ্জুন)
হস্‌চিহ্ন ঃ চণ্ডীমঙ্গল (বণিক্‌)।

(খ) চর্যাপদে ‘কেহো’, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ‘কেহো-কেহ’, চণ্ডীমঙ্গলে গোড়ার দিকে ‘কেহো-কেহ’ আর শেষের দিকে ‘কেহ’।

(গ) ঐ-কার ঃ ঐ-কারের ঝোঁক থাকলেও পাশাপাশি ‘অই’ (উদাহরণ দিন)।

ঔ-কার ঃ ঔ-কার আর ‘অউ’-এর পাশাপাশি প্রয়োগ (উদাহরণ দিন)।

(ঘ) চর্যাপদে ‘শূণ’, শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ‘জাণ’, চণ্ডীমঙ্গলে ‘বেণ্যা’, অন্নদামঙ্গলে ‘বেণে’।

(ঙ) আলিবর্দ্দী, মুখুর্য্যা।

(চ) আণিঞা, পাঞাঁ, কানাঞি, গোসাঞি, ঠাঞি;
প্রয়োগ-সীমা শ্রীকৃষ্ণকীর্তন আর চণ্ডীমঙ্গল কাব্য।

৩. (ক) ‘ক্ষণ’-র বদলে ‘খন’, ‘ক্ষুর’-এর বদলে ‘খুর’, ‘ক্ষেপ’-র বদলে ‘খেপ’।

(খ) ‘চিৎ’ বানানটি ‘চিত’-এর বিচ্যুতি।

(গ) ‘অ-ও’-র ক্ষেত্রে ও-কারের ঝোঁক—মারিবোঁ আসিবোঁ আইলো,
‘ই-ঈ’-র ক্ষেত্রে ঈ-কারের ঝোঁক—চীত, মতী, চুরী,
‘ঐ-অই’-র ক্ষেত্রে ঐ-কারের ঝোঁক— ভৈল, পৈশে হৈলা।

(ঘ) শ্রীকৃষ্ণকীর্তনে ঞ (কানাঞি), ক্ষ (ক্ষেমা), রেফ (গর্জ্জুন);
কবিকঙ্কণ-চণ্ডীতে ৎ (চিৎ), ঃ (পুনঃ), হস্‌চিহ্ন (সম্পদ্‌)।

(ঙ) হস্‌চিহ্ন ঃ ‘**কোন** সুখে যাইব ধরণী’, ‘কোথা **কোন্‌** যজ্ঞ হয়’;
বিসর্গ (ঃ) ঃ **পুনঃ** কহ কি হইবে এখানে মরিলে,’ ‘**পুন** হবে স্বর্গবাসী’।

৪. (ক) শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

(খ) ‘জ’-উচ্চারণে ‘য’।

(গ) শ্রীকৃষ্ণকীর্তন।

(ঘ) অন্নদামঙ্গল।

(ঙ) মুজঃফর, অন্নদামঙ্গল।

৫. ১১২.৩.১ সারাংশ-১ থেকে প্রতিটি কাব্যের বানান-প্রয়োগে বিভ্রান্তি বিচ্যুতি আর বিশেষ প্রবণতার ক্ষেত্রগুলি তালিকাবদ্ধ করুন। এরপর, ১১২.৩-এর মূলপাঠ থেকে ঐ ক্ষেত্রগুলি খুঁজে নিয়ে প্রশ্নোত্তরটি বিশদ এবং সম্পূর্ণ করুন।

১১২.৪.২ অনুশীলনী—২

১. (ক) ঙ-র দিকে (রঙ সঙগীত সঙ্কেত সঙ্কলিত)।

(খ) যত্নবান্‌-শ্রীমান।

(গ) ই-ঈ ঃ গিরি-গিরী, ণ-ন ঃ কেরাণী-কান
শ-ষ ঃ পুলিশ-পোষাক, হস্‌চিহ্ন ঃ কর্‌ছে-পড়্‌বে।

(ঘ) চড়্কী সড়্সড়্ গর্‌রাও ফর্‌রা ঝম্‌ঝম্।

(ঙ) অ > ও ঃ গোরু ঈ > ই ঃ গাড়ি

ঋ > রি ঃ ব্রিটন এ > অ্য ঃ ল্যাজ।

২. (ক) উইলিয়ম কেরি, রামমোহন রায় থেকে তথ্য নিয়ে টীকা তৈরি করুন।

(খ) মৃত্যুঞ্জয় বিদ্যালঙ্কার এবং রামমোহন রায় থেকে তথ্য নিয়ে টীকা তৈরি করুন।

৩. সাময়িক পত্র থেকে তুলে আনা অংশগুলি মন দিয়ে পড়ুন এবং বৈশিষ্ট্যের ক্ষেত্রগুলি সংগ্রহ করে প্রশ্নোত্তর তৈরি করুন।

৪. আলালি আর হুতোমি বানানের বৈশিষ্ট্যগুলিকে তিনটি শ্রেণিতে ভাগ করে নিন—ঐতিহ্য-অনুসারী ঐতিহ্য-বিরোধী আর দ্বিধাগ্রস্ত প্রয়োগ। যেমন, প্যারীচাঁদ মিত্রের পক্ষে ঐতিহ্য-অনুসারী একমাত্র বৈশিষ্ট্য রেফের নীচে ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব প্রয়োগ, দ্বিধার ক্ষেত্র শ-ষ প্রয়োগে (পুলিশ-পোষাক), বাকি প্রায় সবটাই ঐতিহ্য-বিরোধী প্রবণতা। হুতোমি বানানে অ-তৎসম শব্দে 'ণ' প্রয়োগ ঐতিহ্য-অনুসারী বৈশিষ্ট্য, হস্‌চিহ্নের প্রয়োগ (চড়্কী-সড়্সড়্) ঐতিহ্য-বিরোধী প্রবণতা, আবার ক্রিয়াপদের শেষে ও-কার প্রয়োগে রয়েছে দ্বিধা (এলো-গেল)।

১১২.৫.২ অনুশীলনী—৩

১. মূলপাঠটি পড়ুন এবং প্রশ্নোত্তর তৈরি করুন।

২. 'ই-ঈ' ঃ তৎসম পদ্যে দ্বিধা (কুটির-কুটীর)

তৎসম পদ্যে ঈ-কারের ঝোঁক (কাকলী-লহরী-নাড়ী-অন্তরীক্ষ)

তৎসম গদ্যে ই-কারের ঝোঁক (ঘটি-দায়ি)।

অ-তৎসম বানানে দ্বিধা (পূজারিনী-পূজারিনি)।

অ-তৎসম বানানে ঈ-কারের ঝোঁক (পাখি-আশি-বাঁশি-বাড়ি)।

'অ-ও' অ-তৎসম বানানে দ্বিধা (ভাল-ভালো মত-মতো কোন-কোনো)

অ-তৎসম বানানে ও-কারের ঝোঁক (তো-হয়তো-কারো-বারো-বড়ো)।

হস্‌চিহ্ন ঃ তৎসম বানানে দ্বিধা (মহান্‌-মহান বিপদ্‌গ্রস্ত-বিপদ)

হস্‌-বর্জনের ঝোঁক (দিক)।

এবার মূলপাঠ পড়ে ক্ষেত্র-তিনটি নিজের কথায় ব্যাখ্যা করুন।

৩. 'বিসর্গ প্রয়োগ' আর 'হস্‌চিহ্ন প্রয়োগ'-এর উদাহরণগুলির সাহায্য নিয়ে প্রশ্নোত্তর তৈরি করুন।

৪. ঙ-ং আর বিসর্গ প্রয়োগে দ্বিধা প্রসঙ্গে প্রশ্নোত্তর তৈরি করুন।

৫. তৎসম বানান-প্রসঙ্গের অনুচ্ছেদ-১, অ-তৎসম বানান- প্রসঙ্গের অনুচ্ছেদ-১, 'ই-ঈ'-র দৃষ্টান্তগুলি এবং থেকে তৃতীয় অনুচ্ছেদ—এই অংশগুলি থেকে তথ্য সংগ্রহ করে প্রশ্নোত্তর তৈরি করুন।

১১৩.৩.২ অনুশীলনী—১

১. ১১৩.৩.১ সারাংশ-১ থেকে সাহায্য নিন।

২. মূলপাঠের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদটি পড়ে প্রশ্নোত্তর তৈরি করুন।

৩. মূলপাঠের দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ থেকে ষষ্ট অনুচ্ছেদ পর্যন্ত অংশ থেকে তথ্য নিয়ে প্রশ্নোত্তরটি তৈরি করুন।

৪. মূলপাঠের ষষ্ঠ আর সপ্তম অনুচ্ছেদ থেকে তথ্য নিয়ে প্রশ্নোত্তর তৈরি করুন।

১১৩.৪.২ অনুশীলনী—২

১. ১১৩.৪.১ থেকে সংকেত-সূত্র নিয়ে সমগ্র মূলপাঠটি থেকে তথ্য সংগ্রহ করুন।

২. মূলপাঠের ১-নং ২-নং ৫-নং ১১-নং অংশ কটি থেকে তথ্য সংগ্রহ করে প্রশ্নোত্তরটি তৈরি করুন।

৩. মূলপাঠের ৭নং অংশে গোবর্ধনদাস শাস্ত্রী, ৮নং অংশে মুহম্মদ শহিদুল্লাহ, ৯নং অংশে রাজশেখর বসু, ১০নং অংশে দেবপ্রসাদ ঘোষ—এঁদের মধ্য থেকে যেকোনও একজন

বানান-ভাবুককে বেছে নিন, তাঁর বক্তব্য সূত্রবদ্ধ করুন, এবং সবশেষে আজকের ভাবনায় তাঁর বক্তব্য কতটা গ্রহণীয় আর কতটা বর্জনীয় তা যুক্তি দিয়ে বুঝিয়ে দিন।

৪. মূলপাঠের ২-নং আর ১২-নং অংশে মণীন্দ্রকুমার ঘোষ, ৩-নং অংশে সুধীর মিত্র, ৫-নং অংশে রবীন্দ্রনাথ-রাধারানি দেবী-নরেন্দ্র দেব, ৭-নং অংশে গোবর্ধনদাস শাস্ত্রী, ৮-নং অংশে মুহম্মদ শহিদুল্লাহ, ১০-নং অংশে দেবপ্রসাদ ঘোষ—ধ্বনি-বর্ণের অসমতার প্রসঙ্গে এঁদের বক্তব্য তালিকাবদ্ধ করুন, তারপর প্রতিটি বক্তব্যকে বিশদ করে বুঝিয়ে দিন।

১১৩.৫.২ অনুশীলনী—৩

১. রাজশেখর বসুর ‘চলন্তিকা’ অভিধান-এর ‘পরিশিষ্ট-ক’ থেকে ‘বানানের নিয়ম’ অংশটুকু পড়ুন। এর পাশে পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমির ‘আকাদেমি বানান অভিধান’-এর ‘পরিশিষ্ট ১’ থেকে ‘আকাদেমি গৃহীত বানানবিধি’ অংশটুকু পড়ুন। এই দুটি অংশের তুলনা থেকে তথ্যসংগ্রহ করুন এবং তারপর প্রশ্নোত্তর তৈরি করুন।

১১৪.৩.২ অনুশীলনী—১

১. মূলপাঠ-১ থেকে তথ্যসংগ্রহ করে প্রশ্নোত্তর তৈরি করুন।

২. মূলপাঠের শেষ অনুচ্ছেদ বাদে বাকি অংশ পড়ে প্রশ্নোত্তর লিখুন।

৩. (ক) ঋৃ ঌ ৡ ঃ প্রয়োগ নেই;

অন্তস্থ-ব ঃ উচ্চারণ নেই;

ক্ষ ঃ যুক্তবর্ণ (ক ষ), একক ব্যঞ্জন নয়।

(খ) ড় ঢ় য় ঃ শব্দের মাঝখানে বা শেষে থাকলে ড ঢ য-এর এইরকম উচ্চারণ হয়;

ৎ ঃ তৎসম শব্দে এর প্রয়োগ আছে;

ঁ ঃ স্বতন্ত্র ব্যঞ্জনবর্ণ হিসেবে গণ্য।

১১৪.৪.২ অনুশীলনী—২

১. মূলপাঠ-২-এর অংশ থেকে তথ্য নিয়ে প্রশ্নোত্তর তৈরি করুন।

১১৫.৩.২ অনুশীলনী—১

১. মূলপাঠ-১ এর অংশটি থেকে তথ্য সংগ্রহ করে প্রশ্নোত্তর তৈরি করুন।

২. বর্ণমালার উপাদানের সংস্কার, লিখনপদ্ধতির সংস্কার। মূলপাঠের অংশটি থেকে তথ্য নিয়ে প্রশ্নোত্তর তৈরি করুন।

৩. বর্ণচিহ্ন-বিন্যাস, বর্ণরূপের ভেদ আর অস্বচ্ছ যুক্তব্যঞ্জন—এই তিন ধরনের জটিলতা। এরপর মূলপাঠের অংশটি থেকে তথ্য নিয়ে প্রশ্নোত্তর তৈরি করুন।

১১৫.৪.২ অনুশীলনী—২

১. মূলপাঠ-২ এর অংশটি থেকে তথ্য নিয়ে প্রশ্নোত্তর রচনা করুন। প্রতিটি শ্রেণি থেকে তিন থেকে পাঁচটি করে উদাহরণ নিয়ে সরলীকরণের সাফল্য আর ব্যর্থতা দেখিয়ে দিন।

২. মূলপাঠের অংশটি থেকে তথ্য সংগ্রহ করুন।

১১৫.৫.২ অনুশীলনী—৩

১. মূলপাঠ-৩ দেখুন।

ভাগ-১ (অর্চনা কর্ম সূর্য),

ভাগ-২ (দেশি-দেশী ঋক্‌থ-রিক্‌থ যুঁই-জুঁই),

ভাগ-৩ (পদবি উষা অহংকার কোশ শরণি)।

২. 'সার্বিক সরলীকরণ'-এর তাৎপর্য সরলীকরণ-প্রক্রিয়ার পুরোপুরি সাফল্য। একটি প্রচলিত শব্দ তার সবরকমের জটিলতা কাটিয়ে সরল বানানে নতুন পরিচয় পাবে, এবং সেই শব্দ যে

শ্রেণির অন্তর্গত, তার প্রতিটি শব্দ-বানানই একই প্রক্রিয়ায় সরলীকৃত হবে, একই শ্রেণিভুক্ত আর কোনও প্রচলিত বানান বিকল্প বা ব্যতিক্রম হিসেবে সরলীকরণের বাইরে পুরোনো জটিল চেহারা নিয়ে অপরিবর্তিত থেকে যাবে না—'সার্বিক সরলীকরণ' বলতে আমরা এই রকম সরলীকরণকেই বুঝব।

সূত্র	**প্রচলিত বানান**	**সরলীকৃত বানান**
রেফের নীচে ব্যঞ্জনের	আর্য্য	আর্য
দ্বিত্ব-বর্জন (তৎসম ও অ-তৎসম)	জর্দ্দা	জর্দা
ঋ > রি (অ-তৎসম)	খৃষ্টান	খ্রিস্টান
	বৃটিশ	ব্রিটিশ
ণ > ন (অ-তৎসম)	কাণ	কান
	দরুণ	দরুন

উপরের তিনটি সূত্র প্রয়োগ করে বাংলা বানান থেকে রেফযুক্ত ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব, ঋ আর ণ-কে পুরোপুরি মুছে দিয়ে এই তিনটি শ্রেণির অন্তর্গত প্রতিটি বানানকেই সরলীকৃত করা সম্ভব হল। রইল না কোনও বিকল্প বা ব্যতিক্রমী প্রচলিত বানান।

৩.	তৎসম	ঃ	দেশি-দেশী, ঋক্‌থ-রিক্‌থ
	অর্ধ-তৎসম	ঃ	উনতিরিশ-ঊনত্রিশ, ভটচাজ্জি-ভটচায্যি
	তদ্ভব	ঃ	বইঠা-বৈঠা, জুঁই-যুঁই
	দেশি	ঃ	কাহিনি-কাহিনী, সড়াৎ-সড়াত
	বিদেশি	ঃ	ইদ-ঈদ, ব্যাংক-ব্যাঙ্ক

৪.	**শ্রেণি**	**সূত্র**	**প্রচলিত বানান**	**সরলীকৃত বানান**	**ব্যতিক্রম**
	তৎসম	ঈ > ই	পদবী	পদবি	মাধবী
			ভঙ্গী	ভঙ্গি	সঙ্গী
		ঊ > উ	ঊষা	উষা	ঊর্মি
			ঊর্ণা	উর্ণা	ঊরু

অ-তৎসম	ঈ > ই	সরকারী	সরকারি	
		পাকিস্তানী	পাকিস্তানি	কানাডীয়
	ঊ > উ	ঊনিশ	উনিশ	ঊনত্রিশ
		পূজা	পুজো	পূজারি

৫. সার্বিক সরলীকরণের ক্ষেত্র—রেফের নীচে ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব বর্জন (তৎসম-অতৎসম), ঋ > রি (অ-তৎসম), ণ > ন (অ-তৎসম)।

উদাহরণের জন্য উপরের ২নং উত্তর-সংকেত দেখুন।

৬. (ক) সার্বিকভাবে সরলীকৃত— খ্রিস্টান (অ-তৎসম বানানে ঋ > রি), সূর্য ভর্তি (রেফযুক্ত ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব বর্জন), রানি (অ-তৎসম বানানে ণ > ন)।

পাশাপাশি বিকল্প বানান—বইঠা-বৈঠা, কাহিনি-কাহিনী, দেশি-দেশী।

পাশাপাশি ব্যতিক্রমী বানান—শ্রেণি-ফণী, নিশ্বাস-অতঃপর, মউ-মৌলানা।

(খ)

প্রচলিত বানান	**সরলীকৃত বানান**	**বিকল্প বা ব্যতিক্রমী বানান**	**সূত্র**
লাঙগল	লাঙল	জঙগল (ব্যতিক্রম)	ঙগ > ঙ
ঊষা	উষা	ঊর্মি (ব্যতিক্রম)	ঊ > উ
ঈর্ষ্যা	ঈর্ষা	x	য-ফলা বর্জন
মারাঠী	মারাঠি	কানাডীয় (ব্যতিক্রম)	ঈ > ই
ঝিল্লী	ঝিল্লি	হরিণী (ব্যতিক্রম)	ঈ > ই
ঈদ	ইদ	ঈশ্বর (ব্যতিক্রম)	ঈ > ই
পৈতা	পইতা	পৈতা (বিকল্প) বৈঠক (ব্যতিক্রম)	ঐ > অই

(গ) উপরের ২-নং উত্তর-সংকেত দেখুন।

(ঘ)	ঈ ই ঃ	দেশি-দেশী	ঙ > ং ঃ	ব্যাংক-ব্যাঙ্ক
	ঊ > উ ঃ	উনতিরিশ-ঊনত্রিশঅ >	ও ঃ	সড়োগড়ো-সড়গড়
	ঐ > অই ঃ	বইঠা-বৈঠা	য-জ ঃ	জুঁই-যুঁই
	এ > অ্যা ঃ	খ্যাসারত-খেসারত		
(ঙ)	ষ > শ ঃ	কোষ > কোশ, দোষ	ঈ > ই	(অ-তৎসম) ঃ অসমীয়া > অসয়িা, অস্ট্রেলীয়
	য > জ ঃ	যো > জো, যত	ঔ > অউ ঃ	মৌজ > মউজ, মৌজা
	ঐ > অই ঃ	কৈ > কই, কৈফিয়ত	অ > ও ঃ মত > মতো, কত	

ঈ > ই (তৎসম) ঃ পদাবলী > পদাবলি, শ্যামলী

ই. বি. জি—৮
বাংলা বিষয়ের
ঐচ্ছিক পাঠ্যক্রম

পর্যায়
৩২

একক ১১৬ ❑ সম্পাদনার সাধারণ সূত্র

গঠন

১১৬.১ উদ্দেশ্য

১১৬.২ প্রস্তাবনা

১১৬.৩ মূলপাঠ—১ সম্পাদক ও সম্পাদনা

১১৬.৪ সারাংশ

১১৬.৫ অনুশীলনী—১

১১৬.৬ মূলপাঠ—২ সম্পাদনার প্রয়োগ ঃ সংবাদপত্র সম্পাদনা

১১৬.৭ সারাংশ

১১৬.৮ অনুশীলনী—২

১১৬.৯ মূলপাঠ—৩ সংবাদ সংগ্রহ, কপি সম্পাদনা ও শিরোনাম

১১৬.১০ সারাংশ

১১৬.১১ অনুশীলনী—৩

১১৬.১২ মূলপাঠ—৪ সংকলন, কপি পরীক্ষা

১১৬.১৩ সারাংশ

১১৬.১৪ অনুশীলনী—৪

১১৬.১৫ উত্তর সংকেত (অনুশীলনী—১, ২, ৩, ৪)

১১৬.১৬ গ্রন্থপঞ্জি

১১৬.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পড়ার পর আপনি সম্পাদনা সম্পর্কে বিবিধ বিষয় জানতে পারবেন, এবং প্রয়োজনে প্রাসঙ্গিক আলোচনা করতে পারবেন। যে বিষয়গুলি আপনি পড়বেন তা' হল ঃ

- সম্পাদনা বলতে কী বোঝায়?
- সম্পাদনার সময় কী মনে রাখা দরকার;
- দৈনিক পত্রিকা ও সাময়িক পত্রিকার মধ্যে পার্থক্য?
- সম্পাদনার পদ্ধতি সংক্রান্ত আলোচনা;
- অনুচ্ছেদ রচনার তাৎপর্য;
- শিরোনাম প্রদানের গুরুত্ব;
- সংবাদ পুনর্লিখন।

১১৬.২ প্রস্তাবনা

সংবাদপত্র, সাময়িকপত্র বা গ্রন্থ যে কোন প্রকাশনার জন্যই সম্পাদনা প্রয়োজন। যে কোন লেখাকে সে পত্র-পত্রিকা বা গ্রন্থের জন্য রচিত হলেও তা ছাপার আগে ঘষে মেজে পরিষ্কার ঝকঝকে করে গড়ে তোলা দরকার। সম্পাদনা যে কোন লেখাকে ছাপার উপযোগী করে তোলে। সম্পাদনা সম্পর্কে যাবতীয় বিষয় যথাসম্ভব সহজভাবে এখানে আলোচিত হবে। পড়লেই বুঝতে পারবেন সম্পাদনার যাবতীয় কৌশল, নীতি ও প্রক্রিয়া। বিভিন্ন স্তর পেরিয়ে যেতে হয় সম্পাদনার কাজের জন্য। প্রতিটি স্তর পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত। আলোচনার প্রেক্ষিত সামগ্রিকভাবে সমস্ত স্তরকেই ছুঁয়ে যাবে। বানান সংশোধন থেকে বাক্যবিন্যাস ও শিরোনাম তৈরি, অনুচ্ছেদ গঠন থেকে পুনর্লিখন, অঙ্গসজ্জা যাবতীয় প্রাসঙ্গিক বিষয়ের ওপরই আলোকপাত করা হবে।

১১৬.৩ মূলপাঠ—১ ঃ সম্পাদক ও সম্পাদনা

যে কোন সংবাদপত্র, সাময়িক পত্র এবং গ্রন্থ সম্পাদনার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা থাকে। সমস্ত সংবাদ ও সাময়িক পত্রিকা একটি প্রাতিষ্ঠানিয় ব্যবস্থায় পরিচালিত হলেও সম্পাদকের একটি মুখ্য ভূমিকা থাকে। গ্রন্থ সম্পাদনায় সম্পাদক ও প্রকাশক, প্রতিষ্ঠানের ব্যবসায়িক স্বার্থ ও পাঠক সমাজের কাছে দায়বন্ধ হলেও, গ্রন্থ সম্পাদকের গুরুত্বপূর্ণ অবস্থান স্বীকৃত।

সংবাদ ও সাময়িক পত্রের সম্পাদকের সম্পাদকীয় নিবন্ধ রচনা প্রধান কাজ নয়। তিনি বিশেষ

ক্ষেত্র ছাড়া বস্তুতঃ এ নিবন্ধ রচনা করেন না। তাঁর প্রধান কাজ সংবাদপত্র পরিচালনা করা। ফলতঃ তাঁর দায়িত্ব বহুবিধ ও গুরুত্বপূর্ণ। একজন সফল সম্পাদক হতে গেলে তাঁকে বহু বিষয় জানতে হয়। তাঁর স্মৃতি প্রখর হওয়া দরকার, ভারতবর্ষের রাজনীতি সম্পর্কে সর্বব্যাপী অভিজ্ঞতা, নীতিনিষ্ঠ, অফুরন্ত কর্মক্ষমতা, দৃঢ় আত্মবিশ্বাস, চারিত্রিক গুণ ও প্রকাশের সৌকর্য এবং অসামান্য ব্যক্তিত্ব থাকা বাঞ্ছনীয়। একজন আদর্শ সম্পাদকের সুনির্দিষ্ট মতামত থাকা উচিত, কিন্তু তা কোন মতেই অযৌক্তিক ও একগুঁয়ে হবে না।

সম্পাদক সামাজিক মানুষ। তাঁকেও কিছু দায়-দায়িত্ব পালন করতে হয়। তাঁর প্রথম দায় পত্রিকা পাঠকের প্রতি, পরে নিজের বিবেকের প্রতি এবং সরকার ও পত্রিকা পরিচালকদের প্রতি। সম্পাদককে এই চতুঃশক্তির গুরুত্ব বিবেচনায় রেখে তাঁর দায়িত্ব পালন করতে হয়। কাগজ পাঠকের উদ্দেশ্যে রচিত, তাঁদের কাছে জনপ্রিয় হওয়া একান্ত প্রয়োজনীয়। পাঠকদের উপেক্ষা করে পত্রিকা পরিচালনা সম্ভব নয়। তাই পাঠকদের চাহিদার কথা স্মরণ রেখে পত্রিকা সম্পাদনা ও সমগ্র সম্পাদকীয় কার্যক্রম পরিচালনা করতে হয়। এক্ষেত্রেও সম্পাদকের বিবেক সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করে। আর সরকারের সঙ্গে সম্পাদকের সম্পর্ক অনেক সময় কণ্টকাকীর্ণ হয় কারণ সরকারের কার্যকলাপের প্রয়োজনীয় সমালোচনা খবরের কাগজের অন্যতম কর্তব্য, যা প্রকাশক অনেক সময় সহজভাবে গ্রহণ করতে পারে না। পত্রিকার মালিকরা সরকারের সাহায্য সহযোগিতার ওপর অনেকাংশে নির্ভরশীল হওয়ায় সরকারের কোন রকম সমালোচনা ও তাদের শ্রেণীস্বার্থ বিরোধী কোন অবস্থান সমর্থন করেন না, বরং তাঁদের সুরে সুর মিলিয়ে সম্পাদকরা পত্রিকা পরিচালনা করবেন, এটাই প্রত্যাশা করেন।

এই পরিবেশের মধ্যে সম্পাদকদের নিজ দায়িত্ব পালন করতে হয়। সুতরাং তাঁদের ব্যক্তিগত বিদ্যাবত্তা, দক্ষতা, সাধারণ মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতা প্রভৃতি উপরোক্ত প্রতিবন্ধকতার মধ্যেই সামাজিক কর্তব্যবোধে সম্পাদককে যথা সম্ভব সততার সঙ্গে পালন করতে হয়। পত্রিকা সম্পাদনা প্রসঙ্গে এই প্রেক্ষাপটটি স্মরণ রেখে সম্পাদকের ভূমিকা স্মরণ রাখতে হবে।

আধুনিক সম্পাদকদের অধিকিন্তু মুদ্রণশিল্পের সাম্প্রতিকতম প্রযুক্তির ব্যবহার, বিন্যাস রীতি, চিত্র ও চলচ্চিত্র সমালোচনা সম্পর্কে ধারণা থাকা অপরিহার্য। এক সময় সংবাদ সাময়িকপত্র বিদ্যায় সম্পাদকদের ব্যক্তিত্বের ওপর নির্ভরশীল ছিল। অধুনা, অধিকাংশ সম্পাদক পত্রিকা প্রশাসনে পেশাদারিত্বের পরিচয় দিলেও, সম্পাদকের অপরিহার্য অন্যান্য গুণাবলী রহিত, নেহাৎই এক অপরিচিত ব্যক্তি বিশেষ। ফলে পাঠক আকৃষ্ট করবার জন্য বিবিধ বিষয়ে অবতারণা করে কাগজের বিক্রি বাড়াবার আয়োজন করা হয়।

সম্পাদনা কী ও কেন?

যে-কোনো রচনা ছাপার আগে দেখতে হয় রচনাটি ছাপার উপযুক্ত হয়েছে কিনা। যেকোনো মুদ্রিত রচনা আমরা যখন হাতে তুলে নিই, তখন কখনই আশা করি না ঐ রচনায় কোন ভুল থাকবে। হাতে লেখার ভুল কলম চালিয়ে সংশোধন করা যায়, ছাপার ভুল কিন্তু এত সহজে ঠিক করা যায় না। একবার ছাপা হয়ে গেলে কোন পরিবর্তনই করা যায় না। যা কিছু পরিবর্তন সংশোধন করতে হবে ছাপার আগে। যে রচনা ছাপা হবে তা খুঁটিয়ে দেখতে হবে। যাবতীয় ত্রুটি সংশোধন করে একেবারে নিখুঁত করে গড়ে তুলে রচনা পাঠকের কাছে উপস্থিত করা দরকার।

ত্রুটি নানান ধরনের হতে পারে। তথ্যগত ভুল, বানানের ত্রুটি, বাক্যবিন্যাসের অসঙ্গতি, অক্ষরের ওলোট-পালোট প্রভৃতি বিভিন্ন ত্রুটি একটি রচনায় থাকতে পারে। ত্রুটিগুলো সংশোধন না হলে ছাপার মধ্যেও এগুলো থেকে যাবে এবং তা হবে পাঠকের পক্ষে অত্যন্ত পীড়াদায়ক। ত্রুটি সংশোধনের এই প্রক্রিয়ার নামই হল সম্পাদনা। সম্পাদনা যিনি করবেন তাঁকে বলা হয় সম্পাদক। যে কোন রচনায় চোখ রেখে ভুল ধরাই তাঁর কাজ। খুব মনযোগ দিয়ে রচনা পাঠ করবেন। খুঁত খুঁত মন নিয়ে একে একে ভুল বার করে সেগুলিকে ঠিক করবেন। অন্যের লেখার ওপর কলম চালিয়ে লেখার মান বাড়ানোই তাঁর কাজ।

শুধুমাত্র ত্রুটি সংশোধন করার মধ্যেই কিন্তু সম্পাদনার কাজ সীমাবদ্ধ থাকে না। একটি রচনাকে গুণগত দিক দিয়ে উন্নত করাও সম্পাদনার কাজ। ভুল বানান, ভুল নাম কেটে ঠিক করলেই চলবে না। লেখাটি প্রয়োজন হলে পরিমার্জনা করে আরও সুন্দর করে তুলতে হবে। বাক্য বিন্যাসে যদি কোন অস্পষ্টতা থাকে তাহলে তা পাল্টে দিয়ে স্পষ্ট করে তোলা দরকার। একটি ভাবনা ফুটে ওঠে বাক্যবিন্যাসের মাধ্যমে। ভাবনাটি সার্থকভাবে মেলে ধরার মধ্যেই বিন্যাসের সার্থকতা। যদি কোন অস্পষ্টতা থাকে তাহলে ভাবনা সার্থকভাবে ফুটে উঠবে না। লেখকের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হবে। সম্পাদকের কাজ হ'ল লেখকের ভাবনাটিকে ফুটিয়ে তুলতে সাহায্য করা। পাঠক পড়তে গিয়ে যাতে হোঁচট না খায়, উপস্থাপিত বিষয়ের অর্থ বুঝতে তার যেন কোন অসুবিধা না হয়, সেটা দেখতে হবে সম্পাদককে। এক কথায় বলা যেতে পারে রচনার পাঠযোগ্যতা প্রতিষ্ঠা করতে হবে। একের পর এক বাক্য পেরিয়ে অনায়াসে পাঠক যেন বিষয়ের তাৎপর্য বুঝতে পারে।

অল্প কথায় কোন বিষয়কে সহজভাবে পাঠকের কাছে তুলে ধরার মধ্যেই যে কোন রচনার সার্থকতা। লক্ষ্য করার বিষয় লিখতে গেলে পুনরাবৃত্তি ঘটার সম্ভাবনা বেশি। লেখকের মাথায় যে বিষয়টি রয়েছে তা ফিরে ফিরে আসে। এভাবেই ঘটে পুনরাবৃত্তি। উপস্থাপনের পক্ষে যা কখনই ভাল নয়। একই

কথা বার বার ফিরে আসলে রচনার উৎকর্ষ হ্রাস পায়। সম্পাদক যদি পুনরাবৃত্তি আটকাতে পারেন তাহলে রচনা সংক্ষিপ্ত হবে, একেবারে যথার্থ হয়ে উঠবে।

বাক্যবিন্যাসেও সংক্ষিপ্ততা বজায় রাখতে হবে। যে কথা অল্প কথায় বলা যায় তা বিস্তৃত করার কোন অর্থ হয় না। সম্পাদককে দেখতে হবে যাতে অযথা বড় বাক্য নির্মাণ করা না হয়। ঠিক যেমনটি প্রয়োজন তাই লিখতে হবে। অপ্রয়োজনীয় অংশ কেটে বাদ দিতে হবে। দরকার হলে বাক্যবন্ধ পুরোটাই বদলে ফেলতে হবে। নতুন করে লিখতে হবে বাক্যবিন্যাসের পরিবর্তন করে। কেটে ছেঁটে পালটে ফেলে একেবারে ঠিক যেমনটি প্রয়োজন তেমনটি গড়ে তোলাই হল প্রকৃত সম্পাদনা। প্রচ্ছদ নির্মাণ, বাঁধাই, প্রভৃতি বিষয়েও সম্পাদককে খুঁটিয়ে দেখতে হয়। একটি প্রকাশনাকে উন্নতমানের করতে অঙ্গসৌষ্ঠবের দিকটিও জরুরী।

১১৬.৪. সারাংশ

সম্পাদনা একটি প্রকাশনার উৎকর্ষসাধন করে। একটি উন্নতমানের পত্রিকা বা ছাপা বই-এর ক্ষেত্রে সম্পাদনা অত্যন্ত জরুরি। সম্পাদনার অর্থ হল ছাপার আগে যাবতীয় ত্রুটি সংশোধন করে ঘষে মেজে যে কোন বিষয়কে মুদ্রণ উপযোগী করে তোলা। যিনি সম্পাদনা করেন তাঁকে বলা হয় সম্পাদক। লেখকের লেখার ওপর কলম চালিয়ে তিনি রচনার উৎকর্ষ সাধন করেন। তথ্যগত ভুল, বানান, সংশোধন, অনুচ্ছেদ ও পরিচ্ছেদ সংক্রান্ত পরিবর্তন, পুনরাবৃত্তির সম্ভাবনা কমিয়ে সম্পাদক রচনাকে ছাপার উপযুক্ত করে তোলেন। ছাপার পর আর ভুল সংশোধন করার উপায় নেই। তাই যা করবার ছাপার আগে করতে হবে। একটি পত্রিকা বা গ্রন্থের অঙ্গসৌষ্ঠবের উৎকর্ষের দিকটিও সম্পাদককে খতিয়ে দেখতে হয়। বাঁধাই থেকে প্রচ্ছদ বিন্যাস যাবতীয় বিষয়েই তিনি তদারকী করেন।

১১৬.৫ অনুশীলনী—১

১। **শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ**

(ক) সম্পাদনা যে কোন .... ছাপার .... করে তোলে।

(খ) .... সংশোধনের .... নামই হল ....।

(গ) রচনাকে .... দিক দিয়ে .... করাও .... কাজ।

২। সম্পাদনের দায়িত্ব ও কর্তব্য সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৩। সম্পাদনা কী? রচনার উৎকর্ষ সাধনে সম্পাদনা কীভাবে সাহায্য করে?

১১৬.৬ মূলপাঠ—২ ঃ সম্পাদনার প্রয়োগ ঃ সংবাদপত্র সম্পাদনা

সম্পাদনার প্রয়োগ ঃ সম্পাদনার প্রয়োগ মুদ্রণ মাধ্যমের নানা ক্ষেত্রে হতে পারে। খবরের কাগজ, সাময়িকপত্র, পুস্তক প্রকাশনায় ব্যাপকভাবে সম্পাদনার প্রয়োগ ঘটে। যে কোন প্রকাশনাকে পাঠযোগ্য ও নিখুঁত করে গড়ে তোলার কাজে সম্পাদনা তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। কী ধরনের প্রকাশনা তার ওপর নির্ভর করে সম্পাদনার রীতি ও নীতি। সংবাদপত্রের সম্পাদনা যেমন হবে, পুস্তক প্রকাশনার সম্পাদনা সেরকম কখনই হবে না। একেক ক্ষেত্রে একেক রকম সম্পাদনা পদ্ধতির ব্যবহার হবে।

সংবাদপত্র সম্পাদনা ঃ প্রতিদিন সকালবেলা যে সংবাদপত্র আমাদের হাতে পৌঁছয় তা তৈরি হয় এক দীর্ঘ কর্মবহুল প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়ে। খবরের কাগজ পড়ার সময় সংবাদপত্র তৈরির এই বিপুল কর্মকাণ্ডের কথা আমাদের মনে থাকে না। চা খেতে খেতে আমরা চোখ বোলাই কাগজের পাতায়, এক ঝলকে দেখে নিই কাছের, দূরের, বিশ্বের নানা প্রান্তের একেবারে সাম্প্রতিক খবর। যে খবর আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে তা দ্রুত পড়ে নিই। সময় কম, অনেক কাজ বাকী আছে। তাই চট্‌পট্ পড়ে ফেলতে হয়। এটা সম্ভব হয় সংবাদপত্র সম্পাদনার মাধ্যমে গড়ে ওঠে বলেই। যে কাগজ পড়তে পাঠক বেশি স্বাচ্ছন্দ বোধ করেন, অনায়াসে পছন্দ মাফিক খবর খুঁজে পান এবং খুব সহজে পড়ে যেতে পারেন, ধরে নিতে হবে সেই কাগজের সম্পাদনা ভাল। প্রকৃতপক্ষে সম্পাদনাই কাগজের উৎকর্ষ নিয়ে আসে। আলাদা চরিত্র প্রতিষ্ঠা করে।

সংবাদপত্র উৎপাদনের যে সমস্ত স্তর রয়েছে তারমধ্যে সম্পাদনা হল একটি উল্লেখযোগ্য স্তর। প্রথমে খবর সংগ্রহ তারপর সম্পাদনা—এই দুটি কাজ হলেই একটি সংবাদ ছাপার যোগ্য হয়ে ওঠে।

কারা সম্পাদনা করেন ঃ সংবাদপত্রে সম্পাদনা যারা করেন তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য হলেন অবর সম্পাদক বা সাব-এডিটর। একটি বড় কাগজে বহু অবর সম্পাদক থাকেন। নিউজ রুমে বসে সংবাদের কপি সংশোধন, পুনর্নির্মাণ, প্রয়োজনে কাটছাঁট করে সংক্ষিপ্ত করার কাজে তাঁরা নিয়োজিত থাকেন। এঁদের ওপরে থাকেন মুখ্য-অবর সম্পাদক, এবং তাঁর ওপরে থাকেন বার্তা সম্পাদক। নিউজরুমের সম্পূর্ণ দায়িত্ব বর্তায় বার্তা সম্পাদকের ওপর। বার্তা সম্পাদক শুধুমাত্র সম্পাদনা নয় সংবাদ সংগ্রহ করার বিষয়টির ওপরও তদারকি ও নজরদারী করেন।

১১৬.৭ সারাংশ

সম্পাদনার প্রয়োগ মুদ্রণ মাধ্যমের নানা ক্ষেত্রে খুবই জরুরী। সংবাদপত্র, সাময়িকপত্র, গ্রন্থ প্রকাশনা সবক্ষেত্রেই সম্পাদনার প্রয়োজন আছে। তবে মাধ্যমের দাবী অনুযায়ী সম্পাদনার কৌশল নির্ধারিত হয়।

সম্পাদনার প্রয়োগ খবরের কাগজ, সাময়িক পত্রিকা এমনকি গ্রন্থ প্রকাশনায়ও হয়। প্রত্যেকের জন্য রীতি আলাদা।

প্রতিদিন খবরের কাগজ সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা অনুযায়ী সাজিয়ে প্রকাশ করা হয় বলে পাঠক চোখ বুলিয়েই সহজে নিজের পছন্দের সংবাদটুকু দেখে নিতে পারেন। এক ঝলকে কাছের দূরের বিশ্বের নানা প্রান্তের সংবাদ অনায়াসেই জেনে নেওয়া যায়। এভাবে প্রাপ্ত সংবাদ মানুষের চাহিদা অনুযায়ী পরিবেশন করা সম্পাদক ও সম্পাদনার সাফল্যের পরিচায়ক। প্রধান সম্পাদকের পরামর্শ অনুসারে সম্পাদক কপি রচনা করেন, সম্পাদক দপ্তরের অন্যান্য আধিকারিক প্রয়োজনীয় সংশোধন করে সেটি প্রকাশ করেন।

১১৬.৮ অনুশীলনী—২

১। **শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ**

(ক) খবরের কাগজ .... প্রকাশনায় ব্যাপকভাবে .... প্রয়োগ ঘটে।

(খ) প্রকৃতপক্ষে .... কাগজের .... নিয়ে আসে। আলাদা .... প্রতিষ্ঠা করে।

(গ) সংবাদপত্র .... যে সমস্ত .... রয়েছে, তার মধ্যে .... হল একটি .... স্তর।

২। সম্পাদনার প্রয়োগ কোন্ কোন্ ক্ষেত্রে হতে পারে?

৩। সংবাদপত্র সম্পাদনায় যাদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা তাঁর কাজগুলি সংক্ষেপে উল্লেখ করুন।

৪। নিউজ রুমের সম্পূর্ণ দায়িত্ব যার, তাঁর প্রধান কাজগুলি আলোচনা করুন।

৫। সংবাদপত্রের খবর সংগ্রহের সূত্রগুলি উল্লেখ করুন।

১১৬.৯ মূলপাঠ—৩ ঃ সংবাদ সংগ্রহ, কপি সম্পাদনা ও শিরোনাম

সংবাদ সংগ্রহ ঃ নিউজ রুমে খবর আসে নানান সূত্র থেকে। খবর সংগ্রহের দায়িত্বে থাকেন রিপোর্টার বা প্রতিবেদকরা। এঁদের মধ্যেও শ্রেণিবিভাজন রয়েছে। সংবাদপত্রের অফিসে সবচেয়ে বেশি সংখ্যায় থাকেন স্টাফ রিপোর্টাররা। নিউজরুমে মুখ্য-প্রতিবেদকের অধীনে স্টাফ রিপোর্টাররা কাজ করেন। প্রধানত স্থানীয় খবর যোগাড় করার দায়িত্ব থাকে তাঁদের ওপর। তাঁরা সাধারণত বীটে গিয়ে খবর যোগাড় করেন। বীট বলতে বোঝায় সেই সমস্ত জায়গা যেখানে গেলে নিয়মিত খবর পাওয়া যায়। যেমন, মহাকরণ, লালবাজার, পৌরসভার সদর দপ্তর, বিশ্ববিদ্যালয়, আইনসভা প্রভৃতি হল স্টাফ রিপোর্টারদের বীট। মুখ্য প্রতিবেদকের নির্দেশে প্রতিবেদকরা বিভিন্ন বীটে গিয়ে খবর যোগাড় করে নিয়ে আসবেন। অফিসে এসে কপি লিখে জমা দেবেন এবং তারপর সেই সমস্ত কপি যাবে অবর সম্পাদকদের কাছে সম্পাদনার জন্য। স্টাফ রিপোর্টারদের ওপরে থাকেন প্রিন্সিপাল করেসপনডেন্ট এবং তার ওপরে থাকেন স্পেশাল করেসপন্‌ডেন্টরা। সবচেয়ে অভিজ্ঞ প্রতিবেদক হলেন স্পেশাল করেসপনডেন্ট। সর্বাপেক্ষা গুরুত্বপূর্ণ খবর কভার করার দায়িত্বে থাকেন তাঁরাই।

দেশের রাজধানী, বিভিন্ন বড় শহর থেকেও খবর পাঠান স্পেশাল করেসপন্‌ডেন্টরা। ব্যুরো চীফ মারফৎ এই সমস্ত খবর এসে পৌঁছয় নিউজরুমে। তারপর ঐ সমস্ত কপি সম্পাদনার টেবিলে এসে পৌঁছয়। জেলা শহর থেকেও সংবাদদাতারা খবর পাঠান এবং সেই সমস্ত কপিও অবর-সম্পাদকের কাছে যায় সম্পাদিত হবার জন্য। সম্পাদনার পর এই সমস্ত কপি মুদ্রণযোগ্য হয়ে ওঠে।

বিদেশ সংবাদদাতা এবং সংবাদসংস্থার পাঠানো কপিও প্রচুর পরিমাণে এসে জমা হয় নিউজরুমে। লণ্ডন, ওয়াশিংটন, প্যারিস, মস্কো থেকে খবর পাঠান বিদেশ সংবাদদাতারা। প্রতিবেশী দেশগুলি যেমন বাংলাদেশ, পাকিস্তান, নেপাল, চীন থেকেও সংবাদদাতারা ঐ সমস্ত দেশের খবর পাঠান। যত দিন যাচ্ছে বিদেশী খবরের গুরুত্ব ততই বৃদ্ধি পাচ্ছে আমাদের দেশের কাগজে। প্রযুক্তি ও অর্থনৈতিক কারণে পৃথিবীর সীমানা যত ছোট হয়ে আসছে খবরাখবরের আদান-প্রদানও তত বাড়ছে। প্রতিটি কাগজের নিউজরুমে তাই প্রচুর পরিমাণে বিদেশী খবর আসছে। এইসব বিদেশী খবরও সম্পাদনা হবার পর ছাপতে যায়। সম্পাদনা ছাড়া কোন খবরেরই গতি নেই।

সংবাদপত্রের সবচেয়ে বেশি পরিমাণে খবর আসে সংবাদসংস্থার কাছ থেকে। পয়সা দিয়ে সংবাদসংস্থার কাছ থেকে খবর কিনতে হয়। সংবাদ-সংস্থার গ্রাহক হলে খবর পাবার ব্যাপারটা অনেক নিশ্চিত হয়ে যায়। সংবাদদাতারা পাঠাক বা না পাঠাক, খবর আসবেই কাগজে। খবর মিস করার সম্ভাবনা অনেক কম। যেখানে যে খবরই ঘটুক না কেন সংবাদ-সংস্থা সেই খবর পাঠাবেই। বিদেশের

খবর পাঠাবে বিদেশী সংস্থা রয়টার, এপি, এ-এফ পি, আর দেশের খবর পাঠাবে পি.টি.আই, ইউ এন আই-এর মতো জাতীয় সংবাদ-সংস্থা। সংবাদ-সংস্থার পাঠানো বিপুল সংবাদ প্রবাহ থেকে সামান্য অংশই ছাপা হয়। সংবাদপত্রের প্রয়োজন অনুসারে কপি নির্বাচন করে, যথাযোগ্য সম্পাদনা করার পর মুদ্রণযোগ্য কপি তৈরি হয়। পাঠানো হয় কম্পোজ করার জন্য।

কপি সম্পাদনা ঃ অবর-সম্পাদকরা যে সমস্ত কপি সম্পাদনা করেন তার মধ্যে একটি উল্লেখযোগ্য অংশ হল সংবাদ-সংস্থার কপি। হিন্দি, বাংলা এবং উর্দু কাগজে এই সমস্ত কপি অনুবাদ করে নিতে হয়। কারণ সংবাদ-সংস্থার কপি আসে ইংরেজিতে। ঘষে মেজে ভুল ত্রুটি শুধরে প্রয়োজনে অনুবাদ করে ছাপার যোগ্য করে তুলতে হয় এই সমস্ত কপিকে। রিপোর্টারদের কপিও অবর-সম্পাদকরা ঘষে মেজে ছাপার যোগ্য করে তোলেন।

বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে প্রতিদিন অসংখ্য প্রেস রিলিজ এসে পৌঁছয় নিউজরুমে। এই রিলিজের মধ্যে যে বিষয় থাকে তার মূল উদ্দেশ্য হল খবর হওয়া। রিলিজের মধ্যে অনেক তথ্য থাকে। প্রতিষ্ঠান জানে সব তথ্য সংবাদে যাবে না। দু-এক লাইনও যদি যায় তাহলেও অনেক। বড় বিজ্ঞাপনের চেয়ে দু-এক লাইনের খবর প্রতিষ্ঠানের ভাবমূর্তি অনেকখানি বাড়িয়ে দেয়। চেম্বার অফ কমার্স, ভারতীয় রেল, সরকারের বিভিন্ন বিভাগ, বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিভিন্ন বেসরকারী প্রতিষ্ঠান নিয়মিত প্রেসরিলিজ সংবাদপত্রের অফিসে পাঠিয়ে থাকে। অবর-সম্পাদককে এই সমস্ত প্রেস রিলিজ থেকে সংবাদের কপি তৈরি করতে হয়।

শিরোনাম ঃ যে কোন সংবাদের একটা শিরোনাম থাকে। সংবাদ পড়তে গেলে সবার আগে চোখে পড়ে শিরোনাম। ব্যস্ত পাঠক শিরোনাম দেখেই পেয়ে যান সংবাদের নির্যাস। ইচ্ছে না হলে সংবাদের ভিতরে ঢোকার প্রয়োজন নেই। শুধুমাত্র শিরোনাম দেখেই মূল সংবাদের আন্দাজ পাওয়া যাবে। পাঠকের কাছে সংবাদের বিষয় পৌঁছে দিতে শিরোনামের জুড়ি নেই। রিপোর্টারের কপি, সংবাদ-সংস্থার কপি সম্পাদনার পর শিরোনাম বসানো হয়। সম্পাদনা করেন যে অবর-সম্পাদক তিনিই শিরোনাম দেন।

শিরোনাম লেখা সম্পাদনার শেষ কাজ। একেবারে অল্পকথায় অবর-সম্পাদক শিরোনাম লিখবেন। সঠিক শব্দ নির্বাচন করে সংবাদের মূল ভাবনাটিকে প্রকাশ করতে হবে। কপিতে ব্যবহৃত হয়েছে যে শব্দ তাই ফিরে আসবে শিরোনামে। এতে সংবাদের বিষয়কে সহজে চিহ্নিত করা যায়। একটি শিরোনাম সার্থক হয়ে ওঠে ক্রিয়াপদের সঠিক ব্যবহারে। বর্তমান কালের ক্রিয়াপদ কোন ঘটনার সম্প্রতিক চরিত্রকে প্রতিষ্ঠা করে। খবরের টাটকা ভাবটা বজায় থাকে। মানুষ যতক্ষণ না জানছে ততক্ষণই একটা বিষয় খবর থাকে। জানার সঙ্গে সঙ্গে খবরের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হয়। ক্রিয়াপদ জানায়। এমনভাবে জানায়

যাতে পাঠক প্রথম জানার আকস্মিকতা অনুভব করতে পারে। মানুষ কুকুরকে কামড়েছে, এটা একটা ভাল খবর। আবার একই সঙ্গে ভাল শিরোনামও। 'কামড়েছে' ক্রিয়াপদটি বর্তমান কালের এবং তা ঘটনার আকস্মিকতা ও টাটকাভাব ধরে রাখে। খবর জীবনের কথা বলে, আর ক্রিয়াপদ খবরকে জীবন্ত করে গড়ে তোলে।

শিরোনাম একেবারে শেষে দেওয়ার অন্যতম যুক্তি হল একটা সংবাদ কতটা জায়গা পাবে তা একেবারে শেষে ঠিক হয়। সম্পাদনার সময় ক কলাম কত সেন্টিমিটার জায়গা নেবে একটি সংবাদ তা জানা যায়। দু-কলাম জায়গা গেলে শিরোনামকে দু-কলাম জায়গার মধ্যে ধরাতে হবে। আর তিন কলাম জায়গা থাকলে শিরোনাম আরও বিস্তৃত হবে। শিরোনামের বিন্যাস ও সম্পাদনার সময় তৈরি হয়। দু-লাইনে, তিন লাইনে অথবা এক লাইনে শিরোনাম রচনা হতে পারে। কী ধরনের বিন্যাস হবে তা নির্ভর করছে কতটা জায়গা পাওয়া যাচ্ছে তার ওপর।

১১৬.১০ সারাংশ

সংবাদপত্র প্রকাশনায় সম্পাদনার বিভিন্ন পর্যায় রয়েছে। এই পর্যায়গুলি জানার আগে দেখা দরকার কীভাবে সংবাদ আসছে। কারণ আগে সংবাদ, তারপর সম্পাদনা। সংবাদ আসে নানা সূত্র থেকে। সংবাদ আনার মূল দায়িত্বে থাকেন রিপোর্টাররা। রিপোর্টারদের মধ্যে রকমফের আছে। স্টাফ রিপোর্টার, স্পেশাল করেসপনডেন্ট, জেলা সংবাদদাতা, বিদেশ সংবাদদাতা প্রচুর খবর পাঠান নিউজরুমে। এছাড়া আছে সংবাদ-সংস্থা, যেমন পি টি আই, ইউ এন আই, রয়টার্স, এ পি, এ এফ পি প্রভৃতি সংবাদ-সংস্থা দিবারাত্র সংবাদপত্রকে খবর পাঠায়। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে পাঠানো প্রেস বিজ্ঞপ্তি থেকেও সংবাদ তৈরি হয়। প্রতিদিন অসংখ্য প্রেস বিজ্ঞপ্তি সংবাদপত্র অফিসে আসে। এই বিপুল সংবাদ-প্রবাহ থেকে কিছু অংশ বেছে নিয়ে ছাপার জন্য তৈরি করা হয়। তৈরি করার নামই হল সম্পাদনা। অবর-সম্পাদকেরা নির্বাচিত সংবাদ কপিকে ঘষে মেজে মুদ্রণ উপযোগী করে গড়ে তোলেন। কতটা জায়গা নিয়ে কোথায় বসবে সেই সংবাদ সেটা নির্ধারণ করেন, তারপর রচনা করেন সংবাদের উপযুক্ত শিরোনাম। সংবাদ সম্পাদনায় শিরোনামের গুরুত্ব রয়েছে। পাঠক প্রথমেই দেখেন শিরোনাম, সেখানেই তিনি আভাষ পান সংবাদের বিষয়বস্তুর। অত্যন্ত দক্ষতার সঙ্গে অল্প কথায় সঠিক বার্তাটি শিরনামে নিয়ে আসেন অবর-সম্পাদকেরা।

১১৬.১১ অনুশীলনী—৩

১। কাগজের খবর সংগ্রহের সূত্রগুলি উল্লেখ করুন।

২। প্রতিবেদক, মুখ্য প্রতিবেদক, বিশেষ প্রতিবেদক, অবর-সম্পাদক, মুখ্য অবর-সম্পাদক প্রভৃতির কাজ সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৩। 'শিরোনাম'-এর গুরুত্ব ও তাৎপর্য বুঝিয়ে দিন।

১১৬.১২ মূলপাঠ—৪ ঃ সংকলন, কপি পরীক্ষা

সংকলন ঃ সম্পাদনার সময় অনেক সময়ই অবর সম্পাদকদের সঙ্কলনের কাজ করতে হয়। একটি গুরুত্বপূর্ণ সংবাদের ওপর বিভিন্ন সূত্র থেকে খবর আসতে পারে। স্টাফ করেসপনডেন্ট, সংবাদ-সংস্থা একই বিষয়ের ওপর প্রচুর খবর পাঠাতে পারে। গুজরাটের দাঙ্গা, লাটুরের ভূমিকম্পের সময় বিভিন্ন সূত্র থেকে খবর এসেছে। অভিজ্ঞ অবর সম্পাদককে এই সমস্ত খবরকে সংকলিত করে একটি, দুটি সংবাদের কপি বানাতে হয়। যেমন ভূমিকম্পের খবরের নানা দিক রয়েছে। ধ্বংসের খবর, মৃত্যুর খবর, আহতদের খবর, ক্ষতিপূরণের খবর, পুনর্বাসনের খবর প্রভৃতি অনেক খবর আসতে পারে। রিপোর্টারের পাঠানো কপির সঙ্গে সংবাদ-সংস্থার কপির সাদৃশ্য ও বৈসাদৃশ্য দুই-ই থাকতে পারে। সংকলনের সময় এই সমস্ত কিছুই বিবেচনার মধ্যে রাখার দরকার হয়। দুটি সূত্র থেকে আসা খবর নিয়ে যদি কোন বিভ্রান্তি দেখা যায় তাহলে অবর-সম্পাদককে খতিয়ে দেখতে হয় তার সত্যতা। দক্ষ সঙ্কলন সম্পাদনার গুণগত মান বাড়িয়ে দেয়।

কপি পরীক্ষা ঃ যে সংবাদের কপি সম্পাদিত হবে সেটি আগে পরীক্ষা করে দেখতে হয় তা সম্পাদনার তথা ছাপবার যোগ্য কি না। নিউজরুমে যে বিপুল কপি এসে জমা হয় তার মধ্যে থেকে সামান্য অংশই ছাপা হয়। যা ছাপা হবে তা নির্বাচিত হয় কপি পরীক্ষার মাধ্যমে। অভিজ্ঞ সিনিয়র অবর-সম্পাদকরা কপি পরীক্ষা করে থাকেন। সাধারণত মুখ্য অবর-সম্পাদকের ওপরই বর্তায় এই দায়িত্ব। কপি পরীক্ষার সময় অবর-সম্পাদক দেখেন কপিটি পাঠকের চাহিদা, রুচি, পছন্দ পূরণ করবে কিনা। বাংলা কাগজের চাহিদা একরকম, আবার ইংরেজি কাগজের চাহিদা একটু অন্যরকম। বাংলা কাগজে আঞ্চলিক খবরের ওপর গুরুত্ব বেশি দেওয়া হয়। অন্যদিকে ইংরেজি কাগজে, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক খবর বেশি প্রাধান্য পায়। সংবাদপত্রের নিজস্ব নীতিও কপি পরীক্ষাকে প্রভাবিত করে। একেক কাগজের নীতি একেকরকম। কেউ রক্ষণশীল, কেউ উদারপন্থী। অবর-সম্পাদকরা জানেন কাগজের নীতি কী। নীতির কথা মাথায় রেখেই তাঁরা কপি পরীক্ষা করবেন।

১১৬.১৩ সারাংশ

নিজস্ব সংবাদদাতা ছাড়াও বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রাপ্ত গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ আসে। এক্ষেত্রে অবর-সম্পাদকের দায়িত্ব বেড়ে যায়। নিজস্ব সংবাদদাতার কাজ প্রাপ্ত সংবাদ, অন্যান্য সংবাদ-সংস্থা কর্তৃক প্রেরিত সংবাদের তথ্য বিশ্লেষণ যথাযথ সংবাদটি পরিবেশন করা বাঞ্ছনীয়। তথ্যগত অসঙ্গতি, অন্যথায় পাঠকের মনে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করতে পারে। নানা সূত্রে প্রাপ্ত সংবাদ থেকে সঠিক তথ্য সংকলন সম্পাদনার গুণগত মান বৃদ্ধি করে।

কপি পরীক্ষার কাজটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ, সাংবাদিকরা অনেকসময় তাড়াহুড়ো করে তাঁদের প্রাপ্ত সংবাদের কপি তৈরি করে দেন। এক্ষেত্রে অবর-সম্পাদকের কাছে একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ কপি পরীক্ষা করে দেখা যে সেটি আদৌ ছাপাবার যোগ্য কিনা। নিউজ রুমে জমা হওয়া অসংখ্য কপির মধ্য থেকে পাঠকের উপযোগী সংবাদ নির্ব্বাচন করে সঠিকভাবে উপস্থাপনার জন্য অবর-সম্পাদকের কপি পরীক্ষার স্থান সবিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। কারণ তিনি জানেন, জাতীয়, আন্তর্জাতিক পর্যায়ের কোন খবর কতটা গুরুত্বপূর্ণ।

১১৬.১৪ অনুশীলনী—৪

১। সংবাদপত্রে ‘সংকলন’ প্রক্রিয়ার প্রয়োজনীয়তা, তাৎপর্য বুঝিয়ে দিন।

২। ‘কপি পরীক্ষা’ কী এবং কেন করা হয়? কপি পরীক্ষার সূচকগুলি উল্লেখ করুন।

১১৬.১৫ উত্তর-সংকেত (অনুশীলনী—১, ২, ৩, ৪)

অনুশীলনী—১

১। (ক) লেখাকে, উপযোগী।

(খ) ত্রুটি, প্রক্রিয়ার, সম্পাদনা।

(গ) গুণগত, উন্নত, সম্পাদনার।

২। মূল পাঠ — ১ অনুসরণে উত্তর তৈরি করুন।

৩। সম্পাদনা হল যেকোন রচনার ত্রুটি সংশোধন করে তাকে প্রকাশযোগ্য করা।

৪। রচনাটি ছাপার যোগ্যতা বিচার, তথ্যগত ভুল, বানান শুদ্ধি, ভাষাগত ত্রুটি, বাক্যবিন্যাসে অসঙ্গতি সংশোধন করা প্রভৃতি রচনার উৎকর্ষ সাধন করে।

অনুশীলনী—২

১। (ক) সাময়িক পত্র, পুস্তক, সম্পাদনার।

(খ) সম্পাদনাই, উৎকর্ষ, চরিত্র।

(গ) উৎপাদনের, স্তর, সম্পাদনা, উল্লেখযোগ্য।

২। খবরের কাগজ, সাময়িক পত্র, পুস্তক প্রকাশনায় সম্পাদনা প্রয়োগ ঘটতে পারে। যে কোন প্রকাশনাকে পাঠযোগ্য ও নিখুঁত করে গড়ে তোলার কাজে সম্পাদনা তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে।

৩। সংবাদপত্র সম্পাদনায় সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা হোল 'অবর-সম্পাদক' বা 'সাব-এডিটরের'। তাঁর প্রধান কাজ সংবাদের কপি সংশোধন, পুনর্নির্মাণ, প্রয়োজনে কেটেছেঁটে সংক্ষিপ্ত করা।

৪। নিউজ রুমের সম্পূর্ণ দায়িত্ব বার্তা সম্পাদকের। তিনি নানা সূত্রে সংবাদ সংগ্রহের এবং সেই সংগৃহীত সংবাদ সম্পাদনার ওপর তদারকি করেন।

৫। সংবাদপত্রগুলি নানা সূত্রে সংবাদ সংগ্রহ করে। প্রধানতঃ সংবাদ সংগ্রহের দায়িত্বে থাকেন রিপোর্টার বা প্রতিবেদকদের নানা শ্রেণি বিভাজন আছে যথা শহরাঞ্চলের জন্য স্টাফ রিপোর্টার বা নিজস্ব প্রতিনিধি, গ্রামীণ বা গ্রামীণ সংবাদদাতা, ক্রীড়া সাংবাদিক, চলচ্চিত্র বা নাটক ইত্যাদি বিনোদনমূলক সংবাদদাতা, বিদেশে বা বিভিন্ন রাজ্যে নিযুক্ত বিশেষ প্রতিনিধি ছাড়াও প্রিন্সিপ্যাল করেসপনডেন্ট এবং স্পেশাল করেসপনডেন্ট।

অনুশীলনী—৩

১। মূলপাঠে —৩-এর সংবাদ সংগ্রহ অংশটি ভাল করে পড়ে উত্তর তৈরি করুন।

২। সংবাদ সংগ্রহ ও কপি সম্পাদনায় প্রতিবেদক ও সম্পাদকদের কাজ সম্পর্কে আলোচনা আছে। উত্তর প্রস্তুতিতে এর সাহায্য নিন।

৩। শিরোনাম অংশটিতে এই প্রশ্নের উত্তর পাবেন।

অনুশীলনী—৪

১। বিভিন্ন সূত্র থেকে প্রাপ্ত সংবাদের মধ্য থেকে সঠিক সংবাদ চিহ্নিত করা এবং সাংবাদকে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণ করে, কয়েকটি স্বতন্ত্র খবর তৈরি করা হয়।

২। প্রাপ্ত সংবাদ থেকে প্রস্তুত যে কোন কপি প্রকাশযোগ্য করার সময় পাঠকের চাহিদা, রুচি, পত্রিকার নীতি প্রভৃতি মনে রেখে সম্পাদক তাকে পরিমার্জনা করেন। এই প্রক্রিয়াকে বলা হয় কপি সম্পাদনা।

১১৬.১৬ গ্রন্থপঞ্জি

১। চিত্তরঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায় — *বাংলা মুদ্রণ ও প্রকাশন।*

২। ড. পার্থ চট্টোপাধ্যায় — ক) *সাংবাদিকতা ও সংবাদপত্র ভাবনা।*

(খ) *বিষয় — সাংবাদিকতা।*

৩। ধর— *সংবাদ ও সাংবাদিকতা।*

৪। Patanjali Sethi – *Professional Journalism.*

৫। D. S. Mehta – *Mass Communication and Journalism in India.*

৬। বৈদ্যনাথ ভট্টাচার্য — *সংবাদ প্রতিবেদন।*

একক ১১৭ ❑ সম্পাদনার নীতি ও তার প্রয়োগ

গঠন

১১৭.১ উদ্দেশ্য

১১৭.২ প্রস্তাবনা

১১৭.৩ মূলপাঠ—১ সম্পাদনার নীতি

১১৭.৪ সারাংশ

১১৭.৫ অনুশীলনী—১

১১৭.৬ মূলপাঠ—২ সংবাদ সূচনা ও পুনর্লিখন

১১৭.৭ সারাংশ

১১৭.৮ অনুশীলনী—২

১১৭.৯ মূলপাঠ—৩ সম্পাদনা চিহ্ন

১১৭.১০ সারাংশ

১১৭.১১ অনুশীলনী—৩

১১৭.১২ মূলপাঠ—৪ টাইপসজ্জা ও মার্জিন, শিরোনাম, উপশিরোনাম

১১৭.১৩ সারাংশ

১১৭.১৪ অনুশীলনী—৪

১১৭.১৫ মূলপাঠ—৫ অঙ্গসজ্জা ঃ বিভিন্নরূপ

১১৭.১৬ সারাংশ

১১৭.১৭ অনুশীলনী (মূলপাঠ—৪ ও ৫)

১১৭.১৮ উত্তর সংকেত (অনুশীলনী—১, ২, ৩, ৪)

১১৭.১৯ গ্রন্থপঞ্জি

১১৭.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পড়ে আপনি একদিকে যেমন সংবাদপত্র কোন নীতির ভিত্তিতে প্রস্তুত করা হয় জানতে পারবেন তেমনি ভবিষ্যতে আপনার ব্যবহারিক জীবনে সংবাদপত্রের অন্যতম কর্মী অথবা শহর বা গ্রামের স্থানীয় সংবাদ রচনায় সহায়ক হবে। যে বিষয়গুলি এককটিতে জানতে পারবেন তা হোল ঃ

১। সংবাদ রচনার ভাষা সহজ ও সর্বজনবোধ্য হ'তে হবে।

২। সংবাদের যে কোন ধরনের ভুল ভ্রান্তি দূর করতে হবে।

৩। সংবাদ পরিবেশন যথা সম্ভব সংক্ষিপ্ত পরিসরে হওয়া বাঞ্ছনীয়।

৪। সাধারণ যে কোন প্রবন্ধ রচনা থেকে সংবাদ রচনার রীতিগত যে স্বাতন্ত্র্য আছে, তা অনুসরণ করতে হবে।

১১৭.২ প্রস্তাবনা

সংবাদপত্র একটি অত্যন্ত শক্তিশালী গণমাধ্যম। গণমাধ্যমের কাজ হল দেশের মানুষের কাছে দেশ বিদেশের খবর, তথ্য, ঘটনা, সরকারের নীতি, মন্ত্রী ও দেশের প্রশাসকদের কাজ-এর সংবাদ ও সমালোচনা, জনপ্রিয় শিল্পী সাহিত্যিক ও অন্যান্য সাংস্কৃতিক কর্মকান্ডের পরিচয় তুলে ধরা।

তাই সংবাদ পরিবেশনেও কিছু বিশেষত্ব থাকে। যেমন তেমন করে যে কোন ধরনের সংবাদ পরিবেশন করলেই চলে না। কাগজের পাঠকের চাহিদার সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে তাঁর কৌতূহল বজায় রেখে সংবাদ পরিবেশন করতে হয়। তাই তার ভাষা, উপস্থাপনা, বক্তব্যের সংগতি ও সংহতির দিকে বিশেষ নজর রেখে সংবাদ রচনা করতে হয়। খবর রচনা সম্পাদনার সময় অবর-সম্পাদক মুখ্য অবর-সম্পাদককে এদিকে সবিশেষ দৃষ্টি দিতে হয়।

১১৭.৩ মূলপাঠ—১ ঃ সম্পাদনার নীতি

সংবাদ সম্পাদনার কিছু নির্দিষ্ট নীতি রয়েছে। এই নীতিগুলি সম্পাদনার কাজকে দক্ষতার সঙ্গে সম্পন্ন করতে সাহায্য করে। সম্পাদনার কাজে দায়িত্বশীল সাংবাদিকরা এই নীতিগুলি যথাসম্ভব মেনে চলেন। সম্পাদনায় উৎকর্ষতা আনতে এই নীতিগুলির তাৎপর্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ। নীতিগুলি সংক্ষেপে এইরকম ঃ

১। যথাসম্ভব সহজ ভাষায় সংবাদ রচনা করতে হবে। অল্পশিক্ষিত লোকেরাও কাগজ পড়ে। মোটামুটি ক্লাস এইট অবধি পড়া যে কোন ব্যক্তি সংবাদপত্র পড়ে সবই বুঝতে পারে। এটা সম্ভব হয় কারণ সংবাদ লেখা হয় অত্যন্ত সহজ ভাষায়। যতটা সম্ভব সহজভাবে উপস্থিত করা হয় সংবাদের বিষয়কে। সংবাদের কপিতে যদি কোন জটিলতা থাকে সম্পাদনার সময় তা দূর করা দরকার। অত্যন্ত অল্পশিক্ষিত পাঠকও গড় গড় করে সংবাদ পড়ে যাবে, কোথাও হোঁচট খাবে না। এটা সম্ভব যদি সম্পাদনার সময় প্রাঞ্জলতা প্রতিষ্ঠা করার দিকে লক্ষ্য করা হয়।

২। যে-কোনো ধরনের ভুল ভ্রান্তি দূর করতে হবে। ভুল নানা ধরনের হতে পারে। বানান ভুল, তথ্যগত কোন ভুল পাঠককে বিভ্রান্ত করবে। রিপোর্টার তাড়াহুড়ো করে কপি লেখে। ডেডলাইনের মধ্যে অফিসকে খবর ধরাতে হয় তাকে। সামান্য ভুলভ্রান্তি ঘটতেই পারে। সম্পাদনার সময় এই ভুলভ্রান্তি দূর করা হয়। অবর-সম্পাদকের খুঁতখুঁতে-দৃষ্টির সামনে ভুল ধরা পড়বেই। সম্পাদনার টেবিল হল চেকপয়েন্ট। সমস্ত ত্রুটি এখানে সংশোধিত হবে।

৩। সংক্ষিপ্তিতা বজায় রাখা সম্পাদনার একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ নীতি। কাগজের জায়গা খুবই মূল্যবান। সীমিত জায়গার মধ্যে যত বেশি সংবাদ ধরানো যায় ততই ভাল। এ অবস্থায় অপ্রয়োজনীয় অংশ কেটে ছেঁটে ছোট করতে হবে। ঠিক যতটা দরকার ততটাই থাকবে। কোন বাড়তি কথা নয়। একেবারে যথাযথ বক্তব্য উপস্থিত করার ওপরই গুরুত্ব দেওয়া হয় সম্পাদনায়। বক্তব্য একেবারে সরাসরি পাঠকের কাছে উপস্থিত করতে হবে। সংক্ষেপে, সংবাদের আসল কথাটি দ্রুত জানাতে হবে।

৪। সংবাদ লেখার রীতি সাধারণ রচনা নীতির থেকে আলাদা। সাধারণ রচনার ক্ষেত্রে পিরামিড নীতি অনুসরণ করা হয়। পিরামিডের ওপরটা সরু হয়। নিচের দিকটা ধীরে ধীরে প্রশস্ত হতে থাকে। লেখক সাসপেন্স ধরে রেখে আস্তে আস্তে মূল বক্তব্য উপস্থিত করেন। রচনা যত এগোয়, মূল বিষয়বস্তু তত উদঘাটিত হয় পাঠকের কাছে। সংবাদ রচনায় ঠিক এর উল্টো নীতি অনুসরণ করা হয়। পিরামিডের বিপরীত উল্টো পিরামিড। ওপরটা চওড়া নিচের দিকটা ক্রমশ সরু হয়ে মিলিয়ে গেছে। এর অর্থ হল মূল বক্তব্য একেবারে আগে। তারপর ধীরে ধীরে কম গুরুত্বপূর্ণ তথ্য। সংবাদের সবচেয়ে আসল বক্তব্য থাকবে একেবারে প্রথমে, তারপর আস্তে আস্তে ধীরে ধীরে সংবাদের প্রাসঙ্গিক অন্যান্য তথ্য দিতে হবে। সম্পাদনার সময় সংবাদ রচনার এই আঙ্গিকটি বজায় রাখা দরকার। এতে সংবাদ জানতে পাঠকের সুবিধা বেশি। একেবারে প্রথমেই জানা হয়ে যাবে আসল সংবাদটি কী, তারপর ধীরে ধীরে জানা যাবে বিস্তৃত তথ্য। যাঁর সময় কম তিনি অল্প একটু পড়েই সংবাদটির মূল বিষয়টি জেনে যাবেন, যাঁর সময় ও আগ্রহ দুইই আছে তিনি সংবাদটি পুরো পাঠ করবেন, যেখানে পিরামিডের সরু অংশ একেবারে মিলিয়ে যাচ্ছে সেই পর্যন্ত। উল্টো পিরামিডের একেবারে শুরুতে যে প্রশস্ত জায়গা থাকে সেখানে থাকে সূচনা, ইংরেজিতে যাকে বলে ইনট্রো। মূল সংবাদটি এই সূচনার মধ্যেই ধরা থাকে।

১১৭.৪ সারাংশ

সম্পাদনার নীতিগুলির মধ্যে অন্যতম হল— (১) সহজ ভাষায় সংবাদ লেখা (২) যে কোন ভুল-ভ্রান্তি দূর করা (৩) সংক্ষিপ্ততা বজায় রাখা (৪) উল্টো পিরামিড রচনা রীতি মেনে চলা ইত্যাদি। এই নীতিগুলি মেনে চললে সম্পাদনার মান উন্নত হয়। পাঠকের কাছে সংবাদ পাঠ হয়ে ওঠে মনোরম অভিজ্ঞতা। সাধারণ পাঠকের সবসময় বেশি শিক্ষা-দীক্ষা থাকে না। সহজ কথায় না লিখলে তাঁদের বুঝতে অসুবিধা হবে। সময় ও জায়গা কম বলে অল্প কথায়, সীমিত পরিসরে সংবাদ পরিবেশন করতে হবে উল্টো পিরামিড সূত্র মেনে। সম্পাদনার সময় এই নীতিগুলি অনুসরণ করলে সংবাদের কপি ভালভাবে সম্পাদিত হয়।

১১৭.৫ অনুশীলনী—১

১। **শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ**

(ক) মোটামুটি .... অবধি পড়া ব্যক্তি .... পড়ে বুঝতে পারে।

(খ) সম্পাদনায় .... হোল ....।

(গ) বজায় রাখা একটি অত্যন্ত নীতি।

(ঘ) সাধারণ রচনায় .... নীতি .... করা হয়। সংবাদ রচনায় পিরামিডের বিপরীত

.... নীতি অনুসরণ করা হয়।

২। সংবাদ রচনার ভাষা কেমন হওয়া উচিত?

৩। সাধারণ রচনা ও সংবাদ রচনার গঠন রীতি সম্পর্কে বর্ণনা করুন।

৪। সম্পাদনার মূলনীতিগুলি কী?

১১৭.৬ মূলপাঠ—২ ঃ সংবাদ সূচনা ও পুনর্লিখন

উল্টো পিরামিডের আঙ্গিকের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ অংশ হল সূচনা। ইংরেজিতে বলে ইনট্রো। সংবাদের মোদ্দা কথাটি ধরা থাকে ইনট্রোতে। তিরিশ থেকে চল্লিশ শব্দের মধ্যে লেখা হয় ইনট্রো

বা সূচনা। এটুকু পড়লেই পাঠক জেনে যাবেন সংবাদের মূল বিষয়বস্তু। সংবাদ সম্পর্কে পাঠকের সাধারণ কৌতূহলকে পাঁচ W এবং এক H এ ভাগ করে দেখা হয়। পাঁচ W হল, What, When, Who এবং Why, এখানেই শেষ নয়। পাঠক আরও জানতে চায়। তাই আসে H, অর্থাৎ How; যেমন একটি দুর্ঘটনার খবর জানার জন্য পাঠকের মনে প্রশ্ন জাগে কী ঘটল, কখন ঘটল, কোথায় ঘটল, কারা যুক্ত এই ঘটনায়, কেন ঘটল এবং একেবারে শেষে কীভাবে ঘটল। সূচনার মধ্যে এই প্রশ্নগুলির জবাব যথাসাধ্য দেবার চেষ্টা করতে হবে। সূচনাটুকু পড়লে পাঠক এই প্রশ্নগুলির জবাব পাবেন এবং জেনে যাবেন সংবাদের আসল বিষয়।

সম্পাদনা করার সময় ভাল সূচনা লেখার দিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। একেবারে সংবাদের নির্যাসটুকুকে সংক্ষেপে পরিবেশন করতে হবে সূচনায়। সূচনাটি পড়লেই পাঠক মূল সংবাদের হদিশ পাবেন। জেনে যাবেন সংবাদের প্রধান বিষয়গুলি কী। অন্ধ্রে নকশালপন্থীদের আত্মসমর্পণের ওপর একটি সংবাদের সূচনা ছিল এইরকম ঃ ‘‘জনশক্তি গোষ্ঠীর করিমনগর জেলার ৪৬ জন নকশালপন্থী আজ অন্ধ্রপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী চন্দ্রবাবু নাইডুর সামনে অস্ত্রসহ আত্মসমর্পণ করেছে” (আনন্দবাজার পত্রিকা)। একজন রুশ জেনারেলের বিমান দুর্ঘটনার খবরে সূচনা লেখা হয়েছে এইভাবে ঃ ‘‘রাশিয়ার প্রাক্তন জেনারেল এবং রাজনীতিবিদ আলেকজান্ডার লেবেদ আজ হেলিকপ্টার দুর্ঘটায় মারা গিয়েছেন,” (আনন্দবাজার পত্রিকা)। দুটি সূচনাতেই কী, কোথায়, কে, কখন, কেন-র উত্তর দেওয়ার চেষ্টা হয়েছে।

পুনর্লিখন ঃ সম্পাদনার অন্যতম অঙ্গ হল পুনর্লিখন। লেখার মধ্যে যদি কোন জটিলতা, অস্পষ্টতা থাকে তাহলে পুনরায় আবার নতুন করে লিখতে হয়। বাক্যবিন্যাসের সামান্য অদল বদল করলেই জটিলতা দূর হয়ে যেতে পারে। সম্পাদনার দায়িত্বে থাকা অবর-সম্পাদক অনেক সময়ই রিপোর্টারদের লেখার ওপর কলম চালিয়ে নতুন করে লেখাকে ঢেলে সাজান। বড় বাক্যকে কেটে ছোট করেন, প্রয়োজন হলে বাক্যবিন্যাসের পরিবর্তন ঘটিয়ে বিষয়-ভাবনাকে স্পষ্ট করে তোলেন।

সম্পাদনার মূল কারবার শব্দ ও বাক্য নিয়ে। শব্দ ও বাক্যকে যথাযথভাবে ও সঠিকভাবে প্রয়োগ করা দরকার। অবর-সম্পাদক দেখেন কথার ভারে অস্বচ্ছতায় খবর যেন হারিয়ে না যায়। ছোট ছোট কথায় সহজ সরল শব্দ দিয়ে সংবাদ লিখতে হবে। উদ্দেশ্য একটাই, পাঠক পড়া মাত্র বিষয়টি বুঝতে পারবেন। রিপোর্টারের লেখায়, সংবাদ-সংস্থার পাঠানো কপিতে যদি অস্বচ্ছতা থাকে তাহলে অবর-সম্পাদক লেখার ওপর কলম চালাবেন, নতুন করে আবার লিখবেন। একটা নমুনা দেখলেই বিষয়টি আপনারা সহজে বুঝতে পারবেন। গুলি করে টাকা ছিনতাইয়ের একটি খবরের পুনর্লিখন কীভাবে হয়েছে তা নিচে দেওয়া হল। পুনর্লিখনের আগের রূপটি এরকম ঃ

“সোমবার রাতে হাওড়া-তারকেশ্বর শাখার নালিকুল স্টেশনে এক ব্যবসায়ীর কাছ থেকে এক লক্ষ টাকা ছিনতাই করেছে দুস্কৃতীরা। পুলিস সূত্রে জানা গেছে হারাধন দে নামে এক ব্যবসায়ী কাজ সেরে রাত বারোটা নাগাদ নালিকুল স্টেশনে পৌঁছন। শেষ তারকেশ্বর লোকাল থেকে তিনি স্টেশনে নামেন। তাঁর সঙ্গে একটি ব্যাগে প্রচুর টাকা ছিল। এই সময় চার দুষ্কৃতী তাঁকে ঘিরে ধরে ব্যাগটি ছিনতাইয়ের চেষ্টা করে। হারাধনবাবু বাধা দিলে তাঁর মাথায় গুলি করা হয়। তিনি মাটিতে লুটিয়ে পড়লে দুস্কৃতীরা ব্যাগটি নিয়ে পালিয়ে যায়। স্থানীয় মানুষ হারাধনবাবুকে স্থানীয় গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায়। কিন্তু পরে তাঁর অবস্থার অবনতি হওয়ায় কলকাতার মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তরিত করা হয়। পুলিশ দুস্কৃতীদের খোঁজ করছে। এখনও পর্যন্ত কেউ ধরা পড়ে নি।” সংবাদের বিষয়গুলিকে ঠিক ঠাক সাজিয়ে পুনর্লিখনের পর লেখাটি এরকম হবে ঃ

“এক ব্যবসায়ীকে মাথায় গুলি করে এক লক্ষ টাকা ছিনিয়ে নিয়ে গেছে দুষ্কৃতীরা। আশঙ্কাজনক অবস্থায় তাঁকে হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ঘটনাটি ঘটেছে সোমবার রাতে তারকেশ্বর শাখার নালিকুল স্টেশনে। পুলিশ এখনও পর্যন্ত কাউকে গ্রেপ্তার করতে পারে নি।”

পুলিশ জানায় ওই দিন রাতে হারাধন দে নামে এক ব্যবসায়ী কাজ সেরে রাত বারোটা নাগাদ শেষ তারকেশ্বর লোকালে নালিকুল স্টেশনে নামেন। তাঁর কাছে এক লক্ষ টাকা ছিল। এই সময় চার দুস্কৃতী তাঁকে ঘিরে ধরে টাকার ব্যাগটি ছিনতাইয়ের চেষ্টা করে। হারাধন বাধা দিলে দুস্কৃতীরা তাঁর মাথায় গুলি করে টাকার ব্যাগটি নিয়ে পালিয়ে যায়। স্থানীয় মানুষ আহত হারাধনবাবুকে গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে যায়। অবস্থার অবনতি হওয়ায় তাঁকে কলকাতার মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে।”

পুনর্লিখনের ক্ষেত্রে দুটি বিষয় অত্যন্ত জরুরি। এক, সংবাদের বিষয়গুলিকে ক্রমানুসারে সাজানো, যাতে পাঠক যেটা আগে জানা দরকার তা জানতে পারে। দুই হল কতটা জায়গা পাওয়া যাচ্ছে সেটা বিবেচনা করে লেখা। ধরা যাক লেখাটি আছে চারশো শব্দের, কিন্তু জায়গা আছে আড়াইশো শব্দের মতো, তখন ছোট করতে হবে। যদি তলা থেকে কেটে ছোট না করা যায় তাহলে পুনর্লিখন করা ছাড়া উপায় নেই। আর একটি লক্ষণীয় বিষয় হল পুনর্লিখনের সময় দেখতে হয় যাতে পুনরাবৃত্তি যতখানি সম্ভব এড়িয়ে যাওয়া যায়। পুনরাবৃত্তি লেখার আকর্ষণ কমিয়ে দেয়।

১১৭.৭ সারাংশ

সংবাদ রচনায় সূচনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একেবারে মোদ্দা কথাকে সবার আগে নিয়ে আসা হয় সূচনায়। পাঠকের সময় কম, কিন্তু জানতে হবে অনেক কিছু। সংবাদের নির্যাসটুকু যদি সূচনায় ধরিয়ে দেওয়া

যায় তাহলে পাঠকের সুবিধা। মূল বিষয়টি অল্প কথায় জানা হয়ে যায়। যে কোন বিষয় সম্পর্কে পাঠকের কৌতুহলকে পাঁচ W এবং এক H-এ ভাগ করে দেখা হয়। পাঁচ W হল, What, When, Where, Who, Why এবং এক H হল How। সূচনায় যথা সম্ভব এই মূল প্রশ্নগুলির উত্তর খোঁজার চেষ্টা করা হয়।

বিষয় ভাবনাকে সুসংসহত রূপ দেওয়ার জন্য অনেক সময় ঢেলে সাজাতে হয়। একে বলে পুনর্লিখন। মূল বিষয় ভাবনাকে অবিকৃত রেখে নতুন করে লেখা হয়। রিপোর্টার যা লিখেছেন অথবা সংস্থার কপিতে যা পরিবেশিত হয়েছে তা যদি যথাযথ না মনে হয় তাহলে অবর-সম্পাদকেরা আবার নতুন করে লেখেন। শব্দ ও বাক্যের সঠিক প্রয়োগ ঘটে এই পুনর্লিখনে। যে কোন সম্পাদনার অন্যতম অঙ্গ হল পুনর্লিখন।

১১৭.৮ অনুশীলনী—২

১। সূচনা কাকে বলে? সংবাদ রচনায় সূচনার গুরুত্ব কী?

২। পুনর্লিখন বলতে কী বোঝেন? পুনর্লিখনের প্রয়োজন কখন হয়?

১১৭.৯ মূলপাঠ—৩ ঃ সম্পাদনা চিহ্ন

সম্পাদনা চিহ্ন ঃ অবর-সম্পাদকরা যখন কপি সম্পাদনা করেন তাঁরা নিজেদের বক্তব্য বোঝবার জন্য কপির ওপর বিভিন্ন চিহ্ন ব্যবহার করেন। কম্পোজিটররা এই চিহ্ন দেখে বুঝে যান সম্পাদকের বক্তব্য কী। চিহ্ন দেখে তারপর তাঁরা কপি থেকে কম্পোজ করেন।

কপিতে প্রথমেই যে চিহ্নটি ব্যবহার করার দরকার হয় তাহল অনুচ্ছেদ চিহ্ন। একটি নতুন অনুচ্ছেদ শুরুর সময় বাঁদিকে কিছুটা সাদা জায়গা থাকে। সাদা জায়গার এই ব্যবহার অনুচ্ছেদ তৈরিতে খুবই তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। সম্পাদক যদি মনে করেন কোন জায়গায় এসে নতুন অনুচ্ছেদ শুরু করা দরকার তাহলে তিনি একটি চিহ্ন দিয়ে বুঝিয়ে দেবেন এই জায়গা থেকে নতুন অনুচ্ছেদ হবে। চিহ্নটি হল [, একেবারে তৃতীয় বন্ধনীর মতো দেখতে। কম্পোজিটর এই চিহ্নটি অনুযায়ী নতুন অনুচ্ছেদ তৈরি করবেন। ঠিক একইভাবে দুটি অনুচ্ছেদ যদি যোগ করে একটি অনুচ্ছেদ তৈরি করবার দরকার পড়ে তাহলে সম্পাদক প্রথম ও দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের মধ্যবর্তী জায়গায়—এই চিহ্ন ব্যবহার করবেন। প্রথম অনুচ্ছেদের শেষ অংশ থেকে চিহ্নটি শুরু হচ্ছে এবং শেষ হচ্ছে দ্বিতীয় অনুচ্ছেদের প্রথমে।

যিনি কম্পোজ করবেন তিনি বুঝে যাবেন যেখান থেকে চিহ্নটি শুরু হচ্ছে সেই লাইনের সঙ্গে চিহ্নটি শেষ হচ্ছে সেখানকার লাইনের সঙ্গে যুক্ত করতে হবে। সম্পাদনার সময় হামেশাই এই চিহ্নের ব্যবহার করতে হয় সম্পাদককে।

অনেক সময় দুটি শব্দ জুড়ে যায়। দুটি শব্দকে আলাদা করার জন্য একটি সোজা বড় দাঁড়ি চিহ্ন দিয়ে শব্দ দুটির আলাদা স্বাতন্ত্র বোঝানো হয়। যেমন ভারত | সরকার, দাঁড়ি চিহ্নটি দিলে কম্পোজিটর বুঝে যাবেন শব্দ দুটিকে আলাদা করতে হবে। একটি শব্দ যদি আলাদা হয়ে যায়, তাহলে এরকম ‿ চিহ্ন দিয়ে ছাড়া দুটি শব্দকে এক করতে হবে। যেমন বিশ্ব‿বিদ্যালয়, চিহ্নটি বুঝিয়ে দেবে বিশ্ববিদ্যালয় হল একটি শব্দ।

বাক্যবিন্যাসে অনেক সময় অক্ষর অথবা শব্দ বাদ যায়। এই বাদ যাওয়া অক্ষর অথবা শব্দকে বিন্যাসের মধ্যে ঢোকাবার জন্য ∧ ক্যারেট চিহ্ন ব্যবহার করা হয়। যেখানে অক্ষর বা শব্দ ঢোকাবার দরকার সেখানে এই ∧ ক্যারেট চিহ্ন দিয়ে ওপরে অক্ষর বা শব্দটি লিখে দিতে হবে। যেমন 'নিদিতা' হবে 'নি ∧(বে) দিতা'। আবার শব্দও বাদ যেতে পারে। যেমন সূর্য ∧(ওঠে) পূর্ব দিকে।

সম্পাদনার সময় ধরা পড়তে পারে যে কয়েকটি অক্ষর হয়তো উল্টোপাল্টা হয়ে গেছে। যে অক্ষরের আগে থাকার কথা সে চলে গেছে পরে, আর যার পরে থাকার কথা সে চলে এসেছে আগে। অক্ষরগুলিকে তখন ঠিক জায়গায় নিয়ে আসার নির্দেশ দিতে হয়। এর চিহ্নটি হল ⊔⊓ বা, ⊓⊔, কম্পোজিটর এই চিহ্নের সূত্র ধরে সঠিকভাবে বা অক্ষর সাজাতে পারবে। যেমন 'গাছপালা' শব্দটি ভুল করে 'গাপাছলা' হয়ে যেতে পারে। তখন চিহ্ন ব্যবহার করে লিখতে হবে 'গা | পা | ছ | লা'। এতেই কাজ হবে, কম্পোজিটর শুধরে লিখবেন 'গাছপালা'। আবার বাজপেয়ী |আসছেন|কলকাতায়| এই বাক্যটিকে পাল্টে বাজপেয়ী কলকাতায় আসছেন লেখা যায়।

অতিরিক্ত কিছু সংযোজন করতে হলে অবর-সম্পাদক কপির মার্জিনে সংযোজিত অংশ লিখে একটি বৃত্তের চিহ্ন দিয়ে সোজা তীর টেনে ক্যারেট চিহ্নের ওপর নিয়ে আসবেন। যেমন 'সেলিমের ∧(সমস্ত অস্থাবর) সম্পত্তি ক্রোক করল পুলিশ। এখানে 'সমস্ত অস্থাবর' কথাটা তীর চিহ্ন দিয়ে ঢোকানো হল।

এরকম আরও অনেক চিহ্ন আছে যা কপি সংশোধনের সময় অবর-সম্পাদক ব্যবহার করে থাকেন। আজকাল অবশ্য কমপিউটারে সম্পাদনা হচ্ছে। তাই চিহ্ন দিয়ে সম্পাদনার প্রয়োজন আর হচ্ছে না। শুধুমাত্র কমপিউটারের বোতাম টিপে আর মাউস ক্লিক করেই ইচ্ছেমতন শব্দের ও বাক্যের ওলোট পালোট করা যায়।

অনুচ্ছেদ ঃ যে-কোনো রচনা পাঠোপযোগী করে তৈরি করার সময় যে সমস্ত বিষয়ের প্রতি মনোযোগ দেওয়া দরকার তার মধ্যে অন্যতম হল অনুচ্ছেদ। ইংরেজিতে বলে প্যারাগ্রাফ। অনুচ্ছেদ মূলত দুটি উদ্দেশ্যসাধন করে। একটি রচনার কাঠামোকে সুবিন্যস্ত করে। অপরটি রচনার বিষয়গত ভাবনাকে সুসংহত করে প্রকাশ করে। কোন রচনায় যদি অনুচ্ছেদের পরিবর্তে লাইনের পর লাইন বিন্যস্ত হয়, তাহলে একই মাপের অক্ষরের ব্যবহার এক ধরনের ধূসরতা নিয়ে আসবে। পাঠকের চোখের পক্ষে তা যথেষ্ট পীড়াদায়ক। পাঠে বৈচিত্র আনতে সাদা অংশের ব্যবহার খুবই কার্যকরী। অনুচ্ছেদ দিলেই সামান্য যে সাদা জায়গা পাওয়া যায় তা চোখের পক্ষে আরামদায়ক। দুটি অনুচ্ছেদের মধ্যবর্তী জায়গা অঙ্গসজ্জায় নিয়ে আসে বৈচিত্র। একটি অনুচ্ছেদ পড়ার পর পাঠক সামান্য বিরতি পায়, ঘনবদ্ধ ধূসরতা থেকে পায় মুক্তি। একটি রচনার কাঠামোকে এভাবেই সুবিন্যস্ত করা যায় অনুচ্ছেদের ব্যবহারের মাধ্যমে। সম্পাদনার সময় যদি খুব বড় অনুচ্ছেদ এসে যায় তাহলে সঙ্গে সঙ্গে সেটিকে ভেঙে দুতিনটি অনুচ্ছেদে ভাগ করে নেওয়া উচিত।

বিষয়গত দিক থেকে নতুন অনুচ্ছেদ মানেই হল নতুন কোন যুক্তি ও ভাব। ধারাবাহিকতার মধ্যেও এক ধরনের স্বাতন্ত্র্য। যে কোন বিষয়ের উপস্থাপনকে যা মনোগ্রাহী ও আকর্ষণীয় করে তোলে। বিষয়টি উপলব্ধি করতেও পাঠকের সুবিধা হয়।

সম্পাদনার দায়িত্বে থাকা অবর-সম্পাদককে সর্বদা খেয়াল রাখতে হবে যাতে সকল অনুচ্ছেদ একই মাপের না হয়। ছোট বড় মাঝারি মিশিয়ে নেওয়াই ভাল। এতে বৈচিত্র্য আসে, একঘেঁয়েমি আসার সম্ভাবনা কম থাকে। সব অনুচ্ছেদ যদি একই মাপের হয় তাহলে অঙ্গসজ্জা হয়ে উঠবে যান্ত্রিক, পাঠের পক্ষে তা সুখের হবে না। সংবাদ লেখা হয় উল্টো পিরামিড আঙ্গিকে। অনুচ্ছেদ পেরিয়ে যত এগোন যায় তত কম গুরুত্বপূর্ণ তথ্যের সন্ধান মেলে। একেবারে শেষের দিকে এমন তথ্য থাকে যা না জানলেও সংবাদের মূল বিষয়বস্তু বুঝতে পাঠকের কোন অসুবিধা হয় না। অঙ্গসজ্জার সময় যদি প্রয়োজন হয় অনেক সময় রচনাকে ছোট করতে হয়। সেই সময় তলা থেকে একটি দুটি অনুচ্ছেদ প্রয়োজন মতো কেটে বাদ দিলেই কাজ মিটে যায়। কারিগরী কৌশলের দিক থেকে অনুচ্ছেদ ব্যবহারের উপযোগিতা এখানে রয়েছে। অনুচ্ছেদ গঠনের উদাহরণ নীচে দেওয়া হল।

> রিভলভার ঠেকিয়ে এবার পুলিসেরই মোটরসাইকেল ছিনতাই করল দুষ্কৃতীরা। রবিবার সন্ধ্যায় জনবহুল যশোহর রোডের ওপরে এই ঘটনাটি ঘটলেও সোমবার রাত পর্যন্ত পুলিস এই ব্যাপারে কোনও কিনারা করতে পারেনি। দমদম থানার ম্যাগাজিন আবাসনের কাছে যশোহর রোডের উপরে ছিনতাইয়ের এই ঘটনা ঘটে। ওই পুলিসকর্মী সাদা পোষাকে ছিলেন। যে ভাবে

তাঁর বাইকটি ছিনতাই করা হয়েছে তাতে ইতিমধ্যেই নানা প্রশ্ন উঠেছে। রবিবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা নাগাদ লেক টাউন থানার সাদা পোশাকের পুলিস বাহিনীর (পিসিপার্টি) কনস্টেবল অরুণ সরকার ডিউটি সেরে মোটর সাইকেলে বাড়ি ফিরছিলেন। তাঁর বাড়ি গোরাবাজার এলাকায়। পুলিস জানায়, তিনি গত সাত আট বছর দমদম ফাঁড়িতে ছিলেন। এক পুলিস কর্তা বলেন, অরুণবাবু পুলিসকে জানিয়েছেন, মাঝপথে ম্যাগাজিন আবাসনের সামনে তাঁর মোটর সাইকেলের সামনে একটি লরি চলে এলে তিনি গতি আস্তে করে দেন। ততক্ষণে একটি অটোরিকশা তাঁকে পেরিয়ে একেবারে সামনে এসে দাঁড়ায়। নিমেষে অটোরিকশা থেকে দু'জন যুবক নেমে আসে ও অরুণবাবু কিছু বুঝবার আগেই তাঁর কপালে রিভলবার ঠেকিয়ে দেয়। প্রাণভয়ে অরুণবাবু মোটর সাইকেল থেকে নেমে আসেন। দুস্কৃতীরা এর পরে অটোরিকশা ছেড়ে ওই মোটর সাইকেল নিয়ে চম্পট দেয়। তাঁর মোবাইল ফোনটিও ছিনিয়ে নেয় তারা। এই খবর জানাজানি হওয়ার পরেই দমদম ও লেকটাউন থানার অফিসারেরা ঘটনাস্থলে যান। এখনও দুস্কৃতীদের হদিশ মেলেনি।

সংবাদটি সম্পাদনার সময় যদি ক'টি অনুচ্ছেদে ভাগ হয়ে পরিবেশিত হয় তাহলে পাঠকের পড়তে ও বিষয়টি বুঝতে সুবিধা হবে। নিচে করে দেখানো হল ঃ

[রিভলবার ঠেকিয়ে..
....
....কিনারা করতে পারেনি।

[দমদম থানার ম্যাগাজিনে আবাসনের ....
....
....
....
.... প্রশ্ন উঠেছে।

[রবিবার সন্ধ্যা সাড়ে ৬টা..
....
....

....

.... গোরাবাজার এলাকায়।

পুলিশ জানায় ....

....

....

....

.... হদিস মেলেনি।

১১৭.১০ সারাংশ

সম্পাদনায় চিহ্নের ব্যবহার হয়। সাংকেতিক চিহ্নগুলি সম্পাদক দেন তাঁর নির্দেশ কম্পোজিটারকে বোঝাতে। যেমন অনুচ্ছেদ দেবার জন্য [এই চিহ্নটি দিলেই কম্পোজিটর অনুচ্ছেদ দিয়ে দেবেন। বিভিন্ন চিহ্ন রয়েছে, প্রয়োজন মতো এগুলি অবর-সম্পাদকেরা কপির ওপর প্রয়োগ করে সম্পাদনা করেন।

অনুচ্ছেদ যে কোন রচনার বিন্যাসকে সুসংহত করে তোলে। অনুচ্ছেদের প্রয়োগ দুটি দিক থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এক, বিষয়-ভাবনাকে সুন্দরভাবে মেলে ধরবার জন্য। পরতে পরতে যেমন ফুল প্রস্ফুটিত হয় তেমনি বহু অনুচ্ছেদের মাধ্যমে ফুটে উঠবে সামগ্রিক বিষয়-ভাবনা। দুই হল পৃষ্ঠাসজ্জাকে নান্দনিক এবং কারিগরী উপযোগিতার দিক থেকে সার্থক করে তোলা। বৈচিত্র্য আনার জন্য অনুচ্ছেদের মাপও বিভিন্ন রকম করা হয়।

১১৭.১১ অনুশীলনী—৩

১) সম্পাদনা চিহ্নের উপযোগীতা কী? সংক্ষেপে বর্ণনা কর।

২) অনুচ্ছেদ কীভাবে সংবাদ পরিবেশনকে সার্থক করে তোলে? অনুচ্ছেদের আয়তন সমান হওয়া কী বাঞ্ছনীয়? যুক্তিসহ উত্তর দাও।

১১৭.১২ মূলপাঠ—৪ ঃ টাইপসজ্জা ও মার্জিন, শিরোনাম, উপশিরোনাম

টাইপসজ্জা ঃ ছাপা লেখা তৈরি হয় টাইপ দিয়ে। বিভিন্ন মাপের এবং ধরনের টাইপ ব্যবহার করে মুদ্রণকে অভিনব ও দৃষ্টিনন্দন করে তোলা হয়। ছাপতে গেলেও সাজাতে হয়। যা ছাপা হবে

তা যাতে সুন্দর ও আকর্ষণীয় হয়ে ওঠে তার জন্য পরিকল্পিত প্রয়াসের প্রয়োজন। এই প্রয়াসের অন্যতম অঙ্গ হল টাইপসজ্জা। কোন রচনায় কী টাইপ ব্যবহার হবে, তার সাইজ ও ধরন কেমন হবে তা নির্ধারণ করেই টাইপ সজ্জার রূপরেখা তৈরি করা হয়।

একজন দক্ষ অবর-সম্পাদককে টাইপসজ্জা সম্পর্কে বিস্তারিত জানতে হবে। শিরোনাম ও সংবাদ একই মাপের অক্ষরে হয় না। শিরোনামের মাপ হয় অনেক বড়। সংবাদের অক্ষর হয় অনেক ছোট। আবার অনেকসময় সংবাদের সূচনা তৈরি হয় বোল্ড ফেসে। অক্ষরগুলো বেশ ঘন কালো থাকে। কোথায় কী হবে সেটা নির্দেশ করে দেওয়া দরকার। সম্পাদনার সময় অবর-সম্পাদকই এগুলো ঠিক করেন। প্রয়োজন হলে প্রেসে গিয়ে সেখানকার লোকেদের সঙ্গে কথা বলে সিদ্ধান্ত রূপায়ণ করতে হয়।

ইংরেজিতে টাইপ ফেস দুরকম—সেরিফ ও সান্স। সেরিফ একটু সূক্ষ্ম রেখা বিশিষ্ট, সান্সে কোন সূক্ষ্মতা নেই। ‘সান্স’ টাইপ একটু মোটা, ভোঁতা ধরনের। ‘স্টেটসম্যানে’র টাইপ ‘সেরিফ’, নাম সেঞ্চুরি। ‘হিন্দু’র টাইপ ‘সান্স’, নাম হেলভেটিকা।

টাইপের মাপকে পয়েন্ট বলে। সাধারণত ১ ইঞ্চির ১/৭২ অংশ হল ১ পয়েন্ট। এই মাপ অনুসারে টাইপ ৫১/২, ৬, ৭, ৮, ১০, ১২, ১৪, ১৮, ২৪, ৩০, ৩৬, ৪২, ৪৮, ৬০, ৭২ পয়েন্ট পর্যন্ত হতে পারে। ৭২ পয়েন্ট হল ১ ইঞ্চি। এর চেয়ে বড় হরফের দরকার পড়লে ক্যামেরার সাহায্যে বড় করে নেওয়া যায়।

টাইপের আয়তনও গুরুত্বপূর্ণ। সব টাইপের আয়তন একই রকম হয় না। আয়তনের হিসেব হল ১ ইউনিট। AB হল ১ ইউনিট। বাংলায় ক, খ হল ১ ইউনিট। MW ঝঞ হল ১১/২ ইউনিট। ইংরেজি I, দাঁড়ি, কমা, সেমিকোলন প্রভৃতি হল ১/২ ইউনিট।

টাইপের তিনটি পরিবার আছে। এগুলি হল আদল (face), শ্রেণি (font) এবং পরিবার (family)। আদল হচ্ছে বিভিন্ন ধরনের নক্সা। শ্রেণি হচ্ছে অক্ষরের একটি বিশেষ ধরনের নক্সার সামগ্রিক রূপ। আর পরিবার হল একই শ্রেণির বিচিত্র অক্ষরের সমষ্টি। যেমন হাল্কা (light), ছড়ানো (expanded) মধ্যম (medium), স্থূল (bold), ঘনসন্নিবিষ্ট (condensed), বাঁকা (italic) ইত্যাদি বিচিত্র রকমের টাইপ হতে পারে।

টাইপের প্রস্থ মাপা হয় পয়েন্ট দিয়ে। তবে বলার সময় বলা হয় ‘এম’। একটি ইংরেজি ‘এম’ অক্ষর বারো পয়েন্টের। এর অপর নাম হল ‘পাইকা এম’। ‘এম’ দেখতে চৌকো। তাই এর মাপ হল ১২ × ১২ = ১৪৪ বর্গ বিন্দু। অক্ষর দিয়ে লেখা সাজানোর সময় এইসব হিসেব বিবেচনার মধ্যে রাখা দরকার। একটি রচনাকে দৃষ্টিনন্দন করে উপস্থাপনার ব্যাপারে টাইপ সজ্জার ভূমিকা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ।

মার্জিন ঃ লক্ষ করলে দেখা যাবে যে কোন মুদ্রিত রচনার দুই প্রান্তে সাদা অংশ থাকে। এই সাদা অংশকেই বলে মার্জিন। কম্পোজ করার সময় উভয় দিকের মার্জিন সমান রাখা হয়। মার্জিনের সাদা অংশ পাঠযোগ্যতা বাড়িয়ে দেয়। পাঠক তর তর করে পড়ে যেতে পারে। এক লাইন থেকে আরেক লাইনে অনেক সহজে এগোন যায়। খবরের কাগজে সাধারণত কলামের মধ্যে সমান মাপের লাইন সাজানো থাকে। মার্জিন থেকে মার্জিন মেপে লাইনের মাপ করতে হয়। কলামেরও একটি নির্দিষ্ট মাপ থাকে। কলামের দুদিকে সামান্য সাদা অংশের মার্জিন রেখে লাইনগুলি বসাতে হয়। কলামের প্রস্থ যদি ১২ এম হয় তাহলে লাইনের মাপ হবে ১১½ এম। হাফ এম জায়গা বন্টিত হবে দুদিকে। যে কোন রচনার পাঠযোগ্যতা বাড়াতে ও উপস্থাপনাকে দৃষ্টিনন্দন করতে মার্জিনের যথেষ্ট গুরুত্ব রয়েছে। কম্পোজ হবার পর অবর-সম্পাদককে এই মার্জিনের ব্যবহার যথাযথ হয়েছে কিনা তা খতিয়ে দেখতে হয়।

শিরোনাম ঃ সংবাদ পরিবেশনে শিরোনাম খুবই গুরুত্বপূর্ণ। সংবাদের নির্যাসটুকু ধরা থাকে শিরোনামে। পাঠক কাগজে চোখ রেখে প্রথমেই দেখেন শিরোনাম। যাঁর পুরো সংবাদ পড়ার সময় নেই তিনি শিরোনাম দেখেই জানতে পারেন দিনের খবর কী। শিরোনামের মধ্যেই সংবাদের মূল বিষয়টি ধরা থাকে। দেখলেই বোঝা যায় কী ঘটেছে।

সংবাদপত্র প্রকাশনার প্রথম যুগে শিরোনামের ব্যবহার ছিল না। সে সময় কাগজে পরপর সাজানো থাকত কিছু লেখা। সংবাদের ওপরে থাকত কেবলমাত্র লেবেল। ওষুধের শিশির পরিচিতির মতো। লেবেল দেখে আভাষ পাওয়া যেত সংবাদ কাহিনীর বিষয়বস্তুর। এ ছাড়া একটা লেখার সঙ্গে আরেকটি লেখার কোন পার্থক্যও করা যেত না। পর পর সংবাদ পড়ে যাওয়া ছাড়া অন্য কোন উপায় ছিল না পাঠকের কাছে।

শিরোনামের চল শুরু হয় মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে উনিশ শতকের মধ্যভাগে। গৃহযুদ্ধের খবরকে, মেক্সিকো যুদ্ধের সংবাদকে তাড়াতাড়ি পাঠকের কাছে পৌঁছে দেবার জন্য শিরোনাম ব্যবহৃত হতে থাকে সংবাদপত্রে। এরপর আসে হলুদ সাংবাদিকতার যুগ। হলুদ সাংবাদিকতা বলতে বোঝায় চাঞ্চল্যকর সাংবাদিকতা। নাটকীয়ভাবে, চমকসৃষ্টি করে সংবাদ পরিবেশন করা শুরু হয় এই সময়ে। খুব স্বাভাবিকভাবেই বড় শিরোনামের প্রচলন হয় দ্রুত পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করার জন্য। বিশ শতকে প্রথম বিশ্বযুদ্ধ ও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শিরোনামকে আরও জনপ্রিয় করে এবং শিরোনাম প্রতিদিনের সাংবাদিকতার অপরিহার্য অঙ্গ হয়ে দাঁড়ায়। বর্তমানে শিরোনামই সংবাদপত্রের প্রাথমিক পরিচয়। পাঠক কাগজ হাতে নিয়ে প্রথমেই চোখ বোলান শিরোনামে, যা নাটকীয়ভাবে চমক দিয়ে ঘোষণা করে দিনের গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ।

সংবাদের গুরুত্ব অনুযায়ী শিরোনাম তৈরি হয়। প্রথম পাতায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংবাদের শিরোনাম সবচেয়ে বড় আকারে থাকে। আট, সাত অথবা ছ-কলাম জায়গা নিয়ে খুব বড় হরফে ছাপা হয় দিনের সবচেয়ে বড় খবর। তারপর সংবাদের গুরুত্ব অনুযায়ী শিরোনামের আয়তন ছোট হতে থাকে। বিভিন্ন মাপের শিরোনাম পাঠককে বলে দেয় কোন্‌টি আগে পড়তে হবে। কেবলমাত্র শিরোনামে চোখ বুলিয়েই পাঠক বেছে নিতে পারেন তাঁর পছন্দের সংবাদটি। শিরোনামের এই কাজটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। একে বলে সূচি (indexing) তৈরি করে দেওয়ার কাজ। সংবাদ পাঠে শিরোনাম পাঠকের সহায়ক হয়ে ওঠে।

একটা পাতায় অনেকগুলি সংবাদ থাকে। প্রতিটি সংবাদের থাকে একটি করে শিরোনাম যা বিভিন্ন সংবাদের মধ্যে বিভাজন তৈরি করে। খুব সহজে পাঠক একটি সংবাদকে আলাদাভাবে চিনতে পারে। এই স্বাতন্ত্রের মাধ্যমে পৃষ্ঠা সজ্জায় আসে বৈচিত্র। অঙ্গসজ্জাকে মনোরম ও দৃষ্টিনন্দন করে গড়ে তোলে। সব শিরোনামের চেহারা একরকম হয় না। বিভিন্ন ধরনের শিরোনাম একটি পৃষ্ঠায় ব্যবহৃত হতে পারে। কী ধরনের শিরোনামে ব্যবহার হবে তা নির্ধারিত হবে সম্পাদনার সময়।

বিভিন্ন রকমের শিরোনাম ঃ শিরোনামের একটি জনপ্রিয় রূপ হল বাম স্পর্শক (Flush left)। সাধারণত দুই বা তিন লাইনের মধ্যে এই শিরোনাম তৈরি হয়। প্রতিটি লাইন বাঁ দিকের স্তম্ভরেখা থেকে শুরু হয়ে ডান দিকে যে-কোনো জায়গায় শেষ হয়। তবে অবশ্যই কলামের নির্দিষ্ট জায়গার মধ্যে। বিন্যাসের জোর থাকে বাঁদিকে।

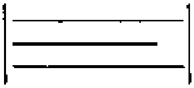

আর একটি শিরোনাম হল দক্ষিণ বাম স্পর্শক (Flush right and left)। এই শিরোনাম দুই তিন বা চার লাইন বিশিষ্ট হয়। দু দিকের স্তম্ভ রেখার পাশে সমান সাদা জায়গা ছেড়ে লাইনগুলি সাজানো হয়। সমান সাদা জায়গা একটি ভারসাম্য নিয়ে আসে এবং দৃষ্টি আবদ্ধ করে মাঝখানের উপস্থাপিত লাইনে।

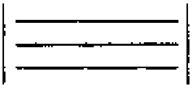

বহুল প্রচলিত একটি শিরোনাম হল উল্টো পিরামিড। সাধারণত দুই, তিন, লাইন দিয়ে তৈরি হয়। প্রথম লাইনটি এক দিকের স্তম্ভ রেখা থেকে বিপরীত দিকের স্তম্ভ রেখা পর্যন্ত প্রসারিত হয়। পরের লাইনগুলো প্রস্থে ছোট হতে থাকে। নীচের দিকটা ক্রমশ ছুঁচলো হওয়ার ফলে উল্টো পিরামিডের আকৃতি নেয়।

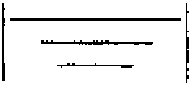

শিরোনামের আর একটি রূপ হল ওয়েস্ট লাইন। তিনটি লাইন অবশ্যই এখানে থাকবে। প্রথম

ও তৃতীয় লাইনটি সমান আকারের হবে। দ্বিতীয় লাইনটি ছোট হবে এবং বাঁ দিকে, ডানদিকে সমান ফাঁক রেখে মধ্যিখানে বসবে। কোমরের সঙ্গে সাদৃশ্য আছে বলে এর নাম ওয়েস্ট লাইন।

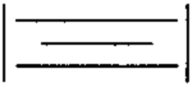

অন্য একটি শিরোনাম হল স্ট্র্যাপ লাইন। মূল শিরোনামের ওপরে ফিতের মতো একটি লাইন রাখা হয়। লাইনটি বাঁদিক, ডানদিক অথবা মাঝখানে বসতে পারে। এর অপর নাম ওভারলাইন অথবা শোল্ডার। ওপরের লাইনটির মাপ মূল শিরোনামের চেয়ে ছোট হবে। মূল শিরোনামের মাপ যদি হয় ৪৮ পয়েন্ট, তাহলে স্ট্র্যাপ লাইনের মাপ হবে ২৪ পয়েন্ট।

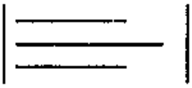

ক্রশ লাইন হল শিরোনামের আর একটি রূপ। একটিমাত্র লাইন নিয়ে গঠিত হয়। কলামের এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত বিস্তৃত হয়। সাধারণত তিন, চার কলাম জায়গা নিয়ে বিন্যস্ত হয়। কলামের দুদিকে সামান্য ফাঁক থাকে।

অনেক সময় খুব গুরুত্বপূর্ণ সংবাদের জন্য আট কলাম জুড়ে শিরোনাম তৈরি হয়। একে বলে ব্যানার শিরোনাম। বড় খবর হলে সারা পাতা জুড়ে এমন শিরোনাম তৈরি করা হয়।

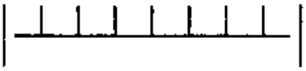

শিরোনাম রচনা ঃ শিরোনাম লেখা হয় সম্পাদনার সময়। জায়গা বুঝে অবর-সম্পাদক সংবাদের মূল বিষয়টি আশ্রয় করে শিরোনাম রচনা করবেন। রিপোর্টার অথবা প্রতিবেদক সংবাদ প্রতিবেদন লেখেন, কিন্তু ঐ প্রতিবেদনের শিরোনাম দেন অবর-সম্পাদক। অবর সম্পাদক সংবাদ প্রতিবেদনটি ঘষামাজা করে ছাপার উপযুক্ত করে যখন গড়ে তোলেন, তখনই জুড়ে দেন একটি উপযুক্ত শিরোনাম।

শিরোনাম রচনায় শব্দের ব্যবহার অত্যন্ত দক্ষতা ও বিবেচনার সঙ্গে করা দরকার। অল্পকথায় সঠিক শব্দচয়ন শিরোনামকে সার্থক করে তোলে। এমন শব্দ নির্বাচন করতে হবে যা সংবাদের বিষয়কে যথাযথভাবে তার রূপ ও ভাব বজায় রেখে প্রকাশ করতে পারে। ঠিক যা ঘটেছে তা ঘটনার মেজাজটুকুসহ পাঠকের কাছে পৌঁছে দিতে হবে। সহজ ছোট শব্দ দিয়ে কাজ সারতে হবে। সোজাসুজি বিষয়টি পৌঁছে দেওয়া দরকার পাঠককে। উপমা, রূপক, অলংকারের ব্যবহার একেবারেই চলবে না। তাহলে কথার ভারে আসল বক্তব্য গুলিয়ে যাবে। একটি ঘটনার মধ্যে থাকে নাটকীয়তা, অভিনবত্ব ও চমক। শিরোনামে এই মেজাজটা ধরে রাখা দরকার।

খবর হল প্রধানত ঘটনা। একটা ঘটনা ঘটেছে, এই ঘটনার ক্রিয়াশীলতা উপস্থিত থাকবে শিরোনামে। 'মানুষ কুকুরকে কামড়েছে' হল একটি দারুণ খবর। এই খবরে 'কামড়েছে' ক্রিয়াপদটি আছে বলে শিরোনামটি হয়েছে জোরালো। কোন ঘটনার কথা বলতে গেলে ঘটনাটি ঘটার কথা অনিবার্যভাবে আসবে। সে দুর্ঘটনা হোক অথবা সামরিক অভ্যুত্থান হোক, যাই ঘটুক না কেন তা সঠিকভাবে বলতে গেলে ক্রিয়াপদের সঠিক ব্যবহার করতেই হবে। একটি ঘটনার প্রকৃত তাৎপর্য-ক্রিয়াপদের মাধ্যমেই তুলে ধরা যায়।

শিরোনামে যে ক্রিয়াপদ ব্যবহৃত হয় তার রূপ হয় বর্তমান কালের। আজকে যা ছাপা হচ্ছে তা কালকের ঘটনা। স্বভাবতই অতীতকালের ক্রিয়াপদ ব্যবহার হওয়াই বাঞ্ছনীয়। কিন্তু ব্যবহৃত হচ্ছে বর্তমান কালের ক্রিয়াপদ। প্রশ্ন উঠতে পারে কেন? একটু ভেবে দেখুন একটা খবর পাঠক যখন পাচ্ছে তখনও সেটা টাটকা ও তাজা। এইমাত্র পাঠক জানলো কী ঘটেছে। এই তরতাজা টাটকা ভাবটি ধরে রাখার জন্যই বর্তমান কালের ক্রিয়াপদ ব্যবহার করা হয়। পাঠকের কাছে এই বার্তা পৌঁছে দিতে হবে যে ঘটনাটি এইমাত্র ঘটেছে। অনেক সময় ক্রিয়াপদ উহ্য রাখা হয়। যেমন 'শুরুতেই অঘটন', এই শিরোনামে ক্রিয়াপদটি উহ্য রয়েছে। 'ঘটলো' এই ক্রিয়াপদটি পাঠক বুঝে নেবে এমনটা ধরে নিয়েই শিরোনামটি তৈরি করা হয়েছে।

মন্তব্য থাকবে না শিরোনামে, থাকবে শুধু খবর। যথাসম্ভব বস্তুনিষ্ঠা বজায় রেখে শিরোনাম লিখতে হবে। মন্তব্য পক্ষপাতের অবতারণা করে। পাঠকরা খবর চায়, মতামত চায় না। শিরোনামে যদি মন্তব্য থাকে তাহলে পাঠকরা বুঝবে জোর করে পাঠকের মতামতকে প্রভাবিত করার চেষ্টা হচ্ছে। এতে কাগজের বিশ্বাসযোগ্যতা কমবে, নিরপেক্ষ চরিত্র ক্ষুণ্ণ হবে।

অনেক সময় শিরোনামে কোটেশন ব্যবহার করা হয়। যদি কারোর উক্তি ঢোকানো হয়, তাহলে কোটেশন ব্যবহার করা উচিত। সন্দেহ থাকলেও কোটেশন ব্যবহার হতে পারে। যেমন কোন মন্ত্রীর মেয়ে আত্মহত্যা করেছে এমন খবর এসেছে। পুলিশ কিন্তু আত্মহত্যার কথা বলছে না। কিন্তু বিভিন্ন সূত্র থেকে জানা যাচ্ছে এটা আত্মহত্যার ঘটনা। সন্দেহ থেকে যাচ্ছে তাই কোটেশন দিয়ে "মন্ত্রীর মেয়ের আত্মহত্যা" শিরোনাম তৈরি করা যেতে পারে।

উপ-শিরোনাম ঃ সংবাদের দুটি অনুচ্ছেদের মধ্যে বসে এই শিরোনাম। একটি নতুন প্রসঙ্গ অথবা বিষয়ের অবতারণা করার সময় এই উপ-শিরোনাম ব্যবহার করা হয়। পাঠককে সংবাদের বিষয়বস্তু ভালভাবে বোঝানোর জন্যই এই শিরোনাম দেওয়া হয়। একটি নিবন্ধ রচনার ক্ষেত্রেও এইরকম শিরোনাম দেওয়ার প্রয়োজন হয়। একটি বিষয়ের সঙ্গে নানান প্রসঙ্গ জড়িয়ে থাকে। কোন নতুন প্রসঙ্গে যাবার সময় উপ-শিরোনাম দিয়ে শুরু করা ভাল।

উপ-শিরোনাম পাঠকের চোখকে বিশ্রামও দেয়। লম্বা লেখার মধ্যে উপ-শিরোনাম মরুদ্যান হয়ে ওঠে। ঘন অক্ষরের ধূসরতা ভেঙে স্বস্তি দেয় পাঠককে। লাইনের মাঝখানে এমনভাবে সেট করা হয় যাতে লাইনের দুপাশে সমান বেশি সাদা জায়গা থাকে। খুব অল্প শব্দে লিখতে হয় এই শিরোনাম। কারণ জায়গা থাকে খুব কম। উপশিরোনাম দু'ধরনের হয়। সেন্টারড হেড এবং সাইড হেড। কলামের মাঝখানে বসলে সেন্টারড এবং বাঁদিক বা ডানদিক চেপে বসলে সাইড হেড। ঘন ঘন উপশিরোনাম দেওয়া ঠিক নয়। চার-পাঁচ অনুচ্ছেদ অন্তর একটি করে উপশিরোনাম দেওয়া যেতে পারে।

১১৭.১৩ সারাংশ

সম্পাদনার অন্যতম উপাদান হল টাইপসজ্জা। ছাপার কাজে বিভিন্ন ধরনের ও মাপের টাইপ ব্যবহার করা হয়। টাইপের মাপ হয় বিভিন্ন রকমের। ৬ থেকে ৭২ পয়েন্ট পর্যন্ত মাপ হতে পারে। বর্তমানে কমপিউটার স্ক্রীনে যে কোন মাপের টাইপ তৈরি করা সম্ভব। টাইপের পরিবার সম্পর্কেও বিস্তারিত জানা প্রয়োজন। সম্পাদনার সময় কী মাপের এবং কোন ধরনের টাইপ ব্যবহৃত হবে তা নির্দেশ করতে হয়।

মার্জিন যথাযথ হয়েছে কিনা সেটা দেখাও জরুরি। সাদা অংশ অঙ্গসজ্জাকে সুন্দর করে তোলে। এক লাইন থেকে আরেক লাইনে যেতে সুবিধা হয় এই মার্জিনের জন্য।

শিরোনাম সম্পাদনা আর একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যে কোন রচনার একটি শিরোনাম থাকে। বিশেষ করে সংবাদপত্র ও সাময়িকপত্রে শিরোনাম সংবাদের মূল বিষয়কে অল্প কথায় একেবারে প্রথমেই প্রকাশ করে। পাঠক শিরোনাম পড়েই জেনে যায় সংবাদের মূল বিষয়। শিরোনামের সূচনা হয়েছিল মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে। তারপর বিভিন্ন পর্যায়ের মধ্যে দিয়ে শিরোনাম বিবর্তিত হয়েছে। বর্তমানে পাঠক কাগজ হাতে নিয়ে প্রথমেই দেখেন শিরোনাম।

শিরোনাম পাঠককে তার পছন্দের বিষয়টি খুঁজে নিতে সাহায্য করে। একে বলে শিরোনামের সূচিপত্রের কাজ। বড় শিরোনাম মানেই বড় খবর, ছোট শিরোনাম মানে কম গুরুত্বপূর্ণ খবর। বিভিন্ন ধরনের শিরোনাম খবরের কাগজে ব্যবহৃত হয়। এদের আলাদা আলাদা নাম আছে।

শিরোনাম রচনায় অবর-সম্পাদককে দেখতে হবে যাতে সংবাদের বিষয় ঠিকঠাকভাবে প্রকাশিত হয় শিরোনামে। অল্প কথায়, সঠিক শব্দ প্রয়োগে ও ক্রিয়াপদের ব্যবহারে নাটকীয় মুহূর্তকে ধরতে হবে। কোনরকম পক্ষপাত রাখা চলবে না। মতামত দেওয়াও ঠিক নয় শিরোনামে। অনেক সময় বিষয়কে ভালভাবে বোঝানোর জন্য ও পাঠযোগ্যতা বাড়াবার জন্য উপ-শিরোনাম ব্যবহার করা হয়।

১১৭.১৪ অনুশীলনী—৪

১। **শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ**

(ক) .... ও .... একই মাপের হয় না।

(খ) ইংরেজিতে টাইপ ফেস দু'রকম .... ও ....।

(গ) .... সাদা অংশ .... বাড়িয়ে দেয়।

(ঘ) .... নির্যাসটুকু ধরা থাকে ....।

(ঙ) .... চল সুরু হয় .... শতকের মধ্যভাগে।

২। সেরিফ আর সান্স টাইপের পার্থক্য সংক্ষেপে বুঝিয়ে দিন।

৩। তিন ধরনের টাইপ-এর সাধারণ পরিচয় দিন।

৪। সংবাদপত্রের টাইপ সজ্জার বিভিন্ন দিক সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৫। হলুদ সাংবাদিকতার অর্থ ও তাৎপর্য বুঝিয়ে দিন।

৬। সংবাদের শিরোনাম রচনার প্রয়োজনীয়তা বুঝিয়ে দিন।

১১৭.১৫ মূলপাঠ—৫ ঃ অঙ্গসজ্জা বিভিন্নরূপ

অঙ্গসজ্জা ঃ সম্পাদনার কাজের সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকা একটি অনিবার্য অনুষঙ্গ হল অঙ্গসজ্জা। একটি পাতায় যে লেখাগুলো ছাপা হবে সেগুলোকে সাজাতে হয়। এলোমেলো করে খুশীমত সাজালে হবে না, পাঠোপযোগী ও দৃষ্টিনন্দন করে সংবাদগুলিকে পরিবেশন করতে হবে। ছবি, শিরোনামের বৈচিত্র্য, কার্টুন, রুল প্রভৃতির সমন্বয়ে একটি পৃষ্ঠার অঙ্গসজ্জা করা হয়। একটি কাগজের যদি ১২টি পৃষ্ঠা থাকে তাহলে প্রত্যেকটি পৃষ্ঠাকে আলাদাভাবে সাজাতে হবে। যেমন প্রথম পৃষ্ঠায় সাধারণত ৭ থেকে ৮টি সংবাদ কাহিনী থাকে। বড় ছবি থাকলে সংবাদ কাহিনী ৬-য়ে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে। বিজ্ঞাপন বাদ দিয়ে যে জায়গা থাকে সেখানেই অঙ্গসজ্জা করতে হয়। প্রথম পৃষ্ঠার অঙ্গসজ্জাই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এই পৃষ্ঠাই হল সংবাদপত্রের প্রাথমিক পরিচয়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ ও ছবি এই পাতাতেই থাকে।

প্রথম পাতায় সব সংবাদের জায়গা হয় না। সবচেয়ে বড় খবরকে প্রথম পাতায় এনে বাকী খবরকে

নিয়ে যাওয়া হয় ভিতরের পাতায়। তবে সবসময় চেষ্টা করা হয় যাতে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ খবর প্রথম পাতায় জায়গা পায়। খেলাধূলা, বাণিজ্য, সংস্কৃতি প্রভৃতি বিষয়ের জন্য আলাদা পাতা থাকে। ঐ সব পাতায় সংশ্লিষ্ট বিষয়গুলিকে নিয়ে যাওয়া হয়। সম্পাদকীয় মতামতের জন্য আলাদা একটি পাতা থাকে। সেখানে সম্পাদকীয় নিবন্ধ ও উত্তর সম্পাদকীয়, চিঠিপত্র প্রভৃতি বিষয় ছাপা হয়। উত্তর সম্পাদকীয় হল সম্পাদকীয় নিবন্ধের পরে মধ্যবর্তী জায়গায় যে রচনা প্রকাশিত হয়।

পৃষ্ঠাসজ্জার কাজ শুরু হয় ডামি শিটের ওপর। ডামি শিট হল কাগজের পাতার একটি নকল রূপ। কাগজের মাপ, কলামের মাপ সবই উল্লিখিত থাকে এই শিটে। বিজ্ঞাপন বিভাগ থেকে এই ডামি শিট এনে পৌঁছয় সম্পাদকীয় বিভাগে। যে সব জায়গায় বিজ্ঞাপন ছাপা হবে সেসব জায়গায় চিহ্ন দিয়ে বিজ্ঞাপনের জায়গা বুক করা থাকে। সম্পাদনার দায়িত্বে থাকা বার্তা সম্পাদক, মুখ্য অবর-সম্পাদক বিজ্ঞাপন নির্দিষ্ট জায়গা বাদ দিয়ে যে জায়গা থাকে সেখানে বিভিন্ন সংবাদকে সাজান। কলাম, সেন্টিমিটার নির্দেশ করে এক একটি সংবাদকে উপযুক্ত জায়গায় বসিয়ে, ছবির জায়গা নির্দিষ্ট করে, রুল বক্স কোথায় কী বসবে তা নির্ধারণ করলেই অঙ্গসজ্জার প্রাথমিক কাজটুকু সারা হয়ে যায়। বিভিন্ন সংবাদ একেকরকম আয়তন নিয়ে পরিবেশিত হয়। কোন সংবাদ তিন কলাম জায়গা নিতে পারে, আবার কোন সংবাদ এক কলাম জায়গা নিতে পারে। ছ, সাত কলাম জায়গা নিয়েও সংবাদ পরিবেশিত হয় অনেক সময়। কোন সংবাদ কতটা জায়গা পাবে সম্পাদনার দায়িত্বে থাকা ব্যক্তিরাই ঠিক করেন।

অঙ্গসজ্জার সময় লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে সংবাদের মূল্য সঠিকভাবে প্রকাশিত হয়। সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংবাদকে সবচেয়ে ভাল জায়গায় দিতে হবে। পাঠক চোখ রাখলেই যেন দিনের প্রধান খবরকে খুঁজে পায়। বড় হরফে, বেশি জায়গা নিয়ে এই সংবাদটি পরিবেশিত হবে। এরপর গুরুত্বের ক্রমানুসারে অন্যান্য সংবাদকে সাজাতে হবে। সংবাদ কাহিনীগুলি এমনভাবে উপস্থাপিত হবে যাতে গুরুত্ব অনুধাবন করে খুশীমতো পাঠক সহজে একটি বিষয় থেকে আরেকটি বিষয়ে চলে যেতে পারে। সবচেয়ে বড় কথা অঙ্গসজ্জাকে দৃষ্টিনন্দন করে তুলতে হবে। পাঠক যেন পাতায় চোখ রেখে উপলব্ধি করতে পারে সজ্জাটি সুন্দর ও স্মার্ট।

নীতি ঃ অঙ্গসজ্জার মূল নীতি হল পাঁচটি—ভারসাম্য (balance), কেন্দ্রবিন্দু (focus), বৈপরীত্য (contrast), গতি (movement) এবং একতা (unity)। ভারসাম্যতা দু'ধরনের হতে পারে—বিধিসম্মত ও বিধি বহির্ভূত ভারসাম্যতা। অঙ্গসজ্জায় বিধিসম্মত ভারসাম্য নিয়ে আসা খুবই সহজ। এই সজ্জার মূল কথাই হল পৃষ্ঠার ডানদিক ও বাঁদিক একইভাবে সাজাতে হবে। অর্থাৎ ডানদিকে তিন কলাম সংবাদ থাকলে বাঁদিকেও তিন কলাম সংবাদ রাখতে হবে। একইভাবে ডান ও বাঁদিকে এক কলাম সংবাদ বসবে। ওপর নীচেও সাদৃশ্য থাকা দরকার। তাই ওপর নীচে সমান ওজনের গুরুত্ব দিতে হবে।

বিধিবর্হির্ভূত ভারসাম্যের ক্ষেত্রে এত বাধ্যবাধকতার চাপ নেই। সামগ্রিকভাবে ভারসাম্য নিয়ে আসাটাই বড় কথা। শিরোনাম, কলাম, রুল, ছবি ব্যবহার করে ভারসাম্যের চাহিদা মেটানো যায়। এই ধরনের অঙ্গসজ্জার প্রয়োগ বেশি দেখা যায়।

কেন্দ্রবিন্দুর সঙ্গে ভারসাম্যের সম্পর্ক রয়েছে। ভারসাম্য রক্ষার জন্য একটি কেন্দ্রবিন্দু স্থির করতে হয়। কেন্দ্রবিন্দু স্থলই হবে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ জায়গা। এখানেই থাকবে সবচাইতে গুরুত্বপূর্ণ সংবাদগুলি। পাঠকের দৃষ্টিকে ঠিক জায়গায় নিয়ে যেতে কেন্দ্রবিন্দুর ভূমিকা খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। কেন্দ্রবিন্দুর স্থান একেক কাগজে একেক রকম হয়। কোন কাগজে ডানদিকে থাকে, আবার কোন কাগজে বাঁদিকে থাকে। কেন্দ্রবিন্দু থেকে চোখ ক্রমশ সরে যাবে বিভিন্ন দিকে। চোখের গতি বাঁদিকে ডানদিকে তারপর আস্তে আস্তে নীচের দিকে সরে যায়।

অঙ্গসজ্জায় বৈপরীত্য প্রতিষ্ঠারও প্রয়োজন আছে। নান্দনিক ও কার্যকরী উভয়দিক থেকে বৈপরীত্য অঙ্গসজ্জাকে সফল করে তোলে। দু'রকমের হরফসজ্জা দিয়ে বৈপরীত্য প্রতিষ্ঠা করা যায়। এতে সৌন্দর্যও যেমন বোঝানো যায় তেমনি সংবাদের গুরুত্বের প্রতিও পাঠকের আকর্ষণ ধরে রাখা যায়। ডিসপ্লে ও বডি টাইপ দিয়ে তারতম্য নিয়ে আসা যায়। আবার বোল্ড ফেস ও লাইট ফেস টাইপ দিয়েও বৈপরীত্য আনা যায়। বিভিন্ন মাপের শিরোনাম সহজেই বৈপরীত্য প্রতিষ্ঠা করতে পারে।

যে কোন শিল্পকর্মের সঙ্গে গতির যোগ থাকে। অঙ্গসজ্জাও এক ধরনের শিল্পকর্ম বলা যেতে পারে। তাই অঙ্গসজ্জাতেও গতি আনা প্রয়োজন। পাঠকের দৃষ্টি একটি পাতায় ঘুরে ফিরে সংবাদ খোঁজে। একটি সংবাদের কিছুটা পড়ে অন্য শিরোনামে চোখ চলে যায়। তারপর আবার অন্য সংবাদে। এটা যত সহজে হতে পারবে তত বলা যাবে অঙ্গসজ্জা সফল হয়েছে।

অপর এক অপরিহার্য দিক হল একতা। একই পরিবারের হরফ ব্যবহার করে সহজে একতা নিয়ে আসা যায়। যেমন সেঞ্চুরি বোল্ড টাইপ ব্যবহার করলে একতা প্রতিষ্ঠিত হয়। এতে কাগজের মৌলিকত্ব বজায় থাকে। একেকটি কাগজে একেক ধরনের টাইপ ব্যবহার করা হয়। পাঠক ঐ হরফের সঙ্গে পরিচিত হয়ে যায়। স্টেটস্‌ম্যান ও টেলিগ্রাফ কাগজ বিশেষ একধরনের হরফ ব্যবহার করে। শুধু হরফ দিয়ে নয়। ছবি, রুল ও সংবাদ কাহিনী বিন্যাস দিয়েও এই একতা ধরে রাখা যায়।

অঙ্গসজ্জার বিভিন্ন রূপ ঃ অঙ্গসজ্জারও রকমফের আছে। প্রাথমিকভাবে অঙ্গসজ্জা সমান্তরাল (Horizontal) হতে পারে আবার উলম্ব (Vertical) হতে পারে। সমান্তরাল অঙ্গসজ্জায় মূল ঝোঁক থাকে সংবাদগুলিকে সমান্তরালভাবে পরিবেশন করার দিকে। সংবাদগুলিকে দু-তিন কলামে পরিবেশন করলেই এটা সম্ভব। উলম্ব অঙ্গসজ্জায় মূল ঝোঁকটা থাকে ওপর থেকে নীচে। এমনভাবে বিন্যাস করা হয় যাতে পাঠকের চোখ উলম্বগতিতে অনুসরণ করে।

অঙ্গসজ্জার রূপ অনুযায়ী বেশ কয়েক ধরনের অঙ্গসজ্জা খুবই জনপ্রিয় হয়েছে। এগুলি হল ব্রেস মেক-আপ (Brace make-up), ম্যাগাজিন মেক-আপ (Magazine make-up), সার্কাস লে-আউট (Circus lay-out)। মডুলার লে-আউট (Modular lay-out), ট্যাবলয়েড মেক-আপ (Tabloid make-up)।

ব্রেস মেক-আপে গুরুত্ব দেওয়া হয় পৃষ্ঠার ওপরের ডানদিকের কোণে। অনেকটা হুকের সঙ্গে এর সাদৃশ্য রয়েছে। ম্যাগাজিন মেক-আপ নান্দনিক বোধ প্রতিষ্ঠার ওপর জোর দেয়। সাধারণত সাময়িক পত্রের আদলে এই মেক-আপ তৈরি হয়। সাম্প্রতিককালে এই মেক-আপের জনপ্রিয়তা বৃদ্ধি পাচ্ছে। সার্কাস লে-আউটে বড় শিরোনাম, রঙিন হরফ ও আলোকচিত্রের সাহায্য নেওয়া হয়। বিন্যাসে তিনটি চক্রের একটা আদল উঠে আসে। তিন রিং বিশিষ্ট সার্কাস থেকে এই লে-আউটের উদ্ভব হয়েছে। ওপরের দিকের সজ্জা এমন করা হয় যাতে মনে হয় বড় কিছু ঘটেছে। মডুলার লে-আউটে আয়তক্ষেত্রের মাপে সংবাদ কাহিনীগুলিকে পরিবেশন করা হয়। ধরা যাক, চারটি সংবাদ কাহিনী পৃষ্ঠার চার কোণে দেওয়া হল। আটটি কাহিনীও হতে পারে। লক্ষ্য রাখতে হবে যাতে প্রত্যেকটি আয়তক্ষেত্রই নিজ স্বাতন্ত্র নিয়ে টিকে থাকে। তবেই সামগ্রিকভাবে পৃষ্ঠার একতাকে কখনই নষ্ট করবে না। ট্যাবলয়েড মেক-আপ নাটকীয় পরিবেশনার ওপর বেশি জোর দেয়। ট্যাবলয়েড হল ছোট কাগজ। প্রভাতি সংবাদপত্রের যে মাপ তার অর্দ্ধেক হল ট্যাবলয়েডের মাপ। একদম প্রথম পাতায় ছবি ও সংক্ষিপ্ত বড় শিরোনাম অত্যন্ত আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থিত করা হয়। দেখামাত্রই যেন পাঠকের চোখ আটকে যায়। সাধারণত সান্ধ্য কাগজের মেক-আপ এমন হয়।

অঙ্গসজ্জার সময় কতগুলি সাধারণ সূত্র মেনে রাখতে হবে। এগুলো মনে রাখলে কাজের সুবিধা বেশি। এগুলো হল— (১) কাগজের নাম থাকবে সবচেয়ে উঁচুতে। (২) ওপরের বাঁদিক হল সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ জায়গা। বড় খবর ঐ জায়গাতে রাখাই শ্রেয়। (৩) সংবাদ কাহিনীগুলি গুরুত্ব-অনুযায়ী নিচে নেমে যাবে। (৪) শিরোনামের মাপ ক্রমশ নীচের দিকে ছোট হবে। (৫) একটি শিরোনাম যেন আরেকটি শিরোনামের সঙ্গে মিশে না যায়। সামান্য হলেও বৈপরীত্য রাখতে হবে। (৬) শিরোনাম বিন্যাসে একটু বৈচিত্র্য আনা দরকার। (৭) ছবির ব্যবহার হলে ভাল, কারণ তাতে বডি টাইপের ধূসরতা ভেঙে যায়। (৮) দু-কলামের মধ্যে বেশি সাদা জায়গা রাখা উচিত নয়। সাদা জায়গা কীভাবে ব্যবহার করা হচ্ছে সেদিকে সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে। (৯) উৎকর্ষতার জন্য প্রয়োজনে নিয়ম ভাঙতে হবে, এতে অঙ্গসজ্জার সৃজনশীল দিকটি অটুট থাকে।

১১৭.১৬ সারাংশ

বিভিন্ন সংবাদকে পাঠোপযোগী করে একটি পৃষ্ঠায় সাজাতে হয়। সাজানোর এই প্রক্রিয়াকে বলে অঙ্গসজ্জা। সম্পাদনার একেবারে শেষ স্তর হল অঙ্গসজ্জা। ডামি সীটের ওপর বিভিন্ন মাপের শিরোনাম সহ সংবাদ-কাহিনী, ছবি, রুল, বক্স প্রভৃতির সাহায্যে পৃষ্ঠার অঙ্গসজ্জা তৈরি হয়। সংবাদের গুরুত্ব অনুযায়ী ঠিক হয় কোথায় কোন্ সংবাদ যাবে। দিনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ সংবাদগুলিকে নিয়ে আসা হয় প্রথম পাতায়। আবার তার মধ্য থেকে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ সংবাদকে সবচেয়ে বড় হরফে বেশি জায়গা নিয়ে ওপরের দিকের সহজে চোখে পড়ার মতো জায়গায় রাখা হয়। প্রতিটি পাতাকেই আলাদা করে সাজাতে হয়। অঙ্গসজ্জার কয়েকটি নীতি আছে। এগুলি হল ভারসাম্য, কেন্দ্রবিন্দু, বৈপরীত্য, গতি এবং একতা।

অঙ্গসজ্জার বিভিন্ন রূপ আছে। এক একটির আদল একেক রকমের। কোথাও উলম্ব গতির ওপর জোর দেওয়া হয়, আবার কোথাও সমান্তরাল গতির ওপর প্রাধান্য থাকে। কোন অঙ্গসজ্জায় ওপরের দিকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়। আবার কোন সজ্জায় তিনটি জায়গায় গুরুত্ব সমানভাবে ছড়িয়ে দেওয়া হয়।

অঙ্গসজ্জা কয়েকটি সাধারণ সূত্রের ওপর ভিত্তি করে গড়ে ওঠে। এগুলো মানলে সজ্জা তৈরি করতে সুবিধা বেশি। যেমন কাগজের নাম থাকবে উঁচুতে। বাঁদিকে বড় খবর থাকবে, গুরুত্ব অনুযায়ী খবর নিচের দিকে নামবে। বিন্যাসে বৈচিত্র্য থাকবে। ছবির ব্যবহার হবে ইত্যাদি।

১১৭.১৭ অনুশীলনী (মূলপাঠ—৪ ও ৫)

১। সম্পাদনায় টাইপ সজ্জার গুরুত্ব কী? সংক্ষেপে লিখুন।

২। শিরোনাম কাকে বলে? শিরোনাম কে রচনা করেন? শিরোনাম রচনার কৌশল কী?

৩। বিভিন্ন ধরনের শিরোনাম সম্পর্কে সংক্ষেপে আলোচনা করুন।

৪। সংবাদপত্রের অঙ্গসজ্জা বলতে কী বোঝেন?

৫। অঙ্গসজ্জার মূলনীতিগুলি কী?

৬। অঙ্গসজ্জার উদ্দেশ্য কী? দুটি অঙ্গসজ্জার ধরন সম্পর্কে আলোচনা করুন।

১১৭.১৮ উত্তর সংকেত (অনুশীলনী—১, ২, ৩ ৪)

অনুশীলনী—১

১। (ক) ক্লাস এইট, সংবাদপত্র।

(খ) টেবিল, চেক পয়েন্ট।

(গ) সংক্ষিপ্ততা, সম্পাদনার, গুরুত্বপূর্ণ।

(ঘ) পিরামিড, অনুসরণ, উল্টো পিরামিড।

২। সংবাদ রচনার ভাষা হবে অত্যন্ত সহজ সরল।

৩। 'সম্পাদকীয় নীতি'—প্রাসঙ্গিক আলোচনা অবলম্বনে উত্তর তৈরি করুন।

অনুশীলনী—২

১। 'সূচনা' অংশ অবলম্বনে উত্তর তৈরি করুন।

২। পুনর্লিখন অংশ অবলম্বনে উত্তর প্রস্তুত করুন।

অনুশীলনী—৩

১। 'সম্পাদনা চিহ্ন' উপবিভাগটি ভাল করে পড়ে উত্তর লিখুন।

২। 'অনুচ্ছেদ' সংক্রান্ত প্রাসঙ্গিক আলোচনা অনুসরণে তৈরি করুন।

অনুশীলনী—৪

১। (ক) শিরোনাম, সংবাদ, অক্ষরে।

(খ) সেরিফ, সান্স, (গ) মার্জিনের, পাঠযোগ্যতা, (ঘ) সংবাদের শিরোনামে।

(ঙ) শিরোনামের, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, উনিশ।

২। 'সেরিফ' সূক্ষ্ম রেখাবিশিষ্ট। 'সান্স' একটু মোটা, ভোঁতা।

৩। তিন ধরনের টাইপ সংক্রান্ত আলোচনা অবলম্বনে উত্তর তৈরি করুন।

৪। 'টাইপ সজ্জা' উপবিভাগ অনুসরণে উত্তর প্রস্তুত করতে হবে।

৫। 'শিরোনাম শীর্ষক' আলোচনা অবলম্বনে প্রাসঙ্গিক উত্তর তৈরি করুন।

১১৭.১৯ গ্রন্থপঞ্জি

১। ড. পার্থ চট্টোপাধ্যায় — *বিষয় সাংবাদিকতা*।

২। কৃষ্ণ ধর — *সংবাদ ও সাংবাদিকতা*।

৩। Patanjali Sethi – *Professional Journalism.*

একক ১১৮ ❑ প্রসঙ্গ সম্পাদনা

গঠন

১১৮.১ উদ্দেশ্য

১১৮.২ প্রস্তাবনা

১১৮.৩ মূলপাঠ—১ সম্পাদক ও সম্পাদকীয়

১১৮.৪ সারাংশ

১১৮.৫ অনুশীলনী—১

১১৮.৬ মূলপাঠ—২ গ্রন্থ সম্পাদনা

১১৮.৭ সারাংশ

১১৮.৮ অনুশীলনী—২

১১৮.৯ মূলপাঠ—৩ সাময়িক পত্রিকা সম্পাদনা

১১৮.১০ সারাংশ

১১৮.১১ অনুশীলনী—৩

১১৮.১২ মূলপাঠ—৪ প্রুফরিডিং

১১৮.১৩ সারাংশ

১১৮.১৪ অনুশীলনী—৪

১১৮.১৫ উত্তর-সংকেত (অনুশীলনী—১, ২, ৩, ৪)

১১৮.১৬ গ্রন্থপঞ্জি

১১৮.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পাঠ করে আপনি সম্পাদনা—খবরের কাগজ সম্পাদনা, গ্রন্থ সম্পাদনা ও সাময়িক পত্রিকা সম্পাদনায় সম্পাদক ও সম্পাদনার রীতি-নীতি সম্পর্কে সাধারণভাবে যা জানতে পারবেন তা হল ঃ

- খবরের কাগজের সম্পাদকের দায়িত্ব ও কর্তব্য;
- গ্রন্থ প্রকাশে গ্রন্থ-সম্পাদক ও সম্পাদনার প্রয়োজনীয়তা;
- সাময়িকপত্র প্রকাশে সম্পাদকের ভূমিকা;
- প্রকাশনায় প্রুফ রিডিং কী ও কেন এবং তার প্রয়োজনীয়তা।

১১৮.২ প্রস্তাবনা

একসময় সংবাদ, সাময়িকপত্রে সম্পাদকের একক কৃতিত্ব প্রকাশ পেত। তিনি স্মরণীয় হতেন। ঈশ্বর গুপ্ত, অক্ষয় কুমার দত্ত, বঙ্কিমচন্দ্রের যুগ এখন আর নেই। পরিবর্তে, বর্তমান কালের সংবাদপত্রকে একটি যৌথ প্রকাশনা বলা যায়।

এ যুগে সম্পাদক ক্রমশ সংবাদপত্রের নেপথ্যে চলে গেছেন—প্রাধান্য পাচ্ছেন কয়েক জন সাংবাদিক। বিশেষ কলাম লেখক। কিন্তু সম্পাদক-এর দায়-দায়িত্ব কোন অংশে কমেনি। কারণ আজকের সংবাদপত্র বৃহৎ শিল্পে পরিণত হওয়ায় পত্রিকা পরিচালনায় দায়দায়িত্ব অনেক বেড়েছে। পত্রিকা প্রশাসন আজ বহু শাখায়িত, তার সুষ্ঠু সমন্বয় প্রয়োজন। এই সমন্বয় ও পারস্পরিক সহযোগিতায় একটি পত্রিকা দৈনিক প্রকাশিত হয়। অনেক পাঠকই এর সংবাদ রাখেন না। এককেকটিতে আপনারা সংবাদপত্র সাময়িকপত্র ও গ্রন্থ সম্পাদনায় সম্পাদকের বহুমুখী দায়িত্ব ও কর্তব্যের পরিচয় পাবেন।

১১৮.৩ মূলপাঠ—১ ঃ সম্পাদক ও সম্পাদকীয়

সম্পাদক ঃ আধুনিক সংবাদপত্রে সব সময় সম্পাদককে নিজহাতে সম্পাদকীয় লিখতে হয় না। তবে তিনি সময় করে কোন গুরুত্বপূর্ণ সংবাদের ওপর চিন্তাশীল কোন সম্পাদকীয় লিখলে বিশেষ মর্যাদার অধিকারী হন। সম্পাদকের দেশ-কাল, সমাজ-রাজনীতি-সাংস্কৃতিক প্রতিবেশ, পাঠক রুচি ও জ্ঞানচিত্ত সম্পর্কে গভীর জ্ঞান এবং পত্রিকা পরিচালনা সম্পর্কে প্রশাসনিক দক্ষতা থাকা বাঞ্ছনীয়। সংবাদপত্রের মুদ্রণ ও অঙ্গবিন্যাস সম্পর্কে কারিগরি জ্ঞান, সংবাদপত্রের ভাষা-পরিভাষা, উপস্থাপনার কলা কৌশল অভিজ্ঞতার মধ্য দিয়ে জানতে হয়। সাম্প্রতিক কালের পেশাদার সম্পাদক জনপ্রিয় সাংবাদিক থেকে অনেক সম্পাদক পদে বৃত হওয়ায় লেখার অভিনবত্ব সম্পর্কে সচেতন এবং অবহিত। তিনি দিনে এক বা একাধিকবার বিভাগীয় সম্পাদক সহকর্মীদের নিয়ে বৈঠক করে প্রকাশিত সংবাদের ত্রুটি-বিচ্যুতি অন্য কাগজের সঙ্গে তুলনায় আলোচনা করে। বিগত দিনের সংবাদের প্রয়োজনীয় ‘ফলো-আপ’ ও কাগজের

নীতি পুনরালোচনা করে, পরিশেষে সেদিনের সম্পাদকীয়তে কোন বিষয় গুরুত্ব পাবে এবং সেটি কে লিখবেন তা বলে দেন। সংবাদপত্রের পরিভাষায় এই সম্পাদকীয় লেখককে বলা হয় 'লিডার রাইটার'। তিনি পত্রিকার গ্রন্থাগার থেকে বইপত্র ও পুরনো সংবাদের প্রাসঙ্গিক ক্লিপিংস আনিয়ে রীতিমত পড়াশুনা করে তাঁর সম্পাদকীয় তৈরি করেন। সম্পাদক সবসময় সম্পাদকীয় লেখেন না বলে 'লিডার রাইটার'-এর দায়িত্ব অনেক।

সম্পাদকীয় ঃ খবরের কাগজে শুধু সংবাদ থাকে না। কাগজের নিজস্ব মতামত ও মূল্যায়নও থাকে। একটি আলাদা পৃষ্ঠায় নিবন্ধ আকারে এই মতামত ও মূল্যায়ন প্রকাশিত হয়। পাঁচ, ছশো শব্দের এই নিবন্ধকে বলা হয় সম্পাদকীয় নিবন্ধ। এর গুরুত্ব অপরিসীম। কাগজের নিজস্ব নীতি, স্বাতন্ত্র বিচারবোধ প্রতিফলিত হয় এই প্রবন্ধে। সম্পাদকীয়কে বলা হয় সংবাদপত্রের কণ্ঠস্বর। সংবাদের মধ্যে কাগজের নিজস্বতা সেভাবে ফুটিয়ে তোলার অবকাশ নেই। কিন্তু সম্পাদকীয় নিবন্ধে কাগজ নিজের স্বাতন্ত্র, ব্যক্তিত্বকে ফুটিয়ে তুলতে পারে।

সম্পাদকীয় লেখা হয় সমসাময়িক গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ও বিষয়ের ওপরে। বাজেট পেশ হলে, মন্ত্রীসভার কোন তাৎপর্যপূর্ণ সিদ্ধান্ত গৃহীত হলে, বড় কোন আর্থ-সামাজিক সমস্যা দেখা দিলে অথবা কোন বড় ঘটনা ঘটলে, তার ওপর সম্পাদকীয় নিবন্ধ রচনা করা হয়। এইসব বিষয় ও ঘটনার ওপরে কাগজের নিজস্ব মূল্যায়ন ও বিচারবোধ স্পষ্টভাবে উচ্চারিত হয় এই নিবন্ধে।

সহ-সম্পাদকেরা সম্পাদকীয় লেখার দায়িত্বে থাকেন। সাংবাদিকতার পরিভাষায় বলা হয় লিডার রাইটার। প্রতিদিন সম্পাদক সহ-সম্পাদকদের নিয়ে সভা করে ঠিক করেন কী বিষয়ের ওপর সম্পাদকীয় নিবন্ধ লেখা হবে এবং ঐ লেখার দায়িত্বে কে থাকবেন। মতামতের ও দৃষ্টিভঙ্গীর রূপরেখাও মোটামুটি ঠিক হয়ে যায় এই সভায়। এরপর দায়িত্বপ্রাপ্ত সম্পাদকীয় লেখক নিবন্ধ রচনার কাজ শুরু করেন।

সম্পাদকীয় নিবন্ধের কতকগুলি সাধারণ উদ্দেশ্য থাকে।

উদ্দেশ্য (১) ঃ পাঠককে বিবিধ বিষয় সম্পর্কে অবহিত করা সম্পাদকীয়র অন্যতম উদ্দেশ্য। পরিবেশ সংরক্ষণের ওপরে যদি সম্পাদকীয় নিবন্ধ রচনা হয় তাহলে এই বিষয় সম্পর্কে বিস্তারিত জানার সুযোগ পায়। বহু নতুন তথ্য পাঠকের গোচরে আসে। বিশ্লেষণ যুক্তি ও বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গী পাঠককে নতুন করে ভাবায়, প্রভাবিত করে।

(২) ঃ সম্পাদকীয়র মধ্যে ব্যাখ্যাও থাকে। জটিল বিষয়কে ব্যাখ্যা করে না দিলে পাঠক বুঝবে না। সাংবিধানিক সংকট, আর্থিক নীতির প্রাসঙ্গিকতা ব্যাখ্যা না করলে সাধারণ পাঠক বিষয়টির তাৎপর্য উপলব্ধি করতে পারে না। তাই ব্যাখ্যা করা সম্পাদকীয়র উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায়।

(৩) ঃ অনেকসময় সম্পাদকীয় পাঠকের কাছে সরাসরি আবেদন রাখে। আইন মেনে চলার জন্য ধর্মান্ধতা থেকে দূরে থাকার প্রয়োজনীয়তার ওপর গুরুত্ব দিয়ে আবেদন সম্বৃদ্ধ সম্পাদকীয় নিবন্ধ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। পাঠককে প্রণোদিত করাই এই ধরনের সম্পাদকীয়র উদ্দেশ্য। যে বিষয়ের ওপর আবেদন রাখা হচ্ছে তার কার্যকারীতা ব্যাখ্যা করে বোঝানো হয়।

(৪) ঃ সক্রিয় প্রতিবাদ জানানোও সম্পাদকীয়র অন্যতম উদ্দেশ্য। সরকার যদি কোন ভূল নীতি অনুসরণ করে তাহলে তার বিরুদ্ধে সরব হয় সম্পাদকীয়। কোন অন্যায়, অবিচার ও কেলেংকারী ফাঁস হলে সম্পাদকীয়তে প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়।

(৫) ঃ কাগজের নীতি ও দৃষ্টিভঙ্গীকে সুস্পষ্টভাবে ঘোষণা করাও সম্পাদকীয়র উদ্দেশ্য বলে বিবেচিত হয়। আর্থ-সামাজিক সম্পর্কিত বিষয়ে সংবাদপত্রের দৃষ্টিভঙ্গী ও মতামত কী তা জানা যায় সম্পাদকীয় নিবন্ধ পাঠ করে, উদার অর্থনৈতিক নীতি যখন ঘোষিত হয়েছিল ভারতের সব সংবাদপত্রই সুস্পষ্টভাবে জানিয়েছিল তাদের মতামত। কাগজের নিজস্ব অনুসৃত নীতিকে অনুসরণ করেই এই মতামত গড়ে উঠেছিল। বিলগ্নীকরণ, বাবরি মসজিদ বিতর্ক প্রভৃতি বিষয়ে যে সমস্ত সম্পাদকীয় নিবন্ধ রচিত হয়েছে তাতে বোঝা গেছে বিভিন্ন সংবাদপত্রের দৃষ্টিভঙ্গী কী। আর এই দৃষ্টিভঙ্গীর মধ্যেই প্রতিফলিত হয়েছে সংবাদপত্রের নীতি।

সম্পাদকীয় লেখার সময় প্রথমেই যে বিষয়টি লেখা হচ্ছে তা পাঠককে ধরিয়ে দিতে হবে। সাধারণত দু-একদিন আগের গুরুত্বপূর্ণ সংবাদের ওপরে সম্পাদকীয় লেখা হয়। ঘটনাটি পাঠক জানেন, শুধুমাত্র সূত্রটুকু ধরিয়ে দেওয়া যাতে সে বুঝতে পারে কী বিষয়ে লেখা হচ্ছে। অতি সংক্ষেপে এই সূত্র ধরিয়ে দেওয়ার কাজটুকু সারতে হবে। একেবারে সাদামাঠাভাবে লিখলেই হবে না। সামান্য চমক থাকলে ভাল। বর্ণনাত্মক না হয়ে বিশ্লেষণাত্মক হয়ে ওঠাটাই কাম্য। পাঠককে বিষয়টি ধরিয়ে দিয়ে বিষয়ের গভীরে প্রবেশ করতে হবে। যুক্তি পরিসংখ্যান তুলনামূলক আলোচনার প্রেক্ষিতে অণ্বেষণ করতে হবে বিষয়টির তাৎপর্য। যাইহোক না কেন তার রূপ, অনিবার্যভাবে তার সঙ্গে জড়িয়ে থাকবে বিচারবোধ ও মতামত যা মন্তব্যের আকারে পরিস্ফুট হবে। একেবারে শেষে আলোচিত বিষয়টি সম্পর্কে কাগজের নিজস্ব অবস্থান ও দৃষ্টিভঙ্গি অতি সংক্ষেপে, বুদ্ধিদীপ্তভাবে প্রতিষ্ঠিত হয়।

সম্পাদকীয় রচনার জন্য প্রয়োজন মননঋদ্ধ যুক্তিপরম্পরা, শব্দ প্রয়োগের চাতুর্য, উপমার দক্ষ প্রয়োগ

ও অনন্য ভাষাশৈলী যার মধ্যে উদ্ভাসিত হবে অপরিমিত সৌন্দর্য ও পর্যাপ্ত রসবোধ। এক একটি কাগজের একেক ধরনের সম্পাদকীয় রচনাশৈলী রয়েছে। ধারাবাহিকতা বজায় রাখতে এই শৈলী খুবই সাহায্য করে। পড়লেই বোঝা যায় এটা আনন্দবাজার পত্রিকার। অন্যটা বর্তমানের। তির্যক মন্তব্য করার দক্ষতার ওপর সম্পাদকীয়র সার্থকতা অনেকটা নির্ভর করে। এক সময় বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়ের ও সত্যেন মজুমদারের সম্পাদকীয় তির্যক মন্তব্যের অনন্যতায় অসাধারণ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল।

(৬) ঃ সুন্দর গদ্য রচনার মধ্যে দিয়ে পাঠককে আনন্দ দেওয়াও সম্পাদকীয় নিবন্ধের উদ্দেশ্য বলে গণ্য হয়। রমনীয় রচনা হাস্যরস ও ব্যঙ্গের ছোঁয়ায় সে অপরূপ আবহ তৈরি করে তাতে পাঠকের মন আনন্দে ভরপুর হয়ে ওঠে। চিত্তের বিনোদন ঘটে। উপমায়, অলংকারে, শব্দ নির্বাচনের যাদুতে পাঠককে শুধুমাত্র আনন্দ দেওয়াই সম্পাদকীয় রচনার উদ্দেশ্য হয়ে দাঁড়ায়।

রচনা পদ্ধতি ঃ সংবাদ লেখার সময় নিরপেক্ষতা বজায় রাখতে হয়। বস্তুনিষ্ঠার নীতি মেনে ঠিক যা ঘটেছে তাই লিখতে হবে, কোনরকম মন্তব্য বা মতামত লেখার মধ্যে ঢোকানো যাবে না। কিন্তু সম্পাদকীয় রচনার ক্ষেত্রে লেখকের স্বাধীনতা অনেক বেশি। সম্পাদকীয় লেখক কাগজের নীতির সঙ্গে সাযুজ্য রেখে মন্তব্য ও মতামত প্রকাশ করতে পারেন। তবে অবশ্যই যুক্তিযুক্তভাবে তা করতে হবে। যে কোন যুক্তিকেই হতে হবে তথ্যনিষ্ঠ। সাদাকে কালো বলে চালানো যাবে না। বিশ্লেষণ করে, তুলনা করে যে কোন ধরনের মতামত ও মন্তব্য শুধু প্রকাশ করা যাবে। সম্পাদকীয় মন্তব্য প্রকাশের বিষয়টি সম্পাদকীয় স্বাধীনতার অন্তর্ভুক্ত।

১১৮.৪ সারাংশ

সম্পাদকের নির্দেশে সহকারী সম্পাদকদের যে কোন একজন সম্পাদকীয় লেখবার দায়িত্ব পেতে পারেন—তাকে তখন 'লিডার রাইটার' বলা হয়। তিনিই তথ্য সূত্র অনুসন্ধান করে প্রাসঙ্গিক সম্পাদকীয় নিবন্ধ তৈরি করেন। প্রচলিত একটি কথা আছে—সম্পাদকীয় হোল কাগজের কণ্ঠস্বর। কাগজের নিজস্বতা কী তা বোঝা যায় সম্পাদকীয় পড়ে। সমসাময়িক বিভিন্ন ঘটনা ও বিষয়ের ওপর কাগজের মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গী কী তা প্রকাশিত হয় সম্পাদকীয় নিবন্ধে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সমালোচনামূলক মন্তব্য করা হয়, যা পড়ে পাঠক প্রভাবিত হয়। সম্পাদকীয়র কয়েকটি উদ্দেশ্য রয়েছে। এগুলি হল, পাঠককে অবহিত করা। ব্যাখ্যা করা। পাঠকের কাছে আবেদন রাখা, প্রয়োজনে সক্রিয় প্রতিবাদ করা, কাগজের নীতিকে প্রতিষ্ঠিত করা এবং মাঝে মাঝে পাঠকের চিত্ত বিনোদন করা।

সম্পাদকীয় নিবন্ধ রচনার নির্দিষ্ট পদ্ধতি রয়েছে। সূচনা, মধ্যবর্তী স্তর এবং উপসংহারের যথেষ্ট উপযোগীতা রয়েছে। শব্দ নির্বাচন, উপমার প্রয়োগ, যুক্তিপরম্পরার ব্যবহার এবং ভাষাশৈলী নিবন্ধকে এক বিশেষ মাত্রা দেয় যা কাগজের নিজস্বতাকে তুলে ধরে। যে কোন কাগজের সম্পাদকীয় নিবন্ধ পাঠ করলেই বোঝা যায় সেই কাগজের কোন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ও বিষয় সম্পর্কে অবস্থান কী।

১১৮.৫ অনুশীলনী—১

১। **শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ**

(ক) .... বলা হয় সংবাদপত্রের ....।

(খ) সম্পাদকীয় লেখা হয় .... গুরুত্বপূর্ণ .... ও .... ওপরে।

(গ) .... জানানোও .... অন্যতম উদ্দেশ্য।

২। সম্পাদকীয় লেখককে ‘লিডার রাইটার বলার কারণ সংক্ষেপে বর্ণনা করুন।

৩। সম্পাদকীয় নিবন্ধের সাধারণ উদ্দেশ্যগুলি উল্লেখ করুন।

১১৮.৬ মূলপাঠ—২ ঃ গ্রন্থ সম্পাদনা

গ্রন্থ সম্পাদনা ঃ ঝকঝকে নতুন বই হাতে তুলতেই আমাদের রোমাঞ্চ হয়। অঙ্গ সৌষ্ঠবের সৌন্দর্য মন ভরিয়ে দেয়। তারপর পাতা উল্টে চলে যাই বিষয়ের গভীরে, অজানা জগৎ-এর অভ্যন্তরে। পরিচ্ছেদ থেকে পরিচ্ছেদে, অনুচ্ছেদের পরতে পরতে মোহবিষ্ট হই বিষয়ের উৎকর্ষতায়, রচনার অভিনব চারিত্রিক বিশিষ্টতায়। একসময় গ্রন্থপাঠ শেষ হয়, মন ভরে ওঠে মনোরম পাঠের উপলব্ধিতে, অভিজ্ঞতায়। বই পড়ার আনন্দটুকুই আমরা উপভোগ করি। রচনার উৎকর্ষে মনপ্রাণ ভরে থাকে। ধন্য ধন্য করি লেখককে। খেয়াল থাকে না একটি গ্রন্থের উৎপাদনে শুধু লেখক নয়, আরো অনেকের অবদান আছে। মলাট থেকে অনুচ্ছেদ সজ্জা সব কিছুতেই রয়েছে সৃজনশীল পরিকল্পনা যার মূল স্থপতি হলেন গ্রন্থ সম্পাদক।

একটি ভালো বই মানেই উৎকৃষ্ট মানের সম্পাদিত বই। একটি যথেষ্ট উচ্চমানের পরিকল্পিত প্রয়াস। লেখক বই লেখেন, বাস্তবায়িত করেন তার ভাবনা ও সৃজনশীলতাকে লেখার মধ্যে। কিন্তু এটুকু সম্পন্ন হলেই ভালমানের গ্রন্থ উৎপাদন হয় না। লেখকের সৃজনকে যথার্থভাবে গ্রন্থে আবদ্ধ করতে, পাঠযোগ্য করে গড়ে তুলতে দরকার একজন দক্ষ গ্রন্থ সম্পাদক।

সংবাদপত্র প্রকাশনায় যেমন সম্পাদনা অত্যন্ত জরুরী। ঠিক তেমনি গ্রন্থ প্রকাশনার ক্ষেত্রেও সম্পাদনার যথেষ্ট তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। সম্পাদক জানেন একটি উৎকৃষ্ট মানের গ্রন্থ কীভাবে তৈরি হয়। কী কী শর্ত মানলে প্রকাশনার মান বজায় রাখা যায়। মলাট থেকে বাঁধাই, ছাপার মান, সজ্জা সবকিছুই সম্পাদনার মধ্যে পড়ে। শুধু বই ছাপলেই চলবে না, বই ছাপাকে পাঠকের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তুলতে হবে। রুচি ও উপযোগিতার সমন্বয়ে আকর্ষণীয় উৎকৃষ্ট গ্রন্থ প্রকাশ করাই সম্পাদনার উদ্দেশ্য।

সম্পাদকের কর্তব্য ঃ লেখক হলেন গ্রন্থের স্রষ্টা। কিন্তু গ্রন্থ সম্পাদক হলেন গ্রন্থের রূপকার। গ্রন্থের প্রকাশনা সংক্রান্ত যাবতীয় পরিকল্পনার দায়িত্ব তাঁর। লেখকের সঙ্গে যোগাযোগ রাখা থেকে মুদ্রণ, বাঁধাই পর্যন্ত যাবতীয় কাজকর্মের সঙ্গে তিনি সরাসরি যুক্ত থাকেন। লেখক যখন রচনায় মগ্ন, সম্পাদক তখন সেই সৃজনশীল রচনাকে কত সার্থকভাবে রূপায়িত করা যায় তা নিয়ে ভাবনাচিন্তা, পরীক্ষা নিরিক্ষায় ব্যস্ত থাকেন। প্রয়োজনে লেখককেও তিনি পরামর্শ দিতে পারেন পরিচ্ছেদ ভাষা, লেখার আয়তন ও প্রকাশন সম্পর্কিত অন্যান্য খুঁটিনাটি বিষয়ে।

ছাপার আগে রচনাটি খুঁটিয়ে পড়তে হয় সম্পাদককে। একজন দক্ষ সম্পাদক সবসময়ই হলেন একজন ভালো পাঠক। পড়তে পড়তেই তিনি পাঠযোগ্যতার বিচার করেন। লেখাটি কীভাবে উপস্থাপিত হলে, পাঠকদের মন জয় করতে পারে সে সম্পর্কে তাঁর স্বচ্ছ ধারণা থাকে। পড়তে পড়তেই তিনি নোট রাখেন। পড়া শেষ করার পর যদি কোন অদলবদল প্রয়োজন মনে করেন তবে তা তিনি লেখককে জানাবেন। লেখক সম্পাদকের দায়িত্ব সম্পর্কে অবহিত থাকেন। তিনি খুব ভালভাবেই জানেন সম্পাদকের হাতেই তাঁর বই নিখুঁত ও মনোরম হয়ে উঠবে।

লেখক লিখতে লিখতে অনেক সময় ছোট খাট ভুল করেন। বানান ভুল, অনুচ্ছেদ সংক্রান্ত ত্রুটি, প্রাসঙ্গিক তথ্য সম্পর্কিত ত্রুটি, একই বিষয় পুনরায় উপস্থাপনের বিষয় অনেক ক্ষেত্রে চোখ এড়িয়ে যায়। সম্পাদকের সজাগ দৃষ্টিতে এই সব ত্রুটি সহজেই ধরা পড়ে এবং তা সংশোধিত হয়। মুদ্রণ প্রমাদ যে কোন প্রকাশনের পক্ষে খুবই পীড়াদায়ক। যে বইয়ে বানান ভুল থাকে সে বই সম্পর্কে পাঠকের ধারণাও খারাপ হয়। সুতরাং সম্পাদনার অন্যতম কাজই হল মুদ্রণ প্রমাদের সম্ভাবনাকে কমিয়ে আনা। ছাপার কাজেও তদারকি করতে হয় তাঁকে। কী কাগজে, কী টাইপে ছাপা হবে তা তিনি নির্ধারণ করেন।

অনুচ্ছেদের উপযুক্ত প্রয়োগ পাঠযোগ্যতা বাড়িয়ে দেয়। খুব বড় বড় অনুচ্ছেদ হলে অক্ষর বিন্যাসের ধূসরতা বৃদ্ধি পায়। চোখের পক্ষে তা একেবারেই আরামদায়ক নয়। পাঠক যাতে পড়ার সময় স্বাচ্ছন্দ বোধ করে তার জন্যই সঠিকভাবে অনুচ্ছেদের ব্যবহার করা হয়। অনুচ্ছেদ দেওয়ার ফলে সাদা অংশের

ব্যবহার হয় এবং তা অক্ষরের ধূসরতা ভাঙতে সাহায্য করে। একটি পৃষ্ঠায় যদি কমপক্ষে একটি অনুচ্ছেদ থাকে তাহলে পৃষ্ঠাসজ্জা মনোরম হয়। তবে খেয়াল রাখতে হবে বিষয়ের প্রাসঙ্গিকতার সঙ্গে যেন অনুচ্ছেদ ব্যবহারের সাযুজ্য থাকে। শুধুমাত্র নান্দনিক হলেই চলবে না। বিষয়ের দাবির প্রতিও আনুগত্য রাখতে হবে। আবার এটাও সত্য যে অনুচ্ছেদ বিষয়ভাবনাকেও উপযুক্তভাবে মেলে ধরতে সাহায্য করে। একটি বিষয়ভাবনা পরতে পরতে প্রস্ফুটিত হয়, যদি প্রতি পরত অনুচ্ছেদের দাবী রাখে তাহলে অবশ্যই সেই দাবী মেটাতে হবে। অনুচ্ছেদ বিষয়ভাবনা এবং পৃষ্ঠাসজ্জা দুটি দিককেই সার্থকভাবে গড়ে তুলতে সাহায্য করে।

কোন তথ্যগত ভ্রান্তি যদি থাকে তাহলে তা দূর করতে হবে। অনেক সময় লেখক বিষয়-ভাবনাকে ভালোভাবে পরিস্ফুট করার জন্য বিভিন্ন তথ্য ও অন্যান্য উপকরণের সাহায্য নেন। লেখার সময় সামান্য ভুল-ত্রুটি হতে পারে। হয়তো লেখকের অজান্তে তথ্যগত কোন ভুল লেখার মধ্যে থেকে যেতে পারে। অনেক সময় উপন্যাসের চরিত্রের নাম বদলে যায়। সম্পাদক এই ভুল শুধরে দিতে পারেন। সম্পাদনার সময় সম্পাদক এই ত্রুটি সংশোধন করে সঠিক তথ্য ও পরিসংখ্যান পরিবেশন করবেন। এই পরিমার্জনা যে একটি লেখাকে কতখানি সাহায্য করে তা বলার অপেক্ষা রাখে না। ঘষে মেজে ঝকমকে করে গড়ে তুলতে সম্পাদনার কোন বিকল্প নেই।

প্রচ্ছদ বিন্যাসেও সম্পাদকের সক্রিয় ভূমিকা থাকে। গ্রন্থের বিষয় ভাবনার সঙ্গে সাযুজ্য রেখে প্রচ্ছদ তৈরি করতে হয়। একজন শিল্পী বিন্যাসের রূপরেখা তৈরি করেন। কিন্তু শিল্পীকে দিয়ে উৎকর্ষ মলাট তৈরি করিয়ে নেওয়ার দায়িত্ব সম্পাদকের। গ্রন্থটির দাবি শিল্পীকে বোঝাবেন তিনি। লেখকের ভাবনার সঙ্গে মলাট সৃজনকে মেলাবার দায়িত্ব বহন করেন সম্পাদক।

একই কথা অনেক সময় ঘুরে ফিরে চলে আসে। যে কোন রচনার পক্ষে তা একেবারেই কাঙ্ক্ষিত নয়। সজাগ সম্পাদক পুনরাবৃত্তি দেখলে সন্তর্পনে তা বাদ দিয়ে দেন। লেখক অজান্তে হয়তো পুনরাবৃত্তি ঘটিয়েছেন। ছাপা হয়ে গেলে তা পাঠের পক্ষে হয়ে উঠবে বিরক্তিকর। সম্পাদক তাই সর্বতোভাবে চেষ্টা করেন পুনরাবৃত্তির দোষ থেকে লেখাকে মুক্ত করতে। পুনরাবৃত্তি যদি না থাকে তাহলে লেখার উৎকর্ষ অনেক পরিমাণে বেড়ে যায়।

সাহিত্য ও গবেষণাধর্মী যে কোন বই-এর জন্যই সম্পাদনা প্রয়োজন। সম্পাদনার সময় যে পরিমার্জনা হয় তাতে একটি লেখা প্রকৃতভাবে মুদ্রণ উপযোগী হয়ে ওঠে। ছাপার মতো করে একটি গ্রন্থকে প্রস্তুত করার জন্যই দক্ষ সম্পাদক প্রয়োজন। একটি ভালো প্রকাশনা মানেই সেখানে রয়েছে সম্পাদকের সযত্ন প্রয়াস যা রচনাকে গুণগত দিক দিয়ে উন্নত করে তুলবে।

ভালো প্রকাশনা সংস্থা সর্বদাই দক্ষ সম্পাদক রাখার চেষ্টা করেন। বিশ্বখ্যাত প্রকাশনা সংস্থা ফেবার অ্যান্ড ফেবারের সম্পাদক ছিলেন এলিয়ট। র‍্যানডম হাইসের সম্পাদক ছিলেন জর্জ মিলার। বাংলা প্রকাশনায় সিগনেট এক সময় খুবই হৈ চৈ ফেলে দিয়েছিল। দিলীপকুমার গুপ্তের সযত্ন প্রয়াসে সিগনেট বাংলা প্রকাশনার গুণগত মান বৃদ্ধি পেয়েছিল। বর্তমানে সম্পাদনার গুরুত্ব এত বৃদ্ধি পেয়েছে যে লেখক নির্বাচনের কাজেও সম্পাদকরা শেষ কথা বলছেন। প্রকাশক যা চান সেটা লেখকের কাছ থেকে ঠিকঠাক নিয়ে আসাটাই সম্পাদকের কৃতিত্ব। তারপর সেই লেখাকে ঝকঝকে মুদ্রণে পরিণত করা পর্যন্ত সম্পাদকের দায়িত্ব থাকছে।

১১৮.৭ সারাংশ

যে-কোনো ভাল উন্নতমানের গ্রন্থ প্রকাশনার জন্য প্রয়োজন দক্ষ সম্পাদকের। অনুচ্ছেদ, পরিচ্ছদ নির্মাণ থেকে মলাট, বাঁধাই পর্যন্ত যাবতীয় বিষয়ের তদারক করেন তিনি। এমনকি অনেক সময় বিষয় নির্বাচনেও তাঁর তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা থাকে। লেখক তো সৃজন করেই ক্ষান্ত হন, কিন্তু ঐ সৃজনকে সার্থকভাবে গ্রন্থে রূপদান করতে সম্পাদকই সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

সম্পাদকের কিছু কর্তব্য থাকে। এগুলি সম্পাদন করে তিনি একটি গ্রন্থের প্রকাশকে বাস্তবায়িত করেন। এই কর্তব্যের মধ্যে রয়েছে, অনুচ্ছেদ, পরিচ্ছেদ, নির্মাণ, পুনরাবৃত্তি, তথ্যগত ও মুদ্রণ প্রমাদ দূর করা, প্রচ্ছদ বিন্যাস, ও ছাপার কাজ তদারকি করা।

সাহিত্য ও গবেষণাধর্মী যে কোন বই-এর জন্যই সম্পাদনা প্রয়োজন। যে প্রকাশনার দক্ষ সম্পাদক আছেন, সেই প্রকাশনার গ্রন্থও উৎকৃষ্টমানের হয়ে থাকে। ব্রিটেনের ফেবার ফেবার, আমাদের সিগনেটের গ্রন্থ সকলের মন সহজেই জয় করেছে। এটা সম্ভব হয়েছে কারণ এই প্রকাশনা দুটি সম্পাদনাকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছে। বর্তমানে যে কোন উন্নতমানের প্রকাশনা সংস্থায় সম্পাদকরাই গ্রন্থের রূপরেখা তৈরি করেন এবং তা বাস্তবায়িত করার দায়িত্ব নেন।

১১৮.৮ অনুশীলনী—২

১। **শূন্যস্থান পূরণ করুন ঃ**

(ক) .... থেকে ...., ... মান, সজ্জা সবকিছুই সম্পাদনার মধ্যে পড়ে।

(খ) .... ও .... সমন্বয়ে, আকর্ষণীয় উৎকৃষ্ট .... করাই .... উদ্দেশ্য।

(গ) বিষয়ের .... সঙ্গে যেন .... ব্যবহারের .... থাকে।

২। গ্রন্থ সম্পাদনার গুরুত্ব কী? সম্পাদনা কি গ্রন্থ প্রকাশনার উৎকর্ষ বাড়ায়?

৩। সম্পাদকের কর্তব্য ও দায়িত্বগুলি বর্ণনা করুন।

১১৮.৯ মূলপাঠ—৩ ঃ সাময়িক পত্রিকা সম্পাদনা

সংবাদপত্র সম্পাদনায় সম্পাদকের ভূমিকা প্রসঙ্গ প্রথম ও বর্তমান এককে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। তাঁর কর্মতৎপরতা, তাঁর দক্ষতা, দূরদৃষ্টি, সমাজ ও পাঠক মনস্তত্ত্ব জ্ঞান, ন্যস্ত দায়িত্ব সার্থকভাবে প্রতিপালনের সহায়ক। সংবাদপত্রের সমস্ত কৃতিত্ব ও ব্যর্থতার দায় সেজন্য তাঁর ওপরই বর্তায়। কাগজে প্রকাশিত সমস্ত কিছুর জন্য তাঁকে আইনত দায়ী থাকতে হয়। বস্তুত সম্পাদকের ব্যক্তিত্বের সঙ্গে সংবাদপত্র প্রত্যক্ষতঃ জড়িত। তাই সংবাদপত্রের প্রচার প্রতিষ্ঠার সঙ্গে বিশেষ বিশেষ সম্পাদকের গৌরব জড়িত থাকে।

সাময়কি পত্র—সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক, ত্রৈমাসিক—সংখ্যায় সংবাদপত্রের থেকে বিপুল হলেও, তার প্রতিটি এককের প্রচার সংখ্যা সীমিত হওয়ায় সমাজে প্রভাব অপেক্ষাকৃত কম। বস্তুতঃ সাময়িক পত্রিকার কম থাকার কতকগুলি বাস্তব কারণও আছে। সাধারণ মানুষের মধ্যে ক্রয় ক্ষমতার স্বল্পতা, দৈনিক পত্রিকা পাঠের পর সাময়িক পত্রিকা পাঠের প্রয়োজনীয়তা বোধের অভাবও অন্যতম হেতু। এক সময় শিক্ষিত মধ্যবিত্তের মধ্যেই সাময়িক পত্রিকার জনপ্রিয়তা ও প্রতিষ্ঠা ছিল। বর্তমানের প্রকাশিত সাময়িক পত্রিকার বাৎসরিক সুমারিগুলি লক্ষ্য করলে দেখা যাবে তার সংখ্যাগত পরিমাণ খুব নগণ্য নয়। প্রতি বৎসরই কিছু কিছু উৎসাহী তরুণ সাহিত্য-সংস্কৃতি প্রেমী ক্ষণজীবি মাসিক-ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশ করছেন। এই সব প্রকাশনায় আত্মপ্রকাশের আবেগ যতটা আছে, নিষ্ঠা যতটা আছে, তুলনায় সাহিত্য শিল্পবোধ প্রায়শ অপ্রতুল।

পঞ্চাশ-ষাটের দশকে বেশ কতকগুলি সাময়িক পত্রিকার প্রকাশ ঘটেছিল। যাঁরা চিন্তার জগতে কাব্য ভাবনায়, নতুন দিশার সন্ধান দিয়েছেন। তাদের মধ্যে অনুক্ত, এক্ষণ, কৃত্তিবাস, উত্তরসূরী, নতুন সাহিত্য, সুন্দরম্, সাহিত্যপত্র, পূর্বপত্র, কবি ও কবিতা, প্রাচীন সাহিত্য, রবীন্দ্রপ্রসঙ্গ', প্রবন্ধ পত্রিকা অন্যতম।

সেই সব বরেণ্য সম্পাদক-পরিচালকরা আজ অনেকেই নেই। তার স্থান অধিকার করেছে আশি-নব্বই-র দশক থেকে কতকগুলি 'বিশেষ সংখ্যা' নির্ভর পত্রিকা, যথা— 'কোরক', এবং 'যুমায়েরা', লোকসংস্কৃতি গবেষণা, ধ্রুবপদ, কৌশিকী, চেতনা প্রভৃতি। এই সব পত্রিকার যাঁরা সম্পাদনা-পরিচালনায় নিযুক্ত আছেন, তাঁরা সকলেই আধুনিক চিন্তাধারায় সম্পন্ন। চিন্তার জগতে নতুন নতুন দিগন্তের সন্ধানে রত। এঁদের কোন কোন সংখ্যা প্রয়াত বা জীবিত লেখক-শিল্পী সম্পর্কে নিবিড় অনুসন্ধানী ও তথ্য সংগ্রহমূলক প্রবন্ধ-নিবন্ধ গ্রন্থনায় গভীর মনোনিবেশে সমৃদ্ধ। সমস্যা হোল সাময়িক পত্রিকার জগতে এঁদের সংখ্যা নগণ্য হওয়ায় প্রভাব প্রতিপত্তিও তুলনামূলকভাবে কম। প্রকাশনার সংখ্যা ও বাজার দখলের হিসেবে সাময়িক পত্রিকার স্থল অধিকার করে আছে কতকগুলি দৃষ্টি আকর্ষক উজ্জ্বল মলাটের ঝাঁ চকচকে পত্রিকা যারা মানে মর্যাদায় কোনদিক থেকেই স্থান পাবার যোগ্য নয়।

সাময়িক পত্র সম্পাদনা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্রতা শিল্পকলা—বিষয়ের বৈচিত্র্যে, উপস্থাপনার অভিনবত্বে, ভাষা শিল্পের সৌকর্যে এবং প্রয়োজনীয় উৎস নির্দেশে—নিবন্ধের গুরুত্ব বাড়ায়। ভাল সাময়িক পত্রিকা সম্পাদনার জন্য সংবাদপত্রের সম্পাদকের মতো সর্বতোমুখী জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার প্রয়োজন না হলেও, সাময়িক পত্র সম্পাদনের সাহিত্য ও সংস্কৃতি মনস্কতার সঙ্গে তাঁর মনন ও পত্রিকা প্রকাশের কৃৎকৌশল সম্পর্কে সাধারণ ধারণা রাখতেই হয়। সাময়িক পত্রিকা হোল জনৈক সাংবাদিকের ভাষায়—''সম্পাদকের একক প্রদর্শনী।" পক্ষান্তরে সংবাদপত্র যৌথ শিল্প—বহু ব্যক্তির সমবেত দক্ষ কর্মকাণ্ডের মধ্য দিয়ে নিত্যদিনের সংবাদ পরিবেশিত হয়। কিন্তু সাময়িক পত্রিকার সম্পাদক—পত্রিকার বিষয়বস্তু পরিকল্পনা থেকে লেখক নির্বাচন, সম্ভাবনাময় নতুন লেখক আবিষ্কার করে তাদের দিয়ে নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে লিখিয়ে নেওয়া, লেখার প্রয়োজনীয় সম্পাদনা মুদ্রণ-তদারকি, সহকারী না থাকলে প্রুফ সংশোধন, কাগজ নির্বাচন, অঙ্গসজ্জা পরিকল্পনা, লে-অফ ঠিক করা, প্রচ্ছদ ও ছবি সম্পর্কে সিদ্ধান্ত নেওয়া মায় বাঁধাই—সবই সম্পাদকের দায়িত্ব।

সংবাদপত্র থেকে সাময়িক পত্রিকার প্রবন্ধ সম্পাদনা ও প্রুফ সংশোধন বিশেষ গুরুত্ব দাবী করে। কেননা সংবাদপত্র একদিনের সাময়িক পত্রিকার নিবন্ধের আবেদন দীর্ঘস্থায়ী। সুতরাং প্রকাশিত, সাময়িক পত্রিকার কোন ভুলভ্রান্তির প্রতিক্রিয়াও দীর্ঘস্থায়ী এবং পত্রিকা প্রচারে বিঘ্ন ঘটায়। তাই প্রতিটি সংখ্যার জন্য সম্পাদককে বিশেষভাবে ভাবতে হয়। পাঠক পত্রিকা কেনেন বিষয়ের দিকে লক্ষ্য রেখে। নতুন দৃষ্টিকোণে কোন বিষয় উপস্থাপিত হলে সেটি সাময়িকীর পাঠককে আকৃষ্ট করে। একটি সংখ্যা প্রকাশের সঙ্গে সঙ্গে তাই সাময়িক পত্রিকার সম্পাদকের বিরামের সুযোগ নেই। তাঁকে পরবর্তী সংখ্যার পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হতে হয়। কেননা সাময়িক পত্রিকার প্রতিটি সংখ্যাই নতুন নতুন চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। সাময়িক পত্রিকা এখনও সম্পাদকের ব্যক্তিত্ব-নির্ভর।

সাম্প্রতিক কালে সংবাদ-সাময়িকী'র প্রকাশ পত্রিকা সম্পাদনায় নতুন ধারার সংযোজন ঘটিয়েছে। এখানে এখন নানা ধরণের কর্মীর প্রয়োজন হয়। বার্তা সম্পাদকের প্রয়োজন না হলেও মুখ্য অবর-সম্পাদকের প্রয়োজনীয়তা আছে। এখানে লেখার মধ্যে অভিনবত্ব ও চমক থাকে। সংবাদ-সাময়িকীতে দরকার হয় কতিপয় চিত্রশিল্পী ও একজন শিল্প নির্দেশক, দৃশ্যসজ্জা পরিকল্পনা বিশেষজ্ঞ। এই পত্রিকার প্রচ্ছদ নিবন্ধ অন্তরতদন্তমূলক চমকপ্রদ ঘটনার সমাবেশে আকর্ষণীয়। অন্যান্য প্রাসঙ্গিক বিষয় তদনুসারী। নতুন প্রজাতির এই সাময়িকীর আবেদন দিনান্তেই বিস্তৃত যোগ্য।

পরিশেষে সাময়িকী সম্পাদনার আলোচনা উপসংহারে নির্দ্দিষ্ট করা যেতে পারে —

(১) সাময়িক পত্রিকা প্রকাশের 'বহু' পূর্বেই সম্পাদক সম্ভাব্য সংখ্যাগুলির পরিকল্পনা প্রণয়ন ও লেখকসূচী নির্দ্দিষ্ট করে তাঁদের সঙ্গে যোগাযোগের ব্যবস্থা করেন।

(২) সম্পাদক তাঁর সৃজনি শক্তি ও কল্পনার সাহায্যে নতুন নতুন আলোচনার বিষয়বস্তুর উদ্ভাবন করবেন।

(৩) নতুন লেখক তৈরি করা এবং তাঁদের যোগ্যতা বিচার করে তাঁদের দিয়ে বিভিন্ন বিষয়ে প্রবন্ধ লিখতে উৎসাহিত করা।

(৪) সাময়িক সম্পাদকের বিভিন্ন বিষয় সম্পর্কে আগ্রহ, ভাষা, প্রকাশ ভঙ্গি সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান থাকা সবিশেষে গুরুত্বপূর্ণ।

১১৮.১০ সারাংশ

সংবাদপত্র ও সাময়িক পত্রিকা সম্পাদনায় পার্থক্য আছে। সংবাদপত্র প্রকাশনায় থাকে একটি সামগ্রিক উদ্যোগ। তাই সংবাদপত্র সম্পাদককে একজন দক্ষ প্রশাসক হতে হয়। সাময়িকপত্রের সম্পাদক একাই সব। পত্রিকার সম্ভাব্য সংখ্যাগুলি সম্পর্কে সময় থাকতে পরিকল্পনা রচনা, সম্ভাব্য লেখকসূচী স্থির করা, মুদ্রণ, অঙ্গসজ্জা পরিকল্পনা সবই সম্পাদকের একার ওপর নির্ভরশীল।

সাময়িক-সম্পাদক হবেন বিজ্ঞ, বিচক্ষণ, সাহিত্য, শিল্প-সংস্কৃতি বোধসম্পন্ন। তাঁকে সম্পাদনায় সাহায্য করবার জন্য সম্ভাব্য ক্ষেত্রে একজন সুযোগ্য সহকারী দরকার, অন্যথায় পত্রিকা হয়ে ওঠে সম্পাদকের 'একক প্রদর্শনী' বিশেষ। অতি সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে নিরঙ্কুশ সাহিত্য-বিজ্ঞানের পরিবর্তে 'সংবাদ-সাময়িকী' প্রকাশিত হচ্ছে। এগুলি সমসাময়িক ঘটনা নির্ভর সাময়িক পত্রিকা—সংবাদ-সাময়িকী। এখানে বিশেষভাবে সাংবাদিক সম্পাদকদের প্রাধান্য।

১১৮.১১ অনুশীলনী—৩

১। সংবাদপত্র অপেক্ষা সাময়িক পত্রিকার সংখ্যাধিক্য সত্ত্বেও সাময়িক পত্রিকা প্রচারের স্বল্পতার কারণ সম্পর্কে আপনার অভিমত লিখুন।

২। পঞ্চাশ-ষাটের দশকের স্মরণীয় ৫ (পাঁচটি) পত্রিকার নাম উল্লেখ করুন।

৩। সাময়িকপত্র সম্পাদনায় সম্পাদকের ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করুন।

৪। সাময়িক পত্রিকা সম্পাদকের দায়িত্ব ও কর্তব্য পালনে তাঁর কী কী গুণাবলী থাকা প্রয়োজন আলোচনা করুন।

১১৮.১২ মূলপাঠ—৪ ঃ প্রুফরিডিং

প্রুফরিডিং ঃ যে কোন রচনাকে নিখুঁত করে গড়ে তুলতে প্রুফরিডিং দারুণভাবে সাহায্য করে। কোন রচনা কম্পোজ হবার পরে প্রথম ছাপা তোলা হয় কাগজে। একে বলে গ্যালি প্রুফ। এক কলামে ছাপা এই প্রুফ মূল রচনার সঙ্গে মিলিয়ে সংশোধন করা হয়। এই সংশোধন প্রক্রিয়ার নাম প্রুফ রিডিং। মূল রচনায় যা আছে কম্পোজ করার পর প্রথম ছাপায় তা হুবহু থাকে না। প্রচুর ত্রুটি বিচ্যুতি থাকে। এগুলো প্রুফরিডিং-এর সময় সংশোধন করা হয়। যিনি প্রুফরিডিং করেন তাঁকে বলা হয় প্রুফরিডার। সংবাদপত্র, সাময়িকপত্র ও গ্রন্থ প্রকাশনায় প্রুফরিডারদের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। তাঁরা অত্যন্ত সর্তকতার সঙ্গে মূল রচনার সঙ্গে গ্যালি প্রুফ মিলিয়ে যাবতীয় ত্রুটি সংশোধন করে দেন। এই সংশোধন মুদ্রিত রচনার পাঠযোগ্যতা বাড়িয়ে দেয়।

ব্যুরো অফ ইন্ডিয়ান স্ট্যানডার্ড প্রুফ রিডিংয়ের কতকগুলি সাধারণ সূত্র ও বিধি দিয়েছেন যা মেনে চললে দেশের সমস্ত প্রকাশনার ত্রুটি সংশোধনে এক ধরনের সমতা আসবে। বি আই এস-এর নির্দেশ মতো পাঁচটি বিষয়ের ওপরে গুরুত্ব দিতে হবে। এগুলি হল— (১) বিষয়গত ত্রুটি (text), (২) যতিচিহ্ন (punctuation), (৩) স্থানের নির্দেশ (spacing), (৪) সমতা (alignment) এবং (৫) হরফ (type)।

প্রুফরিডারের কাজ ঃ খুব সতর্কভাবে মূল পাঠের সঙ্গে গ্যালি প্রুফকে মিলিয়ে দেখতে হবে। মূল পাঠে যা আছে তা অনুসরণ করে প্রুফে যদি কোন ভুল থাকে তাহলে তা সংশোধন করবেন প্রুফরিডার।

প্রথমেই তিনি বানান ভুল সংশোধন করবেন। কম্পোজ করা ম্যাটারে প্রচুর বানান ভুল থাকে।

সেগুলি সংশোধন করতে হয়। একই বইতে অথবা সংবাদপত্রে এক বানান রীতি মেনে চলা দরকার। 'সরকারি' বানান সর্বত্রই একই রকম হওয়া উচিৎ। এক জায়গায় হ্রস্ব ইকার, আরেক জায়গায় দীর্ঘ ঈ-কার দেওয়া উচিৎ নয়।

দ্বিতীয়ত, অক্ষর অনেক সময় উলটে যায়। যেমন ন উলটে এইরকম ছাপা হল, তখন উলটে যাওয়া 'ন'কে ঠিক করে দিতে হবে। অতিরিক্ত কোন অক্ষর যদি ছাপা হয় তাহলে তা বাদ দিতে হবে।

তৃতীয়ত একটি শব্দের মধ্যে অনেকসময় ফাঁক থেকে যায়, তখন তা দূর করে কাছাকাছি নিয়ে আসতে হবে। সংবাদ পত্র, এরকম থাকলে তা করতে হবে সংবাদপত্র। ঠিক একইভাবে যেখানে ফাঁক থাকা দরকার। সেখানে যদি তা না থাকে তাহলে তা বসাতে হবে। যেমন—'বামফ্রন্টসরকার' হবে 'বামফ্রন্ট সরকার'।

চতুর্থত মূল পাঠের কিছু অংশ বাদ যেতে পারে গ্যালি প্রুফে। কম্পোজিটর ভুল করে হয়তো কিছু অংশ বাদ দিয়ে কম্পোজ করেছে। তখন বাদ দেওয়া অংশকে পুনরায় সংযোজিত করতে হবে।

পঞ্চমত ঠিকঠাকভাবে অনুচ্ছেদ বসাতে হবে। অনেক সময় অনুচ্ছেদের ওলোট পালোট হয়ে যায়, তখন তা সঠিক জায়গায় বসাতে হয়।

ষষ্ঠত, তারিখ, সালের ও নামের ভুল থাকলে প্রুফরিডিং-এর সময় তা সংশোধন করে ঠিক করা হয়। প্রুফরিডিং হল শেষ চেক পয়েন্ট। ভুল শোধরাবার শেষ জায়গা।

প্রুফ সংশোধনের চিহ্ন ঃ প্রুফ দেখার সময় মার্জিনের সাদা জায়গায় সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহার করে সংশোধনের নির্দেশ দেওয়া হয়। অফসেট ছাপায় কমপক্ষে দু'বার প্রুফ দেখতে হয়। প্রথম প্রুফ দেখার সময় যে রঙের কালি ব্যবহার করা হয়, দ্বিতীয় প্রুফ দেখার সময় অন্য রঙের কালি ব্যবহার করাই যুক্তিযুক্ত।

হরফ বদল করার জন্য যেখানে প্রয়োজন সেখানে / এইরকম চিহ্ন দিয়ে মার্জিনে / এই চিহ্ন দিয়ে যে বদলি হরফ চাওয়া হচ্ছে সেটা লিখে দিলেই হবে। যেমন শব্দে 'ন' পাল্টে ল আনতে হবে। মার্জিনে / ল এইভাবে লিখলেই কম্পোজিটার বুঝতে পারবেন প্রুফরিডার কী পরিবর্তন চাইছেন। একটি শব্দ যদি ভুল করে আলাদা হয়ে যায় তাহলে / চিহ্ন দিয়ে তারপর মার্জিনে এই চিহ্ন দিলেই হবে। হরফ ওলোট পালোট হলে মূল পাঠেই বসাতে হবে এই চিহ্ন। কোন হরফ বা শবব্দ বাদ দিতে গেলে / এই চিহ্ন দিয়ে মার্জিনে চিহ্ন d দিতে হবে। এইরকম অসংখ্য চিহ্ন আছে যা প্রুফ রিডাররা কাজের সময় প্রয়োগ করেন সঠিক জায়গায় এবং এই চিহ্ন দিয়ে কম্পোজিটারকে বুঝিয়ে দেন কাঙ্খিত পরিবর্তনটি কী হবে।

১১৮.১৩ সারাংশ

ছাপা রচনায় যাতে কোন ভুল না থাকে তার জন্য দরকার প্রুফ রিডিংয়ের। কাজটি করেন প্রুফরিডার, মূল পাঠের সঙ্গে গ্যালি প্রুফকে মিলিয়ে তিনি প্রুফ দেখেন। বানান ভুল, তথ্যগত ত্রুটি, হরফের ওলোট-পালোট, সবকিছুই সংশোধন করা হয়। বিশেষ কিছু সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহার করে তিনি এই প্রুফ সংশোধন করেন। যে কোন ছাপা রচনাকে ত্রুটি মুক্ত ও নিখুঁত করে তুলতে প্রুফের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

১১৮.১৪ অনুশীলনী—৪

১। প্রুফ সংশোধন কেন প্রয়োজনীয়? সংক্ষেপে লিখুন।

২। প্রুফ কে সংশোধন করেন? প্রুফ দেখায় সাংকেতিক চিহ্ন ব্যবহারের উপযোগিতা কী?

১১৮.১৫ উত্তর-সংকেত (অনুশীলনী (মূলপাঠ—১, ২, ৩ ৪)

অনুশীলনী—১

১। (ক) ক্লাস এইট, সংবাদপত্র।

১১৮.৬ গ্রন্থপঞ্জি

অনুশীলনী—১

১। (ক) সম্পাদকীয় কে, কণ্ঠস্বর।

(খ) সমসাময়িক, ঘটনা, বিষয়ের।

(গ) সক্রিয়, প্রতিবাদ, সম্পাদকীয়ের।

২। সম্পাদকীয় লেখককে ‘লিডার রাইটার’ বলার কারণ তিনি সমসাময়িক যে কোন গুরুত্বপূর্ণ ঘটনার ওপর সম্পাদকীয় নিবন্ধে ঘটনাটির সম্ভাব্য কারণ, জীবনে তার প্রতিক্রিয়ার সম্বন্ধে কাগজে মতামত দেন। এর ফলে এটি জনমত তৈরি করতে সাহায্য করে।

৩। সাধারণ উদ্দেশ্যগুলি ‘সম্পাদকীয়’ শীর্ষক আলোচনায় যে দুটি সূত্র নির্দেশ করা হয়েছে, তার সারাংশ উপস্থাপিত করুন।

অনুশীলনী—২

১। (ক) মলাট, বাঁধাই, ছাপার, সজ্জা।

(খ) রুচি, উপযোগিতা, গ্রন্থপ্রকাশ, সম্পাদনার।

(গ) প্রাসঙ্গিকতার, অনুচ্ছেদ, সাযুজ্য।

২। ‘গ্রন্থ সম্পাদনা’ অংশটি ভাল করে পড়ে উত্তর তৈরি করুন।

৩। ‘সম্পাদকের কর্তব্য’ শীর্ষক অংশ পড়ে উত্তর দিন।

অনুশীলনী—৩

১। মূলপাঠ—৩-এর অর্ন্তগত, সাময়িক পত্রিকা সম্পাদনা’ প্রসঙ্গ ভাল করে পড়লেই উত্তর করতে পারবেন।

২। পঞ্চাশ-ষাটের দশকের পাঁচটি পত্রিকা ঃ অনুক্ত, এক্ষণ, কৃত্তিবাস, উত্তরসূরী, নতুন সাহিত্য।

৩। সাময়িকপত্র সম্পাদকের ভূমিকা মূলপাঠ—৩-এর শেষাংশ অবলম্বনে উত্তর করুন।

৪। মূলপাঠ—৩ অবলম্বনে আপনার উত্তর তৈরি করুন।

অনুশীলনী—৪

দুটি প্রশ্নেরই প্রাসঙ্গিক উত্তর মূলপাঠ—৪ অবলম্বনে তৈরি করুন।

১১৮.১৬ গ্রন্থপঞ্জি

১। Editor on Editing –*NBT Publication.*

২। M. V. Kamath –*Professional Journalism.*

৩। ড. পার্থ চট্টোপাধ্যায় — *সাংবাদিকতা ও সংবাদপত্রভাবনা — বিষয় সাংবাদিকতা।*

ই. বি. জি—৮
বাংলা বিষয়ের
ঐচ্ছিক পাঠ্যক্রম

পর্যায়
৩৩

একক ১১৯ ❑ সাংবাদিকতার প্রথম পাঠ ও প্রতিবেদন রচনার প্রস্তুতি

গঠন

১১৯.১ উদ্দেশ্য

১১৯.২ প্রস্তাবনা

১১৯.৩ মূলপাঠ

১১৯.৪ সারাংশ

১১৯.৫ অনুশীলনী

১১৯.৬ গ্রন্থপঞ্জি

১১৯.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি মন দিয়ে পড়ুন। তাহলে—

- একালের একটি আকর্ষণীয় ও সম্মানজনক পেশা যে সাংবাদিকতা তার একটি রূপরেখা সম্বন্ধে আপনার মনে একটি ধারণা গড়ে উঠবে।
- সাংবাদিকতার নানা স্তর, নানা দিক আছে। তার মধ্যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ হল রিপোর্ট তৈরি বা প্রতিবেদন রচনা। সেই প্রতিবেদন কীভাবে লিখতে হয় বা তৈরি করতে হয় তা আপনি এখানে জানতে পারবেন। শিখতে পারবেন বুঝতে তো পারবেনই, আর নিজে নিজেই তা লিখতে পারবেন কিংবা আপনার প্রতিষ্ঠানের উপযুক্ত করে পাঠাতে পারবেন।
- প্রত্যেক দিন সংবাদপত্রে মুদ্রিত আকারে আমরা যা যা পড়ি তার একটি অংশ হল প্রতিবেদন। সেই প্রতিবেদনের নিজস্ব যে রূপ ও রীতি আছে তা আপনি এখানে দেখতে পাবেন এবং হাতে-কলমে প্রয়োগ করতে পারবেন।
- প্রতিবেদনের ভাষা একটু আলাদা ধাঁচের হয়। তার ভঙ্গি, স্বাদ অন্যান্য সাহিত্যিক বা ব্যবহারিক গদ্যরচনা থেকে স্বভাবে, মর্জিতে বা মেজাজে খানিকটা আলাদা। সেই ভাষাভঙ্গিটি আপনি আয়ত্ত করতে পারবেন।

- খবরের কাগজে প্রকাশের জন্য প্রতিবেদন রচনার সঙ্গে বেতার, দূরদর্শন, ইন্টারনেটের মাধ্যমে প্রচারের জন্য প্রতিবেদন রচনার একটি মৌলিক পার্থক্য রয়েছে। তফাত রয়েছে মুদ্রণ মাধ্যমের সঙ্গে বৈদ্যুতিন মাধ্যমের। এক জায়গায় পাঠক নিজেই মনে মনে খবরটি পড়েন, কখনো কখনো আড্ডার ভিতর বড়ো জোর দু-একজনকে পড়ে শোনান, আর অন্য গণমাধ্যমগুলোয় শ্রোতারা শোনেন, দর্শকেরা শ্রবণ-দর্শনের মেলবন্ধন ঘটান, গ্রাহকেরা গ্রহণ করেন। তাই মাধ্যম বা মিডিয়ার কারণেই প্রতিবেদনে প্রতিবেদনে কীভাবে পার্থক্য ঘটে যায় বা তফাতটি করতে হয়, সেই বিষয়টাও আপনি এখানে জানতে পারবেন, রপ্ত করে প্রয়োগ করতে পারবেন।
- সাময়িক পত্র, জার্নাল ইত্যাদির জন্য প্রতিবেদন রচনা আবার স্বতন্ত্র ধরনের। সেই স্বাতন্ত্র্য কোথায়, তা কীভাবে রক্ষা করতে হয় তা-ও আপনি জানতে পারবেন।
- সাংস্কৃতিক, বাণিজ্যিক, শিল্প, ট্রেড ইউনিয়ন, ক্লাব ইত্যাদি কোনো প্রতিষ্ঠানের মাসান্তিক, দ্বিমাসিক, ত্রিমাসিক, চতুর্মাসিক, ষান্মাষিক, বার্ষিক প্রতিবেদন রচনা, আবার কোনো গণমাধ্যমে প্রচারের জন্য বা প্রকাশার্থে তৈরি প্রতিবেদন যে গুণগত, ভঙ্গিগত দিক থেকেও আলাদা তা আপনি সহজেই এখানে বুঝতে বা জানতে পারবেন। প্রতিষ্ঠানের প্রতিবেদন কীভাবে যুক্তি-তথ্য-পরিসংখ্যান দিয়ে লিখতে হয় সেই পদ্ধতিটি আপনি এখানে খুঁজে নিতে পারবেন।

১১৯.২ প্রস্তাবনা

এ যুগ তথ্য-প্রযুক্তির যুগ। এ যুগ বিশ্বব্যাপী বার্তা-বিনিময় ও প্রচারের প্রসারিত কাল। সংবাদ জানার অধিকার একালের সকলের অধিকার। ঘরের খবর, বাইরের খবর, দেশের খবর, দশের খবর—সব খবরেই মানুষের বরাবর আগ্রহ, অনুসন্ধিৎসা। শুধু তাই নয়, আঁতের খবর, হাঁড়ির খবর, এমন কী খবর ছাড়িয়ে খবর, খবরের ভিতরের খবরও টেনে বের করাই সাংবাদিকের কাজ। তাঁরা চান পাঠক-শ্রোতা-দর্শকদের হরেকরকম চাহিদা মেটাতে। চান টক-ঝাল-নোনতা-মিষ্টির মিশেল দিয়ে কৌতূহল উস্‌কে দিতে, নিজ নিজ প্রতিষ্ঠানের প্রভাব বাড়িয়ে বাণিজ্যের প্রসার ঘটাতে, বাজার দখল করতে। অথবা চান আদর্শের বিস্তার; চান সংগ্রামের ভিত আরো মজবুত করতে, সংগঠনের বৃদ্ধিও। চান শাসন ক্ষমতা দখলে রাখতে বা দখল করতে। সোজা সাপ্টা ব্যাপার হল, শ্রেণীবিভক্ত সমাজে খবরের দুনিয়ায় নিরন্তর প্রতিযোগিতার মধ্যে প্রত্যেকটি সংবাদ-প্রতিষ্ঠানই চায় টিকে থাকতে, চায় বিপণনের বৃদ্ধি, আধিপত্যের বিস্তার।

মুদ্রণ মাধ্যমেই হোক আর বৈদ্যুতিন মাধ্যমেই হোক গণমাধ্যম হল বিশ্বের বাতায়ন। এ হল সেই খোলা দরজা-জানালা যার মধ্য দিয়ে পাঠক-শ্রোতা-দর্শকেরা পান চলমান পৃথিবীর রোজকার টাটকা বাতাস, সঞ্জীবনী আলো। এর মাধ্যমেই তাঁরা প্রতিদিনই নিজেদের নতুন করে আবিষ্কার করেন, তথ্যসমৃদ্ধ করেন, জ্ঞানের ব্যাপ্তি ঘটান, গভীরতা বাড়ান। তাঁরা থাকেন সংবাদ-সম্পদে তরতাজা, চলতে থাকেন সময়ের সঙ্গে সঙ্গে। আর তাঁদের কর্মকুশলতায় পাঠক-দর্শকেরা তাঁদের সংবাদ বুভুক্ষা মেটান। বার্তাজীবীদের আনকূল্যেই সংবাদপত্র বিশ্বের দর্পণ, বেতার বিশ্বব্যাপী বাণী, দূরদর্শন সপ্তসিন্ধু দশ দিগন্তের দর্শন-শ্রবণের চলমান শৈল্পিক সমাহার।

১১৯.৩ মূলপাঠ

সাংবাদিকতা শিক্ষার্থীদের কাছে একটি চিত্তাকর্ষক পাঠ্যক্রম। আবার তা ব্যবহারিক জীবনে অর্থাৎ জীবিকা অর্জনের ক্ষেত্রে এক আকর্ষণীয় পেশা। সামাজিক মর্যাদায় তা গুরুত্বপূর্ণ। কোনো ক্ষেত্রে আদর্শগত সংগ্রামের শানানো হাতিয়ার হল সাংবাদিকতা। অন্যান্য অনেক পাঠ্যবিষয়ের মতো শ্রেণিকক্ষে ভাষণ দানের মধ্যে সাংবাদিকতায় পাঠদান শেষ হয় না, তা মুখস্থবিদ্যার নিষ্ফল প্রদর্শনীও নয়। এ হল হাতে-কলমে করে দেখানোর বিষয়। এর প্রায়োগিক দিকটাই অধিকতর মূল্যবান। জরুরিও বটে।

বলাই বাহুল্য, জন্মসূত্রে কেউ সাংবাদিক হন না। স্বভাব-সাংবাদিক বলেও কিছু হয় না। সাংবাদিক হতে গেলে তাঁকে সব ব্যাপারে কৌতূহলী হতে হয়, সজাগ থাকতে হয়, চোখ-কান খোলা রাখতে হয়। তাঁকে প্রতিনিয়তই শিক্ষা নিতে হয় বিশ্বজোড়া ঘটনাপ্রবাহ থেকে। নিজের সমাজকে, দেশকে, জনজীবনকে চিনতে হয় গভীর মমতায়, সংবেদনশীলতায়। ভাবতে হয় সমাজের স্বার্থে, মানুষের মঙ্গলে কীভাবে সাংবাদিকতাকে আরো চাঁচাছোলাভাবে ব্যবহার করা যায়। সমাজে নানামুখী চিন্তার ঝোঁক, কর্মের স্রোত পর্যবেক্ষণ করতে হয় সাংবাদিককে গভীর নিষ্ঠার সঙ্গে। বাস্তবিকই, সমাজজীবনের পাঠশালা থেকে যেমন তাঁকে শিক্ষা নিতে হয় তেমনি দেশ-বিদেশের বিভিন্ন কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি চমকপ্রদ ও চিত্তাকর্ষক পাঠ্যবিষয় হল সাংবাদিকতা। এ বিষয়টি যথার্থই নিয়মিত অধ্যয়ন-অনুশীলনের দাবি রাখে। তত্ত্ব ও তথ্যগত দিক থেকে সাংবাদিককে সমৃদ্ধ হতে হয়। জানতে হয় তাঁকে সাংবাদিকতার ইতিহাস, দেশ-বিদেশের খ্যাতকীর্তি গণমাধ্যমগুলির স্মৃতি-সত্তা-ভবিষ্যৎ, শ্রেণিবিভক্ত সমাজে গণমাধ্যমের গুরুত্ব ও ভূমিকা, মুদ্রণ মাধ্যমগুলির পরিচালন ব্যবস্থা-প্রচার-পরিবেশনের পদ্ধতি, বৈদ্যুতিন মাধ্যমগুলির অবদান-চরিত্র-বিশেষত্ব, সাংবাদিক হিসেবে বিভিন্ন বিশ্বব্যক্তিত্ব ও তাঁদের কর্ম-চিন্তা-কৃতিত্ব, সাংবাদিকতার নানা সংরূপ বা জেনর্, বিভিন্ন শ্রেণি-পর্যায় ইত্যাদি।

উদ্দেশ্য কর্মপদ্ধতি-চরিত্র-প্রভাবের পার্থক্য সত্ত্বেও কমবেশি প্রত্যেকটি গণমাধ্যম বা সংবাদপত্র-টি.ভি.-রেডিওয় কর্মীদের মধ্যে মোটামুটিভাবে দুটি ভাগ দেখা যায়। একদিকে সম্পাদনার বিষয়সমূহ অন্যদিকে ব্যবস্থাপনার ব্যাপার-স্যাপার। একদিকে সম্পাদক, উপ-সম্পাদক, সহ-সম্পাদক অবর সম্পাদকদের নিয়ে সম্পাদকীয় বিভাগ, অন্যদিকে বার্তা সম্পাদক, উপ-বার্তা সম্পাদক, সহ-বার্তা সম্পাদক, প্রতিবেদক, সংবাদদাতা, বিশেষ প্রতিনিধি, ফোটোগ্রাফার, সংবাদলেখক, অনুবাদক, চিত্র সাংবাদিক, প্রুফ সংশোধক প্রমুখ নিয়ে বার্তা বিভাগ। অন্যদিকে ইঞ্জিনিয়ার, কারিগরি ব্যক্তিত্ব, অর্থ-উপদেষ্টা, বিজ্ঞাপন অধিকর্তা, গ্রন্থাগারিক, গবেষণাকর্মী, প্রচার অধিকর্তা, পরিবেশক প্রমুখ নিয়ে বিরাট সংখ্যক অবার্তাজীবী।

পেশা হিসাবে সাংবাদিকতার আলাদা বাড়তি আকর্ষণ আছে। রয়েছে তার ভিতরে চটক, চমক, চমৎকারিত্ব। সর্বোপরি আছে জীবনের প্রতি অঙ্গীকার, সমাজের প্রতি দায়বদ্ধতা, বৃত্তির প্রতি নৈতিক নিষ্ঠা—এক কথায় পেশাদারিত্ব।

সাংবাদিক হিসেবে কেউ কেউ পছন্দ করেন ডেস্কে বসে দপ্তরের হিমেল আবেশে বা যন্ত্রের মায়াবী গুঞ্জন ও নিম্নস্বর শতকণ্ঠের সম্মিলিত পরিমণ্ডলে লেখনীটিকে সচল রাখতে। অত্যন্ত দ্রুততায় নব নব সৃষ্টিতে ভাষান্তরে, পরিবর্তন-পরিবর্ধন-পরিমার্জনে ব্যস্ত থাকে তাঁদের কলম, টান-টান থাকে মন ও মনন। বেরিয়ে আসে সম্পাদকীয় নিবন্ধ, সম্পাদকীয় প্রতিবেদন, কলম রচনা, চিঠিপত্র, সম্পাদকীয় টিপ্পনী, নিউজ এজেন্সির পাঠানো সংবাদটিকে প্রতিষ্ঠানের চরিত্রানুযায়ী গড়ে তোলা ইত্যাদি। কখনও কখনও প্রতিবেদকের পাঠানো প্রতিবেদনটির ঘষামাজা করে নতুন করেও লিখে নিতে হয়। আবার অনেক সাংবাদিকই দপ্তরে বসে কাজ করতে ভালোবাসেন না। এঁরা চান বাইরের জগত থেকে, ঘটনাপ্রবাহ থেকে, সভা-সমাবেশ-আলোচনা-বিতর্ক থেকে সংবাদ সংগ্রহ করে পাঠক-শ্রোতা-দর্শকের মধ্যে নিজস্ব ঢঙে পরিবেশন করতে। এঁরা তুলনামূলকভাবে অনেক বেশি চনমনে হন, গোপন খবরের জন্য ছোঁক ছোঁক করেন, দরকারে গোয়েন্দা পুলিশের মতো সোর্স-কে কাজে লাগান, স্বাদ নেন সাংবাদিকতা পেশাটির ভিতরকার রহস্য-রোমাঞ্চ-অ্যাডভেঞ্চারিজম। এঁরা গোপন খবর বের করে পান আবিষ্কারের আনন্দ, ঝুঁকি নিয়েই খুঁজে পান সাংবাদিকতার বর্ণময়তা। এঁরা রিপোর্ট বা প্রতিবেদন দানের মধ্যে নিজেদের মগ্ন রাখতে ভালোবাসেন। খরা-বন্যা-মারী-যুদ্ধ-সন্ত্রাস থেকে রাজনৈতিক ঘটনা ও আন্দোলন, সামাজিক-সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, অর্থনৈতিক বিতর্ক, খেলাধুলো, বিজ্ঞান, শিক্ষা, আইন-আদালত এঁদের ভীষণভাবে টানে। যেখানেই খবরের সম্ভাবনা সেখানেই হাজির হন এঁরা নিজেদের প্রতিষ্ঠানের গ্রাহকদের স্বার্থে। নিজস্ব প্রতিবেদন নিয়ে প্রতিষ্ঠানে প্রতিষ্ঠানে প্রতিবেদকে প্রতিবেদকে চলে অনেক সময় সযত্নে রক্ষিত গুপ্ত প্রতিযোগিতাও। এরকম প্রতিবেদনই পাঠক-শ্রোত-দর্শকদের মধ্যে আলোড়ন তোলে, সাড়া জাগায়, চাঞ্চল্য আনে। বিতর্ক উস্‌কে দেয়, আলোচনার ঝড় ওঠে, সংবাদ প্রতিষ্ঠানের অনিবার্যতা প্রতিষ্ঠিত হয়।

বাস্তবিকই, সাংবাদিকতার আসল মেজাজটি পাওয়া যায়, অনেকের মতে, প্রতিবেদন পেশ করার মধ্যে। প্রতিবেদকের স্মার্টনেস, খবরের ভিতর থেকে খবর বের করে নেবার কুশলতা, সংবাদপত্রই শুধু নয় টি.ভি., রেডিও ইত্যাদিরও সম্পদ। তবে একথাও যেন আমরা ভুলে না যাই যে গণমাধ্যমগুলোয় প্রকাশিত প্রতিবেদন কোনো খাপছাড়া বিষয় নয়। সাংবাদিকতায় কোনটাই খাপছাড়া জিনিস হয় না। সব কিছুর মধ্যেই থাকে এক ধরনের সঙ্গতি। ঐকতানের আমেজ। এমন কী সাংবাদিকতার অন্যতম প্রধান আকর্ষণ যে রিপোর্ট বা প্রতিবেদন রচনা, তা পেশ বা সম্প্রচার করা, তাকে বিশেষ কোনো উদ্দেশ্যহীন বা নৈমিত্তিক ব্যাপার বলাও ঠিক হবে না। সোজা কথায় সংবাদপত্রে প্রতিবেদন ছাপানোটাকে যদি কেউ মনে করেন মাঝে-মাঝে ঘটে যাওয়া ব্যাপার-স্যাপার তাহলে বিসমিল্লাতেই গলদ থেকে যাবে। রিপোর্টের যে আলাদা গুরুত্ব আছে সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে সেটাকে অস্বীকার করা মানে সংবাদপত্রকে কতগুলি ছাপানো অক্ষর ও ছবির ঝুড়িতে টেনে নামানো। কিংবা বলা যায়, তা করলে সংবাদপত্রকে জোলো করে ফেলা হবে, আকর্ষণ, চাহিদা কিছুই থাকবে না পাঠকের কাছে। এতে ব্যবসা মার খাবে। আর সংবাদপত্রকে যাঁরা আদর্শগত সংগ্রামের হাতিয়ার হিসাবে ব্যবহার করতে চান সেটাও নষ্ট হবে। তা যাতে না হয় অর্থাৎ সংবাদপত্র যাতে বেশি বেশি করে পাঠক আকর্ষণ করতে পারে, তাঁদের সংগঠিত, শিক্ষিত, উদ্দীপিত করতে সক্ষম হয়, টাটকা তাজা খবর গরম গরম পরিবেশন করতে পারে সেজন্য প্রতিবেদনের রয়েছে ব্যাপক-গভীর সোচ্চার ভূমিকা। কাজে কাজেই, নিয়মিত প্রতিবেদন প্রকাশ করাটা সংবাদপত্রের দীর্ঘমেয়াদি পরিকল্পনারই অর্ন্তগত। এই ধরনের লেখার মধ্যে রয়েছে উঁচু মানের রাজনৈতিক ও আদর্শগত গুরুত্ব।

কিন্তু রিপোর্টটা আপনি লিখবেন কেমন করে? প্রতিবেদন রচনার জন্য আপনি কীভাবে জোগাড় করবেন তার উপকরণ, মাল-মশলা? প্রস্তুতিই বা নেবেন কীভাবে? ধরুন আপনাকে কোনো একটি ঘটনার ওপর প্রতিবেদন তৈরি করতে বলা হয়েছে। বলা তো হল, কিন্তু আপনি কীভাবে এগোবেন আরোপিত কর্তব্যটি সম্পাদন করতে?

সাংবাদিক হিসাবে আপনার ওপর দায়িত্ব বর্তানোর সঙ্গে সঙ্গে আপনি ঘটনাটির বিষয়ে খোঁজ-খবর নেওয়া শুরু করবেন। রিপোর্টটি সুষ্ঠুভাবে লেখার জন্য আপনি যা যা দরকারি বলে মনে করবেন তা জোগাড় করতে উঠে পড়ে লাগবেন বেশ বুদ্ধিমত্তার সঙ্গে। মনে রাখবেন রিপোর্টাররা হন খুব চালাকচতুর, সতর্ক, ক্ষুরধার বুদ্ধিসম্পন্ন ও রসিক। বাক্-বৈদগ্ধ্য তাঁদের স্বভাবের কবচকুণ্ডল। চোখ-কান সবসময়ে খোলা রাখতে হয় প্রতিবেদককে। আবার কখনো কখনো তাঁদের গবেষকদের দায়িত্বও পালন করতে হয়।

ধরা যাক যে ঘটনার ওপর প্রতিবেদন তৈরির দায়িত্ব পেয়েছেন সেই ঘটনার ওপর ইতোমধ্যেই নিউজ এজেন্সি থেকে সংবাদ এসে গিয়েছে আপনার পত্রিকা দপ্তরে। কিন্তু আপনার বিবেচনায় মনে হল প্রেরিত তথ্য যথেষ্ট নয়। এবার শুরু হল রিপোর্টার হিসাবে আপনার অভিযান। পুলিশ থেকে শুরু করে যাবতীয় নির্দিষ্ট সূত্র থেকেও আপনি জোগাড় করলেন অতিরিক্ত কিছু তথ্য। তাতেও আপনার মনে হল পাঠকের কৌতূহল বজায় রেখেও তাঁদের চাহিদা মেটানোর মতো রশদ নেই। সম্ভব হলে নিজেই এবার যাবেন ঘটনাস্থলে। ঘটনাস্থলে যা যা দেখলেন সেগুলোও আপনার প্রতিবেদক-দৃষ্টিকে খুশি করতে পারছে না। বারবার মনে হচ্ছে শাদা চোখে ঘটনাটার যা যা দেখছেন, শুনছেন, জানতে পারছেন, সেখানেও কোথায় যেন ফাঁক রয়েছে। মন বলছে, ডাল মে কুছ্ কালা হ্যায়। আপনার মন তখন আতালি-পাতালি করছে, গোয়েন্দা কুকুরের মতো গন্ধ শুঁকে বেড়াচ্ছে সব কিছুতেই আপনার ঘ্রাণেন্দ্রিয়। ঘটনার ভিতর থেকে বের করে আনতে চাইছে গোপন তথ্য, আসল সত্য।

এসব ক্ষেত্রে নানা জনের সঙ্গে আপনাকে কথা বলতে হবে। একের পর এক খুব কৌশলী, সতর্ক প্রশ্ন করে বুঝবার চেষ্টা করবেন ব্যাপারটা কী। এজন্য প্রতিবেদক হিসাবে সুন্দর সুন্দর কথা বলার আর্ট আপনাকে রপ্ত করতে হবে। এভাবে নানা দিক থেকে যে মালমশলা আপনি পাবেন তা থেকে ঝাড়াই-বাছাই করে, দরকার মতো যুক্তিসিদ্ধ তথ্যপ্রমাণ দিয়ে তৈরি করবেন আপনার পত্রিকার জন্য নির্দিষ্ট প্রতিবেদনটি। খেয়াল রাখবেন পরিমাণের সঙ্গে যেন উৎকর্ষের মেলবন্ধন ঘটে। বিষয় অনুযায়ী ভাষাশৈলীর সংহতিসাধন করবেন। কল্পনার উদ্দামতা, আবেগের আতিশয্য অবশ্যই ছেঁটে ফেলবেন প্রতিবেদন থেকে। তাই বলে ভাষা যেন কাঠ-কাঠ না হয়। গদ্য হবে ঝরঝরে, মেদবর্জিত। কারো ওপর দোষ চাপাবার চেষ্টা করবেন না সন্দেহবশত, কিংবা অদৃশ্য ব্যক্তির হয়ে কাজ করবেন না। অনুমানের ওপর ভরসা করে প্রতিবেদনকে একপেশে করে তোলাও সাংবাদিকের কাজ নয়। আর যখন দেখবেন নানা ধরনের গোলমেলে বা বিপরীতধর্মী তথ্য পাচ্ছেন তখন প্রাপ্ত তথ্যসমূহ যাচাই করে নেবেন ক্রশ চেকিং করে। তারপর নিজের বিবেচনামতো ঠিক করে ফেলবেন কী কী রাখবেন, কতটুকু রাখবেন এবং কেন রাখবেন। এক্ষেত্রে সংবাদপত্রের স্বার্থ, তার চরিত্র ও লক্ষ্যকে অবশ্যই বেশি গুরুত্ব দিয়ে বিবেচনা করবেন।

তাহলে গণমাধ্যমের জন্য প্রতিবেদন লিখতে গেলে আপনি কীভাবে এগোবেন? এক কথায় এর কোনো জবাব হয় না। নেই কোনো বাঁধা গৎ-ও। তবে আপনি ইচ্ছে করলে নিচে উল্লিখিত উপায়গুলি একবার ভেবে দেখতে পারেন। অর্থাৎ আপনাকে জানতে হবে—

- ঘটনার প্রকৃতি বা বিষয়টি কী ধরনের।

- কী অবস্থায় কী কারণে কেমনভাবে ঘটনাটা ঘটল। এক্ষেত্রে ভেবে-চিন্তে এগোবেন, মুহূর্তের মধ্যে কোন সিদ্ধান্ত নেবেন না।

- বিষয়টির ক্ষেত্রে নির্দিষ্ট সমস্যাটা কী তা বিভিন্ন দিক থেকে যাচাই করতে হবে, সমস্যার সমাধান কীভাবে করা যায় তার ইঙ্গিত পারলে যোগাড় করবেন এবং এটা করতে পারেন বিশেষজ্ঞ-অবিশেষজ্ঞ যাঁকে যাঁকে হাতের কাছে পাবেন তাঁদের থেকে। এক্ষেত্রে প্রতিবেদক হিসাবে আপনি বিষয় অনুসারে এমন কিছু লোক বাছাই করে নেবেন যাঁদের সঙ্গে কথা বললে আপনি বেশ কিছু তথ্য পেতে পারেন। এজন্য গণসংগঠন, ট্রেড ইউনিয়ন, সরকারি আমলা, পুলিশ, বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি পরিষেবামূলক প্রতিষ্ঠান, রাজনৈতিক দল ইত্যাদির কাছে প্রশ্ন রাখতে পারেন—

  (i) সমস্যা বা বিষয়টি সম্পর্কে স্বচ্ছ ধারণা আছে এমন ব্যক্তিটি কে বা কারা?

  (ii) তাঁদের মধ্যে আবার বিষয়টি সম্পর্কে কার জ্ঞান ও অন্তর্দৃষ্টি সবচেয়ে তীক্ষ্ণ?

  (iii) সমস্যার সুরাহার পথ কে বাতলে দিতে পারেন?

একটা জিনিস খেয়াল রাখবেন, অনেক সময় নোট নিতে গেলে বিপত্তি ঘটতে পারে। অর্থাৎ সাংবাদিক নোট নিচ্ছেন দেখলে উত্তরদাতা গুটিয়ে যেতে পারেন, খোলামেলা আলোচনা না-ও করতে পারেন। সেক্ষেত্রে যথাসাধ্য স্মৃতিতে ধরে রাখবেন উত্তর, তাঁর সামনে কিছুই লিখবনে না। বরং তাঁর সঙ্গে মিশবার, কথা বলবার চেষ্টা করবেন বন্ধুর মতো বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করে।

- সব কিছু জানা-শোনা-বোঝার পর নিজের ক্ষমতা যাচাই করে ঠিক করে নেবেন ব্যাপারটা প্রতিবেদন রচনার উপযোগী কিনা।

- প্রতিবেদনে আপনি ঘটনা বা বিষয়টির কোন্ দিকের ওপর ঝোঁক দেবেন বেশি সেটাও ঠিক করে নেবেন। এক্ষেত্রে আপনি নিজেকেই নিজে কিছু প্রশ্ন করে মনে মনে জবাব তৈরি করে নিতে পারেন। তা হল,

  (i) আমার প্রতিবেদনের কোন্ অংশ পাঠক-দর্শক শ্রোতাকে বেশি নাড়া দেবে, উন্নতি ঘটাবে, চেতনা বাড়াবে?

  (ii) কোন্ মানসিকতা কাজ করেছিল ঘটনাটার মূলে?

  (iii) ঘটনা ঘটার কারণ যা যা তা জানানো হলে পাঠকের-দর্শকের-শ্রোতাদের কী প্রতিক্রিয়া ঘটতে পারে?

  (iv) ঘটনাটা পাঠকের কাছে কোন্ বার্তা পৌঁছে দেবে?

- ঘটনা সম্পর্কে যাবতীয় তথ্য, পরিসংখ্যান ইত্যাদি আপনার জানা থাকা জরুরি।
- মূল প্রশ্নটির উত্তর বিশদভাবে আপনি জানবার চেষ্টা করবেন।

একের পর এক সমস্ত বা অধিকাংশ জিজ্ঞাসারই যখন জবাব আপনি হাতের মুঠোয় পেয়ে যাবেন তখনই লিখতে শুরু করবেন নিজের প্রতিষ্ঠানের জন্য প্রতিবেদনটি। সমস্ত প্রক্রিয়াটিই খুব দ্রুত সেরে ফেলবেন। রয়ে-সয়ে দেখছি-দেখব করে সময় কাটালে রিপোর্টের প্রয়োজনীয়তা যে ফুরিয়ে যায় সেটা কিন্তু খেয়ালে রাখবেন। রিপোর্ট হল গণমাধ্যমের চট্‌জলদি তৈরি খাবার।

এরপর সমস্ত উপকরণ নিয়ে আপনি একে একে নিচের প্রশ্নের উত্তর দেবেন আপনার লেখা প্রতিবেদনটিতে। অবশ্য নিউজ আইটেমের ক্ষেত্রেও এইসব প্রশ্নের জবাব দিতে হয় সাংবাদিককে। প্রশ্নগুলি হল,

- কে বা কারা?
- কবে, কখন, কোথায়?
- কী
- কীভাবে?
- কেন?
- কীসের জন্য?

প্রতিবেদন তৈরির সময়ে প্রতিবেদক হিসাবে আপনি ভুলে যাবেন না পুরনো দিনের কথা। ভালো প্রশ্নের সব সময়েই মেলে ভালো উত্তর। পাশাপাশি মনেও আনবেন না সেই কথাটা—খোশ খবরের ঝুটাও ভালো।

একথা ঠিক প্রতিবেদন হল সংবাদ মাধ্যমের বিভিন্ন অংশের মধ্যে একটু সহজ সর্ববোধগম্য সংরূপ, যদিও এটারই চাহিদা সবচেয়ে বেশি পাঠক-শ্রোতা-দর্শকের কাছে। তবে সব প্রতিবেদনই আবার লেখা সহজ নয়। অর্ন্ততদন্তমূলক প্রতিবেদন রচনা তো খুবই জটিল। সেখানে বিচক্ষণতার সঙ্গে আইনি অভিজ্ঞতা থেকে নানা বিষয়ে অধীত বিদ্যার ছাপ রাখতে হয়। কোনো কোনো ক্ষেত্রে পেশাদার গোয়েন্দাও হার মেনে যেতে পারেন প্রতিবেদকের রিপোর্টের কুশলতার কাছে।

প্রসঙ্গত, কেউ কেউ প্রশ্ন তুলতে পারেন ভালো প্রতিবেদন বলতে আমরা সচরাচর কী বুঝি। সর্বজনবোধ্য ভাষায়, সরস লিখন শৈলীতে কোনো জটিল বিষয়কে যখন তথ্যসমৃদ্ধ করে ও পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে পাঠকের সামনে পরিবেশন করা হয় তাকে ভালো প্রতিবেদন বলা যেতে পারে। এখানে

মনে রাখবেন চমৎকার প্রতিবেদনের ভাষাও হবে ঝকঝকে, জনচিত্তজয়ী অথচ থাকবে তাতে মেধার দ্যুতি, মননের ছাপ। যুক্তির পরাম্পর্য রক্ষিত হবে প্রতিবেদনের মধ্যে, আবার তা পড়তে পড়তে বা শুনতে শুনতে কিংবা দেখতে দেখতে পাঠক-শ্রোতা-দর্শকের মধ্যে জাগবে অপার কৌতূহল। প্রতিবেদক এমনভাবে প্রতিবেদন পরিবেশন করবেন যাতে গ্রাহক তাঁর রিপোর্টকে গিলে ফেলতে চাইবেন খুব তাড়াতাড়ি। এক কথায় প্রতিবেদন হবে সহজবোধ্য, নাতিদীর্ঘ কিন্তু স্বয়ংসম্পূর্ণ।

অনেক ভালো প্রতিবেদন প্রথম পুরুষে লেখা যেতে পারে। লেখাও হয়েছে। এই ধরনের প্রতিবেদনে প্রতিবেদক নিজের মতামত প্রকাশের সুবিধা নিতে পারেন, নিয়েও থাকেন অনেকে। তবে উত্তম পুরুষে রচিত প্রতিবেদনে একটা বিপদের সম্ভাবনাও নিহিত থাকে। কেউ কেউ প্রতিবেদনের শুরুতেই এমন বেমক্কা মন্তব্য করে বসেন যার ফলে প্রতিবেদনের গ্রাহক হারিয়ে ফেলেন যাবতীয় আগ্রহ। এতে প্রতিবেদনের উদ্দেশ্যটাই মার খেয়ে যায়। কাজে কাজেই আপনি যদি প্রথম পুরুষে প্রতিবেদন তৈরি করবেন বলে মনে করেন, তাহলে গোড়াতে আপনার কোনো মন্তব্য চাপিয়ে দেবেন না। কোনো সিদ্ধান্তও জানাবেন না। এখানে প্রতিবেদককে হতে হবে কিছুটা নৈর্ব্যক্তিক।

প্রসঙ্গত আসে প্রতিবেদনের বিন্যাস নিয়ে দু-চার কথা। বলাই বাহুল্য, এই বিন্যাসের ব্যাপারটা পুরোপুরি নির্ভর করে বর্ণিত বিষয়ের ওপর। আবার কখনো কখনো তা সাংবাদিকের বিশেষ ঝোঁকের ওপরও দাঁড়ায়। এমন কি, কোনো ব্যাপারে যদি সাংবাদিক বা প্রতিবেদক বিশেষত বা স্পেশালিস্ট হন তবে তাঁর সেই বিশেষ জ্ঞানের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে পারে প্রতিবেদনের বিন্যাস। এর ফলে লাভবান হন সকল পক্ষই। প্রথমত সাংবাদিকের ইচ্ছাপূরণ হল, প্রতিষ্ঠানের সুনাম বৃদ্ধি পায়, পাঠক-শ্রোতা-দর্শক অনেক অজানা তথ্যের হদিশ পান। তাই—

- প্রতিবেদক হিসাবে প্রথমেই আপনাকে ঠিক করে নিতে হবে যে প্রতিবেদনটিতে আপনি কী বলতে বা জানতে বা শোনাতে চাইছেন।
- ঘটনাকে ঘিরে যেসব তথ্য আপনি যোগাড় করেছেন, একটা ধারণাও গড়ে নিয়েছেন মনে মনে, তার থেকে আপনাকে বেছে নিতে হবে কী কী আপনি ব্যবহার করবেন পাঠকের-শ্রোতার-দর্শকের কৌতূহল মেটাতে, বিশ্বাসযোগ্যতা অর্জন করতে এবং সমীহ আদায় করতে।
- প্রাপ্ত ও নির্বাচিত তথ্যগুলিকে কত সুন্দরভাবে, যুক্তিসহ নিপুণতার শব্দে পরিবেশন করতে পারেন সেটাই হবে মূল লক্ষ্য। এটা রপ্ত করা খুব সহজ নয়, বেশ অনুশীলন সাপেক্ষ।

উল্লিখিত বিভিন্ন ধাপকে সচেতনভাবে প্রতিবেদন তৈরির কাজে লাগিয়ে আপনাকে প্রমাণ করতে হবে সত্যিসত্যিই আপনি একজন ঝকমকে রিপোর্টার।

এবারে দেখা যাক প্রতিবেদন কীভাবে বিন্যস্ত করা যায়।

- প্রথমেই বুঝে নিতে হবে যে বিষয়ে বা ঘটনাকে নিয়ে প্রতিবেদন তৈরি করতে হবে তার উদ্দেশ্য কী। রিপোর্ট সব সময়েই তৈরি হয় সদ্য ঘটে যাওয়া ঘটনার ওপর বিস্তৃত সংবাদ নিয়ে। সেখানে ঘটনাটিকে বিশদভাবে প্রত্যক্ষ করানো, মূল্যায়ন ঘটানো ও সাধারণের জানার কৌতূহল মেটানো প্রধান কাজ। যে গণমাধ্যমে বেশি বেশি করে গ্রাহকের চাহিদা পূরণের ব্যবস্থা থাকে বা গ্রাহককে অধিক সংখ্যক সংবাদ সরবরাহ করে সেই গণমাধ্যমটি লাভ করে গ্রাহক-সমৃদ্ধি।

- দ্বিতীয় ধাপে পরীক্ষা ও শ্রেণিবিভাজন করে বুঝে নেবেন যে খবরগুলি, বা তথ্যসমূহ আপনি যোগাড় করেছেন তা প্রতিবেদনের জন্য নির্ধারিত বিষয়টির নিখুঁত ছবি তুলে ধরার পক্ষে যথেষ্ট কি না। মনে রাখতে হবে, পাঠক-শ্রোতার কাছে রিপোর্ট এঁকে দেয় ঘটনার বিশদ জীবন্ত বর্ণনা।

- তৃতীয় পর্যায়ে দেখতে হবে আপনি যে প্রতিবেদনটি তৈরি করেছেন সেজন্য সংবাদের তথ্য নির্বাচন নির্ভুল হয়েছে কিনা। আপনি রিপোর্ট করার জন্য যা যা খবর সংগ্রহ করবেন তার অনেক কিছুই একসময় আপনার মনে হবে অপ্রয়োজনীয়। এক্ষেত্রে আপনি আপনার সংগৃহীত তথ্যগুলি ভালোভাবে ঝাড়াই-বাছাই করে নেবেন গ্রাহকের কৌতূহল মেটানো ও সন্ধিৎসা বাড়ানোর জন্য। এর পরেই প্রতিবেদন তৈরি করা বাঞ্ছনীয়।

- সংগৃীহত ও নির্বাচিত তথ্যগুলিকে যুক্তি পরম্পরায় ও বিশ্বাসযোগ্যতার মাপকাঠিতে পরপর সাজিয়ে ভাষার বুনুনিতে গেঁথে তুলবেন আপনার প্রতিবেদনটি। প্রত্যেক প্রতিবেদনের থাকে একটি ছোট্ট ভূমিকা যাকে বলা হয় Intro। তাকে অনুসরণ করে গড়ে উঠবে শরীর। সবশেষে উপসংহার। অবশ্য অবয়বকে আপনি পয়েন্ট অনুসারে কয়েকটি ছোট ছোট অনুচ্ছেদে ভাগ করে সাজিয়ে নিতে পারেন।

- Intro বা ভূমিকাটিকে আকর্ষণীয় করে তুলতে মোটেও কসুর করবেন না। বরং এখানেই উস্‌কে দেবেন পাঠকের আগ্রহ। যা বলবেন তা যেন সরাসরিই পাঠক-শ্রোতা-দর্শক বুঝতে পারেন, এটা খেয়াল রাখবেন। কোনরকম ভাষার মারপ্যাঁচ, অলংকারের ঝংকার বা বাগাড়ম্বর ভূমিকায় থাকবে না। এই লক্ষ্য পূরণ হতে পারে নানা পদ্ধতিতে।

১১৯.৪ সারাংশ

উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে সাংবাদিকতা একটি আকর্ষণীয় বিষয়। বৃত্তি হিসাবে তা মর্যাদাপূর্ণ, চমকপ্রদ-ও। শিল্পব্যবসায়ে এর গুরুত্ব বর্ধমান। সাংবাদিকতায় একদিকে থাকে নিশ্চয়তা, পাশাপাশি নিহিত সমাজের প্রতি দায়িত্ব ও কর্তব্য। সাংবাদিকতার মধ্যে থাকে জনগণকে শিক্ষিত, সংগঠিত, উদ্দীপিত করার শক্তি। তা নিছক যৌথ প্রচারক ও আন্দোলনকারী নয়, তা সম্মিলিত সংগঠকও। এ হেন সাংবাদিকতার প্রকাশ ঘটে লিখিত মাধ্যম হিসাবে সংবাদপত্রে, নিউজ এজেন্সিতে এবং বৈদ্যুতিন মাধ্যম হিসাবে বেতার, দূরদর্শন ইত্যাদিতে। আবার, সাংবাদিকতায় রয়েছে নানা ধরনের সংরূপ বা Genre। প্রতিবেদন হল বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ সংরূপ। এর প্রারম্ভিক অনুচ্ছেদটিকে বলে ‘লীড’। এই ‘লীড’ বা প্রথম অনুচ্ছেদ রচনার সময় ‘ছয়-ক’ মেনে চলতে হয়। যেগুলি হল—(১) কে? (২) কী? (৩) কখন? (৪) কোথায়? (৫) কেন? (৬) কেমন করে? বাস্তবিকই, প্রতিবেদনের ‘লীড’ বা ভূমিকা বা প্রারম্ভিক অনুচ্ছেদটিকে যেমন করে তুলতে হয় আকর্ষণীয়, কৌতূহলোদ্দীপক, তেমনি উপসংহার হবে পুরোপুরি বাহুল্যবর্জিত, টানটান। তবে বিষয় ও রিপোর্টের আঙ্গিকটি যাতে গ্রাহকের অভিজ্ঞতার মধ্যে থাকে, সেটা খেয়াল রাখবেন।

রিপোর্টের অবয়বেই থাকবে বিশদ বিবরণ। সেখানেই ঘটবে তথ্যের সমাবেশ। তবে নীরস সংখ্যাতত্ত্বে ঠেসে দেবেন না আপনার যত্নে গড়ে তোলা প্রতিবেদনটিকে। এতে পাঠক বিভ্রান্ত হন। আর বিষয়ের গুরুত্ব, গ্রাহকদের মনস্তত্ত্ব বুঝে নিয়ে অবয়বটির বিস্তৃতি ঘটাবেন। কোথাও পাণ্ডিত্য দেখানোর চেষ্টা করবেন না।

উপসংহার হবে সবসময়েই ছোট্ট। এখানেই আপনি প্রতিবেদনটির নির্যাস পরিবেশন করতে পারেন। পরিস্থিতির মূল্যায়নও ঘটাতে পারেন এখানে।

১১৯.৫ অনুশীলনী

ক. ছোট প্রশ্ন

নিচে একটি ছোট প্রশ্ন আর তার উত্তরে নমুনা দেওয়া হল। লক্ষ্য করুন উত্তর একটি বাক্যে সম্পূর্ণ হচ্ছে। এর জন্য বরাদ্দ নম্বর ১।

প্রশ্ন ঃ ‘সংরূপ’ পরিভাষাটি কোন্ ইংরেজি শব্দের প্রতিশব্দ?

নমুনা উত্তর ঃ ‘সংরূপ’ পরিভাষাটি ইংরেজি Genre শব্দের প্রতিশব্দ।

ছোট প্রশ্নের উত্তর কীভাবে লিখতে হয় দেখলেন। এবার, একটি করে বাক্যে নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর লিখুন।

১। প্রতিবেদন শব্দটি কোন্ ইংরেজি শব্দের প্রতিশব্দ?

২। গণমাধ্যমকে কি বিশ্বের বাতায়ন বলা যায়?

৩। জন্মসূত্রে কি কেউ সাংবাদিক হন?

৪। প্রুফ সংশোধক কি সাংবাদিক?

৫। প্রতিবেদনের গদ্য কীরকম হয়?

খ. মাঝারি প্রশ্ন

নিচে একটি প্রশ্ন, আর তার উত্তরের নমুনা দেওয়া হল। লক্ষ্য করুন উত্তরের দৈর্ঘ্য খুব বড়ো নয়। সাধারণত ৫/৬টি বাক্যে এ ধরনের প্রশ্নের উত্তর দিতে হয় এবং প্রশ্নের মান ৫। অর্থাৎ এ ধরনের প্রশ্নের উত্তরের জন্য নম্বর বরাদ্দ ৫।

প্রশ্ন ঃ পাঠ্যবিষয় হিসাবে সাংবাদিকতার বিশেষত্ব কোথায়? ৬/৭টি বাক্যে লিখুন।

নমুনা উত্তর ঃ পাঠ্যবিষয় হিসাবে সাংবাদিকতা বেশ আকর্ষণীয় ও রোমাঞ্চকর। সামাজিক মর্যাদায় ও স্বাতন্ত্র্যে তা উজ্জ্বল। ব্যবহারিক জীবনেও পেশা হিসাবে সাংবাদিকতার স্থান অনেক উচ্চে। কোনো কোনো ক্ষেত্রে বিশেষ করে আদর্শগত সংগ্রামের শাণিত লেখনী-অস্ত্র হল সাংবাদিকতা। এই বিষয়টি কখনওই মুখস্থবিদ্যার প্রদর্শনী নয়। এ হল হাতে-কলমে দেখানোর বিষয়। এর প্রায়োগিক দিকটিই সবচেয়ে মূল্যবান।

এবার নিচের প্রশ্নগুলির উত্তর পাঁচ-ছটি বাক্যে লিখুন।

গ. বড় প্রশ্ন

১। প্রতিবেদন কীভাবে বিন্যস্ত করা হয়, তা ১০টি বাক্যে লিখুন।

২। আমাদের জীবনে সংবাদের গুরুত্ব কোথায়, আলোচনা করুন।

৩। সাংবাদিক হতে গেলে কী কী বৈশিষ্ট্য থাকা চাই, উল্লেখ করুন।

১১৯.৬ গ্রন্থপঞ্জি

১। এফ. ফ্রেজার বন্ড : *সাংবাদিকতার গোড়ার কথা।*

২। শৈলেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় : *সংবাদপত্রের রূপায়ণ।*

৩। H.W. Steed : *The Press.*

একক ১২০ ❑ সাংবাদিক সংরূপ ও প্রতিবেদনের শিরোনাম

গঠন

১২০.১ উদ্দেশ্য

১২০.২ প্রস্তাবনা

১২০.৩. মূলপাঠ

১২০.৩.১ সাংবাদিক সংরূপ

১২০.৩.২ হেডলাইন বা শিরোনাম

১২০.৪ সারাংশ

১২০.৫ অনুশীলনী

১২০.৬ গ্রন্থপঞ্জি

১২০.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি মনোযোগ সহকারে কয়েকবার পড়ুন। তাহলেই আপনি মনে মনে গড়ে নিতে পারবেন,

- সাংবাদিকতা অর্থাৎ Journalism শব্দটি কীভাবে তৈরি হয়েছে সে সম্বন্ধে একটি ধারণা।
- সাংবাদিকতা বলতে ঠিক কী বোঝায় সেটাও আপনি জানতে পারবেন এই এককটি পাঠ করলে।
- সাংবাদিকতার সঙ্গে প্রেসের স্বাধীনতার ব্যাপারটা কেন গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠল, স্বাধীনতা বলতেই বা কী বোঝায় সেসব ব্যাপারে আপনি নিজের মতামত তৈরি করে নিতে পারবেন এই এককটির মধ্যস্থতায়।
- সাংবাদিকতার কাজে দায়িত্ব কতখানি সে সম্বন্ধেও একটা সাধারণ ধারণা গড়ে উঠবে এখানে।
- সংরূপ বা Genre বলতে কী বোঝায়, সংরূপ বিচারের মান কী কী, তাদের পার্থক্য কোথায় এবং সাংবাদিক হিসাবে আপনি কখন কোন্ সংরূপটি ব্যবহার করবেন সে সম্পর্কে একটি ধারণা তৈরি করে নিতে পারবেন এই এককটি কয়েকবার পাঠ করলে।

- সাংবাদিক-সংরূপ বা জার্নালিস্টিক জেন্‌রের অবয়ব নিয়ে বিভিন্ন মতের সন্ধান পাবেন এখানে।
- বিভিন্ন সাংবাদিক-সংরূপের দৃষ্টান্ত লক্ষ্য করতে পারবেন এই এককটিতে। এর ফলে তত্ত্ব ও তার প্রয়োগের ব্যাপারে আপনার মনে কোন সংশয় হয়তো দেখা দেবে না।
- হেডলাইন বা শিরোনামের গুরুত্ব কোথায়, এবং বিশেষ করে মুদ্রিত প্রতিবেদনে শিরোনাম দানের পদ্ধতি কী, সে বিষয়েও আপনি একটি ধারণা গড়ে নিতে পারবেন এই এককটির মধ্য দিয়ে।

১২০.২ প্রস্তাবনা

প্রেস বা সংবাদপত্রের জগতকে কেউ কেউ বহুমস্তকবিশিষ্ট দৈত্যের সঙ্গে তুলনা করতে ভালোবাসেন। আবার অনেকেই মনে করেন গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র ব্যবস্থায় স্বাধীনতার রক্ষাকবচ। তা যাঁরা যে চোখেই দেখুন না কেন সংবাদ হল জীবনের অস্তিত্বের জন্য প্রয়োজনীয় রক্ত। একে বলা যায় প্রাণরস বা প্রাণশক্তি। কেউ কেউ তাই বলেন, জনগণ যা চায়, তাদের তাই দেওয়া হল সাংবাদিকতার কাজ। উল্টোদিকে কেউ কেউ বলেন, যে সত্য জনগণের জানা বিশেষ দরকার, তাদের তা জানতে দাও। এই দুই মতবাদের মধ্যে যে সত্যটিকে কোনভাবেই আর ঢেকে রাখা যায় না তা হল সংবাদপত্রের স্বাধীনতার ব্যাপারটা। সব দেশেই সর্বকালেই এই ব্যাপারটা নিয়ে নানান মতের চাপান-উতোর আছে, ছিল, থাকবেও হয়তো। তবে একথা সত্য, আগেকার দিনে শাসক ও ধর্মযাজকেরা সেই সংবাদই প্রচার করতে দিতেন যা তাঁদের পক্ষে নিরাপদ। তাঁদের মতের বিরোধী সবরকম সংবাদই শাসক ও পুরোহিত-মোল্লা-যাজকেরা চেপে দিতেন। কারণ তাঁরা ভয় পেতেন বাইবেলের সেই অমোঘ বাক্যটি—‘সত্যই তোমায় মুক্ত করবে’। একালের শাসকেরাও মেনে নিতে পারেন না রবীন্দ্রনাথের কথা—

মনেরে তাই কহো যে,
ভালো মন্দ যাহাই আসুক
সত্যেরে লও সহজে।

সাংবাদিকতা যে সামাজিকভাবেই অপরিসীম মূল্যবান, নির্ভীক চিত্তে উন্নতশির দায়িত্ববোধসম্পন্ন এবং উচ্চতর মর্যাদাপন্ন সে বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। বর্তমান বিশ্বে যেদিন থেকে জীবনের সূচনা সেদিন থেকেই মানবসমাজে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে এসেছে সংবাদ। না, শুধু মানুষের ক্ষেত্রেই নয়, অন্যতর প্রাণীজগতেও এর ভূমিকা ন্যূন নয়। কীটপতঙ্গ থেকে জীবজন্তুও বুঝতে পারে কীসে

তাদের বিপদ আসছে এবং তা মুহূর্তের মধ্যে তারা নিজেদের সমাজে এক-এক উপায়ে দ্রুত ছড়িয়ে দেয়। এই যে বিপদের সম্ভাবনা ছড়িয়ে দেয় সেটাই তো সংবাদ। সঠিক সময়ে সঠিক বার্তার বিকল্প আর কিছু কি হতে পারে? সংবাদের জন্যই তো ঘুরঘুর করেন গুপ্তচর, সোর্স পোষেন রাষ্ট্রদূত-প্রশাসন-সরকারি ও সরকারবিরোধী দল, প্রতিষ্ঠান, সংগঠন। শোষণ-শাসন-ত্রাশন অক্ষুণ্ণ রাখতে, স্থিতাবস্থা বজায় রাখতে বা পাল্টে দিতে সকলেই চায় প্রচারযন্ত্রকে নিজেদের মতো করে ব্যবহার করতে। অর্থাৎ যেদিক থেকেই বিচার করে দেখা যাক না কেন, প্রেস বা সংবাদপত্র-বেতার-দূরদর্শন ইত্যাদি গণমাধ্যম হল সমাজসেবার সমাজশোষণের এক প্রধান হাতিয়ার। সাংবাদিকতা সে কারণেই এত গুরুত্বপূর্ণ।

সেই সাংবাদিকতার প্রকাশ ঘটে নানামুখী সাংবাদিক-সংরূপে। এর মধ্যে আবার প্রতিবেদনের স্থান খুবই উঁচুতে।

১২০.৩ মূলপাঠ

১২০.৩.১ সাংবাদিক সংরূপ

সাংবাদিকতা শব্দটি এসেছে সংবাদ + ইক + তা হয়ে। মানে হল সাংবাদিকের কাজ। বিশেষ্য। এটাও আপনি জানেন যে সংবাদ শব্দটির বুৎপত্তি হল সম্‌ + √বিদ্‌ (বলা) + অ। অর্থাৎ বিবরণ, বৃত্তান্ত। এই তাৎপর্যেই মনসামঙ্গলে পাবেন—

'পদ্মার সংবাদ সব মৎস্যগণ জানে।'

আবার, সংবাদ বলতে বোঝায় বার্তা, খবর, সমাচার, সন্দেশবাক্য। কৃত্তিবাস তাই বলেন—

'আমার সংবাদ কহ রাজার গোচরে।'

কিংবা, সংবাদ লইয়া বিপ্র চলিল সত্বর।'

সাংবাদিকতাকে ইংরেজিতে বলে Journalism (জার্নালিজম্‌)। শব্দটি এসেছে লাতিন diurnalis থেকে diurnal হয়ে প্রাচীন ফরাসিতে Journal-এর ভিতর দিয়ে। মধ্যযুগীয় ইংরাজিতে তা Journal হল। এর সঙ্গে ist যুক্ত হয়ে যেমন জার্নালিস্ট বা সাংবাদিক হল, তেমনি ism যুক্ত হয়ে হল জার্নালিজম্‌ বা সাংবাদিকতা। অনেকে আবার জার্নালিজম্‌ শব্দটির শিকড় খুঁজে পান DIURNA-র মধ্যে। প্রাচীন রোমে যে প্রথাগত ঘোষণার মধ্য দিয়ে সেনেটের সব গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত এবং অন্যান্য খবরও জানিয়ে দেওয়া হত প্রকাশ্য জায়গায় একই নোটিশের একাধিক নকল ঝুলিয়ে বা সেঁটে দিয়ে তাকে বলা হত ACTA DIURNA এবং এর ভূমিকা রোমক সমাজে ছিল খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এখানে বলা ভালো যে

Journalism শব্দটি আদিতে যে অর্থ বোঝাত এখন তা ছাপিয়ে গিয়েছে অনেকখানি, ঘটেছে অর্থের বিস্তার।

প্রশ্ন হল, সাংবাদিকতা বা জার্নালিজম বলতে কী বোঝায়? মুদ্রণ বা লিখন, চিত্রণ বা কথন, অথবা পারস্পরিক সংযোগে নানাধরনের তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা প্রবাহকে তুলে ধরে এবং জনগণের বিভিন্ন স্তরের মধ্যে প্রভাব বিস্তার করে বিশেষ গুরুত্ব পায় এমনই একটি প্রক্রিয়া। সেই সঙ্গে এটি একটি শিক্ষার বিষয় বা জীবিকার উপায়। অন্যদিকে সাংবাদিকতা সমাজসেবার মাধ্যম বা অভিজাত ব্যবসা বা সমাজ পরিবর্তনের অন্যতম অনুঘটক বা আদর্শ বিস্তারের-সংগ্রামের-সংগঠকের কর্মধারা ও অনুষঙ্গ। বস্তুত, একালে সাংবাদিকতা বলতে বোঝায়, সংবাদ ও সংবাদভিত্তিক আলোচনা, মন্তব্য ইত্যাদি জনগণের কাছে কোন মাধ্যমের সাহায্যে পৌঁছে দেওয়া। এই পৌঁছে দেওয়ার ব্যাপারটায় যে উপকরণগুলো লাগে বা থাকে তাতে সবচেয়ে কার্যকর ভূমিকা নিয়ে থাকেন যাঁরা তাঁরা হলেন সাংবাদিক। সত্য প্রকাশ ও পরিবেশনের তাগিদে উত্তর-পূর্ব-পশ্চিম-দক্ষিণ (N = North, E = East, W = West, S = South > NEWS) অর্থাৎ এই পৃথিবীর চারদিক থেকে খবর জোগাড় করে এবং তার সত্যতা যাচাই করে নিখুঁতভাবে উপস্থাপন ও প্রচার করে থাকেন সাংবাদিকেরাই। তাঁরাই সব কিছু জানান। জানার অধিকার সকলেরই জন্মগত অধিকার। ফলে, জনসাধারণের জানার অধিকার যেমন সাংবাদিকতায় স্বীকৃতি তেমনি তা মেনে নিয়ে জানানোর দায়িত্বও সাংবাদিকতার বৈশিষ্ট্য। সত্য জানাটা সকলেরই বিশেষভাবে দরকার। তবে সত্যকে মেনে নিতে, জানান দিতে বেশিরভাগ সময়েই ভয় পান শাসকেরা। এই ভীতি গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থায় যেমন সত্য, তেমনি রূঢ় বাস্তব একনায়কতন্ত্রী, একদলীয় শাসনব্যবস্থায়। সামন্ততান্ত্রিক, ধনতান্ত্রিক, মিশ্র—সব আর্থ-সমাজব্যবস্থাতেই একথা পুরোপুরি খাটে। কখনো কখনো সত্য প্রকাশে বিচলিত হন প্রাপ্তির রাজনীতিতে বিশ্বাসী সরকার বিরোধীরাও। আর মৌলবাদীরা তো চেষ্টাই করেন সত্য-যুক্তি-বিজ্ঞান থেকে যতটা নিরাপদ দূরত্বে ঘেরাটোপের মধ্যে থাকা যায়। ফলে স্বাধীনতার জন্যই আসে সাংবাদিকতার স্বাধীনতা। তবে সেই স্বাধীনতার মধ্যে নিহিত থাকে দায়িত্বের ব্যাপারটা, কর্তব্যের বোঝা, এমনকি অঙ্গীকারের বোধ। আর সত্যকে চাপা দেবার চেষ্টার ভিতরেই উজ্জ্বল হয়ে ওঠে সত্যের জোর। পাশাপাশি সাংবাদিকতায় স্বাধীনতা প্রসঙ্গে এটাও খেয়াল রাখতে হয় সেই স্বাধীনতা কাদের জন্য? এটা কি প্রতিষ্ঠানের মালিকদের মুনাফা বৃদ্ধির স্বাধীনতা, অথবা সংবাদকে বিকৃত, গ্রাহকদের বিভ্রান্ত করার স্বাধীনতা? অথবা, সাংবাদিকতায় অসুস্থতা আমদানির স্বাধীনতা? আসলে সংবাদপত্রের স্বাধীনতা বরাবর ছিল, আছে, থাকবেও। লক্ষ্যণীয় যেটা, তা হচ্ছে, সেই স্বাধীনতা কার স্বার্থরক্ষক? মুষ্টিমেয়ের মুনাফা বৃদ্ধি, শোষণের উপায় বৃদ্ধি বা রাজনৈতিক সুবিধাভোগের স্বাধীনতার স্বার্থে বৃহত্তম জনগণের স্বাধীনতা বিসর্জন কখনোই সাংবাদিকতার স্বাধীনতা বলে বিবেচিত হয় না, হতে পারে না।

হয়তো এ জন্যই অনেকে মনে করেন, একালের গণতন্ত্রের কেন্দ্রীয় সমস্যা হল গণমাধ্যম ও তার স্বাধীনতা। সংবাদ হল সেই গণতন্ত্রের হৃদয়, জীবনশোণিত। পাশাপাশি এটাও ভুলে যাওয়া অসম্ভব যে গণমাধ্যমের বা প্রেসের ক্রিয়াকর্ম সামাজিকভাবেই খুব মূল্যবান, তা যথেষ্ট সম্মানজনক ও দায়িত্বপূর্ণ। জনস্বার্থে প্রেস যেমন সংবাদ দেয় তেমনি তার ভাষ্যও রচনা করে।

স্বাভাবিকভাবে একথা বলার অপেক্ষা রাখে না যে সাংবাদিকতা কাজটি বেশ জটিল ও দুরূহ। নিজের ওপর পুরোপুরি আস্থা রেখে, পক্ষপাতশূন্য হয়ে সৎ-নির্ভুল-দায়িত্বজ্ঞানসম্পন্ন ও পরিশীলিতভাবে নিষ্পন্ন করতে হয় সাংবাদিকতার মতো কঠিন-দায়িত্বপূর্ণ কাজ। সমাজের প্রতি অঙ্গীকারবদ্ধ থেকে সম্পন্ন করতে হয় এই ব্রত। সংবাদ জানানো, বোঝানো, ব্যাখ্যা করা, পরিচালনা ও আনন্দদানই শুধু নয়, পাঠক-শ্রোতা-দর্শক অর্থাৎ প্রেসের গ্রাহককে বিজ্ঞাপিত শিক্ষিত-সংগঠিত-উদ্দীপিত করে তোলাই সাংবাদিকতার উদ্দেশ্য। সামাজিকভাবে এই ক্রিয়াকর্মটি মোটেও হেলাফেলার নয়। বরং মূল্যবান ও গুরুত্বপূর্ণ। তা দায়িত্বের পরিচয় বহন করে, আবার যথেষ্ট মর্যাদাসূচকও। সমাজের ভালোমন্দের অনেক কিছুই যে সাংবাদিকতার ওপর নির্ভর করে তা এখন আর কেউ অস্বীকার করেন না। যেদিন থেকে এই গ্রহে জীবনের সূচনা এক হিসাবে সেই দিন থেকেই সংবাদ হয়ে ওঠে মানবজীবনের পক্ষে অপরিহার্য। এমনকি পশুজগতেও এর ভূমিকা ন্যূন নয়। বিশেষ করে যখন জীবজন্তুর অস্তিত্ব বিপন্ন হয়ে পড়ে তখন তা গুরুত্বপূর্ণ সংবাদ হয়ে মানব জাতিরই স্বার্থে। পরিবেশের ভারসাম্য রক্ষায় জীবজগতের অবদান কম নয়। তাই সকলেই সঠিক সময়েই চান সঠিক সংবাদ।

কেবল ব্যক্তিজীবনেই নয়, সমাজজীবনের পক্ষেও সংবাদ কল্যাণপ্রদ। রাষ্ট্রদূত ও রাণার, গুপ্তচর ও গণৎকার, নবজাতক ও মৃতদেহ, যুদ্ধবিমান ও ঠেলাগাড়ি থেকে কোন কিছুই বাদ যায় না সাংবাদিকতার আওতা থেকে। উপরন্তু এর বিশ্বাসযোগ্যতা হওয়া দরকার সবরকম সন্দেহের উর্ধ্বে। বাস্তবিকই জনসাধারণের বেসরকারি পরিষেবাদান হল সাংবাদিকতার লক্ষ্য। ব্যক্তিগত সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য অর্জনই কখনো শেষ কথা হতে পারে না একজন সাংবাদিকের কাছে। তাঁকে মনে রাখতে হয় সমাজের অগ্রগতি সাধনে তাঁর ভূমিকা কাঠবেড়ালির চেয়ে অন্ততঃ কম নয়। সাংবাদিক যে-খবর, যে-দৃষ্টিভঙ্গি সরবরাহ করেন তাতে তাঁকে অবশ্যই জনগণের প্রতি বিশ্বস্ত থাকতে হয়। অর্থাৎ পাঠক-শ্রোতা-দর্শকের কাছে পরিপূর্ণ বিশ্বস্ত থাকা সাংবাদিকের প্রাথমিক কর্তব্য। একজন চিকিৎসকের সঙ্গে তাঁর রোগীর যে সম্পর্ক অনেকটা সেরকম আস্থাই অর্জন করতে হয় সাংবাদিককে, প্রেসকে তাঁর গ্রাহকদের কাছে। তবে চিকিৎসককে যেখানে মেডিক্যাল ডিগ্রি লাভ করে ও তাঁর পেশাগত সংহিতা মান্য করে কাজ করতে হয়, সেখানে সাংবাদিকতা অনেকটা ‘স্বাধীন’ বৃত্তি। অবশ্য সাংবাদিককেও মেনে চলতে হয় কিছু বাইরের বিধি-নিষেধ, দেশের আইনকানুন, আন্তর্জাতিক রীতিনীতি। কিন্তু একজন অসাধু চিকিৎসক খুব জোর যেখানে কয়েকজন

রোগীর ক্ষতি করতে পারেন সেখানে একজন অসৎ সাংবাদিক তার লক্ষ লক্ষ পাঠক-দর্শক-শ্রোতার মনে বিষ ছড়িয়ে দিতে সক্ষম। একজন ব্যবসায়ী তাঁর খদ্দেরদের দামে ঠকাতে পারেন, এমনকি বাজে মালও গছিয়ে দিতে পারেন, তাতে ক্ষতি হবে কিছু সংখ্যক মানুষের মাত্র, কিন্তু সাংবাদিক জেনে-শুনেও যদি মিথ্যা বিবৃতি, বিকৃত সংবাদ পরিবেশন করেন তাতে হাজার হাজার মানুষ বিপথে চালিত হয়ে জাতিদাঙ্গা ঘটিয়ে দিতে পারেন, দেশকে ঠেলে দিতে পারেন সর্বনাশের দিকে। তাই যে-সাংবাদিক তাঁর গ্রাহকদের প্রতারণা করেন তিনি অসাধু ব্যবসায়ীর চেয়ে একজন মারাত্মক মানুষ বলে গণ্য হন। একজন অসৎ শিক্ষক তাঁর ক্লাশরুমের কিছুসংখ্যক ছাত্রছাত্রীকে ভুল শিখিয়ে বিপথে চালিত করতে পারেন, একজন রাজনীতিবিদ খুব জোর কয়েক হাজার শ্রোতাকে ভ্রান্ত দিক্ নির্দেশ করে উত্তেজিত করে ভাঙচুর ঘটাতে সাহায্য করতে পারেন, কিন্তু সাংবাদিকতার সততা, নিষ্ঠা, বিশ্বস্ততাকে পদদলিত করে একজন সাংবাদিক গোটা দেশ-জাতি-সমাজের সর্বনাশ সাধন করতে পারেন। কাজে কাজেই সাংবাদিকতার কাজ আকর্ষণীয়, সম্মানীয় হলেও তার দায়িত্ব অপরিসীম।

এই যে সাংবাদিকতা, তার প্রকাশমাধ্যম আবার সরলরৈখিক নয়। বরং বলা যেতে পারে এর প্রকাশমাধ্যম যেমন বিভিন্ন তেমনি তার প্রকাশভঙ্গিও বিচিত্রতর। অর্থাৎ সাংবাদিকতায় আমরা নানাবিধ সংরূপ বা জেন্‌রের দেখা পাই।

সংরূপ হল একটি বহুল ব্যবহৃত, ব্যাপক তাৎপর্যমণ্ডিত পরিভাষা। সম্ + রূপ = সংরূপ। অর্থাৎ কোনো রচনার বিশেষ ধরনটিই সম্যক রূপ বা মূর্তি বা আকৃতি এবং এটাই সাংবাদিকতার ক্ষেত্রে সাংবাদিক-সংরূপ বা জার্নালিস্টিক জেন্‌র বা জ্যঁর। Genre শব্দটির শেকড় রয়েছে লাতিন Genus-এ। তার থেকে Generis, বহুবচনে Genera অর্থাৎ ধরন, রকম, হওয়া বা সত্তা। ফরাসি ভাষার মধ্য দিয়ে এই পরিভাষাটি গৃহীত হয়েছে জার্মান ভাষায় ও ইংরেজিতে। শিল্প, সাহিত্য, বিজ্ঞান ইত্যাদির ক্ষেত্রে এক-একরকম তাৎপর্যে পরিভাষাটি ব্যবহৃত হয়। শিল্পকলার ইতিহাসে যখন আমরা জেন্‌র-পেন্টিং কথাটি ব্যবহার করি তখন তার মানে গিয়ে দাঁড়ায়, দৈনন্দিন জীবনের চিত্রশোভিত অবিকল প্রতিলিপি। সংগীতের ক্ষেত্রে পরিভাষাটিকে ব্যবহার করি সিম্ফনি, অপেরা, সঙ্গ্ ইত্যাদি নানারকম কম্প্যাজিশনের শ্রেণিভেদ হিসাবে। কবিতা, প্রবন্ধ, রম্যরচনা, উপন্যাস ছোটগল্প, পত্রসাহিত্য প্রভৃতি ছোট ছোট নানা ভাগ মেনে নিয়েও সাহিত্যের ক্ষেত্রে গ্রন্থকর্তাগণ প্রধানত মহাকাব্য, নাটক, গীতিকবিতা—মূলতঃ এই তিনটি পরিচয় দিতে Genre-কে ব্যবহার করেন। সাংবাদিকতায় এর প্রয়োগ অনেকটা সাহিত্যের মতো। বস্তুত সাংবাদিকতা এক হিসাবে সাহিত্যেরই নিকটতম প্রতিবেশী। এমন কি, কেউ কেউ সাংবাদিকতাকে মনে করে সাহিত্যের অন্যতম আদল। বাঙালি কবি বিষ্ণু দে তো তাঁর কাব্যগ্রন্থের নামই দেন ‘সংবাদ মূলত কাব্য’। এখানে একটা কথা বলে রাখা দরকার, সাক্ষাৎকার, সম্পাদকীয়, প্রতিবেদন ইত্যাদি দু-চারটি

সাংবাদিক-সংরূপকে বাদ দিলে অধিকাংশ সংরূপেরই অস্তিত্ব মানেন না অনেকেই। আসলে একালে কোন সংরূপই নিজের চৌহদ্দির মধ্যে নিজেকে আর বেঁধে রাখে না, অর্থাৎ সৃজনব্রতী সাংবাদিকেরা সংরূপের ধ্রুপদী ধারণাকে ভেঙে তছ্‌নছ্‌ করে দিয়েছেন, একের মধ্যে অপরের প্রবেশ ঘটিয়েছেন। ফলে অনেক সময় বুঝে ওঠা দুরূহ হয়ে পড়ে কোন্‌টা সংবাদপ্রসঙ্গ বা নিউজ আইটেম আর কোন্‌টা প্রতিবেদন বা রিপোর্ট।

সাংবাদিক-সংরূপ বা জার্নালিস্টিক জেন্‌রের বিচারের মান তিনটি—

- সংরূপের বিষয়,
- সংরূপের কার্যাবলি,
- সংরূপের পদ্ধতি।

আবার সাংবাদিক-সংরূপের পার্থক্যটি বোঝা যায়—

- বস্তুর চরিত্রে,
- বাস্তব লক্ষ্যে,
- সিদ্ধান্ত বা উপসংহার এবং সাধারণীকরণের নির্দিষ্ট মাপকাঠিতে,
- ব্যবহৃত সাহিত্যিক-রীতিটির বৈশিষ্ট্যে,
- বাস্তব প্রতিফলনের পদ্ধতিতে।

সাংবাদিক হিসাবে আপনি যখন নির্দিষ্ট সংরূপটি ব্যবহার করবেন তখন মনে মনে নিজের সঙ্গে বোঝাপড়া করে নেবেন, এই ভেবে—

- যা বলতে চান তার মূল্যায়ন করে নেবেন হাতের নাগালে পাওয়া জ্ঞান ও তথ্যের সাহায্যে। বুঝে নেবেন কোন্‌ সংরূপটি আপনার বক্তব্য প্রকাশের সবচেয়ে জোরালো উপযোগী।
- যে সংরূপটি ব্যবহার করবেন তার জন্য সবরকম সম্ভাব্য সুযোগের সদ্ব্যবহার করতে কুণ্ঠাবোধ করবেন না।
- যে-সংরূপই আপনি ব্যবহার করুন না কেন প্রয়োজনে তার চৌহদ্দি পেরোবেন গ্রাহকদের চিত্তরঞ্জনের স্বার্থে। এক্ষেত্রে মিত্র সংরূপ বা নতুন কোন স্টাইল আমদানি করতে পারেন।

এ প্রসঙ্গে আরো একটি জরুরি কথা হল, কোন্‌ কোন্‌ উপাদানের সমন্বয়ে সংরূপ নিজ নিজ কাজ করে যায়, তা সতত মনে রাখবেন। সেগুলি হল—

● বিষয়বস্তু।

কোন্ ঘটনার কোন্ দিকটা পাঠক-শ্রোতা-দর্শককে জানাতেই হবে সেটা নির্ধারণ করে নেবেন প্রথম থেকেই। মনে রাখবেন, প্রতিটি সংরূপই কিছু-না-কিছু তথ্য সরবরাহ করে থাকে।

● অভিপ্রায়।

কী কারণে গ্রাহকদের তথ্য সরবরাহ করছেন সেটা পরিষ্কার বুঝে নেবেন। প্রতিটি সংরূপই কোন-না-কোনভাবে নিজস্ব লক্ষ্য পূরণ করে।

● পদ্ধতি।

কোন্ পদ্ধতি বা উপায়ে আপনি আপনার গ্রাহকদের মধ্যে বিতর্ক উস্‌কে দেবেন, তথ্য জানিয়ে দেবেন, সৌন্দর্যবোধ চারিয়ে দেবেন, শিক্ষার বিস্তার ঘটাবেন ও মনোরঞ্জন করবেন সেটা মুহূর্তের মধ্যেই স্থির করে ফেলবেন। খেয়াল রাখবেন, প্রতিটি সংরূপের মধ্যেই কিছু-না-কিছু নান্দনিক ও মনোরম উপাদান অনিবার্যভাবেই নিহিত থাকে। মূলত সাংবাদিক রচনা দুটি মূল নীতির ওপর গ্রথিত হয়। একটি হল পর্ব আর একটি গঠন পদ্ধতি।

দ্বিতীয় মতটি হল—

সাংবাদিক-সংরূপের পর্বভাগ

আদি | মধ্য | অন্ত্য

দ্বিতীয় মতটি হল—

সাংবাদিক-সংরূপের গঠন পদ্ধতি

উন্মোচন বা প্রকট | সম্প্রসারণ বা বিশদ | উপসংহার বা সিদ্ধান্ত | চূড়ান্ত মন্তব্য বা অভিমত

অর্থাৎ,

● উন্মোচনে ঘটবে উদ্দীপিত ভূমিকা;

● সম্প্রসারণে থাকবে বিশদভাবে বিষয়বস্তু, পরিসংখ্যান বা তথ্য, সাক্ষ্যপ্রমাণ এবং ক্রিয়ার তীব্রতা;

● উপসংহারে থাকবে বিশ্বাসযোগ্য সমাধান;

● চূড়ান্ত মন্তব্য তা অভিমতে বাঞ্ছিত পাঠক-শ্রোতা-দর্শকের নির্ভুল মুক্তি।

এছাড়াও, প্রতিটি সাংবাদিক-সংরূপ বা জার্নালিস্টিক জেন্‌রের চারিত্রিক বৈশিষ্ট্যে ও বিচারের মানদণ্ডে যা যা পাওয়া যেতে পারে বা থাকলে ভালো হয় সেগুলি একে একে বলা যাক—

- সমকালীনতা বা টাটকা ঘটনা;
- কার্যকরিতা বা ফলপ্রসূতা;
- সর্বজনীনতা বা আন্তর্জাতিকতা;
- প্রচারধর্মিতা;
- ধারাবাহিকতা;
- গণমাধ্যমটির সক্রিয়তা
- সম্মিলিত সক্ষমতা।

এবারে আমরা কয়েকটি জনপ্রিয় সাংবাদিক-সংরূপের উল্লেখ করি। পাশাপাশি কয়েকটি সংরূপের দৃষ্টান্তও দিচ্ছি বাংলা পত্র-পত্রিকা থেকে।

❒ সংবাদ প্রসঙ্গ বা নিউজ-আইটেম

এই সংরূপটিরই ব্যবহার সবচেয়ে বেশি দেখা যায় সংবাদপত্রে, বেতারে, দূরদর্শনে। সাধারণভাবে কে বা কারা, কী, কখন, কোথায়, কেন, কীভাবে—এই ছ'টি প্রশ্নের উত্তর দিয়েই তৈরি হয় এক-একটি নিউজ-আইটেম। অবশ্যই এর সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকে হেডলাইন বা শিরোনাম। উদাহরণ—

(ক) যুদ্ধের বিরুদ্ধে মিছিলে উত্তাল গোটা আমেরিকা

ওয়াশিংটন, ৭ অক্টোবর—ইরাকে সম্ভাব্য হামলার প্রতিবাদ জানিয়ে হাজার হাজার মানুষ গোটা মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র জুড়ে বিক্ষোভ আন্দোলনে সামিল হলেন রবিবার। ইরাকে হানাদারি দেশের নিরাপত্তার স্বার্থে কতটা জরুরী এবং সাদ্দাম হুসেইন গোটা বিশ্বের নিরাপত্তার পক্ষে কতটা বিপজ্জনক, সেসব গল্প শুনিয়ে দেশবাসীর সমর্থন আদায়ের জন্য সোমবার জাতির উদ্দেশে ভাষণ দেওয়ার কথা রাষ্ট্রপতি বুশের। দেশবাসী যে বুশের এইসব যুক্তিকে আদৌ বিশ্বাস করছেন না, তা রাষ্ট্রপতি এবং প্রশাসনকে বুঝিয়ে দেবার জন্যই তার ২৪ ঘন্টা আগে নিউয়র্ক, লস এঞ্জেলস, সানফান্সিসকো সিয়াটেল, শিকাগো, ওয়াশিংটন-সহ সমস্ত প্রধান প্রধান শহরে বিক্ষোভ সমাবেশের ডাক দিয়েছিল 'নট ইন আওয়ার নেম' নামে যুদ্ধ-বিরোধী সংগঠনগুলির একটি যৌথ মঞ্চ। এবং সর্বস্তরের মানুষ সে আন্দোলনে শামিল হয়ে পথে নেমে জানিয়ে দিলেন, এরপর বুশ ইরাকে হামলা চালালেও, মার্কিন জনগণের তাতে সায় থাকবে না। উল্লেখ্য, ইরাকে হানাদারির জন্য বুশ এই যুক্তিই দিচ্ছেন, নাগরিকদের সুরক্ষার জন্য এ কাজ

প্রয়োজনীয়। শুক্রবারও এক অনুষ্ঠানে বুশ বলেছেন, একজন মার্কিন নাগরিকেরও ক্ষতি করার আগে শিক্ষা দিতে হবে ইরাকের রাষ্ট্রপতি সাদ্দাম হুসেইনকে। মার্কিন নাগরিকরা তাই এই আওয়াজই তুলেছেন, ‘‘আমাদের নামে নয়।’’ গত কয়েকদিনই বিশ্বজুড়ে যুদ্ধের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ-বিক্ষোভ তীব্র আকার নিয়েছে। হাজার হাজার মানুষ বিক্ষোভ দেখিয়েছেন অস্ট্রেলিয়াতে। ইতালিতে প্রায় ১০০ শহরে শনিবার অজস্র মিছিল-সমাবেশে অংশ নেন ১৫ লক্ষ (দেড় লক্ষ নয়)-এর বেশি মানুষ। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নানা শহরেওও গত একমাস ধরে চলছিল বিক্ষোভ প্রদর্শনের ঘটনা। গত সপ্তাহে ওয়াশিংটনে আই এম এফ-বিশ্বব্যাঙ্কের বৈঠককে ঘিরে বিশ্বায়ন-বিরোধী আন্দোলন মাত্রা নিয়েছিল ইরাকের বিরুদ্ধে যুদ্ধ বিরোধী প্রতিবাদেও। শনিবারই পোর্টল্যান্ড ও অন্যান্য কিছু শহরে যুদ্ধের বিরুদ্ধে মিছিল সমাবেশ হয়েছে। কিন্তু, রবিবারের আন্দোলন ছিল আরও সার্বিক, আরও সংঘবদ্ধ। গোটা আমেরিকার সর্বত্র একই দিন পথে নেমে জনগণ জানিয়ে দিলেন, ইরাক বা সাদ্দাম হুসেইনকে নিকেশ করার কাজে বুশের পেছনে তাঁরা কেউ নেই।

এদিনের সবচেয়ে বড় সমাবেশটি হয় নিউ ইয়র্ক শহরের সেন্ট্রাল পার্কে। নানা বয়স, পেশা, জাতি, ধর্মের ২৫ হাজারের বেশি মানুষ অজস্র পোস্টার ও ফেস্টুন নিয়ে এই সমাবেশে শামিল হয়ে যুদ্ধ-বিরোধী স্লোগান দেন। ভিয়েতনাম ও আগের ইরাক যুদ্ধের প্রাক্তন সেনারাও এই সমাবেশে অংশ নেন। নজর কাড়ে একটি বিশাল ব্যানার, যাতে লেখা ‘‘আমাদের নামে নিরবচ্ছিন্ন যুদ্ধ চালানো চলবে না, আমাদের নামে কোনও দেশের সার্বভৌমত্ব লঙ্ঘন চলবে না, চলবে না সাধারণ মানুষের ওপর বোমাবর্ষণ, অজস্র নারী-শিশুকে হত্যার অপকর্ম।’’ বেশ কয়েকজন চলচ্চিত্র তারকাও এই সমাবেশে সাধারণ মানুষের কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে অংশ নেন। অভিনেত্রী সুসান সারনভন প্রশ্ন ছুঁড়ে দেন, ‘‘আমাদের জনগণ কী এই নব্য রোম সাম্রাজ্য মেনে নেবেন, তারা হত্যা ও যুদ্ধ ছাড়া আর কিছু বোঝে না? তাছাড়া অন্তহীন যুদ্ধ চালিয়ে কি নিজেদের নিরাপত্তা অক্ষুণ্ণ রাখা সম্ভব?’’

একই ছবি সান ফ্রান্সিসকো শহরের ইউনিয়ন স্কোয়ারেও। বহু বিক্ষোভকারীকে দেখা যায় বড় বড় ড্রাম ও বিউগল বাজিয়ে তার সঙ্গে যুদ্ধ-বিরোধী স্লোগান দিতে। রাষ্ট্রপতি বুশকে বিক্ষোভকারীরা বর্ণবাদী, হঠকারী ও হত্যাকারী বলে অভিহিত করেন। এক বিক্ষোভকারী বলেন, বধির প্রশাসনের কানে মানুষের দাবি পৌঁছে দেবার জন্যই তাঁরা ড্রাম ও বিউগলের সাহায্য নিয়েছেন। অর্থাৎ এতে যদি বুশ প্রশাসনের ঘুম ভাঙে। বহু ছাত্র-ছাত্রী সান ফ্রান্সিসকোর সমাবেশে হাজির ছিলেন। সমাবেশের বাইরেও বহু গাড়ির চালক হর্ন বাজিয়ে বিক্ষোভকারীদের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করেন।

লস এঞ্জেলসে ক্যালিফোর্নিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে অনুষ্ঠিত সমাবেশে অংশ নেন প্রায় দশ হাজার বিক্ষোভকারী। পুলিসের এক মুখপাত্র মন্তব্য করেছেন, শহরে এতবড় সমাবেশ তিনি আগে কখনও

দেখেননি। সমাবেশ আগাগোড়া ছিল শান্তিপূর্ণ। রাষ্ট্রপতি বুশের উদ্দেশ্যে অকথ্য গালাগালি ছুঁড়ে দেওয়া ছাড়া পুলিসের উদ্দেশে আর কিছু ছোঁড়েননি বিক্ষোভকারীরা। ঐ মুখপাত্র বলেন, একটা সময় তাঁরা ভেবেছিলেন, এতবড় সমাবেশ সহিংস হয়ে উঠলে তা সামলানো অসম্ভব হয়ে উঠবে পুলিসের পক্ষে। কিন্তু, বিক্ষোভকারীদের ধন্যবাদ, কোনও গণ্ডগোল তৈরি তাঁদের লক্ষ্য ছিল না। তাঁরা যে শান্তিই চান, নিজেদের আচরণেও বিক্ষোভকারীরা তা বুঝিয়ে দিয়েছেন। শিকাগো, কলোরাডো, পোর্টল্যান্ড, ওরেগন ডেনভার ও আলাস্কা শহর থেকেও ব্যাপক যুদ্ধ-বিরোধী বিক্ষোভের খবর এসেছে। সর্বত্রই হাজার হাজার মানুষ পথে নেমে স্লোগানে, ফেস্টুনে, ব্যানারে সোচ্চারে জানিয়ে দিয়েছেন, বুশের যুদ্ধে তাঁরা নেই।

● **আনন্দবাজার পত্রিকা**

এরকম বড়ো নিউজ-আইটেমের পাশাপাশি ছোট ছোট নিউজ-আইটেম বা সংবাদ প্রসঙ্গও শোভা পায় সংবাদপত্রে। একে কোন কোন সংস্থা 'সংবাদচুম্বক' নামেও অভিহিত করেন। যেমন—

(খ) চিকিৎসকদের ক্ষোভ

পশ্চিমবঙ্গে ১৩টি হোমিওপ্যাথিক ডিগ্রি কলেজ থাকলেও স্নাতকোত্তর পড়াশোনা বা গবেষণার কোনও সুযোগ না থাকায় হোমিও চিকিৎসকেরা ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। সেই সঙ্গে তাঁরা হোমিওপ্যাথিতে ফার্মাসি কোর্স চালু করা এবং এই চিকিৎসা ব্যবস্থার উন্নতিতে রাজ্য বাজেটে বিশেষ বরাদ্দেরও দাবি জানিয়েছেন। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তের শ'তিনেক হোমিও চিকিৎসকের উপস্থিতিতে গত রবিবার কলকাতায় হোমিও মেডিক্যাল ক্লাব-এর ৪৭তম বার্ষিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।

❐ প্রবন্ধ বা আর্টিকল্

দৈনন্দিন কাজ চালানোর জন্য সংবাদপত্রের পৃষ্ঠায় প্রবন্ধ বা আর্টিক্ল্ প্রকাশিত হয়। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ ও অন্যতম প্রধান সাংবাদিক-সংরূপ। এখানে যে সব সময় প্রতিষ্ঠানেরই দৃষ্টিভঙ্গি প্রকাশিত হবে তার কোনো মানে নেই। লেখকের স্বাধীনতা প্রায়শই রক্ষিত হয়, যদি না তা রাষ্ট্রদ্রোহী কার্যকলাপ বলে বিবেচিত হয়।

❐ লীডার বা সম্পাদকীয়

চলতি সময়ের কোন একটি বিশেষ ঘটনা বা সমস্যা নিয়ে অন্তর্দৃষ্টি ফেলে সম্পাদকের কলামে এটি লেখা হয়। এই বক্তব্যকে সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠানের ভাষ্য হিসাবেই বিবেচনা হয়। যেমন—

(ক) কাবেরী বিতর্কে কেন্দ্রের হস্তক্ষেপ জরুরি

জলসম্পদের উপযুক্ত ও সুষম ব্যবহার ও বণ্টন যে-কোনো দেশের কাছেই জরুরি। বিশেষ করে জলের চাহিদা যখন দিনে দিনে বাড়ছে। সাম্প্রতিক সময়ে জল নিয়ে কর্ণাটক ও তামিলনাড়ুর মধ্যে ঘোরতর কাজিয়া শুরু হয়ে গেছে। ফলে দু'রাজ্যেই বিপজ্জনক প্রাদেশিকতা মাথা চাড়া দিয়েছে। বিষয়টি রীতিমতো উদ্বেগজনক। এবারে কাবেরী অববাহিকায় বৃষ্টি কম হওয়ায় জলের যোগান কমে গেছে। ফলে চাষবাসের জন্য জল এবং পানীয় জলের ক্ষেত্রে গুরুতর সঙ্কট তৈরি হয়েছে। পরিস্থিতির মোকাবিলায় পরামর্শ দিয়েছে সুপ্রিম কোর্ট এবং কাবেরী রিভার অর্থরিটি (সি আর এ)। এদের সুপারিশের ভিত্তি হলো শুখা বছরে জলবণ্টনের নীতি। সুপ্রিম কোর্ট এবং সি আর এ তামিলনাড়ুর জন্য জল দেবার নির্দেশ দিয়েছে কর্ণাটক সরকারকে। কিন্তু কর্ণাটক সরকার ঐ রায় মানছে না। তাদের বক্তব্য হলো, এবারের জলের পরিমাণ খুব কম এবং জলের দাবিতে চাষীরা প্রথম আন্দোলনে নেমেছেন। ফলে কর্ণাটক সরকারের পক্ষে তামিলনাড়ুকে জল দেওয়া সম্ভব নয়। এই নিয়ে দু'দেশের মধ্যে প্রবল বিতর্ক চলছে। এই পরিস্থিতি চলতে থাকলে আঞ্চলিক শান্তি বিনষ্ট হতে পারে। তাই এই ধরনের স্পর্শকাতর বিষয় নিয়ে যাতে অবাঞ্ছিত উত্তেজনা তৈরি না হয় সেদিকে দু'রাজ্যকে নজর রাখতে হবে। কেন্দ্রীয় সরকারের উচিত অবিলম্বে এগিয়ে আসা। কিন্তু দেখা যাচ্ছে, প্রধানমন্ত্রী বাজপেয়ী বিদেশ যাত্রার আগে সোমবার সমস্ত দায় সুপ্রিম কোর্টের উপরে চাপিয়ে দিয়ে গেলেন। কিন্তু এই বাজপেয়ী সরকার ১৯৯৮ সালে ঘোষণা করেছিল যে, কাবেরী জল সমস্যার সমাধান হয়ে গেছে। এখন দেখা যাচ্ছে, বাজপেয়ীর ঘোষণা ছিল শূন্যগর্ভ। বাজপেয়ীরা তখন সমস্যাটি ধামাচাপা দিয়ে গা বাঁচিয়েছিলেন। কিন্তু সেই স্বস্তি ক্ষণস্থায়ী।

দুই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী নানারকম উত্তেজক মন্তব্য করে পরিস্থিতিকে ঘোরালো করে তুলছেন। যেমন তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী জয়ললিতা দাবি জানিয়েছেন, জল না ছাড়লে কর্ণাটকের এস এম কৃষ্ণ সরকারকে অবিলম্বে খারিজ করতে হবে। তামিলনাড়ুতে কয়েকটি মহল দাবি তুলেছে, কর্ণাটকে বিদ্যুৎ দেওয়া বন্ধ করতে হবে। এইসব দাবির ভিত্তি হলো সঙ্কীর্ণ ও উগ্র প্রাদেশিকতা। এইসব দাবি যদি প্রবল হয়ে ওঠে তা হলে আমাদের দেশের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর পক্ষে বিপদ নেমে আসতে পারে। সামগ্রিক ও বস্তুনিষ্ঠ দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে না চললে দু'রাজ্যের মধ্যেকার বিবাদের স্ফুলিঙ্গ অন্যান্য আরও নানা বকেয়া সমস্যার উপরে গিয়ে পড়তে পারে। ফলে বড় আকারের বিপদ ঘটার আশঙ্কা রয়েছে।

একদিকে কর্ণাটক সরকার জল দেবার ব্যাপারে সুপ্রিম কোর্ট এবং কাবেরী নদী কর্তৃপক্ষের রায় বা সুপারিশ মানতে নারাজ। যার ফলে আমাদের যুক্তরাষ্ট্রীয় কাঠামোর উপরে আঘাত নেমে আসতে পারে। অপরদিকে তামিলনাড়ু কাবেরী নদী কর্তৃপক্ষের সঙ্গে অসহযোগিতামূলক দৃষ্টিভঙ্গি নিয়ে চলছে।

কর্ণাটক সরকারের উচিত তাদের অসুবিধার কথা কাবেরী নদী কর্তৃপক্ষকে (সি আর এ) জানানো। তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী তাঁর ভাষণে এস এম কৃষ্ণ সরকারকে খারিজ করার দাবি জানিয়ে পরিস্থিতিকে গুরুতর করে তুলছেন। জল নিয়ে এই কাজিয়ায় উন্নয়ন স্তব্ধ হবে।

এই পরিস্থিতিতে কেন্দ্রীয় সরকারের উচিত অবিলম্বে হস্তক্ষেপ করা। কেন্দ্রের উচিত উত্তেজনা প্রশমিত করে পারস্পরিক সদ্ভাব ও আস্থার ভিত্তিতে এই সম্প্রচার সমাধান করা। কিন্তু বাজপেয়ী সরকার এখন নিষ্ক্রিয় দর্শকের ভূমিকা নিয়ে বসে আছে। তাদের উচিত পরিস্থিতিকে নিয়ন্ত্রণে রেখে সমাধানের সূত্র খোঁজা। আরেকটি উদ্বেগজনক দিক হলো কংগ্রেস এবং বি জে পি-র দুই রাজ্যের ইউনিটগুলি সঙ্কীর্ণ প্রাদেশিকতায় জড়িয়ে পড়েছে। এর পরিণতি বিপজ্জনক। কর্ণাটকের কংগ্রেসী মুখ্যমন্ত্রী এস এম কৃষ্ণ যে "পদযাত্রা"য় বেরিয়েছেন তার প্রয়োজন ছিল না। কারণ এই পদযাত্রার ফলে কাবেরী বিতর্ক অহেতুক রাজনৈতিক রঙ পাচ্ছে। কর্ণাটকের মুখ্যমন্ত্রীর উচিত সুপ্রিম কোর্টের আদেশ মেনে চলা। তামিলনাড়ুর মুখ্যমন্ত্রী জয়ললিতার উচিত সংঘর্ষে উসকানি না দেওয়া। এই পরিস্থিতিতে কেন্দ্রের হস্তক্ষেপ তাই জরুরী।

● **গণশক্তি**

❒ কমেন্টরি বা মন্তব্য

বিতর্ক উস্‌কে দেবার ক্ষেত্রে কমেন্টরি বা মন্তব্য সংবাদপত্রের অন্যতম জনপ্রিয় ও গুরুত্বপূর্ণ সাংবাদিক-সংরূপ। দৈনন্দিন রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সাংস্কৃতিক ব্যাপার নিয়ে টুকিটাকি মন্তব্য সরসভঙ্গিতেই সাধারণত এখানে উপস্থাপিত করা হয়। তবে কমেন্টরির মর্মমূলে থাকে যুক্তি। সত্যি কথা বলতে কি রোমান সম্রাট জুলিয়াস সীজারই প্রথম তাঁর ডায়েরিতে ব্যবহার ঘটান COMMENTARICI শব্দটি। এখান থেকেই কমেন্ট্রি শব্দটি এসেছে। বর্তমানে এর ঘটেছে অর্থব্যাপ্তি। যুক্তির সঙ্গে সরসতা মিশিয়ে তির্যকতা আনাই একালের কমেন্ট্রি বা মন্তব্যের মূলকথা। কখনো কখনো সপ্তাহের বিশেষ সমস্যা নিয়েও মন্তব্য করা হয় পত্র-পত্রিকায়। আবার কখনো কখনো সংবাদপত্র গুরুগম্ভীর সম্পাদকীয় রচনার প্রথাসিদ্ধ পথ পরিত্যাগ করে সংক্ষিপ্তাকারে সম্পাদকীয়ের বদলে তির্যক পদ্ধতিতে মন্তব্য বা কমেন্ট্রি ছাপান। কেউ কেউ অবশ্য একে সম্পাদকীয়ই বলে চালাতে চান। সেখানে মন্তব্যের দায় বা দায়িত্ব সম্পাদকের ওপরেই বর্তায়। যেমন,

(ক) গড়াপেটা নয়?

দশ বছর আগে বাবরি মসজিদ ধ্বংসে কার্যত নেতৃত্ব দিয়ে ধর্মনিরপেক্ষ ভারতবর্ষের বুকে ছুরি বসিয়েছিলেন উত্তরপ্রদেশের তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী মূর্তিমান অকল্যাণ। এবার গণহত্যার ছাই মাড়িয়ে অগৌরব যাত্রায় বেরিয়েছেন গুজরাটের মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদি। তখন, সেই দশ বছর আগে, ধর্মীয়

গুণ্ডাদের শাবল-গাঁইতির আঘাতে বাবরি মসজিদ চুরচুর করে ভেঙে পড়ছে দেখে আনন্দে মুরলীমনোহর যোশিকে জড়িয়ে ধরেছিলেন উমা ভারতী, সেই সংবাদচিত্র এখনও মাঝেমাঝে ছাপা হয়। তখন, সেই দশ বছর আগে, বি জে পি-র প্রধান দুই নেতা প্রকাশ্যে আনন্দ প্রকাশ করেননি। অটলবিহারী বাজপেয়ী দুঃখে কবিতা লিখে ফেলেছিলেন। বলেছিলেন, ১৯৯২ সালের ৬ ডিসেম্বর তাঁর জীবনের সবচেয়ে দুঃখের দিনগুলোর মধ্যে একটি। রামরথারূঢ় হয়ে ভাঙার ও দাঙ্গার সলতে পাকিয়েছিলেন যিনি, সেই আদবানিও বাবরি মসজিদ ধ্বংসে দুঃখপ্রকাশ করেছিলেন। বলেছেন, লিখেওছেন, দুঃখে ও ক্ষোভে রাজনীতি ছেড়ে দেওয়ার কথাও ভেবেছিলেন তিনি। সেই দুই দুঃখ-প্রকাশক এখন দেশের প্রধানমন্ত্রী ও উপপ্রধানমন্ত্রী। বাজপেয়ী সাম্প্রতিক আমেরিকা সফরেও বললেন, গুজরাটের সাম্প্রতিক ঘটনা ভারতবর্ষের লজ্জা। একাধিকবার তিনি বোঝাতে চেয়েছেন, মোদির কাজে তাঁর অনুমোদন নেই। গুজরাটের গান্ধীনগরের সাংসদ আদবানিও অতি সম্প্রতি মোদিকে সতর্ক থাকতে বলেছেন, প্ররোচনামূলক মন্তব্য থেকে বিরত থাকতে বলেছেন। আদবানির সতর্কবার্তার পরদিনই মোদি আবার ওই 'হম পাঁচ হমারা পঁচিশ' বললেন, সঙ্গে 'ছশো পঁচিশ' জুড়ে দিলেন। মানে, মোদি দাঙ্গারথ চালিয়ে জিতুন গুজরাটে। এদিকে দুই প্রধান নেতা 'আহা উহু' করে নরম মুখ ধরে রাখবেন। গড়াপেটা নয়।

● আজকাল

কমেন্টরির পাশাপাশি বেতারে, দূরদর্শনে যে কমেন্টরির ব্যবস্থা করা হয় তাকে বলে রানিং কমেন্টরি বা ধারাবিবরণী। সাধারণভাবে ঘটছে, চলছে এমন ঘটমান, চলমান ঘটনার বর্ণনা যখন ঘটনাস্থলে উপস্থিত থেকেই প্রাণবন্ত বিবরণ শোনানো, দেখানো হয় রেডিয়ও, টিভিতে তাকে বলা হয় রানিং কমেন্টরি বা ধারাভাষ্য। সংবাদপত্রে ধারাবিবরণী দেওয়ার সুযোগ নেই। খেলাধুলো, কোনো ঐতিহাসিক বা স্মরণীয় সমাবেশের বিবরণ শ্রোতা-দর্শকের কাছে তুলে ধরা জরুরি কর্তব্য বলে বিবেচিত তখনই রানিং কমেন্টরি বা ধারাবিবরণীর ব্যবস্থা করা হয়।

❐ প্রতিবেদন বা রিপোর্ট

চল্‌তি ঘটনা বিষয়ে পাঠক-শ্রোতা-দর্শককে জ্ঞাত করে প্রতিবেদন বা রিপোর্ট। প্রত্যক্ষদ্রষ্টার লেখনীতে প্রতিবেদন তৈরি হয় বলে নিউজ-আইটেমের সঙ্গে প্রতিবেদনের আবেদনে তফাৎ ঘটে যায়। তাছাড়া প্রতিবেদনের ভাষা হয় অনেক প্রাঞ্জল। দৃষ্টান্ত—

(ক) রাতে ভয়াল আগুন ফিরপো মার্কেটে

স্টাফ রিপোর্টার : মঙ্গলবার রাতে ধর্মতলার ফিরপো মার্কেটে ভয়াবহ আগুন লাগে। বাজারের সব ক'টি দোকানেই কিছুক্ষণের মধ্যে আগুন ছড়িয়ে পড়ে। ওই বাজারে জামাকাপড় ও জুতোর বেশ

কয়েকটি দোকান আছে। দোকান বন্ধ করে দোকানিরা বাড়ি ফেরার পরেই বাজারের একটি ঘর থেকে গলগল করে ধোঁয়া বেরোতে দেখা যায়। কিছুক্ষণের মধ্যেই আগুনের লেলিহান শিখা রীতিমতো আতঙ্কের সৃষ্টি করে গোটা এলাকায়। আশপাশের বাড়ির মানুষ ঘর ছেড়ে বেরিয়ে আসেন। দমকলের ১৫টি গাড়ি ঘটনাস্থলে পৌঁছয়। বেশিরভাগ দোকানেরই শার্টার ছিল বন্ধ। তাই আগুনের উৎসস্থলে এক ঘণ্টা পরেও পৌঁছতে পারেনি দমকল। দোকানগুলির শাটার কী ভাবে ভাঙা হবে, তা নিয়ে পুলিশ ও দমকলের কর্মীরা দ্বিধায় ছিলেন। বাজারের মধ্যে কেউ কোনও ঘরে আটকে আছেন কি না, গভীর রাত পর্যন্ত দমকল তা জানতে পারেনি।

রাতে জওহরলাল নেহরু রোড বন্ধ করে দেওয়া হয়। খবর পেয়ে দোকানিরা অনেকেই ছুটে আসেন। অনেককে মাথা চাপড়ে কাঁদতে দেখা যায়। হাজারখানেক লোক জমে যায় রাস্তার উপরে। কেন দমকল শাটার ভেঙে ঢুকতে পারছে না, তা নিয়ে উত্তেজিত দোকানদারদের সঙ্গে পুলিশ ও দমকল কর্মীদের রীতিমতো তর্ক বেধে যায়। পরিস্থিতির সামাল দিতে লালবাজার থেকে পাঠানো হয় র‍্যাফ। পাশেই মনোহর দাস তড়াগ থাকায় দমকলের জল পেতে সমস্যা হয়নি। ওই বাজারের পাশেই আছে একটি জামাকাপড়ের শো-রুম। ওই বাড়িতে যাতে আগুন না-ছড়ায়, দমকলকে তা দেখতে বলে পুলিশ। দমকল তাড়াতাড়ি চলে আসায় আগুন আর ছড়ায়নি। দমকল সূত্রে বলা হয়, দোকানগুলিতে জামাকাপড় ঠাসা ছিল। প্রকৃতপক্ষে তা জতুগৃহ হয়ে ছিল। মেয়র সুব্রত মুখোপাধ্যায় রাতে বলেন, দোকানগুলি নিয়ম মেনে তৈরি হয়েছে কি না, তা খতিয়ে দেখার নির্দেশ দিয়েছেন তিনি।

স্থানীয় দোকানদারেরা জানান, রাত ৯টার পরে একটি বন্ধ দোকানের তলা থেকে ধোঁয়া বেরোতে দেখা যায়। তখনও বোঝা যায়নি, ভিতরে ভিতরে দোকানগুলিতে আগুন কতটা ছড়িয়েছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই আগুনের লেলিহান শিখা গোটা এলাকাকে গ্রাস করে। কাছেই দমকলের সদর দফতর থাকায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে সুবিধা হয়। দমকলমন্ত্রী প্রতিম চট্টোপাধ্যায়, মেয়র-পরিষদ মালা রায়কে দমকল ও পুলিশের সঙ্গে মিলে অগ্নি নির্বাপণের পরিকল্পনা তৈরি করতে দেখা যায়। পরে পৌঁছন মেয়রও। আগেকার ফিরপো হোটেল ভেঙেই পরবর্তী কালে গড়ে ওঠে ফিরপো মার্কেট। চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকে সাহেব-মেম ও সম্পন্ন বাঙালিদের বৈকালিক মেলামেশার জায়গা ছিল ফিরপো হোটেলের বারান্দা।

● আনন্দবাজার পত্রিকা

❐ শিল্পিত প্রতিবেদন বা রিপোর্টাজ

মূলত সংবাদপত্রের জন্য বিশেষ এক রীতিতে লেখা ঘটনার প্রতিবেদন হচ্ছে রিপোর্টাজ। একেবারে তরতাজা ঘটনা বা বিষয় বা অভিজ্ঞতার শৈল্পিক প্রকাশ এখানে মনোজ্ঞ ভঙ্গিতে বিবৃত করা হয়।

এতে মানুষের নিশ্বাস-প্রশ্বাস টের পাওয়া যায়। ফুটে ওঠে বিবিধ দ্বন্দ্ব ও বৈপরীত্য। তথ্যের উপস্থাপনা সত্ত্বেও সাহিত্যের স্বাদ, নান্দনিক বোধ, অন্তর্জীবনের চিত্রায়ণ, কিংবা স্মৃতি-সত্তার অন্তঃসার রিপোর্টাজকে দেয় যেমন ডকুমেনটেশনের মূল্য তেমনি তা হয়ে ওঠে শৈল্পিক সুষমায় অনবদ্য। এক হিসাবে রিপোর্টাজ হল সংবাদ ও সাহিত্যের সম্মিলিত রসায়ন। দৃষ্টান্ত—

(ক) ফুঁসে ওঠে ইতিহাস

বরফ না পড়লেও বাইরে বেশ কনকনে শীত। চার থেকে পাঁচ-ছয় ডিগ্রি সেণ্টিগ্রেডের মধ্যেই ওঠানামা করছে পারদ। লেগেছে মাতন। দাপটের সবকিছুকেই উড়িয়ে নেবার নেশা বার্লিনের বাতাসে।

শুক্রবার। ৩১ মার্চ। ভোরবেলাতেই তৈরি হয়ে নিলাম। সারাদিনের জন্যেই বেরোচ্ছি একরকম। সন্ধ্যে নাগাদ ফিরব আস্তানায়। বার্লিনের 'সুলে ডেয়ার সলিডারিটাট' অর্থাৎ সংহতি কলেজে।

চলেছি জাক্সেন হাউসে। ঐতিহাসিক কসাইখানায়। বুখেনভাল্ডেরই নাম শুনেছিলাম এর আগে। কিন্তু জাক্সেন হাউস? উঁহু, স্মরণে পড়ে না। আমি তো জানতাম বুখেনভাল্ডেরই জাল দিয়ে ছেঁকে তুলে জমা করেছিল দুনিয়ার কমিউনিস্ট আর প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীদের সবচেয়ে বেশি। ঐ বন্দীশালারই এক প্রান্তে জার্মানির কমিউনিস্ট পার্টির চেয়ারম্যান থালমান নিহত হন। ছাপান্ন হাজার নানান দেশের মানুষ হলেন তাঁর অনুসারী। শহীদ হলেন পোল্যাণ্ড, ফ্রান্স, সোভিয়েত ইউনিয়ন, জার্মানি, ফিনল্যাণ্ডের মানুষগুলো। চোখে ছিল তাঁদের স্বপ্ন, মায়া, নতুন পৃথিবীর উজ্জ্বল আদল। কিন্তু জাক্সেন হাউস নয়। এই বন্দী শিবিরের নাম-ডাক শুনি নি তো।

এখন অবশ্য হুবহু সেই কসাইখানাটা নেই। ঘষে-মেজে সংস্কার করা হয়েছে। যে বিরাট এলাকা জুড়ে ছিল বন্দীশিবির, সেসব মডেলের মাধ্যমে বুঝিয়ে দিচ্ছিলেন গাইড। অসংখ্য তথ্য আর ছবি, সময়-ক্রমিক অনুসারে সাজানো রয়েছে দেয়ালে দেয়ালে। মানচিত্রও। নাৎসী নায়কদের জীবনী। পাশাপাশি শহীদের কথা। জার্মান, রুশ, পোলিশ ফ্যাসিবাদ-বিরোধীদের ছবি।

এই তো ইতিহাসের অন্ধকার দিনগুলো। বাদুড়ের ডানায় ঢাকা দিনগুলি, রাতগুলি!

ঘুরে ঘুরে দেখছি সেই ঐতিহাসিক কসাইখানা। শ্বাপদের পদচিহ্ন।

চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি ইতিহাসকে। বর্বরতার চলমান দিবস-রজনীর পদাবলী। তোলপাড় করছে শহীদবীরের আত্মদান। মানবসভ্যতার আকাশ-ফাটা চিৎকার।

ঝাড়ে-বংশে কমিউনিস্টদের কচুকাটা করার জন্যে কী কাণ্ডটাই না করল নাৎসীরা! যে-কোনো ছলছুতো করে পেটাও, পেটাও ঐ লাল জুজুর সাগরেদদের। আর এ-ব্যাপারে যেমন গুরু, তেমনি চেলাও

জুটেছিল সংখ্যাহীন। আশ্চর্য ব্যবস্থা। হিটলারের পয়লা নম্বর স্যাঙাৎ ছিলেন গ্যোরিং। গোয়েবলস নিলেন প্রচারের ছলাকলার ভার। চোখ ধাঁধানো সেসব আয়োজন। শোষণ আর নির্যাতনে পৃথিবী উঠল কেঁপে। বাতাসে তখন বারুদের গন্ধ। চলল গণ-নিধন।

নাৎসী নায়কেরা বানালেন দিকে দিকে বন্দীশিবির, ফাঁসির মঞ্চ। কল্পনাতেই গা শিউরে ওঠে।

বছরটা ১৯৩৬। জাক্সেন হাউস সে-সময়ই তৈরি হল। ৩.৮৮বর্গ কিলোমিটার জুড়ে এই বন্দী শিবির। নির্মিত হল ৬৮টি কুঁড়ে। ৪৭টি দেশের বন্দীবীরের ভাগ্যস্থল। পশুরাও এর চেয়ে থাকত স্বর্গে। কয়েক বছরের মধ্যেই ফ্যাসিবাদের শিকার হলেন ২,০৪,৫৩৭ জন। তার মধ্যে এস-এস বাহিনী হত্যা করে ১,১৬,৮০১ জন। উপড়ে নেয় হৃদপিন্ডের রক্তগোলাপ। গুড়ো-গাড়া থেকে শুরু করে বুড়োবুড়িও রেহাই পায়নি উলঙ্গ নেকড়ের রক্তমাখা থাবা থেকে। প্রত্যেক বছরের হিসেবেই ঠিক-ঠাক রাখা হয়েছে এই মিউজিয়ামে। ১৯৩৬ থেকে ১৯৪৪ সাল পর্যন্ত কতজন বন্দী হয়েছিল, আর বেঁচেই বা ছিলেন কত লোক, তার হিসেব রাখা হয়েছে যেমন বছর ভিত্তিতে, তেমনি ১৯৪৫-এর জানুয়ারি থেকে ২১ এপ্রিল পর্যন্ত হিসবে রাখা হয়েছে মাসভিত্তিক।

সাজিয়ে রাখা হয়েছে একদিকে সেই সব হত্যাকারীর ছবি, যাঁরা ছিলেন হিটলারের বংশবদ, ফ্যাসিস্ট ব্যবস্থার নাটবল্টু।

পাশের ঘরে সংখ্যাহীন শহীদের মুখ। জাক্সেন হাউসের প্রতিরোধ সংগঠনের প্রাণবন্ত সেই সব নায়কের ছবি। বেশিরভাগই খুন হয়েছিলেন এই বন্দীশিবিরে, কেউ কেউ অবশ্য অন্যত্র। এই শিবিরের বেশিরভাগ শহীদই ছিলেন লেখক, সাংবাদিক, অধ্যাপক বা বুদ্ধিজীবী।

সাজানো রয়েছে নানান ধরনের চাবুক। সাপের জিভের মতো অন্ধকার দিনগুলোর স্বাক্ষরিত লক্‌লকে চাবুক সব। বন্দীদের পিঠে, বুকে সর্বত্র চলত এর অভিযান। ছোটবড় কতগুলো ইঞ্জেকশনের সিরিঞ্জও রয়েছে দেখলাম। ভেতরে থাকত বিষ। বন্দীদের শরীরে ফোঁড়া হত সূচ। রক্তের সঙ্গে ধীরে ধীরে মিশে যেত সর্বনেশে তরল পদার্থ। দেখতে দেখতে নীল অপরাজিতা ফুটে উঠত তাদের গায়ে। নেমে আসত নিবিড় নীলিমা। ঢলে পড়ত মৃত্যুর কোলে। একদিকে রয়েছে চুলের পাহাড়। ওরে বাপস্, এত চুল কিসের, কী হত এসব দিয়ে? এ-রকম প্রশ্ন একে একে ছুঁড়তে লাগলাম। বললেন গাইড : বন্দীদের মাথা কামিয়ে দেওয়া হত। আর ঐ যে দেখছেন চীনে মাটির বাসন, পাশে কাঁটা-চামচ-ছুরি, ওতে দেওয়া হত খাবার। মাথা পিছু বরাদ্দ ছিল রোজ ৩০০ গ্রাম শুকনো রুটি আর জল। তবে রুশ বন্দীদের জন্য ছিল মাত্র ১৫০ গ্রাম রুটিই শুধু।

১৯৪৫-এর ২১ এপ্রিল। শেষের সেদিন কী ভয়ঙ্কর। হঠাৎ তোড়াজোড়, সাজো সাজো রব।

হুলুস্থুল কাণ্ড। সাড়া পড়ে যায় শিবিরে। বন্দীদের নিয়ে যাওয়া হবে ট্রাকে করে। পর পর তোলা হবে জাহাজে। সেই শুদ্ধ ডুবিয়ে দেওয়া হবে বাল্টিকের জলে। ছক মাফিক সব কাজ এগোতে লাগল। নাৎসীদের চোখেমুখে জ্বলছে কয়েক হাজার বাঘের ক্ষুধা। কালো ছায়ায় ঢাকা আকাশ। নেকড়েদের হম্বিতম্বি।

চারদিকেই যেন ভয়ঙ্করতা। এক হিংস্র ভয়ঙ্করতা ওৎ পেতে বসে। কী হবে, কী হবে ভাবনায় আচ্ছন্ন বাতাস। বারুদে ঠাসা বাতাস যেন।

সময় তখন স্থির পায়ে দাঁড়িয়ে। প্রতি নিঃশ্বাসে বন্দীরা শুনতে পাচ্ছে পরস্পরের শ্বাস। ধ্বংসের মুখোমুখি কয়েক হাজার প্রাণ। না, আর হল না। এগিয়ে আসছে ঝড়ের বেগে সোভিয়েত বাহিনী, মৈত্রীবাহিনীর শরিক। গর্জে উঠলেন তাঁরা : খামোশ! দুশমন হুঁশিয়ার!

মিকলেনবুর্গের রাস্তায় বাধা পেল লাল ফৌজ। চলল লড়াই।

ক্ষতবিক্ষত রুশ বাহিনী শেষ পর্যন্ত ঘায়েল করল ফ্যাসিস্টদের। রক্ত আর ঘামের ভিতর দিয়ে ঝিলিক দিল জীবন। মিলিয়ে গেল বারুদের ধোঁয়ায় ঢাকা আকাশ নতুন আলোয়। ফুটে উঠল সূর্য। সোভিয়েত বাহিনী এগিয়ে এল জাক্সেন হাউসে। মুক্তি দিলেন বন্দীদের। নীলকণ্ঠ ইতিহাসে বহু দীর্ঘ চড়াই-উৎরাইয়ের হল এক সাফল্য অভিযান।

ঘুরে ঘুরে দেখার পালা শেষ।

বেরিয়ে এলোম ঘরগুলো থেকে। বন্দী শিবিরের খুপরি থেকেই যেন। আমাদের মাথার উপর এখন শান্ত আকাশ। সীমানাহীন নিবিড় নীলিমা।

বুকের ভিতর তোলপাড়। চোখের ভিতর থেকে বেরিয়ে আসছে আগুন। ফুঁসে ওঠে ইতিহাস!

❐ শোকসংবাদ বা অবিচুঅরি

বিশিষ্ট ব্যক্তিদের মৃত্যুতে তাঁর জীবনালেখ্য ফুটিয়ে তোলার মধ্যে নিবেদিত হয় যে শ্রদ্ধাঞ্জলি তাকেই বলে শোকসংবাদ বা অবিচুআরি। যেমন—

(ক) শ্রীকৃষ্ণকান্ত (১৯২৭-২০০২)

তাঁর বাবা লালা অচিন্ত্য রাম ছিলেন লালা লাজপত রাইয়ের সহযোগী, স্বাধীনতা সংগ্রামে যোগ দিয়ে তিনি এবং তাঁর স্ত্রী জেলেও গিয়েছিলেন। সহ্য করেছিলেন ইংরেজ শাসকদের অনেক অকথ্য অত্যাচার। তাঁদের পুত্র কৃষ্ণকান্তেরও যে রাজনীতিতেই স্বাভাবিক আকর্ষণ থাকবে সেটা তাই মোটেই

আশ্চর্যের নয়। লাহোর থেকে বারানসী, সেখান থেকে দিল্লি এবং শেষ পর্যন্ত উপ-রাষ্ট্রপতি পর্যন্ত পথটা কিন্তু এই ‘তরুণ তুর্কি’র মোটেই মসৃণ ছিল না। তিনি উপ-রাষ্ট্রপতি হবেন এটাই ছিল একেবারে অভাবিত। যেমন অভাবিত ভাবেই হঠাৎ হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা গেলেন কাল পর্যন্ত পূর্ণ সুস্থ কৃষ্ণকান্ত। তাঁর মা সত্যবতী এখনও জীবিত, বয়স ৯৭।

অবিভক্ত ভারতের পঞ্জাব প্রদেশের অমৃতসর জেলার প্রত্যন্ত গ্রাম কোট মহম্মদ খানে কৃষ্ণকান্তের জন্ম। ১৯২৭ সালের ২৮ ফেব্রুয়ারি। লাহোরে ছাত্রজীবনের গোড়ায় জড়িয়ে পড়েন স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে। ‘ভারত ছাড়ো’ আন্দোলনে শরিক হয়েছিলেন মাত্র ১৫ বছর বয়সেই। সেই বয়সেই ভোগ করেন কারাদণ্ডও। পরে চলে আসেন বারানসীতে। হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম এসসি ডিগ্রি পান। জীবন শুরুও হয় বিজ্ঞানী হিসাবেই। কিন্তু বেছে নিলেন রাজনীতিকের জীবন। যেগ দিলেন কংগ্রেসে।

ষাটের দশকের শেষ দিকে ইন্দিরা গান্ধী যখন সিন্ডিকেটের নেতাদের সঙ্গে লড়ছেন, কৃষ্ণকান্ত এবং আরও কয়েকজন নেতা দলের নীতি নির্ধারণে রীতিমতো প্রভাবশালী ছিলেন। কিন্তু ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ যুদ্ধের পরে ইন্দিরা গান্ধী বিপুল সংখ্যাধিক্য নিয়ে ক্ষমতায় আসার পরে তাঁর সঙ্গে কৃষ্ণকান্তদের মতপার্থক্য বাড়তে থাকে। জরুরি অবস্থা জারি করার তীব্র বিরোধিতা করায় ১৯৭৫ সালের দল থেকে বহিষ্কৃতও হন চার ‘তরুণ তুর্কি’—কৃষ্ণকান্ত, চন্দ্রশেখর, মোহন ধারিয়া এবং রামধন। চার জনেই জেলেও যান।

দুর্নিতিমুক্ত রাজনীতির আদর্শে অবিচল কৃষ্ণকান্তের রাজনৈতিক জীবনের আর একটি পর্যায় আরম্ভ হল জয়প্রকাশ নারায়ণের সংস্পর্শে এসে। ইউনিয়ন অব সিভিল লিবার্টিজ অ্যাণ্ড ডেমোক্রাটিক রাইটসের তিনি ছিলেন প্রতিষ্ঠাতা সাধারণ সম্পাদক। সভাপতি ছিলেন জয়প্রকাশ নারায়ণ। ১৯২১ সালে মহাত্মা গান্ধী প্রতিষ্ঠিত সারভেন্টস অব পিপলস সোসাইটির সদস্য ও পরে তার সভাপতি কৃষ্ণকান্ত জয়প্রকাশ নারায়ণ প্রতিষ্ঠিত গান্ধীয়ান ইন্সটিটিউট অব স্টাজিজের সদস্যও ছিলেন আজীবন। ১৯৬৬ থেকে ’৭৭ পর্যন্ত তিনি রাজ্যসভার সদস্য ছিলেন। পরে লোকসভার সদস্যও হয়েছিলেন।

১৯৮৯ সালে বিশ্বনাথ প্রতাপ সিংহ সরকার তাঁকে অন্ধ্রপ্রদেশের রাজ্যপালের দায়িত্ব দেয়। ১৯৯৭ সালে কেন্দ্রে যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমতায় এল। প্রধানমন্ত্রী হলেন ’৪২ সালে এক সঙ্গে কারাদণ্ড ভোগ করা ইন্দ্রকুমার গুজরাল। প্রধানত তাঁর আগ্রহেই সে বছর উপ-রাষ্ট্রপতির দায়িত্ব পেলেন কৃষ্ণকান্ত। তাঁর মেয়াদ শেষ হওয়ার আর বাকি ছিল মাত্র ২৪ দিন।

এক দিকে তিনি যেমন বিজ্ঞানের ভক্ত। অন্য দিকে তেমনই সাহিত্যানুরাগী। ভারতের পরমাণু অস্ত্র

থাকা দরকার বলে মনে করতেন। ‘সায়েন্স ইন পার্লামেন্ট’ পত্রিকার সম্পাদকও হয়েছিলেন। নির্বাচনী সংস্কারের পাশাপাশি প্রচার মাধ্যমের স্বাধীনতা নিয়েও সরব হয়েছেন বারবার। সেই সঙ্গেই ছিলেন উর্দু কবিতার অনুরাগী।

● আনন্দবাজার পত্রিকা

❒ সাক্ষাৎকার বা ইন্টারভ্যু

প্রশ্ন-উত্তরের ফ্রেমে সাংবাদিক যখন খ্যাতকীর্তি ব্যক্তিত্বের রূপ ও স্বরূপ, কর্মজীবন, ধ্যানধারণা, কৃতিত্ব ও ব্যর্থতাকে পাঠক-শ্রোতা-দর্শকের কাছে মনোজ্ঞ ভঙ্গিতে উপস্থিত করেন, সেই সাংবাদিক-সংরূপটিই হল সাক্ষাৎকার। যেমন—

(ক) কে বলে জয়সূর্যরা এগিয়ে, প্রশ্ন সৌরভের

প্রশ্ন : শ্রীনাথকে উড়িয়ে এনে খেলানোটা মস্ত বড় ফাটকা হয়ে যাচ্ছে না? এত লম্বা জার্নি করে এসেই কয়েক ঘণ্টার মধ্যে একটা লোক মাঠে নামবে কী করে?

সৌরভ : সে তো যে কোনও পছন্দসই বোলারকে সুযোগ দেওয়াটাই চান্সের মতো। এক্সপেরিমেন্টটা খাটতেও পারে, না-ও খাটতে পারে। তা ছাড়া করতে তো হবে কেবল দশ ওভার। তা-ও একসঙ্গে নয়। শ্রীনাথ ম্যাচ ফিটও রয়েছে। নিয়মিত খেলেছে ওখানে।

প্রশ্ন : এটা তো আগরকরের মতো যারা টিমে আছেন, তাঁদের প্রতি অনাস্থা।

সৌরভ : অনাস্থা কেন? আমরা তো আগরকরকে খেলাতেও পারি। এমন হতে পারে যে শ্রীনাথ, আগরকর আর জাহির তিনজনেই খেলে কুম্বলে বসল।

প্রশ্ন : মাঝখানে বেশ কয়েকটা ওয়ান ডে ফাইনাল আমরা হেরেছি। গত বারের মিনি বিশ্বকাপ যেমন। আবার যাতে একই জিনিস না ঘটে, সেটা বুখতে কীসের উপর লক্ষ্য রাখছেন।

সৌরভ : এ বছর সবক'টা ফাইনাল বা চূড়ান্ত নিষ্পত্তির ম্যাচগুলোয় কিন্তু আমরা জিতেছি। যেন ন্যাটওয়েস্ট ফাইনাল, গুয়াহাটিতে জিম্বাবোয়ে সিরিজ বা ওয়েস্ট ইন্ডিজে গিয়ে শেষ ওয়ান ডে-টা।

প্রশ্ন : টানা হার থেকে জয়—এই রূপান্তরটা কী ভাবে এল?

সৌরভ : ফিজিক্যাল ফিটনেস অনেক বেড়েছে ছেলেদের। তাছাড়া ফাইনালে ভাগ্যও একটা ব্যাপার। সেটা কাজ করেছে।

প্রশ্ন : আজ রাতে টিম মিটিংয়ে কী বলবেন ছেলেদের?

সৌরভ : বলব, মাথাটা ঠাণ্ডা রাখতে। বেশি যেন ফাইনাল-ফাইনাল ভাবতে না যায়।

প্রশ্ন : শ্রীলঙ্কাকে প্রচণ্ড আত্মবিশ্বাসী দেখাচ্ছে।

সৌরভ : দেখাক, কাদের আত্মবিশ্বাস বেশি, মাঠে দেখা যাবে।

প্রশ্ন : জয়সূর্যের দাবি, ব্যাটিংয়ে দু'টো টিম সমান-সমান। কিন্তু শ্রীলঙ্কা জিতবে, কারণ তারা বোলিংয়ে এগিয়ে।

সৌরভ : কীসের এগিয়ে? জাহির এখন যা বল করছে, এর চেয়ে কি চামিণ্ডা ব্যাস বড় বোলার? দিলহারা ফার্নান্ডো কি শ্রীনাথের চেয়ে এগিয়ে? ওদের লেগস্পিনারটা কি কুম্বলের থেকে ভয়ঙ্কর? একমাত্র বলতে পারেন, হরভজনের চেয়ে মুরলী এগিয়ে।

প্রশ্ন : সহবাগের সঙ্গে ব্যাট করার অভিজ্ঞতা কেমন?

সৌরভ : খুব ভাল। দারুণ ব্যাট করছে ও। ওকে ফাইনালেও বলা আছে শুরু থেকে শট খেলতে। আমি অন্য দিকটা ধরব। এই স্ট্র্যাটেজিটা শুরু থেকেই আমাদের আছে। ন্যাটওয়েস্ট ফাইনালের মতো বড় স্কোর ধাওয়া করতে হলে অবশ্য অন্য কথা। সেখানে উপায় ছিল না বলে শুরু থেকেই দু'জনকে চালাতে হয়েছিল।

প্রশ্ন : টস জিতলে কী করবেন?

সৌরভ : অবশ্যই ব্যাটিং। ফাইনালে ওদের মাঠে রান তাড়া সহজ হবে না।

প্রশ্ন : সচিন তেন্ডুলকরের ব্যাটিং অর্ডার কী হবে?

সৌরভ : কেন? চার।

প্রশ্ন : বিশেষজ্ঞেরা অনেকেই মনে করছেন, সচিনকে অন্তত তিন নম্বরে তুলে আনা উচিত। আপনাদের জুটির ভাল শুরুর ছন্দটা ওয়ান ডাউনে অন্য কেউ গেলে হারিয়ে যাচ্ছে। সেখানে সচিন খুব কাজে দেবেন। তাছাড়া সচিন যথেষ্ট বলও পাচ্ছেন না।

সৌরভ : হুঁ। ঠিকই।

প্রশ্ন : তা হলে-সচিন কত নম্বরে খেলবেন? তিন না চারে?

সৌরভ : চার।

প্রশ্ন : ভারতীয় সমর্থকদের উদ্দেশ্যে কিছু বলার আছে?

সৌরভ : আমরা আপ্রাণ চেষ্টা করব, এই ভরসাটা রাখতে পারেন।

প্রশ্ন : শ্রীলঙ্কার সম্ভাব্য স্ট্র্যাটেজি কী হতে পারে?

সৌরভ : ওরা তিনজন সিমার খেলাবে। ধর্মসেনাকে বাদ দেবে। আর চেষ্টা করবে আমাদের পেসারদের শুরু থেকে ঠ্যাঙাতে। তবে একটা কথা মাথায় রাখবেন, গত সাত ম্যাচের রেকর্ডে কিন্তু আমরা এগিয়ে আছি ৫-২য়ে।

প্রশ্ন : সমালোচক হিসাবে লিখতে হলে কী লিখতেন? ফাইনালের আসল নির্ণয়াক কী হতে যাচ্ছে?

সৌরভ : আমরা কত ভাল ব্যাট করতে পারি।

প্রশ্ন : বলা হচ্ছে, গোটা দেশে মন্দির হামলার পর তৈরি হতাশার রেশ মানুষ কাটিয়ে উঠেছে শুধু আপনার টিমকে সফল হতে দেখে। আপনি কি সে ব্যাপারে ওয়াকিবহাল?

সৌরভ : হতেই পারে। এখানে বসে এতটা তো টের পাওয়া যায় না। তবে ভারতের জনজীবনে ক্রিকেটের অসম্ভব প্রভাব আছেই। ছুটকো-ছাটকা ওয়ান ডে ম্যাচ জিতলেই কী না কী হয়, আর এটা হল মিনি বিশ্বকাপ ফাইনাল।

● **আনন্দবাজার পত্রিকা**

এছাড়াও আরও অনেক Genre বা সংরূপের অস্তিত্ব রয়েছে সংবাদিকের ঝুলিতে। নিত্য-নতুন সংরূপও তৈরি হচ্ছে চলমান জীবনের দাবিতে, অভিজ্ঞতার আলোকে। এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায় আলেখ্য বা Portrait, আলোচনা or Discussion সমালোচনা বা Review, টিপ্পনী বা Gloss, পুচ্ছপট বা Tale-pice, স্তম্ভ বা Column, Propayanda-Case, Feuilleton ইত্যাদি সাংবাদিক-সংরূপ বা Journalistic-Genres.

১২০.৩.২ হেডলাইন বা শিরোনাম

সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রতিটি প্রতিবেদনেরই অপরিহার্য অঙ্গ হল তার শিরোনাম বা হেডলাইন। তবে নিছক প্রতিবেদন বা রিপোর্টের ক্ষেত্রেই যে হেডলাইন দিতে হয় তা নয়, খবরের কাগজে ছাপা হয় যেসব রচনা, সম্পাদকীয়, চিঠিপত্র, মন্তব্য, নিউজ আইটেম ইত্যাদি প্রত্যেকটির বেলাতেই আলাদা আলাদা শিরোনাম থাকা বাধ্যতামূলক।

রিপোর্টার বা প্রতিবেদক যখন প্রতিবেদন তৈরি করেন তখন তারই অবিভাজ্য অংশ হিসাবে একটি শিরোনামও ব্যবহার করেন। অনেক সময় আবার বার্তা-সম্পাদক নিজে, কিংবা হেডলাইন যথাযথ হয়েছে কিনা দেখার জন্য যিনি ভারপ্রাপ্ত থাকেন তিনি সেই হেডলাইন অদল-বদল করে দেন বা দিতে পারেন। কোন কোন প্রতিষ্ঠানে একজন সহ-সম্পাদক থাকেন যিনি প্রতিবেদন, নিউজ আইটেম পড়ে নিয়ে যুতসই শিরোনাম জুড়ে দেন। শিরোনাম বা হেডলাইন যে এত গুরুত্বপূর্ণ তার কারণ অবশ্য অনেক। বাস্তবে

দেখা যায়, ব্যস্ততা বা সময়ের অভাবের জন্য পাঠকদের একটা অংশ সংবাদের ভিতরে গিয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ার সময় পান না। আবার এমন পাঠকও বেশি পাওয়া যায় না যাঁরা সবরকম সংবাদ সম্পর্কে সমান আগ্রহী। এর মূলে রয়েছে রুচির ভিন্নতা, শিক্ষার হেরফের, দৃষ্টিভঙ্গির স্বাতন্ত্র্য। ভালো লাগা-না-লাগার জেরেই অনেক পাঠক যেসব খবর এড়িয়ে যান, কোনরকম আগ্রহই বোধ করেন না, সেইসব সংবাদই আবার আরেক দল পাঠক গোগ্রাসে গেলেন, কিংবা তারিয়ে তারিয়ে পড়ে পান আনন্দ। সংবাদপত্রকে কিন্তু নানান রুচির, মতের পাঠকদের কথা মনে রেখেই, সমাজের সর্বস্তরের পাঠক-গ্রাহকদের স্বার্থ রক্ষা করেই সংবাদ পরিবেশনে বৈচিত্র্য আনতে হয়। আর এই বিচিত্রতার বিজ্ঞাপন পয়লা দফার ঝলমলে করে আকর্ষণীয় হেডলাইনের সহযোগিতায়। তাই খবরের কাগজে শিরোনাম বা হেডলাইন তৈরির ব্যাপারটা কিছুতেই হেলাফেলার নয়।

তবে সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রতিবেদনে শিরোনাম দেবার সঙ্গে শিল্প-সাহিত্যে শিরোনাম দানের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য আছে বা থেকে যায়। সাহিত্যের ক্ষেত্রে শিরোনাম দেবার পিছনে লেখকের মানসিক প্রবণতা বেশি কাজ করে। তাছাড়া নামকরণও হয় নানা ধরনের। কবি, কথাকার, নাট্যকার, প্রাবন্ধিক, এমন কি চিত্রশিল্পী, ভাস্কর, চলচ্চিত্র নির্মাতাগণ তাঁদের নিজ নিজ সৃষ্টির ক্ষেত্রে নামকরণ করে থাকেন কখনো বিষয়টির প্রাধান্য মাথায় রেখে, আবার কখনো বাঁক-ঘটানো মুখ্য ঘটনাটির ওপর সন্ধানী আলো ফেলে। নায়ক-নায়িকার নামেও যেমন শিরোনাম দেওয়া হয়, তেমনি আঙ্গিক, সময়-নির্ভরও নামকরণ করা হয়। নানা রঙের দ্যুতি ঠিকরানো হিরের টুকরোর মতো ব্যঞ্জনাধর্মী বা সাংকেতিক নামও সাহিত্যে কম জায়গা জুড়ে নেই।

কিন্তু সংবাদপত্রের ক্ষেত্রে প্রতিবেদকের ইচ্ছানুসারে সব সময় শিরোনাম দেওয়া যায় না, বা হয়ও না। সাহিত্যের জগতে শিরোনামের জায়গাটিতে যেমন বিরাট এলাকা জুড়ে থাকে ভাবগর্ভ নামকরণ, সংবাদপত্রের বেলায় তেমনটি সচরাচর হয় না। বরং বলা যায়, কখনো কখনো ব্যঞ্জনাগর্ভ হেডলাইন পাঠককে বিপথগামী করে, বর্ণিত বিষয়ের সঙ্গে কোন মিল খুঁজে পান না তাঁরা। একথা খেয়াল রাখবেন সংবাদপত্রের সাধারণ পাঠকের চেয়ে সৃজনশীল সাহিত্যের পাঠকসংখ্যা কমই শুধু নয়, অনেক বেশি সংবেদনশীলও। চিত্রশিল্প, ভাস্কর্যের দর্শকও ঠিক সাধারণ স্তরের নয়। এঁদেরও রয়েছে একটা নিজস্ব জগত, যার সঙ্গে সাধারণের ধ্যানধারণা মেলে না। অন্যদিকে খবরের কাগজকে পৌঁছুতে হয় সবচেয়ে বেশি সংখ্যক পাঠকের কাছে। দিনকে দিন গ্রাহকসংখ্যা বাড়ানোর লক্ষ্যে, প্রতিযোগিতার বাজারে নামতে হয় সংবাদপত্রকে। একালে এটা একটা ইন্ডাস্ট্রি। গ্রাহকদের মন জোগানো, প্রতিষ্ঠানের মুনাফা বাড়ানো, বিজ্ঞাপনের বাজার দখল করার জন্য নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে যেতে হয়। ফলে সংবাদপত্রের কৌটোয় পুরে দিতে হয় দুনিয়ার খবর। তাই সাহিত্যের শিরোনাম দানের সঙ্গে

সংবাদপত্রের প্রতিবেদনের হেডলাইনকে একাসনে বসানো ঠিক নয়। সংবাদপত্রের প্রতিবেদনের হেডলাইন হয় মূলত বিষয়নিষ্ঠ। দূরদর্শন, বেতারের ক্ষেত্রেও এই একই কথা প্রযোজ্য। এ ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথকে পুরোপুরি মেনে নিতে খানিকটা অসুবিধা হতে পারে। নামকরণের ব্যাপারে তিনি এক জায়গায় বলেছেন, 'নামকে যাঁহারা নামমাত্র মনে করেন আমি তাঁহাদের দলে নই। শেক্স্পীয়র বলিয়া গেছেন—গোলাপকে যে-কোনো নাম দেওয়া যাক তাহার মাধুর্যের তারতম্য হয় না। গোলাপ সম্বন্ধে হয়তো তাহা খাটিতেও পারে, কারণ গোলাপের মাধুর্য সংকীর্ণ সীমাবদ্ধ। তাহা কেবল গুটিকতক সুস্পষ্ট প্রত্যক্ষগম্য গুণের উপর নির্ভর করে। কিন্তু মানুষের মাধুর্য এমন সর্বাংশে সুগোচর নহে, তাহার মধ্যে অনেকগুলি সূক্ষ্ম সুকুমার সমাবেশে অনির্বচনীয়তার উদ্রেক করে। তাহাকে আমরা কেবল ইন্দ্রিয় দ্বারা পাই না, কল্পনা দ্বারা সৃষ্টি করি। নাম সেই সৃষ্টিকার্যের সহায়তা করে।' আবার, 'বিচিত্রা' পত্রিকায় ধারাবাহিকভাবে যখন বেরোচ্ছিল রবীন্দ্রনাথের 'যোগাযোগ' উপন্যাসটি তখন তিনি নামান্তর নামে ছোট্ট একটি আলোচনা সেরে নেন। 'বিচিত্রা'র প্রথম দু-সংখ্যায় উপন্যাসটি 'তিন পুরুষ' নামে ছাপা হচ্ছিল। তৃতীয় সংখ্যা থেকে কবি এর নাম দেন 'যোগাযোগ'। এই নাম পরিবর্তনের বিষয়ে লেখক যে কৈফিয়ৎ দেন তাতে নামকরণের ব্যাপারে রবীন্দ্রনাথের মত আমাদের কাছে খুবই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। তিনি জানাতে কসুর করেন নি যে 'ব্যক্তিগত নাম ডাকবার জন্যে, বিষয়গত নাম স্বভাবনির্দেশের জন্যে।' রবীন্দ্রনাথ আরো জানান, 'রসশাস্ত্রে মূর্তিটা মাটির চেয়ে বেশি, গল্পটাও বিষয়ের চেয়ে বড়ো। এইজন্যে বিষয়টাকেই শিরোধার্য করে নিয়ে গল্পের নাম দিতে আমার মন যায় না।' তিনি উদাহরণ দিয়ে আরো বেশি খোলসা করেন নিজের অভিমত। জানান, 'জাপানে দেখেছি, তলোয়ারের ফলকটার উপরে কারিগর যখন তার কারুকলার আনন্দ ঢেলে দেয় খাপটাকে তখন নিতান্ত নিরলংকার করে রাখে। গল্প নিজেই নিজের পরিচয় দেবার সাহস রাখে যেন, নামটাকে যেন জোর গলায় আগে আগে নকিবগিরি করতে না পাঠায়।'

রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গিটি শিল্পসাহিত্যের ক্ষেত্রে মেনে নিতে হয়, কিন্তু সংবাদপত্রের প্রতিবেদনে বিষয়েরই দাদাগিরি। বৈষয়িকতাই এখানে বড়ো জায়গা জুড়ে। তাই প্রতিবেদনের হেডলাইনে বিষয়বুদ্ধি-প্রধান বিজ্ঞানের জয়জয়কার। পাশাপাশি এটাও মনে রাখতে হবে যে হেডলাইন খবর নয়, সংবাদের চূড়ামাত্র। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তা নিজেই নিজের পরিচয় দেয়, হয়ে ওঠে মুদ্রিত সংবাদের অবিচ্ছেদ্য অংশ। বস্তুত, খবরের ভিতরে ঢুকবার ছাড়পত্র হল হেডলাইন, তা প্রথম দরজা। সংবাদের বিস্তৃত বিবরণটি পড়ে নেবার আগেই পাঠকের চোখ আটকে যায় হেডলাইনে বা শীর্ষনামে।

এই হেডলাইনকে হতে হয় খুবই আকর্ষণীয়। তা সংক্ষিপ্ত হওয়াও বাঞ্ছনীয়। নেহাতই দু-চারটে শব্দ খরচ করে প্রতিবেদনের শিরোনামটি তৈরি করতে হয়। এক্ষেত্রে অনেক সময় সংবাদপত্রের লে-আউট

বা অঙ্গসজ্জা আড়াল থেকে নিতে পারে খানিকটা নিয়ন্ত্রকের ভূমিকা। হেডলাইনের ব্যাপারে তখন আর প্রতিবেদকের কোন ভূমিকা থাকে না। লে-আউট ডিজাইনার, প্রতিষ্ঠানের গ্রাফিকশিল্পীর দৃষ্টিতে যদি কোন হেডলাইন অঙ্গসজ্জার পক্ষে দৃষ্টিনন্দন না হয় তাহলে শিল্পীর কথামতো সেই শীর্ষনামকে বদলে দিতে পারেন ভারপ্রাপ্ত সম্পাদক। কেউ কেউ আবার হেডলাইনে চমক দিতে গিয়ে বিষয়সম্পর্ক-শূন্য এমন শিরোনাম ব্যবহার করেন যা সুস্থ সাংবাদিকতার পরিপন্থী। এতে বেশ কিছু পাঠক বিভ্রান্ত হতে পারেন। শস্তা জনপ্রিয়তা লাভের আশায় এমন হেডলাইন দেওয়া উচিত নয় যাতে পাঠক বেমক্কা হোঁচট খান, কিংবা বিষয়ের সঙ্গে হেডলাইনের মানে মেরুসমান ফারাক হয়। অনেকসময় এই ধরনের হেডলাইন ব্যবহার করা হয় ট্যাবলয়েডে, যার গোড়ায় থাকে হলুদ সাংবাদিকতার প্রেরণা। অবশ্য কোন কোন হেডলাইন বিষয়কে ছাপিয়ে বা বিষয়ের ইঙ্গিত দিয়েই হতে পারে কবিত্বঘেঁষা। সেখানে ছড়িয়ে পড়ে শিল্পের সুষমা। ইতিহাসের দরবারে জায়গা করে নেয় এরকমই শিল্পের রেণুমাখানো হেডলাইন।

সাংবাদিক-সংরূপ বা জার্নালিস্টিক জেন্‌র-এর ওপর নির্ভর করে তার হেডলাইন বা শীর্ষনামটি কেমন হবে। অর্থাৎ রিপোর্ট, রিপোর্টাজ, নিউজ আইটেম ইত্যাদি প্রত্যেকটি জেন্‌রের চরিত্র যেমন আলাদা তেমনি তাদের হেডলাইনের ধরনটিও হবে আলাদা আলাদা। ইদানিং অবশ্য অনেকে এই স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার বিরুদ্ধে। হেডলাইনে তাই মুড়ি-মিছরি একাকার হয়ে যাচ্ছে। সুযোগ পেলেই কবিতার পঙ্‌ক্তিঘেঁষা শিরোনাম দিতে সাংবাদিকেরা তৎপর হচ্ছেন।

এই ব্যাপারটা অনেকের চোখে ভালো ঠেকছে না। সে যাই হোক, ভালো-মন্দ বিচারের ভার গ্রাহক-পাঠকদের ওপরেই ছেড়ে দেওয়া যেতে পারে। শেষ কথা বলার অধিকার কারো নেই। কোনো কোনো হেডলাইন হয় ইনফরমেটিভ। এখানে এক লহমায় পাঠকের কাছে সংবাদের সার জ্ঞাপন করাই হয়ে ওঠে হেডলাইনের কাজ। যেমন,

‘প্রবল বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত কোচবিহার, জলপাইগুড়ি’
‘মুখ্যমন্ত্রীর ফোন দিল্লিকে, রেল নিয়ে বসবে কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভা’
‘মন্দির মুক্ত, গুজরাটে সেনা, সতর্ক দেশ’
‘গুজরাটের মন্দিরে জঙ্গী হামলা, মৃত ৩০’
‘মহামিছিল জানালো রেল ভাগ মানবো না’
‘শ্রম আইন বদলের বিরুদ্ধে এককাট্টা শ্রমিক সংগঠনগুলি’
‘বাগডোগরাকে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর করার দাবি’।

কোন কোন হেডলাইনে সাংবাদিকের দৃষ্টিভঙ্গি, মন্তব্য স্পষ্টতা পায়। যেমন—

'জল, বাতাসহীন ছোট লক-আপ যেন বদ্ধ কূপ'

'শিশু হাসপাতাল ফিরেছে পুরনো চেহারায়'

'সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির তাস খেলছে সব দলই'

'আজ দুর্বল বাংলাদেশকে পাচ্ছে ভারত'।

কোন কোন হেডলাইনে রহস্যের হাতছানি, পাঠকের কৌতূহল জাগানোর প্রয়াস। যেমন—

'হীরক-রাজ্যে হঠাৎ সাবা'

'স্থাপত্যের অসামান্য প্রাঙ্গণ ছিলো নিরাপত্তাহীন'

'দীর্ঘ ৩১ বছর পর'।

'পকেট বাঁচাতে বাজারে গোয়েন্দা'।

হেডলাইনের মধ্যেই পাঠক বেশির ভাগ সময় পেতে চান প্রতিবেদনের ভিতরে কী আছে। রিপোর্টাজে কিংবা পোর্ট্রেটে সেটা আশা করা সবসময় ঠিক নয়। এই ধরনের সাংবাদিক-সংরূপে সাংবাদিকের ব্যক্তিগত আবেগ-অনুভূতি-দৃষ্টিভঙ্গির মিশেল ঘটে। এক্ষেত্রে তথ্য অনেকসময় গৌণ হয়ে পড়ে। ভাষা ছুঁয়ে যায় সাহিত্যের সীমানা। শব্দের হৃদয় খুঁড়ে ব্যাঞ্জনার দ্যুতি পড়ে ঠিকরে। তাই রিপোর্টাজের হেডলাইন কবিতার পঙ্ক্তির মতো ভাবগর্ভ হতে পারে, হয়েও থাকে। যেমন—

'লালকমলের দেশে ওড়ে, মুক্তির পারাবত'

'ভূস্বর্গে মৃত্যুর মহড়া'

'শহিদ মিনারের মুখোমুখি'

'আচমকা মনে ভাসে পিকাসো'।

তাহলে দেখা যাচ্ছে হেডলাইন বা শিরোনাম পাঠককে—

- বিষয় সম্পর্কে আগাম আভাস দেয় বা গাইড করে;
- খবর চালান দেয়, অর্থাৎ বিষয়টিকে ঘিরে তথ্য সরবরাহ করে;
- বর্ণিত ঘটনা বা সমস্যার মূল্যায়ন করে, অর্থাৎ বিষয়টির বিশেষত্ব কী সেটা মূল্যায়ন করার সুযোগ এনে দেয়;
- দৃষ্টিনন্দন সংবাদপত্র উপহার দেয়, অর্থাৎ হেডলাইন বা শিরোনামের থাকে গ্রাফিক ফাংশন।

এতেই শেষ হয়ে যায় না হেডলাইনের ভূমিকা। বরং হেডলাইন—

- পাঠকের কাছে কিছু কিছু নির্দেশ পৌঁছে দেয়;
- পাঠককে সংবাদ দেয়;
- বর্ণিত ঘটনার বা সমস্যার প্রতি পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে;
- কৌতূহল জাগিয়ে তোলে;
- ঘটনার ভিতরকার ঘটনার সুলুকসন্ধান দেয়;
- পাঠকের মধ্যে উৎসাহ সঞ্চার করে;
- গভীরভাবে চিন্তা করতে পাঠককে সাহায্য করে;
- সর্বোপরি পাঠককে করে উদ্দীপিত ও সুশিক্ষিত।

সংবাদপত্রে হেডলাইন দেবার দায়িত্ব প্রতিবেদকের ওপর বর্তায় না। সেটি সহ-সম্পাদক বা সাব-এডিটরদের দায়িত্বের মধ্যে পড়ে। এই হেডলাইনের জন্য হরফের পয়েন্ট নির্বাচন করতে হয় কলমের মাপ অনুসারে, অর্থাৎ হেডলাইনটি কত কলমের হবে। তদনুযায়ী কত পয়েন্টের শব্দ বসালে তা ওই বরাদ্দ কলমের মধ্যে ধরবে।

এছাড়া প্রতিবেদনের উপযুক্ত হেডলাইন রচনার সময়ে কয়েকটি জিনিস ভেবে দেখতে হয়। তা হল, প্রতিবেদনের শিরোনামে সাধারণভাবে—

- অতিশয়োক্তি বা উচ্ছাসপূর্ণ ভাষা ব্যবহার বর্জনীয়;
- অলংকারের আধিক্য অনভিপ্রেত;
- ভবিষ্যদ্বাণী পরিত্যাজ্য;
- অঘটিত ঘটনার আভাস পরিহারযোগ্য;
- বিষয়ের সঙ্গে সম্পর্কশূন্য হেডলাইন বিভ্রান্তি ছড়ায়, তাই তা বাদ দেবেন;
- ঘটনার ইঙ্গিত থাকবে, কিন্তু বিস্তৃত ব্যাখ্যা না থাকলে ভালো;
- যেন কৌতূহল জাগিয়ে তোলে,
- বর্তমান কালের ব্যবহারই কাম্য;
- অনুজ্ঞাবাচক, আদেশধর্মী শব্দ বর্জনীয়;
- যথাসম্ভব সংখ্যা পরিহার করবেন;
- উক্তি দিলেও উদ্ধৃতিচিহ্ন দেবেন না। [যেমন—‘বন্দি-মৃত্যুতে শাস্তি পাবে পুলিশ ঃ বুদ্ধ’]

হেডলাইনের ব্যাপারে আর একটি কথা না বললেই নয়। তা হল, একালে সাংবাদিক-সংরূপের

বিশুদ্ধতা পত্র-পত্রিকায় ঠিকমতো রক্ষিত হচ্ছে না। একজন কমপ্লিট ফুটবলার যেমন একালে সব পজিশনেই খেলতে পারেন তেমনি আধুনিক সাংবাদিকেরা মনে করেন জার্নালিস্টিক জেন্‌র-এর কথা না ভেবে সাংবাদিকের লেখাটির একটি উপযুক্ত শিরোনাম দিলেই চলবে। এক্ষেত্রে রিপোর্ট, রিপোর্টাজ, নিউজ আইটেম, সাক্ষাৎকার, সম্পাদকীয় ইত্যাদি বিভিন্ন সংরূপের বৈশিষ্ট্য ভেবে হেডলাইন ঠিক করার কোন মানে হয় না। ধ্রুপদী দৃষ্টীভঙ্গির বদলে সাংবাদিকতাতেও এসেছে আজ আধুনিকতার ঢল। তাই একালের সাংবাদিকের লেখনীতে হেডলাইনের বিশুদ্ধতা বিলীয়মান। তাঁদের কলমে যাবতীয় সীমানা ভেঙে চৌচির। লক্ষ্য সকলের একটাই—গ্রাহকসংখ্যা বাড়াও, পাঠকের মন জয় করো, বিজ্ঞাপনের আলোয় ঝলমল করুক পত্রিকা এবং মুনাফার স্বর্গে পৌঁছে দাও নিজের প্রতিষ্ঠানকে।

১২০.৪ সারাংশ

খবর দেওয়া-নেওয়া অর্থাৎ সংবাদ শ্রবণ-দর্শন-পঠন-পরিবেশনের ব্যাপারটা দীর্ঘকালের। একালের মানুষের কাছে তো তা একরকম চলমান সভ্যতার নামান্তর। প্রতিবেদন হল যাবতীয় সাংবাদিক- সংরূপের মধ্যে অন্যতম প্রধান অবলম্বন। এর মাল-মশলা জোগাড়ের ক্ষেত্রে প্রতিবেদককে যেমন মেনে চলতে হয় অনেক কিছুই, তেমনি প্রতিবেদন রচনাকালে প্রতিবেদকের মধ্যে কোন্ কোন্ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্যণীয়ভাবে ফুটে ওঠা দরকার—সেটাও খেয়ালে রাখা জরুরি। বলাইবাহুল্য বিষয় ও চরিত্র অনুযায়ী প্রতিবেদনের বৈশিষ্ট্য, রচনার অবলম্বিত পদ্ধতিও আলাদা আলাদা।

১২০.৫ অনুশীলনী

ক. ছোট প্রশ্ন [প্রতিটির মান ১ নম্বর]

১। সাংবাদিকতা শব্দটির ব্যুৎপত্তি নির্ণয় করুন।

২। ‘সংবাদ’ শব্দটির চারটি প্রতিশব্দ লিখুন।

৩। Journalism-এর বাংলা প্রতিশব্দ কী?

৪। News-শব্দটির N, E, W, S-হরফগুলি কোন্ কোন্ অর্থের কথা বোঝায়?

৫। সাংবাদিকতার কাজটি খুবই সহজ, না জটিল?—এক কথায় উত্তর দিন।

খ. মাঝারি প্রশ্ন [প্রতিটির মান ৪/৫ নম্বর]

১। Journalism শব্দটি কীভাবে এসেছে? ৪/৫টি বাক্যে লিখুন।

২। কোন্ ইংরেজি শব্দের পারিভাষিক রূপ 'সংরূপ'? সেটি কীভাবে এসেছে?

৩। সাংবাদিক-সংরূপ বিচারের যে-তিনটি মান রয়েছে তা কী কী?

৪। নিউজ-আইটেম কাকে বলে?—৩/৪টি বাক্যে লিখুন।

৫। সংবাদচুম্বক কাকে বলে? ৪/৫টি বাক্যে একটি উদাহরণ দিন।

৬। প্রতিবেদন বা রিপোর্ট কাকে বলে? ৩/৪টি বাক্যে লিখুন।

৭। রিপোর্টাজ বলতে কী বোঝেন তা তিন-চারটি বাক্যে লিখুন।

গ. বড় প্রশ্ন [প্রতিটি প্রশ্নের মান ৮ থেকে ১০ নম্বর]

১। কোনো খ্যাতনামা ব্যক্তির মৃত্যু ঘটেছে। সেই খবর জানিয়ে সংবাদপত্রের উপযোগী একটি শোকসংবাদ তৈরি করুন।

২। কেরোসিন তেল সংগ্রহের জন্য দোকানের সামনে বিশাল লাইন পড়েছে। সেই লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা এক বৃদ্ধার একটি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করুন। ১০টি বাক্যে।

৩। রচনার শিরোনাম সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টিভঙ্গির উল্লেখ করে ১০টি বাক্যে শিরোনাম বিষয়ে একটি অনুচ্ছেদ তৈরি করুন।

৪। সংবাদপত্রে প্রকাশিত সংবাদের শিরোনামের কাজ কী কী? কয়েকটি বাক্যে লিখুন।

৫। প্রতিবেদন বা রিপোর্টের শিরোনাম দেবার সময় প্রতিবেদককে কী কী খেয়াল রাখা উচিত বলে আপনি মনে করেন?

৬। নিচে কয়েকটি প্রতিবেদন দেওয়া হল। প্রত্যেকটি প্রতিবেদনের নিচে বন্ধনীর মধ্যে একাধিক বিকল্প শীর্ষনাম দেওয়া হল। প্রতিবেদনগুলি পড়ে উপযুক্ত শিরোনাম বেছে নিন। কেন এই শিরোনাম নির্বাচন করেছেন তার উপযুক্ত কারণ দেখান।

● **নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা, ১৩ই সেপ্টেম্বর**—বিধানচন্দ্র রায় শিশু হাসপাতাল ১০টি শিশু মৃত্যুর ঘটনার তদন্ত চলছে। শুক্রবার মৃত শিশুদের পরিবারবর্গের সঙ্গে কথা বললেন অনুসন্ধানকারী দলের অন্যতম সদস্য রাজ্যের স্বাস্থ্য অধিকর্তা ডাঃ প্রভাকর চ্যাটার্জি। শুক্রবার বিধাননগরে স্বাস্থ্য ভবনে এসেছিলেন মৃত শিশুদের মা-বাবা, পরিবার-পরিজন। ৭টি পরিবার এদিন আসে। বাকি ৩টি পরিবারের সঙ্গে এখনও যোগাযোগ হয়নি। হাসপাতালের নথিপত্র থেকে জানা গেছে, এই ৩টি পরিবারের মধ্যে ২টি পরিবার কলকাতাতেই থাকে। তাই এদিন স্বাস্থ্য দপ্তরের পক্ষ থেকে কলকাতা পুলিসকে জানানো হয়েছে, সাহায্য চাওয়া হয়েছে। এই ৩টি পরিবারের সঙ্গে কথা বলা হবে আগামী সোমবার।

প্রসঙ্গত, এ মাসের একেবারে শুরুতে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় শিশু হাসপাতালে ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ১০টি শিশুর মৃত্যু হয়। তারপরই রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাঃ সূর্যকান্ত মিশ্র ঐ ঘটনার তদন্তের নির্দেশ দেন। প্রাথমিক তদন্ত রিপোর্ট পাওয়ার পর স্বাস্থ্যমন্ত্রী জানান, চিকিৎসার গাফিলতির কারণে কোন শিশুর মৃত্যু হয়নি। এমনকি শিশুদের মৃত্যুর কারণ কোন ধরনের সংক্রামক বা জীবাণুবাহিত রোগও নয়। এরপরই মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এবং স্বাস্থ্যমন্ত্রী বি সি রায় শিশু হাসপাতাল পরিদর্শনে যান। তাঁরা এবং স্বাস্থ্য দপ্তরের উচ্চপদস্থ অফিসাররা প্রায় দেড় ঘণ্টা ঐ হাসপাতালে কাটান। হাসপাতালের চিকিৎসক, নার্স, কর্মী এবং চিকিৎসারত শিশুদের অভিভাবকদের সঙ্গে কথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী ও স্বাস্থ্যমন্ত্রী। পরদিনই মহাকরণে মুখ্যমন্ত্রী শিশুমৃত্যুর ঘটনায় আরও বিস্তারিত এবং পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্তের নির্দেশ দেন।

রাজ্যের স্বাস্থ্য অধিকর্তা ডাঃ প্রভাকর চ্যাটার্জি এবং চিকিৎসা-শিক্ষা অধিকর্তা অধ্যাপক চিত্তরঞ্জন মাইতি এই তদন্ত করছেন। তাঁরা দু'জনেই গোটা সপ্তাহ ধরে বি সি রায় শিশু হাসপাতালের সুপার, চিকিৎসক, নার্স, কর্মচারীদের জিজ্ঞাসাবাদ করেছেন। বিশেষ করে ১লা এবং ২রা সেপ্টেম্বর যাঁরা হাসপাতালে কর্মরত ছিলেন, তাঁদের দফায় দফায় জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছে। তদন্তকারী দলের দুই অফিসার কথাবার্তা বলেছেন ঐ হাসপাতালে চিকিৎসারত শিশুদের অভিভাবকদের সঙ্গেও।

মৃত শিশুদের পরিবারবর্গের সঙ্গে তদন্তকারী অফিসাররা কথা বলবেন—এটা আগে থেকেই জানা ছিল। ফলে সাংবাদিকরা একবার মহাকরণ, একবার বি সি রায় শিশু হাসপাতালে ছোটাছুটি করেন। কিন্তু পুলিসের পরামর্শমতো বিধাননগরে স্বাস্থ্য ভবনে আয়োজন করা হয় জিজ্ঞাসাবাদের। উত্তর ২৪ পরগনা, হুগলী এবং হাওড়া এই তিন জেলা থেকে বেলা ১২টার মধ্যেই চলে আসেন কাকলি মজুমদার, মঞ্জু দে, রাজা গুপ্ত, ইশা সাহা পোদ্দার। চন্দা দাস আসতে পারেননি। তিনি তাঁর প্রতিনিধিকে পাঠান। হুড়োহুড়ি, ধাক্কাধাক্কি'র মাঝে বাকি ২টি পরিবারের নাম পাওয়া যায়নি। দীর্ঘক্ষণ এঁদের সঙ্গে কথা বলেন স্বাস্থ্য সচিব।

জানা গেছে, হাসপাতালের পরিচ্ছন্নতা এবং অক্সিজেন সিলিন্ডারের ব্যবহার নিয়ে কয়েকজন অভিভাবক অভিযোগ করেছেন। স্বাস্থ্য সচিব এদিন এ সংক্রান্ত সাংবাদিকদের সমস্ত প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে গেছেন। কি কথা হলো অভিভাবকদের সঙ্গে? এ প্রশ্নের কোন উত্তর দেননি তিনি। শুধু জানিয়েছেন, 'আগামী সপ্তাহে আমরা আমাদের রিপোর্ট দিয়ে দেব। তারপর যা বলার রাজ্য সরকারই বলবে।'

[(i) শিশুমৃত্যু ঃ অভিভাবকদের সঙ্গে কথা তদন্তকারীদের; (ii) তদন্ত চলছে; (iii) শিশুমৃত্যু ঃ মূলে অবহেলা; (iv) স্বাস্থ্য পরিষেবা তলানিতে, তাই শিশুমৃত্যু।]

● **বিশেষ সংবাদদাতা : হায়দরাবাদ :** হাইটেক প্রযুক্তির রাজ্য অন্ধ্রপ্রদেশে বেআইনী অঙ্গ কেনা-বেচার ঘটনা এখন নিত্যদিনের ঘটনা। প্রশাসনের একাংশের মদতেই অবাধে চলছে কিডনি পাচার। স্বাভাবিকভাবেই রাজ্যের স্বাস্থ্য ও পরিবার কল্যাণ দপ্তরের কাজকর্ম নিয়ে প্রশ্ন উঠেছে। অভিযোগের আঙুল উঠেছে অঙ্গ প্রতিস্থাপন সংক্রান্ত কমিটির দিকে। সম্প্রতি দক্ষিণ ভারতের একটি ইংরাজী দৈনিক ফাঁস করেছে ঐ কিডনি পাচার চক্রের কর্মকাণ্ড। এই খবরের কেন্দ্র করে তীব্র চাঞ্চল্য দেখা দিয়েছে গোটা অন্ধ্রপ্রদেশ জুড়ে।

এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে আজ পর্যন্ত কোনো স্পষ্ট ব্যাখ্যা দেয়নি রাজ্য সরকার। এমনকি অঙ্গ প্রতিস্থাপন সংক্রান্ত কমিটির কাছেও কৈফিয়ৎ তলব করেনি রাজ্যের স্বাস্থ্য বিভাগ। বরং সরকার পরোক্ষে এই বেআইনী ব্যবসার বৈধতা মেনে নেওয়ায় মানুষের ক্ষোভ আরও তীব্র আকার নিয়েছে।

অন্ধ্রপ্রদেশে আর্থিক বিকেন্দ্রীকরণ ও মাথাপিছু আয়ের বিষয়টি মোটেই আশাপ্রদ নয়। কৃষিব্যবস্থা প্রায় ভেঙে পড়ার মুখে। কৃষক ও দিনমজুরদের ঘরে ঘরে খাদ্য সঙ্কট খুবই তীব্র। এই পরিস্থিতিতে দরিদ্র পরিবারের মানুষেরা যে অর্থের লোভে কিডনি বিক্রির মতো কাজকে প্রাধান্য দেবে সে কথা বলাই বাহুল্য। সম্প্রতি রাজ্যের মেডিক্যাল এডুকেশন দপ্তরের ডিরেক্টর ডাঃ সার এস রমাদেবী তাঁর দপ্তরের সীমাবদ্ধতার কথা স্বীকার করে নিয়েই জানিয়েছেন যে, গোটা ব্যাপারটাই ধোঁয়াশাপূর্ণ। বহু ক্ষেত্রেই শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গ বিক্রির খবর আমাদের কাছে আসে না। বেশিরভাগ জায়গায় ভুয়ো শংসাপত্র দেখিয়ে বেসরকারী নার্সিংহোমগুলিতে কিডনি প্রতিস্থাপনের কাজ চালানো হচ্ছে। অথচ ঐ সমস্ত শংসাপত্রের বৈধতা পরীক্ষা করার মতো কোনো নির্দেশনামা আমাদের হাতে নেই। হিসাব অনুযায়ী গত তিন বছরে অন্ধ্রপ্রদেশে বেআইনীভাবে অন্তত ৫০০টি এই ধরনের ঘটনা ঘটেছে। ১৯৯৪ সালে অন্ধ্রপ্রদেশে অঙ্গ প্রতিস্থাপন সংক্রান্ত একটি আইন পাশ করা হলেও এ ব্যাপারে বে-আইনী কাজ-কারবার রদ করতে কী কী ব্যবস্থা নেওয়া হবে সে সম্পর্কে কোনো কথাই সেখানে উল্লেখ করা হয়নি। এমনকি বেসরকারী যে সমস্ত সংস্থা এ ধরনের কর্মকাণ্ডের সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়েছে তাদের বিরুদ্ধেও কোনো ব্যবস্থা নেওয়া হবে কি না সে কথাও আইনে উল্লেখ করা হয়নি।

সম্প্রতি ঐ কমিটির কাজে গতি আনতে ও দুর্নীতি রুখতে বেসরকারী হাসপাতালের কয়েকজন প্রতিনিধিকে এই কমিটির অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। কিন্তু তাতেও পরিস্থিতি বদলায়নি। সবচেয়ে বড় সমস্যা দেখা দিয়েছে কমিটির সদস্যদের অযোগ্যতা ও অর্থলোলুপতাকে ঘিরে। এঁদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য বিভিন্ন মহল থেকে বার বার রাজ্য সরকারের কাছে আবেদন জানানো সত্ত্বেও এখনও পর্যন্ত কোনো ব্যবস্থাই কার্যকরী হয়নি। কারণ দুনীর্তির গভীরতা এত বেশি যে সেক্ষেত্রে রাজ্য সরকারের বহু কর্তাব্যক্তিও ফেঁসে যেতে পারেন।

[(i) প্রদীপের নিচেই অন্ধকার; (ii) অন্ধ্রে প্রশাসনের মদতেই চলছে কিডনি পাচার; (iii) কিডনির সাতকাহন; (iv) কিডনিও কিডন্যাপড।]

● **স্টাফ রিপোর্টার, খোয়াই, ২৬ অক্টোবর**—পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার খোয়াই শহরের কাছে চম্পাহাওড় এলাকায় একটি যাত্রিবাহী জিপের উপর আজ জঙ্গিরা হামলা চালালে এক শিশু ও তিন মহিলা-সহ আটজন নিহত হয়েছেন। নিহতেরা সকলেই বাঙালি। জখম হয়েছেন ন'জন। শনিবার সকাল আটটা নাগাদ এই ঘটনা ঘটে। নির্বিচারে হত্যালীলা চালিয়ে জঙ্গিরা বাংলাদেশে পালিয়ে গিয়েছে। পুলিশের মতে অল ত্রিপুরা টাইগার ফোর্সের (এ টি টি এফ) জঙ্গিরা এই হামলার পিছনে রয়েছে। ঘটনার ঘন্টাখানেক পরে আধাসামরিক বাহিনী পৌঁছে শুধু মৃতদেহগুলি আনতে পেরেছে। এর প্রতিবাদে রবিার খোয়াই মহকুমায় ১২ ঘন্টার বন্ধ ডেকেছে সি পি এম।

আগরতলা থেকে প্রায় ১১২ কিলোমিটার দূরে বড়টিলা নামে এক জনহীন এলাকায় এই ঘটনা ঘটে। ওই রাস্তায় যানবাহন বলতে শুধু জিপ। মানুষকে খোয়াই আসতে হয় জিপে গাদাগাদি করে। এ দিন নিখিল রায় তাঁর জিপে ঠাসা যাত্রী নিয়ে খোয়াই আসছিলেন। নিখিলবাবু জানালেন, প্রথমে একটি টিলার উপর থেকে জঙ্গিরা জিপ লক্ষ্য করে এলোপাথাড়ি গুলি চালায়। সঙ্গে সঙ্গেই কয়েকজন যাত্রী মারা যান। একই সঙ্গে জিপের পিছনের ডানদিকের চাকাও গুলি লেগে ফেটে যায়। নিয়ন্ত্রণ হারিয়ে জিপটি ডানদিকে উল্টে পড়ে। জঙ্গিরা তখন টিলা থেকে নেমে এসে গাড়িটির উপর আবার গুলি চালায়। তারপর তারা বাংলাদেশের দিকে পালিয়ে যায়।

বি এস এফের এক অফিসার জানালেন, নির্বাচনের আগে মানুষের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করতেই জঙ্গিরা এই হামলা চালিয়েছে। ঘটনাস্থলে গিয়ে দেখা গেল, রাস্তার এখানে ওখানে চাপ চাপ রক্ত ছড়িয়ে আছে। একটি ছাগলও মরে পড়ে আছে। তার গায়েও গুলি লাগার চিহ্ন স্পষ্ট। টিলার উপরে ও রাস্তায় ত্রিপুরা স্টেট রাইফেলস, সি আর পি এফ ও বি এস এফের জওয়ানেরা পাহারা দিচ্ছেন। মৃতদেহগুলি আধাসামরিক বাহিনীর একটি ট্রাকে তোলা হয়েছে। জঙ্গিরা এ কে সিরিজের রাইফেল ব্যবহার করেছিল। এই নিয়ে চলতি মাসে জঙ্গিরা নিরাপত্তা রক্ষী ও সাধারণ মানুষ সমেত মোট ১৭ জনকে হত্যা করল। ৯ অক্টোবর এন এল এফ টি জঙ্গিরা ধলাই জেলায় ৯ জন জওয়ানকে মারে। ২০ অগস্ট পশ্চিম ত্রিপুরা জেলার হিরাপুরে একই গোষ্ঠীর জঙ্গিদের হামলায় ত্রিপুরা স্টেট রাইফেলসের (টি এস আর) ২০ জওয়ান নিহত হন। ২৬ জুলাই পশ্চিম ত্রিপুরায় টি এস আরের ৬ জওয়ান-সহ আট জন মারা যান। ২৬ এপ্রিল ও ১৩ মার্চ এন এল এফ টি জঙ্গিরা যথাক্রমে ৮ ও ১৩ জনকে গুলি করে মারে। ১৩ জানুয়ারি এ টি টি এফের হামলায় ১৬ জন নিহত হন।

[(i) জঙ্গিদের কবলে ত্রিপুরা; (ii) ত্রিপুরা অগ্নিগর্ভ; (iii) ত্রিপুরায় জঙ্গি হানা ঃ শিশু, মহিলাসহ নিহত আট; (iv) ত্রিপুরায় জঙ্গি হানা অব্যাহত।]

● এক ব্যক্তিকে চোর সাজিয়ে আত্মহত্যার প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগ তিন জনকে গ্রেফতার করল পুলিশ। বেনিয়াপুকুর থানার ক্রিমেটোরিয়াম স্ট্রিটের ৫৫ বছরের সেবাস্টিয়ান টেসরার অস্বাভাবিক মৃত্যু হয় সোমবার। তিনি অ্যাসিড খেয়েছিলেন বলে পুলিশ জানিয়েছেন। ওই অস্বাভাবিক মৃত্যুর তদন্তে নেমে পুলিশ জানতে পারে, পাড়ায় টেসরা ৫০ বছর ধরে বাস করছিলেন, সেখানকারই কিছু বাসিন্দা তাঁর নামে চুরির অপবাদ দিচ্ছিলেন। ওই অপবাদের জ্বালা সইতে না পেরেই ওই ভদ্রলোক অ্যাসিড খেয়েছিলেন কি না তা খতিয়ে দেখতে শুরু করেছে পুলিশ। মৃতের মায়ের অভিযোগ পেয়ে প্রাথমিক তদন্তের ভিত্তিতে পুলিশ মুন্নি বেগম, চুন্নি বেগম এবং মহম্মদ ছোটু নামে তিনজনকে আত্মহত্যায় প্ররোচনা দেওয়ার অভিযোগে গ্রেফতার করেছে।

গত সোমবার ওই ব্যক্তি হাসপাতালে মারা যান। মারা যাওয়ার আগে ভাগ্নে নোয়েল মাইকেলকে বলে যান, ‘‘বিশ্বাস করো, আমি চুরি করিনি।’’ পুলিশকে তা জানিয়েছেন মাইকেল এবং মৃতের মা। ওই অভিযোগের ভিত্তিতেই পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। পাড়ার লোকেরা কিন্তু টেসরার পরিবারের অভিযোগ নিয়ে দ্বিধাবিভক্ত। ওই মৃত্যুর সঠিক তদন্ত চেয়ে এলাকায় পোস্টারও পড়েছে। ডি সি (ই এস ডি) সঞ্জয় মুখোপাধ্যায় বলেন, ‘‘ওই এলাকায় একটি বাড়িতে অল্প কিছু তার চুরি যাওয়ার পরে টেসরার বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন ওই বাড়ির লোকেরা। অন্য দিকে টেসরার আত্মীয়েরা জানান তিনি চুরি করেননি।’’

ডি সি বলেন, ‘‘যাঁদের জিনিস চুরি হয়, তাঁরা জানান চুরির কথা স্বীকার করেছিলেন টেসরা। ৫০০ টাকার বিনিময়ে তিনি সেই তার বিক্রি করে দিয়েছেন বলে অভিযোগ করেছেন অভিযোগকারীরা। আমরা তদন্ত করে দেখছি কোন্ বক্তব্যটি ঠিক? তবে, টেসরা যে চোর, তার কোও নথি পুলিশের খাতায় নেই।’’ সঞ্জয়বাবু বলেছেন, ‘‘টেসরাকে যে মারধর ও অপমান করা হয়েছে তার প্রমাণ পুলিশের কাছে এসেছে। মনে করা হচ্ছে, এই অপমানের জন্যই তিনি মিউরেটিক অ্যাসিড খেয়ে আত্মহত্যা করেন।’’

বৃহস্পতিবার টেসরার দিদি দীপালি পিটার বলেন, ‘‘ছোট থেকে ও এখানেই থাকত। দু’বছর আগে ঠাকুরপুকুরে চলে গিয়েছে। তবে, ১০ বছরের ছেলে ভিক্টরকে স্কুলে ছাড়তে সে রোজই এখানে আসত।’’ এক সময়ে বন্দরে শ্রমিকের চাকরি করতেন টেসরা। সেই চাকরি চলে যাওয়ার পর তিনি ছুতোরমিস্ত্রির কাজ করতেন। দিদির পাশের বাড়ি মুন্নি বেগমদের বাড়িতেও সে কখনও ছোটখাটো কাজ করছেন। গত শুক্রবার তাঁকে মুন্নি বেগমের বাড়ি থেকে ডেকে পাঠানো হয়। টেসরা সেখান থেকে ফিরে আসার পরে মুন্নি বেগমের বাড়ির লোকেরা দেখেন, ব্যাগে রাখা কিছু তার পাওয়া যাচ্ছে না। তখন থেকেই তাঁদের সেবাস্টিয়ানের উপরে সন্দেহ হয় বলে মনে করছে পুলিশ।

দীপালিদেবীর অভিযোগ, ‘‘সোমবার টেসরা ছেলেকে স্কুলে দিয়ে দিদির বাড়িতে এলে তাঁকে ডেকে নিয়ে যাওয়া হয়। মারধর করে মুন্নিরা।” এর পরে তিনি ওই বাড়ি থেকে বেরিয়ে এলে তাঁকে পিছন থেকে ‘চোর-চোর’ বলে তাড়া করা হয় বলে অভিযোগ। পুলিশ জানায়, কাছেই একটি মুদির দোকানের মালিককে কিছু বুঝতে না দিয়ে টেসরা সেখান থেকে একটি অ্যাসিডের বোতল তুলে গলায় ঢেলে দেন।

[(i) আত্মহত্যায় প্ররোচনা ঃ গ্রেফতার তিন; (ii) অস্বাভাবিক মৃত্যু; (iii) ‘চোর’ সাজানোয় আত্মহত্যা, ধৃত তিন; (iv) চোর অপবাদে আত্মহত্যা।]

১২০.৬ গ্রন্থপঞ্জি

১। Alfred Jahnke : *THE JOURNALIST GENRES.*

২। Julius Waldschmidt : *JOURNALISTIC GENRES AND THEIR USE IN RADIO.*

৩। H. W. Steed : *THE PRESS.*

৪। Sumanta Banerjee : *INDIA’S MONOPOLY PRESS.*

৫। পার্থ চট্টোপাধ্যায় : *গণ-জ্ঞাপন*।

৬। Vladimir Hudec : *JOURNALISM.*

৭। M. Chalapathi Rau : *THE PRESS.*

৮। Alfred Jahnke : *THE HEADLINE.*

একক ১২১ ❑ প্রতিবেদন রচনা

গঠন

১২১.১ উদ্দেশ্য

১২১.২ প্রস্তাবনা

১২১.৩ মূলপাঠ

১২১.৪ প্রতিবেদনের নমুনা

১২১.৫ সারাংশ

১২১.৬ অনুশীলনী

১২১.৭ গ্রন্থপঞ্জি

১২১.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি আপনি যত্ন-সহকারে কয়েকবার পড়ুন। তাহলেই আপনি জানতে পারবেন, বুঝতে পারবেন, এবং প্রয়োগ করতে পারবেন।

- অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ও আকর্ষণীয় সাংবাদিক-সংরূপ অর্থাৎ Journalistic Genre প্রতিবেদন বা Report কাকে বলে।
- প্রতিবেদন পরিভাষাটি যে মূল শব্দের অর্থ বহন করে তৈরি হয়েছে তার উৎস কোথায় সেটি জানতে পারবেন।
- প্রতিবেদন শব্দের নানা অর্থও আপনি জানতে পারবেন।
- প্রতিবেদকের মধ্যে কোন্ কোন্ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্যণীয় হয়ে ওঠে তা আপনি এখানে বুঝতে পারবেন।
- প্রতিবেদকের কর্মপদ্ধতিকে কোন্ কোন্ পর্যায়ে ভাগ করা যায় তা এই একক থেকে আপনি জানতে পারবেন।
- প্রতিবেদনের বৈশিষ্ট্যগুলি কী—তা আপনি জানতে পারবেন।

- প্রতিবেদন রচনার পদ্ধতি কী, তাও আপনি এই একক থেকে জানতে পারবেন।
- প্রতিবেদন তৈরির সময় প্রতিবেদক হিসাবে আপনি কী কী মেনে চলতে পারেন, বরং বলা যায় মেনে চললে ভালো হয় সে সম্পর্কে একটা ধারণা পেয়ে যাবেন।
- প্রকাশিত প্রতিবেদনের দৃষ্টান্তগুলির সাহায্যে আপনি আপনার আহৃত জ্ঞানকে প্রতিবেদন রচনার সময় কাজে লাগাতে পারবেন।

১২১.২ প্রস্তাবনা

যেদিক থেকেই আমরা বিচার করি না কেন, মানুষের স্বাভাবিক অনুভূতি হল প্রাথমিকভাবেই খিদে মেটানো। টিকে থাকার জন্যে ক্ষুণ্ণিবৃত্তি নিবৃত্ত করাই তার প্রথম লক্ষ্য। এর জন্যে মানুষ করতে পারে না এমন কোনো কাজ নেই। ক্ষুণ্ণিবৃত্তি নিবৃত্ত করার মতোই আর যে-একটা প্রবল তাগিদ মানুষ ভীষণভাবে অনুভব করে সেটি হল খবরের খিদে মেটানো। বস্তুত মানবজাতির অস্তিত্বের মতোই প্রাচীন হল তার সংবাদ-অন্বেষা। এমনকি প্রাগৈতিহাসিক যুগেও কোন্‌খানে শিকারের পশু পাওয়া যাবে, কেমন করে তার পশ্চাদ্ধাবন হবে, কীভাবে দু-তিন জন মিলে বড় বড় প্রাণীকে খতম করা যাবে—সেই সংবাদ হত বিনিময়। এর বহু প্রমাণ রয়েছে উত্তর আফ্রিকার প্রস্তরচিত্রণ ও গুহাঙ্কনের মধ্যে।

সভ্যতার ঊষাকালে মানুষে-মানুষে সংবাদ সরবরাহ বা যোগাযোগের উপায় ছিল মূক-বধিরদের মতো ইশারার ভাষা বা ইঙ্গিত-ভাষা; পাহাড়ে, বালিতে কিংবা মৃত্তিকায় অঙ্কিত ভাষা। এখনও ঠিক নিশ্চিতভাবে বলা যায় নি, ঐ সময়ে একে অপরের কাছে নিজেকে বোঝানোর জন্য কতদূর পর্যন্ত মানবিক ভাষা ব্যবহার করত বা হত। যদিও আজ আর আমাদের অজানা নেই যে ভাষা হচ্ছে মনের আয়না। তার মধ্য দিয়েই আমরা জানতে পারি পরস্পরকে, বুঝতে পারি মনের অলি-গলি, ছুঁতে পারি ইচ্ছা-অনিচ্ছা-আবেগ-অনুভূতি। অবশ্য যতই মানুষ ভাষা তৈরি করুক, তার ক্রমাগ্রসরণ ঘটাক তবু ভাষা মনের অখণ্ড দর্পণ, না আংশিক আরশি—সে বিষয়ে অনেকেরই সংশয় পুরোপুরি ঘোচে নি। একথাও তো সত্য ভাষার মধ্যে রয়েছে অবয়তত্ত্ব, স্বোপার্জন তত্ত্ব ও ব্যবহারিক তত্ত্ব।

যাই হোক, খাদ্যের মতোই মানুষের জীবনে সংবাদের প্রয়োজনীয়তা একান্ত বাস্তব ও অনিবার্য সত্য। জীবন রক্ষার ক্ষেত্রে সেই সংবাদের চাহিদা পূরণ করা ছাড়া গত্যন্তর নেই মানুষের। যুগ যুগ ধরেই সংবাদের চাহিদা যেমন প্রতিষ্ঠিত সত্য তেমনি তার তীব্রতাও ঊর্ধ্বমুখী। আধুনিক মানুষ তো আধুনিকই নন সংবাদ ছাড়া। এমন কি মানবসভ্যতার প্রাচীন নিদর্শনগুলিও তো সেকালের জীবনযাত্রার বাস্তব চিত্র ও সংবাদই নিরন্তর পৌঁছে দিয়েছে, দিচ্ছে, দেবে হাজার-হাজার বছরের পরবর্তী

উত্তরসূরিদের কাছে। তাই মানুষ যেমন খাদ্য ছাড়া টিকে থাকতে পারে না, তেমনি মানুষ মানুষ ছাড়া, সংবাদ ছাড়া বাঁচতে পারে না। সংবাদের জন্য মানুষের এই অনিবার্য চাহিদা, নিরন্তর হাহাকারই সংবাদপত্রের উৎসে, গণমাধ্যমের প্রস্থানভূমি। প্রতিবেদন হল তার অন্যতম প্রধান অস্ত্র, সংবাদ সংরূপ।

১২১.৩ মূলপাঠ

এর আগে আপনি সাংবাদিক-সংরূপ বা জার্নালিস্টিক জেন্‌র হিসাবে প্রতিবেদনের সাধারণ পরিচয় পেয়েছেন। এখানে তার আর-একটু বিশদ পরিচয় তুলে ধরা হচ্ছে। সঙ্গে সঙ্গে কীভাবে প্রতিবেদন রচনা করবেন তার-ও রূপরেখা দেওয়া হল।

একথা সত্য যে, আমরা এমন এক ঐতিহাসিক নজিরবিহীন বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সময়ে বসবাস করছি যখন আমাদের চোখের সামনে ঘটে চলেছে বিশ্বজুড়ে সামাজিক ও রাজনৈতিক মুখের বদল। সেই পরিবর্তন-সাধনে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি নিয়েছে নিঃসন্দেহেই এক উজ্জ্বলতর, ব্যাপকতর ভূমিকা। যোগাযোগের ক্ষেত্রেও ঘটে গিয়েছে বিস্ময়কর বিস্ফোরণ। গোড়ার দিকে গণসংযোগের এই অগ্রগতি ধীর লয়ে সাধিত হলেও পরে তা আকাঙ্খিত গতিবেগ ও মাত্রা লাভ করে। অন্তত কেউ যদি মনে রাখেন যে কমবেশি পাঁচ লক্ষ বছর আগে মানুষ কথা বলা রপ্ত করে, চার হাজার বছর আগে শুরু করে লিখতে এবং পাঁচশো বছর আগে আবিষ্কৃত হয় মুদ্রণযন্ত্র, গণদূরদর্শন ষাট বৎসর পূর্বে, কমপিউটার প্রায় পঞ্চান্ন বছর আগে আর টেলিকমিউকেশন স্যাটেলাইট আসে ত্রিশ বছর আগে, তাহলে বিস্ময়ে অভিভূত হওয়া ছাড়া গত্যন্তর থাকে না।

সত্যিসত্যিই যে জ্ঞাপন বিস্ফোরণ ঘটে গিয়েছে তার প্রমাণ মেলে যখন আমরা জানতে পারি দেড়শো কোটির বেশি রেডিওসেট, পঁয়ত্রিশ হাজারের মতো বেতারকেন্দ্র, পঞ্চাশ কোটি টিভি সেট, দেড়শোর বেশি নিউজ এজেন্সি, বিশ্বময় ছড়িয়ে আছে, কিংবা কাজ করে চলেছে। এটাও আজ আর অজানা নেই যে গড়ে রোজই পৃথিবীতে সতেরোশ' নতুন নতুন বই বেরোচ্ছে এবং বছরে বিভিন্ন বইয়ের মোট প্রচারসংখ্যা আটশো কোটিরও বেশি। বিশ্বজুড়ে দৈনিক পত্রিকা বেরোয় প্রায় দশ হাজার এবং তার পাঠক কয়েকশো কোটি।

যে যেভাবেই ব্যাখ্যা করুন না কেন, এটাই বাস্তব সত্য যে মানুষের মৌলিক চাহিদা হিসাবেই প্রতিষ্ঠা পেয়েছে সংবাদলাভের বিষয়টি, আর সেই খবর যেমন সাধারণ বিষয় নিয়ে হতে পারে তেমনি তা হতে পারে চিত্তপ্রকর্ষের, দৈশিকতার, রাষ্ট্রউদ্যমের বা জনাদর নিয়ে। গণমাধ্যম ঢুকে গিয়েছে দৈনন্দিন জীবনযাত্রার একেবারে খুঁটিনাটি ব্যাপারেও।

সেই গণমাধ্যমের, তা মুদ্রণই হোক কি বৈদ্যুতিনই হোক, অর্থাৎ সংবাদপত্র, আকাশবাণী, দূরদর্শন প্রভৃতিতে যে সাংবাদিক-সংরূপটি সবসময়েই ব্যবহৃত হয় তা হল প্রতিবেদন। আর প্রতিবেদন যিনি তৈরি করেন বা পাঠান তিনি হলেন প্রতিবেদক। এঁকে হতে হয় ক্ষিপ্রনিশ্চয়। তিনি যেমন প্রত্যক্ষবাদী তেমনি হন প্রত্যক্ষসিদ্ধ। অবশ্য তাঁকেও মনে রাখতে হয় কোন গণমাধ্যমই নিছক সংবাদের অভিসমবায় নয়।

'প্রতিবেদন' শব্দটি একটি পরিভাষা। রবীন্দ্রনাথের ব্যবহার বিশেষভাবে লক্ষ্য করি—যেমন, 'অধিষ্ঠায়কবর্গের নিকট বিদ্যালয়ের প্রতিবেদন প্রেরিত হইয়াছে'। 'প্রতিবেদন' শব্দটি ইংরেজি 'Report'-এর বাংলা পারিভাষিক প্রতিশব্দ। 'রিপোর্ট' শব্দটির শিকড় রয়েছে লাতিন re-portare-র মধ্যে। সেখান থেকে প্রাচীন ফরাসিতে হল reporteur, ইঙ্গ-ফরাসিতে reportour, তা থেকে ইংরেজিতে শব্দটি গৃহীত হয়েছে। রিপোর্ট শব্দটির অর্থ হল ফিরিয়ে আনা, আর রিপোর্টার বলতে বোঝায় যিনি রিপোর্ট করেন; সংবাদপত্র, বাক্‌প্রসার, দূরদৃশ্যধ্বনিবহ ইত্যাদির জন্য সংবাদের রিপোর্ট করেন যেসব চাকুরে। 'প্রতিবেদন' শব্দটি বিশেষ্য। অর্থ ঃ বিজ্ঞাপন, বিজ্ঞাপনপত্র; রিপোর্ট। অভিধানকার জ্ঞানেন্দ্রমোহন দাসের মতে, প্রতিবেদন শব্দটি রবীন্দ্রনাথ কর্তৃক নির্বাচিত। মানে হল ঃ বিবৃতি; সমাচার; বার্তা; বিবরণী report। পাশাপাশি 'প্রতিবেদক' শব্দের অর্থ 'সংঘটিত কার্য বা ঘটনার সংবাদদাতা reporter'।

তবে মুদ্রিত গণমাধ্যমে, নির্দিষ্টভাবে দৈনিক সংবাদপত্রে আপনি যে ছাপানো প্রতিবেদন পড়েন সেগুলো কীভাবে লেখা যায় বা তৈরি করা হয় তার দৃষ্টান্ত আমরা মূলপাঠে দিয়ে দিচ্ছি। পাশাপাশি আপনি পাবেন সংবাদপত্রের উপযোগী প্রতিবেদনের সঙ্গে দূরদর্শন ও আকাশবাণীর জন্য তৈরি প্রতিবেদনের পার্থক্যটা কোথায়।

একথা তো অস্বীকার করা যায় না যে, সংবাদপত্রের যে-দুটি সংরূপের প্রতি পাঠকদের দুর্বলতা, ভালোবাসা বা নিন্দা, বিতর্ক সোচ্চার সে দুটি হল নিউজ আইটেম ও রিপোর্ট। অন্যান্য সংরূপের গুরুত্ব সামান্য খর্ব না করেও বলতে হবে এই সংরূপদুটির সাফল্য বা ব্যর্থতার ওপর সংবাদপত্রের জনাদর অনেকখানি নির্ভর করে। বস্তুত, সংবাদের দুটি ডানা—তার একটি নিউজ আইটেম, অন্যটি রিপোর্ট।

সবরকম সংবাদ সংগ্রহের কাজ যাঁরা করেন তাঁদের বলে প্রতিবেদক বা রিপোর্টার। মূলত এঁরা রাজধানী, শহর বা শহরের কাছাকাছি এলাকার খবর জোগাড় করেন। আবার অনেকের জন্য নির্দিষ্ট স্থানও থাকে। বিষয়কেন্দ্রিকতায়-ও রিপোর্টার আলাদা আলাদা হতে পারেন। কেউ যেমন কভার করতে পারেন কলকাতাস্থিত মহাকরণের সংবাদ, কারও ওপর দায়িত্ব থাকতে পারে আইন-আদালত-পুলিশী

রিপোর্ট। কেউ যেমন বিশ্ববিদ্যালয়-মহাবিদ্যালয়-বিদ্যালয়ের অর্থাৎ শিক্ষাবিষয়ক রিপোর্ট কভারের দায়িত্ব পান তেমনি কারও ওপর দায়িত্ব বর্তায় বিভিন্ন দূতাবাসের খবর জোগাড় করে প্রতিবেদন রচনার। তবে রিপোর্টার বা প্রতিবেদক স্থানীয় এলাকাতেই কাজ করুন বা দূরদেশেই কাজে যান, তাঁর দায়িত্ব মোটামুটি একইরকম। প্রতিবেদককে ঘটনাস্থলে যেতে হবে, খবর সংগ্রহ করতে হবে এবং তা থেকে কাহিনী বা প্রতিবেদন তৈরি করে নিজের প্রতিষ্ঠানে ছাপানোর জন্যে পাঠাতে হবে। সম সময়েই যে কাহিনী মিলবে তার কোন নিশ্চয়তা নেই, বা সব কাহিনীই যে ছাপার যোগ্য বলে বিবেচিত হবে, সেটাও ঠিক নয়। তবে প্রতিবেদককে অসীম ধৈর্য ধরতে হয়, বিচক্ষণ হতে হয়। পরিশ্রমী, কৌতূহলী, সুনিপুণ কর্মী তো হতেই হবে। তিনি সংবেদনশীলও হবেন। মনে রাখতে হবে, একালে প্রতিবেদকের কাজ বেশ প্রতিযোগিতামূলক। তীক্ষ্ণ বুদ্ধি ও ষষ্ঠেন্দ্রিয়ের প্রখরতা না থাকলে সফল প্রতিবেদক হওয়া খুবই কঠিন। সেজন্যে একটা কথা রিপোর্টারদের মধ্যে প্রচলিত আছে তাঁরাই হলেন সংবাদপত্রের জনপ্রিয়তার আসল কারিগর। কেউ কেউ মনে করেন, একজন বুদ্ধিমান প্রতিবেদক একজন বিবেচক সম্পাদকের চেয়েও অনেক বেশি দামি সংবাদপত্রে।

আপনি যদি একজন ভালো প্রতিবেদক হতে চান তাহলে আপনার মধ্যে কম করেও যে-যে বিশেষত্ব অনেকেই খুঁজবেন সেগুলো হল—

- ভালোরকম বুনিয়াদি শিক্ষা,
- চটপটে ভাব বা স্মার্টনেশ,
- স্বচ্ছ চিন্তা করার অধিকার,
- সহজ-সরল-প্রাঞ্জলভাবে অর্থাৎ ঝরঝরে লেখার দক্ষতা,
- সততা,
- নির্ভরযোগ্যতা,
- না-ছোড়বান্দা মনোভাব,
- প্রীতিপ্রদ ব্যক্তিত্ব।

যেহেতু প্রতিবেদকেরা মূলত যে শহর বা এলাকা থেকে কাগজটি বেরোয় সেখানকার সংবাদ সংগ্রহ করেন, তাই প্রত্যেক সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠানেরই থাকে নিজস্ব সংবাদদাতা, যাঁরাও আসলে একধরনের কেন পুরোপুরি রিপোর্টারই। এঁরা প্রধানত কাজ করেন শহরতলিতে বা ভিন্ রাজ্যে, দূরবর্তী অঞ্চলে। এঁরা সাধারণত সংবাদ পাঠান দূরধ্বনিবহনযোগে, টেলিপ্রিন্টারে, ফ্যাক্সে, ডাকযোগে, ই-মেলে, ইন্টারনেটে। স্যাটেলাইটেও সংবাদ আসে। নিজস্ব সংবাদদাতাদের মতো থাকে বিশেষ সংবাদদাতা, নিজস্ব

প্রতিনিধি, বিশেষ প্রতিনিধি প্রমুখ। এভাবেই শহরতলির সংবাদদাতা, রাজ্য ও জাতীয় সংবাদদাতা, মুম্বাই-চেন্নাই-দিল্লি-মস্কো-ওয়াশিংটন-প্যারিস-লন্ডনের প্রতিনিধি, যুদ্ধের সংবাদদাতা ইত্যাদি। সংবাদ এসে পৌঁছায় আরো একাধিক সূত্র থেকে। নিউজ এজেন্সি, দূরদর্শন, আকাশবাণী থেকেও সংবাদপত্রের সাংবাদিকগণ কোনও কোনও প্রতিবেদন বা সংবাদ সংগ্রহ করে থাকেন। এ-ব্যাপারে স্বেচ্ছাকর্মীদের ভূমিকাও নগণ্য নয়।

প্রতিবেদকের কর্মপদ্ধতিকে অনেকগুলি সূক্ষ্ম স্তরে ভাগ করা গেলেও মোটা দাগে চার পাঁচটি পর্যায়ে বিভক্ত বা বিন্যস্ত করা চলে। অবশ্য সর্বত্রই যে একই পদ্ধতি অনুসরণ করা হয় তা নয়। কোনও কোনও সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠান নিজেদের সুবিধামতো পর্যায়গুলো ভাগ করে নেন, করেন কাজের বিলিবণ্টন। দায়িত্বও ভাগ করে দৈনন্দিন কাজ চালান। তবে যে-কটি স্তরে প্রতিবেদকের কাজ ভাগ না করলেই নয়, সেই পর্যায়গুলি এভাবেও বিন্যস্ত করা যেতে পারে।—

প্রতিষ্ঠানের নির্দেশমত ঘটনাস্থলে উপস্থিতি

↓

সংবাদসংগ্রহ

↓

তথ্যবাছাই [প্রমাণসহ]

↓

পরিবেশন বা বিতরণ ভাবনা

↓

প্রতিবেদন বা কাহিনী নির্মাণ

সাধারণভাবে প্রতিবেদককে প্রথমে আসতে হয় নিজের কর্মস্থলে অর্থাৎ সংবাদপত্রের দপ্তরে। সেখান থেকে চীফ রিপোর্টার বা বার্তা সম্পাদক বা ভারপ্রাপ্ত কর্তাব্যক্তি প্রতিবেদককে জানান তাঁর ডিউটি অর্থাৎ কোথায়, কখন, কোন্ ঘটনা বা বিষয় নিয়ে তাঁকে রিপোর্ট লিখতে হবে। এই নির্দেশ ঘটনার পূর্বদিনেও জানিয়ে দিতে পারেন, যদি প্রতিবেদনে বর্ণিতব্য বিষয় বা ঘটনাটি পূর্বনির্ধারিত হয় (যেমন পূর্বনির্ধারিত সাংবাদিক সম্মেলন, সভাসমিতি, কোনও কিছুর উদ্বোধন অনুষ্ঠান ইত্যাদি)। জরুরি কোন আকস্মিক ঘটনা ঘটলে টেলিফোনেও প্রতিবেদকের কাছে ঘটনাস্থলে যাওয়া ও তা কভার করার নির্দেশ যেতে পারে। ক্ষিপ্রতার সঙ্গেই তৈরি হয়ে নিতে হয় প্রতিবেদককে ঘটনাস্থলে যাবার জন্য এবং তা করতে হয় অবশ্যই ঘটনার চরিত্র ও গুরুত্ব অনুসারে।

এবারে প্রতিবেদক যাবেন ঘটনাস্থলে। প্রয়োজনে সঙ্গে যাবেন ফটোগ্রাফার। রিপোর্টার ঘটনাস্থল থেকে যা যা পারবেন তথ্য সংগ্রহ করবেন, নিজে যা যা দেখলেন নোট্ করে নেবেন, প্রত্যক্ষদর্শীদের

বিবরণ লিপিবদ্ধ করে নেবেন, ঘটনা অনুসারে সরকারি বা প্রশাসনিক ব্যক্তিদের মন্তব্য সংগ্রহ করবেন। এরপরে চলে আসবেন নিজের প্রতিষ্ঠানে। সেখানে চলবে তাঁর তথ্য ঝাড়াই-বাছাই। এই কাজটা শেষ হলে আসে সংবাদটা কীভাবে পরিবেশন বা বিতরণ করবেন তার ভাবনা। সেই ভাবনার ফসল হবে প্রতিবেদনটি বা 'স্টোরি'টি। প্রতিবেদনে প্রতিবেদকের মন্তব্য জুড়ে দিলে অনেক সময়েই প্রতিবেদনের বস্তুনিষ্ঠতা বিনষ্ট হয়, পাঠকদেরও নিজস্ব মতামত তৈরির সুযোগ থেকে বঞ্চিত করা হয়। তবে সংবাদপত্রে আজকাল প্রতিবেদনও মন্তব্যহীনভাবে বিশেষ প্রকাশিত হয় না। সেই মন্তব্য কখনও হেডলাইনের মধ্যে উঁকি মারে, আবার কখনও কখনও তা মুদ্রিত প্রতিবেদনের অভ্যন্তরেই নগ্নভাবে ফুটে ওঠে। কিন্তু প্রতিবেদন রচনার প্রথাসিদ্ধ নিয়ম হল তথ্যের প্রতি একনিষ্ঠ থেকে মন্তব্য প্রকাশের অধিকার সম্পাদকের জন্য সুরক্ষিত রাখা।

প্রতিবেদন তৈরির সময়ে প্রতিবেদককে খুবই সচেতন ও দায়িত্ববান থাকতে হয়। অন্ততঃ প্রতিবেদকের কাছে সেটাই অভিপ্রেত। সংবাদের তথ্যে যাতে কোনভাবেই বিকৃতি না ঘটে, সেটা খেয়াল রাখা খুবই জরুরি। সততা ও সাহসিকতা হচ্ছে প্রতিবেদকের মেরুদণ্ড। তার সঙ্গে চাই ভাষাজ্ঞান ও শিল্পশৈলী। প্রতিবেদনের ভাষা হবে জীবন্ত। তা হবে বাস্তবধর্মী, সর্বজনবোধ্য অথচ শিল্পিত। এলিয়ে পড়া ভাষাভঙ্গি পাঠককে ঘুম পাড়ায়। কাজে কাজেই ভাষার মধ্যে বলিষ্ঠতাও যেন ছড়িয়ে দেয় হীরের দ্যুতি—এটা নজর রাখতে হবে প্রতিবেদককেই। অকারণ বাগ্‌বিস্তার প্রতিবেদনে পরিত্যাজ্য। চটুল ভাষা প্রয়োগের সময় দেখতে হবে ভাষার সুর কেটে যাচ্ছে কিনা। একই কথা খাটে গুরুগম্ভীর তৎসম শব্দের আধিক্য ঘটালে। মনে রাখতে হবে, সংবাদপত্রের পাঠক আর জ্ঞানগর্ভ প্রবন্ধের পাঠক এক নন। অপশব্দের প্রয়োগ রুচিহীনতার পরিচায়ক, এটাও খেয়ালে রাখা দরকার। প্রতিবেদনের মধ্য দিয়ে প্রতিবেদককে সব সময়েই জানান দিতে হবে যে রিপোর্টার সমাজের বিবেক, গণতন্ত্রের প্রহরী। তিনি নির্ভীক, বস্তুনিষ্ঠ ও শিল্পী। কাউকে আঘাত দেওয়া প্রতিবেদকে মানায় না, তা তাঁর কাজের মধ্যেও পড়ে না। ধর্মীয় বা সাম্প্রদায়িক উস্‌কানিমূলক সংবাদ; যৌন-উত্তেজনা সঞ্চারক সন্দেশ; মাদকসেবনে উৎসাহবর্ধক বা মানসিক বিকৃতি জাগায় বা ছড়ায় এমন খবরও প্রতিবেদনে জায়গা পাওয়া উচিত নয়। গুজব ছড়ানো থেকেও তিনি নিজেকে বিরত রাখবেন। 'একান্ত ব্যক্তিগত' বা 'ছাপানোর জন্য নয়' এরকম কোনও সতর্কিত বা প্রতিশ্রুতি সংবাদ প্রতিবদনে প্রকাশ করা অনৈতিক। এতে প্রতিবেদকের বিশ্বাসযোগ্যতা ক্ষুণ্ণ হয়। উপরন্তু প্রতিবেদন রচনার-সময় প্রেস ল', দেশের বিচারব্যবস্থা, আন্তর্জাতিক বিধি-বিধান, দ্বন্দ্বসহ বস্তুনিষ্ঠ সমাজ-উন্নয়নের ধারা, নানা টানাপোড়েনের মধ্য দিয়ে দেশ-সমাজ-জাতির বিভিন্ন রীতিনীতি-ঐতিহ্য-আইনকানুন-পারিবারিক সম্পর্ক সম্বন্ধে শ্রদ্ধাশীল ও সচেতন থাকা দরকার। দেশের নিরাপত্তা, জনগণের সংহতি-মৈত্রী-কল্যাণ-শান্তি বিনষ্ট হয় এমন কোনও খবরও প্রতিবেদনের

বিষয় হওয়া অনুচিত। বরং এধরনের সংবাদ সর্বথা পরিত্যাজ্য। বৃত্তি হিসাবে সাংবাদিকতার কিছু নিজস্ব নৈতিকতাবোধ থাকে, সেগুলি প্রতিবেদকের পক্ষে অবশ্য পালনীয়। সর্বোপরি প্রতিবেদক হবেন সত্যাশ্রয়ী। চটকদারি সংবাদ পরিবেশন করে সমাজ ও জাতির স্থিতিশীলতা নষ্ট করার অধিকার কোনও প্রতিবেদকেরই নেই। তাঁকে হতে হয় সহিষ্ণু। আর প্রতিবেদককে মনে রাখতে হয়, সমস্ত প্রতিবেদনের মর্মবীজ হবেন মানুষ। হ্যাঁ, মানুষ, মানুষ আর মানুষই প্রতিবেদনের মর্মভাষা।

তাহলে, প্রতিবেদনের প্রধান কাজ কী? তা হল, সবে ঘটে গিয়েছে বা ঘটছে যে ঘটনা সে সম্পর্কে পাঠক-শ্রোতা-দর্শককে তরতাজা বস্তুনিষ্ঠভাবে অবহিত করা। বাসি খবরে কোনও পাঠক-শ্রোতা-দর্শকেরই আগ্রহ থাকে না। সময়, দিন, স্থানে উল্লেখ করে সদ্য সংঘটিত ঘটনাকে বুদ্ধিদীপ্ত, পরিশীলত ও মনোরঞ্জন ভাষায় সত্যনিষ্ঠ থেকে পরিবেশন করতে পারলেই প্রতিবেদন হয়ে ওঠে বিশ্বস্ত, সুন্দর ও সাবলীল। তা তখন গ্রহণীয়, আস্বাদনীয় হয়। পরের মুখে ঝাল খেয়ে প্রতিবেদন লিখতে নেই। এতে সত্য রক্ষা পায় না। কাজেকাজেই প্রতিবেদককে ঘটনাস্থলে যেতে হয়, দেখতে-শুনতে-থাকতে হয়, বিচারবিবেচনা প্রয়োগ করে শেষমেশ লিখতে হয় প্রতিবেদন। কেননা প্রতিবেদককে সব সময়েই বিবেচনা করা হয় প্রত্যক্ষদর্শী হিসাবে, ঘটনার সাক্ষীরূপে।

এবার সূত্রাকারে উল্লেখ করা যাক সেইসব বৈশিষ্ট্য যা প্রতিবেদনে অভিপ্রেত। তবে সমস্ত বৈশিষ্ট্যই যে সব প্রতিবেদনে পাওয়া যাবে এমনটি আশা করা সমীচীন হবে না। বৈশিষ্ট্যগুলি হল—

- প্রাসঙ্গিকতা
- সর্বজনীনতা
- বিশ্বাসযোগ্যতা
- দায়িত্বসচেতনতা
- বহুগুণতা
- সমকালীনতা
- তৎপরতা
- প্রাতিষ্ঠানিক চারিত্র্য

এর সঙ্গে আশা করা যেতে পারে প্রতিবেদকের অঙ্গীকার বা কমিটমেন্ট। তাঁর দেখার চোখ আলাদা, বিচার করার ষষ্ঠেন্দ্রিয় স্বতন্ত্র। বিশ্ব-ইতিহাসের অন্যতম স্মরণীয় ব্যক্তিত্ব চেক-সাংবাদিক জুলিয়াস ফুচিক বলেছিলেন, ‘একটা ভালো রিপোর্টাজে থাকতে পারে কোনো ছোট্ট বাস্তব তথ্য, বর্ণসমৃদ্ধ

ঘটনা, কিন্তু তা ব্যতিক্রমী নয়। শুধুমাত্র তার থেকে আমার অনুপুঙ্খ ও বিশ্বাসযোগ্যভাবে এঁকে ফেলি জনগণের ছবি এবং ঘটনাটা। সেটাই রিপোর্টাজ। সেখানে ছোট্ট ঐ টিপিক্যাল তথ্যের খামতি থাকতে পারে। তবে চারদিকের ধূসর গতানুগতিক সাধারণ দিনগুলোর ভেতর থেকে রোজকার ঘটনাবলির ডাঁই ঘেঁটে বের করে নেবেন সেইসব তথ্যই যা আপনাকে টানবে, আর আপনি অনুভব করবেন বিশেষ মমত্ব। আর আপনি যদি রিপোর্টার হিসাবে নিজের বিচারবোধে ঠিক থাকেন, আপনি যদি নিজেকে নিছক লিখিয়ে হিসাবে বিচার না করেন তাহলে লক্ষ্য রাখবেন কীভাবে আপনার চারদিকের দুনিয়াটা বদলে যাচ্ছে।' বাস্তবিকই একজন প্রতিবেদক কীভাবে ঘটনাকে দেখছে তার ওপরও নির্ভর করে শ্রেণিবিভক্ত সমাজে একজন রিপোর্টার বা প্রতিবেদকের অবস্থান।

এর আগে আপনি জেনেছেন নিউজ আইটেম বা রিপোর্ট তৈরির পদ্ধতি। তবু আর একবার সেসব কথা ঝালিয়ে নিতে পারি। অর্থাৎ আপনি যখন প্রতিবেদন লিখবেন তখন যে-যে প্রশ্নগুলি মনে মনে নিজেকে করবেন এবং তার উত্তর পর পর সাজিয়ে-গুছিয়ে নেবেন, সেগুলিই উল্লেখ করছি পুনরায়। তা হল—

- কোথায় ঘটেছে?
- কবে ও কখন ঘটেছে?
- কে বা কারা ঘটিয়েছে?
- কী ঘটেছে?
- কীভাবে ও কেন ঘটেছে?

এই প্রশ্নগুলির উত্তর পর পর মনে মনে গুছিয়ে নিয়ে প্রতিবেদন রচনা শুরু করলে পাঠক-শ্রোতা-দর্শকের চাহিদা আপনি পূরণ করতে পারবেন আশা করি। সঙ্গে সঙ্গে আপনার গ্রাহকদের কৌতূহল বাড়িয়ে তুলতে সক্ষম হবেন।

বলাই বাহুল্য, প্রতিবেদনেরও রকমফের আছে। অভিজ্ঞতা, পারদর্শিতা, বিশেষত্বে আছে অনেক হেরফের। একালে প্রতিবেদক আর একজন সাধারণ সংবাদ-জোগাড়ে নন। আসলে দুনিয়াটা যেমন বদলাচ্ছে তেমনি বর্তমান বিশ্বে সংবাদপত্রের ভূমিকাও পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছে অনেকখানি। বেশিরভাগ সংবাদপত্র হল মুনাফাবৃদ্ধির অভিজাত মাধ্যম। সংগ্রাম বা আদর্শের হাতিয়ার হিসাবে সংবাদপত্রের ভূমিকা মুনাফাশিকারীরা আজ আর স্বীকার করেন না, যদিও আমাদের দেশে এর সংখ্যা একসময় কম ছিল না। রাজনৈতিক দলের মুখপত্র, তা সে দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক যাই হোক না কেন একদল উন্নাসিক সেগুলোকে সংবাদপত্রের মর্যাদা দিতে চান না। যদিও এইসব পত্রিকাও নিজেদের গন্ডি পেরিয়েও

জনগণের সংগ্রাম-শিক্ষা-অগ্রগতির কাজেই নিজেদের নিযুক্ত রাখছে। আদর্শের ক্ষেত্রে কোনওরকম সমঝোতা না করেও সংবাদকে সংবাদ হিসাবেই পরিবেশন করছেন। সংবাদপত্র আজ একধরনের মর্যাদাসম্পন্ন লাভজনক ইন্ডাস্ট্রি। এক্ষেত্রে চাকুরিজীবী সাংবাদিকেরও রয়েছে বিশেষ ভূমিকা। বার্তাজীবীর দল মুনাফাবৃদ্ধির হাতিয়ার। তাঁদের লেখনী অধিকাংশ সময়েই নেয় বিশ্বস্ত সেবাদাসের ভূমিকা এবং কখনোই সেই লেখনী গাছের ডাল-কাটা কালিদাসের সেবায় নিয়োজিত হয় না। প্রতিষ্ঠানের বাণিজ্য-বৃদ্ধির ভূমিকায় যে-সাংবাদিকেরা থাকেন, তাঁদের একটা অংশ হলেন প্রতিবেদক। তাঁদের সুলিখিত প্রতিবেদন পত্রিকার প্রচার বাড়ায়, বিক্রি বাড়ায়, মালিকের ঘরে মুনাফা তুলতে সাহায্য করে। বিনিময়ে প্রতিবেদক পান স্তর অনুযায়ী বেতন, ভাতা, স্বাচ্ছন্দ্য, সচ্ছলতা, বিলাসের উপকরণ, ভোগের উপাদান। সুতরাং প্রতিবেদন রচনায় মুনশিয়ানা চাই। এমন কি চলে প্রতিবেদকে প্রতিবেদকে, একই প্রতিষ্ঠানে, সুপ্ত প্রতিযোগিতা।

সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রতিবেদনগুলি বিশ্লেষণ করলে আমরা কয়েকটি পর্যায়ে তাদের ভাগ করতে পারি। অবশ্য প্রত্যেকটি পর্যায়কে আবার অনেকগুলি ভাগে বিভক্ত করা যায়। এ ছাড়াও থাকে প্রাতিষ্ঠানিক, সাংগঠনিক প্রতিবেদন। সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রতিবেদন হয় নিম্নরূপে—

- ঘটনা, দুর্ঘটনার প্রতিবেদন
- জনকল্যাণমুখী বা জনস্বার্থবিরোধী কোন প্রকল্পের বা কাজের প্রতিবেদন
- রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, সামাজিক ইত্যাদি সভা-সমাবেশ-আন্দোলন-উৎসবের প্রতিবেদন
- ক্রীড়া-বিজ্ঞান-প্রযুক্তি-ব্যবসাবাণিজ্য-পরিবেশ বিষয়ক প্রতিবেদন
- সম্পাদকীয় প্রতিবেদন
- বিখ্যাত ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকারভিত্তিক প্রতিবেদন
- কোনো কর্মকাণ্ডের তদন্তভিত্তিক প্রতিবেদন।

প্রত্যেক সংবাদপত্রেই থাকেন বিশেষজ্ঞ প্রতিবেদক। সামর্থ্য, কৌতূহল, ভালোবাসার দিকে লক্ষ্য রেখে পরিকল্পনামাফিক সংবাদপত্রের পরিচালক বা উচ্চক্ষমতাসম্পন্ন সাংবাদিক-ব্যক্তিত্ব প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে ধীরে ধীরে তৈরি করে নেন একঝাঁক বিশেষজ্ঞ প্রতিবেদক। একই বা সম-বিষয় কেন্দ্রিক প্রতিবেদন লিখতে লিখতে অনেকেই সেই বিষয়ে বিশেষজ্ঞ হয়ে পড়েন। এই বিশেষজ্ঞ প্রতিবেদকেরা সংবাদপত্র প্রতিষ্ঠানের মূল্যবান সম্পদ বলে বিবেচিত হন। এভাবেই কোনো কোনো প্রতিবেদক যেমন শিক্ষাবিষয়ে বিশেষজ্ঞ প্রতিবেদক হয়ে পড়েন, তেমনি কেউ কেউ হয়ে ওঠে রাজনীতি-বিষয়ে পারদর্শী প্রতিবেদক বা সংবাদদাতা। এভাবেই শিল্প-বাণিজ্য বিষয়ক, কৃষি-বিষয়ক, শ্রম-বিষয়ক, পশুপাল বিষয়ক,

সমাজকল্যাণ-বিষয়ক, সংস্কৃতি-বিষয়ক, ক্রীড়া-বিষয়ক, বিজ্ঞান-বিষয়ক, পরিবেশ-বিষয়ক, কর্মসংস্থান-বিষয়ক, চলচ্চিত্র-নাটক- বিষয়ক, আইন-আদালত-পুলিশ-বিষয়ক, সামরিক-বিষয়ক বিশেষজ্ঞ প্রতিবেদক হয়ে ওঠেন।

প্রতিবেদককে আর একটি বিষয়ে সচেতন থাকতে হয়। তাঁকে জানতে হয়, বুঝতে হয় কোন্‌টা সংবাদ, আর কোন্‌টা সংবাদ নয়। তাঁকে ষষ্ঠেন্দ্রিয়ের মাধ্যমে বুঝে নিতে হবে, কোন্ ঘটনাটা পাঠক-শ্রোতা-দর্শক খাবে, আর কোন্‌টা খাবে না। প্রতিদিনই আমাদের চারপাশে নানা ঘটনা ঘটছে, কিন্তু তার সবগুলিই সংবাদপত্রে ছাপার মতো গুরুত্বপূর্ণ নয়। যেসব ঘটনা ডাল-ভাত-শুক্তো-চচ্চড়ির মতো সেসব নিরামিষ ঘটনা জেনে বা জানিয়ে পাঠকের যেমন লাভ হয় না, তেমনি সংবাদপত্রের। কাজে কাজেই বর্ণহীন, কৌতূহলশূন্য ঘটনা সংবাদের যোগ নয় বলেই বিবেচিত। যে-সব ঘটনা বিবিধ কারণে গুরুত্বপূর্ণ, যা জনগণের কৌতূহল জাগায় বা নিবৃত্ত করে, যা জনজীবনে বিশেষ ভূমিকা নেয়, যা সংবাদ হিসাবে অন্তত বেশ কিছু সংখ্যক মানুষের কাছে দরকারি বা আকর্ষণীয়, অথবা যে-সব ঘটনা আমাদের অভিজ্ঞতার বিপরীত—সেগুলিই সংবাদ হিসাবে পরিগণিত হয় এবং এরই রিপোর্ট বা প্রতিবেদন রচিত, প্রকাশিত হওয়া উচিত। বস্তুত-সমাজের অধিকাংশ মানুষকে আগ্রহশীল, কৌতূহলী করে তোলে যে একেবারে টাটকা তরতাজা আকর্ষণীয় বিষয়, যা ব্যতিক্রমী, অ-দৃষ্টপূর্ব তা-ই সংবাদ। এর মধ্যে থাকে আগ্রহ সৃষ্টির চিন্তা। আবার, কোনও বিশেষ ঘটনা, যা পাঠকের কাছে উপাদেয় বা জরুরি হিসাবে গণ্য হয়েছে বা হয়, তার অর্ন্ততদন্ত বা তদন্তমূলক প্রতিবেদন সেই পত্রিকার চাহিদা বাড়ায়, গৌরবও বৃদ্ধি করে।

এবার সংক্ষেপে আর একবার জানাই, প্রতিবেদন রচনার সময়ে আপনি কী কী মনে রাখবেন। কিংবা প্রতিবেদন যখন তৈরি করবেন তখন যেসব বিষয়ে সতর্ক থাকবেন সেগুলো হচ্ছে—

- প্রতিবেদন হচ্ছে প্রত্যক্ষদর্শীর শিল্পিত বিবরণ।
- তা হবে তথ্যভিত্তিক, বস্তুনিষ্ঠ, সত্যাশ্রয়ী।
- গুজব প্রতিবেদনের ভিত্তি হতে পারে না।
- প্রতিবেদনের ভাষা হবে গতিময়, আকর্ষণীয়, বাস্তবধর্মী, সর্বজনবোধ, ব্যবহারিক অথচ শৈল্পিক।
- ব্যক্তিগত আক্রমণ, কুৎসা, অবমাননাকর উক্তি বা ইঙ্গিতদান পরিত্যাজ্য।
- একপেশে প্রতিবেদন পাঠকের কৌতূহল মিইয়ে দেয়, তাই অনভিপ্রেত।
- দেশ-জাতি-সমাজের মূল্যবোধ-ঐতিহ্যকে আঘাত দেওয়া প্রতিবেদনে অবশ্যই বর্জনীয়।
- কোনও ঘটনা বা দুর্ঘটনার প্রতিবেদন রচনার সময়ে কারণ অনুসন্ধান ও প্রতিকারের উপায় নির্দেশ করতে পারলে ভালো হয়। উপায়-নির্দেশটি হবে বিজ্ঞানসম্মত, যুক্তিপূর্ণ, তথ্যনিষ্ঠ।

- ঘটনার পটভূমি প্রতিবেদনে থাকলে ভালো হয়, তবে তা হবে খুবই সংক্ষিপ্ত।
- নিজস্ব মন্তব্য প্রকাশের প্রলোভন সংবরণই কাম্য।
- হেডিং বা শিরোনাম হবে সংক্ষিপ্ত অথচ আকর্ষক, বিষয়নিষ্ঠ অথচ শিল্পশোভন।
- সাংবাদিকতার নিজস্ব নৈতিকতা কখনওই যেন লঙ্ঘিত না হয়।

১২১.৪ প্রতিবেদনের নমুনা

প্রতিবেদন বলতে আমরা কী বুঝি তা এতক্ষণে আপনার জানা হয়ে গিয়েছে। আপনি এটাও জেনে গিয়েছেন কীভাবে প্রতিবেদন তৈরি করতে হয়। এবার নিচে সংবাদপত্রে প্রকাশিত কয়েকটি প্রতিবেদনের নিদর্শন উদ্ধৃত করছি। এই উদাহরণগুলি খুঁটিয়ে পড়ুন। তাহলে নিজে নিজেই এই ধরনের প্রতিবেদন লিখতে পারবেন।

(ক) সাহসিকতার স্বীকৃতি দিলেন মুখ্যমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার : ২০০১-এর ২৪ অগস্ট। সন্ধ্যায় দক্ষিণ কলকাতার পূর্ণ মিত্র প্লেসের বাড়িতে ফিরছিলেন অঞ্জনা চক্রবর্তী। প্রিন্স আনোয়ার শাহ রোডে মোটর সাইকেলে চড়ে আসা দুই যুবক অঞ্জনার গলার হার ছিনিয়ে পালাতে যায়। ধাওয়া করে তাদের ধরে ফেলেন তিনি। অনেকটা এ ভাবেই অকুতোভয়ে দুষ্কৃতী ধরেছেন বেলতলা রোডের গৃহকর্ত্রী দীপান্বিতা ভট্টাচার্য।

দীপান্বিতা-অঞ্জনাদের মত 'সৎ ও সাহসী' ১৪ জন শনিবার এক অনুষ্ঠানে এসেছিলেন কলকাতা পুলিশের অনুরোধে। মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ও কলকাতার শেরিফ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় স্বীকৃতি জানালেন ১৪ জনকে। তাঁদের মধ্যে চার জন মহিলা। ২০০১-এর ৩১ অগস্ট মধ্য কলকাতার একটি দোকানের মালকিন রীতা গুপ্ত ধরে ফেলেন সশস্ত্র ডাকাতদের। এ বছর ২৫ এপ্রিল ডাকাতেরা ফ্ল্যাটে ঢুকে গৃহকর্ত্রী মঞ্জু আঞ্জালিয়ার হাত-মুখ বেঁধে দুষ্কর্ম শুরু করে। ইঙ্গিতে প্রতিবেশীদের সতর্ক করেন মঞ্জু। ডাকাতেরা ধরা পড়ে যায়। পুরস্কার প্রাপকদের মধ্যে আছেন তিন ট্যাক্সি চালকও। তাঁদের অন্যতম রবীন্দ্রনাথ পালের সততায় কয়েক হাজার টাকা ও মোবাইল ফোন ফেরত পান এক যাত্রী। আর এক জন শীতল মাহাতো ট্যাক্সিতে এক যাত্রীর ফেলে যাওয়া আইন পরীক্ষার খাতা দিয়ে আসেন লালবাজারে। যাত্রীর ফেলে যাওয়া অলঙ্কার ও টাকা-সহ সুটকেস ফিরিয়ে দেন কিশোর প্রসাদ।

অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, ''বেকারত্বের জন্য তরুণদের মধ্যে এমনিতেই একটা বেপরোয়া মনোভাব। এর মধ্যেই সিনেমা আর টি ভি-তে বিরক্তিকর নানা ছবি দেখানো হচ্ছে। কি ভয়ঙ্কর মারামারি, হিংসা

সে সবে। যারা দেখছে, তাদের মধ্যে 'আমিও একটু করে দেখাই' গোছের মনোভাব তৈরি হচ্ছে। সঙ্গে রয়েছে ভোগ্যপণ্যের বিজ্ঞাপন।"

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, "আলো-অন্ধকারের বিরোধের মধ্যেও মানুষ আলোর দিকেই এগোচ্ছে। আর্থ-সামাজিক কারণে পুলিশের কাজ বেড়ে গিয়েছে। আমেদাবাদে পুলিশও দাঙ্গা করেছে। কলকাতার পুলিশ কখনও দাঙ্গা করবে না। গত কয়েক বছরে এই শহরে যত খুন হয়েছে, তার ৯০ শতাংশের কিনারা করেছে পুলিশ। দুষ্কৃতীদের ধরা বা তাদের শাস্তি দেওয়ার ব্যাপারেও পুলিশ দৃষ্টান্ত দেখিয়েছে।"

মানুষের সঙ্গে যোগাযোগ বাড়ালে অপরাধের দ্রুত কিনারা সম্ভবপর বলে মন্তব্য করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, "এই কারণে পাড়া-ফুটবল চালু করা হয়েছে। এতে যথেষ্ট সুফল মিলেছে। লোকে যেন কোনও পরিস্থিতিতেই পুলিশকে শত্রু মনে না-করে।" পুলিশ কমিশনার সুজয় চক্রবর্তীও তাঁর ভাষণে বলেন, "তদন্তে সাধারণ লোকের অংশগ্রহণ ছাড়া অপরাধ-দমন করা সম্ভব নয়। এই কারণে শুরু করা হয়েছে জনসংযোগ-কর্মসূচি।" শেরিফ সুনীল গঙ্গোপাধ্যায় বলেন, "মানুষের স্বভাব পাল্টে গিয়েছে। এখন লোকে অন্যের জন্য ভাবে না। অপরাধ বেড়ে চলার এটাও একটা অন্যতম কারণ।"

● আনন্দবাজার পত্রিকা

(খ) ওয়াইল্ড লাইফ ইনস্টিটিউট গড়বে রাজ্য, ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রীর

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা, ৩রা অক্টোবর—সুন্দরবনের উন্নয়নে একযোগে কাজ করবে ইউ এন ডি পি এবং এশিয়ান ডেভলপমেন্ট ব্যাঙ্ক (এ ডি বি)। সংস্থা দুটির তরফে দুটি পৃথক প্রকল্প গ্রহণ করা হলেও সুন্দরবনের সামগ্রিক উন্নয়নের স্বার্থে তার মেলবন্ধন ঘটানো হচ্ছে রাজ্য সরকারের তরফে। মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যকে চেয়ারম্যান করে ইতোমধ্যেই গঠন করা হয়েছে এক কার্যকরী কমিটি। বনদপ্তর, প্রাণী সম্পদ উন্নয়ন, মৎস্যদপ্তর, সুন্দরবন উন্নয়ন সহ সংশ্লিষ্ট সবকটি বিভাগকেই আনা হয়েছে এই কমিটির মাধ্যমে একই ছাতার তলায়। আর তা করা হয়েছে ড. এম. এস. স্বামীনাথনের পরামর্শে, যিনি এই প্রকল্পটির দায়িত্বপ্রাপ্ত। বৃহস্পতিবার শিশির মঞ্চে বন্যপ্রাণ সপ্তাহের উদ্বোধন করে একথা জানান মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য নিজেই।

এদিনই মহাকরণে এ ডি বি-র প্রতিনিধি দলের সঙ্গে এবিষয়ে এক বৈঠক করেন মুখ্যমন্ত্রী। প্রায় একঘণ্টা ধরে চলে সেই বৈঠক। সুন্দরবনের পরিবেশ উন্নয়ন, অরণ্য এবং বন্যপ্রাণী সংরক্ষণ ছাড়াও প্রকল্পে গুরুত্ব পাবে সুন্দরবনবাসী অর্থনৈতিক উন্নয়নের বিষয়টিও। এবিষয়ে শিশির মঞ্চের অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রীর পরিষ্কার বক্তব্য, বনাঞ্চলের পার্শ্ববর্তী এলাকার মানুষের জীবন-জীবিকার উন্নতি না ঘটাতে পারলে, রক্ষা করা যাবে না অরণ্য ও বন্যপ্রাণী। আবার, উলটো দিকে প্রকৃতি ধ্বংস হলে বাঁচবে

না মানুষও। তাই রাজ্যের মানুষের স্বার্থেই রক্ষা করতে হবে রাজ্যের প্রাকৃতিক সম্পদ। অন্যদিকে এদিন মুখ্যমন্ত্রীর সঙ্গে বৈঠকের পর এ ডি বি-র প্রতিনিধি দল জানান, প্রাথমিক পর্যায়ে এই প্রকল্পে বরাদ্দ করা হয়েছে সাড়ে তিন কোটি টাকা। এতেই তৈরি করা হবে সুন্দরবনের উপর একটি মাস্টারপ্ল্যান। তার উপর ভিত্তি করেই এ ডি বি ঋণ দেবে রাজ্য সরকারকে। নভেম্বরেই সুন্দরবনে সমীক্ষার কাজ শুরু করবে এ ডি বি। ছয় মাসের মধ্যেই তারা রিপোর্ট জমা দেবে। উল্লেখ্য, এর আগে বাংলাদেশের অন্তর্গত সুন্দরবনেও সমীক্ষা চালায় তারা।

প্রকৃতি এবং পরিবেশ রক্ষার্থে এছাড়াও আরও কিছু কর্মসূচী এদিন ঘোষণা করেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি জানান, এরাজ্যে একটি ওয়াইল্ড লাইফ ইনস্টিটিউট গঠনের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত করেছে রাজ্য সরকার। খড়গপুর আই আই টি-র সহযোগিতায় গড়ে উঠবে কেন্দ্রটি। আপাতত ঠিক হয়েছে, পরিবেশ, অরণ্য এবং বন্যপ্রাণীর উপর দুটি কোর্স পড়ানো হবে সেখানে। একটি স্বল্পকালীন কোর্স ছাড়াও ব্যবস্থা থাকবে একটি অ্যাডভান্স কোর্সের। এই পরিকল্পনাটি দ্রুত বাস্তবায়নের জন্য কেন্দ্রীয় সরকার, দেরাদুনের ফরেস্ট ইনস্টিটিউট এবং ডব্লিউ ডব্লিউ এফের সঙ্গেও যোগাযোগ করা হচ্ছে। শুধু পড়াতেই সীমাবদ্ধ না রেখে প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত এই ছাত্র-ছাত্রীদের যাতে বন সংরক্ষণ জুলজিকাল গার্ডেন, বটানিকাল গার্ডেন সহ অন্যত্র কাজ পেতে পারেন, তা নিয়েও চিন্তাভাবনা করছে রাজ্য সরকার।

এছাড়াও প্রাকৃতিক সম্পদ সংরক্ষণ এবং উন্নয়নে বর্তমান আইনের সংশোধন ঘটিয়ে আনা হতে চলেছে আরও কঠোর আইন। তবে শুধু আইনের উপর গুরুত্ব না দিয়ে এই কাজে বন সুরক্ষা কমিটিকে আরও শক্তিশালী করা এবং স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলির অংশগ্রহণ বাড়াতে চাইছে রাজ্য সরকার। এই লক্ষ্যে কাজ করতে ইচ্ছুক স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলির একটি তালিকাও তৈরি করা হচ্ছে। এমনকি তরুণ এবং শিক্ষিত ছাত্র-ছাত্রীরা যদি এই ক্ষেত্রে স্বেচ্ছায় কাজ করতে এগিয়ে আসেন, তবে তাঁদের সঙ্গে সবরকম সহযোগিতা করার আশ্বাসও এদিন দিয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী। তিনি বলেন, বনকে ঘিরে বনাঞ্চলের পার্শ্ববর্তী এলাকার মানুষের আবেগ রয়েছে। তাঁরাই বন রক্ষা করতে পারেন। সঙ্গে চেতনাসম্পন্ন শিক্ষিত ছাত্র-ছাত্রী, তরুণরা একাজে এগিয়ে এলে কাঙ্খিত লক্ষ্যে আমরা পৌঁছাবই। উল্লেখ্য, কাঙ্খিত লক্ষ্য মানে, রাজ্যের ৩৩ শতাংশ বনাঞ্চল সৃষ্টি। যা আন্তর্জাতিক মান অনুযায়ী নির্দিষ্ট। বর্তমানে সামাজিক বনসৃজনকে ধরলে এরাজ্যে বনাঞ্চলের পরিমাণ প্রায় ২৭ শতাংশ।

এদিন শিশিরমঞ্চের এই অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন রাজ্যের বনমন্ত্রী যোগেশচন্দ্র বর্মণ। বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য ছাড়াও এই সভায় উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের বন প্রতিমন্ত্রী মহেশ্বর মুর্মু, বনদপ্তরের প্রধান সচিব মঞ্জুলা গুপ্ত, মুখ্য বনপাল সহ বিভাগীয় অন্যান্য উচ্চপদস্থ আধিকারিকরা। ৩রা অক্টোবর থেকে ৯ই অক্টোবর পর্যন্ত উদ্‌যাপিত হবে বন্যপ্রাণ সপ্তাহ। সমাপ্তি অনুষ্ঠান হবে শিলিগুড়িতে।

বন্যপ্রাণ সপ্তাহ উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে এদিন সন্ধ্যায় গগনেন্দ্র শিল্প প্রদর্শনশালায় বন্যপ্রাণ বিষয়ক একটি আলোকচিত্র প্রদর্শনীরও উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী। পরে বন ও বন্যপ্রাণী রক্ষায় অসম সাহসিকতার জন্য বিশেষ পুরস্কারও প্রদান করেন তিনি। পুরস্কার দেওয়া হয়েছে বনবিভাগের কর্মী সুব্রত পালচৌধুরী, বিজয়কুমার গায়েন এবং দক্ষিণ ২৪ পরগণা ফরেস্ট ডিভিসনকে।

● **গণশক্তি**

(গ) খাদ্য সংগ্রহের নামে কোটি কোটি টাকা নয়ছয়

নিজস্ব সংবাদাতা, বারাকপুর : রাজ্য সরকারের খাদ্যশস্য সংগ্রহ অভিযানে সাংঘাতিক অনিয়ম ধরা পড়েছে, ক্ষতি হয়েছে ১৭৭ কোটি টাকা। আর্থিক অনিয়ম, স্বজনপোষণ, নীতি বহির্ভূতভাবে চালকল মালিকদের প্রচুর টাকা পাইয়ে দেওয়া, ভুয়ো পরিবহন বিল বানিয়ে টাকা তোলা সহ একাধিক অনিয়ম ও অবৈধ কাজের অভিযোগ উঠেছে। কোটি কোটি টাকা নয়ছয় হয়েছে রাজ্য সরকারের খাদ্যশস্য সংগ্রহ অভিযানে। খাদ্যশস্য সংগ্রহ অভিযানে নানা অনিয়মের অভিযোগের তীর মূলত বর্ধমান, হুগলি এবং উত্তর ও দক্ষিণ ২৪ পরগণার খাদ্য দপ্তরের বিরুদ্ধেই।

১৯৯৭ সাল থেকে রাজ্য সরকার খাদ্যশস্য সংগ্রহ অভিযানে অংশ নিয়ে চলেছে। কিন্তু গত চার বছরে সংগ্রহ অভিযান কখনও লক্ষ্যমাত্রা ছুঁতে পারেনি। টাকা লেনদেনে নানা অসংগতি, আর্থিক দাবি পেশ করার ক্ষেত্রে অহেতুক দেরি, চাষীদের ন্যায্য দাম থেকে বঞ্চিত করা, মজুত খাদ্যশস্য নষ্ট করা, খাদ্যশয্যের মান সম্পর্কে উদাসীনতা ইত্যাদি আরও নানা কারণে কমপক্ষে ১৭৭ কোটি ৬৮ লাখ টাকার ক্ষতি হয়েছে গত চার বছরে। ১৯৯৭ সালের অক্টোবর থেকে ২০০২ সালের মার্চ পর্যন্ত এই ক্ষতি হয়েছে বলে রাজ্যের খাদ্য কমিশনার এবং রাজ্য সরকারের প্রিন্সিপাল সেক্রেটারি এন রামজিকে জানিয়েছেন ডেপুটি অ্যাকাউন্ট্যান্ট জেনারেল এস বি বেহেরা। খাদ্যশস্য সংগ্রহ অভিযানে কেন্দ্রীয় সরকারের এই প্রকল্পের দায়িত্ব রাজ্য সরকারকে দেওয়া হলে, রাজ্য সরকারের আধিকারিকরা খাদ্যশস্য সংগ্রহ অভিযানের টাকায় অবৈধভাবে ভ্রমণ, কন্টিন্জেন্সি বা অফিস চালানোর খরচ, ছাপা, কাগজপত্র, কালি, বিভাগীয় বাড়ি তৈরি, গোডাউন ভাড়া ইত্যাদি কাজেও প্রায় ৫০ কোটি টাকা খরচ করেছেন। সরকারি নির্দেশ অমান্য করে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রকল্পের জন্য ভর্তুকির টাকা ও 'ক্যাশ ক্রেডিট অ্যাকাউন্টে' জমা না দিয়ে 'শট টার্ম ডিপোজিট'-এ জমা দেওয়া হয়েছে যার ফলে আরও তিরিশ লাখ টাকা লোকসান হয়েছে।

সরকারি ওই রিপোর্ট থেকে আরও জানা গেছে রাজ্যের ৪২টি মিলের চালকল থেকে গোডাউন পরিবহন বাবদ ১৪ কোটি ৪০ লাখ টাকার বিল পাইয়ে দেওয়া হয়েছে মিল মালিকদের। সরকারি

নির্দেশ ছিল চালকল থেকে আট কিলোমিটার দূরে থাকা গোডাউনে চাল মজুত করা হলে তবেই পরিবহন ভাড়া দেওয়া হবে।

কিন্তু চালকলের মধ্যে গোডাউন অথচ পরিবহন বাবদ ওই বিপুল টাকার বিল মেটানোর প্রশ্ন উঠেছে কার স্বার্থে এবং কি উদ্দেশ্যে ওই টাকা মিল মালিকদের পাইয়ে দেওয়া হয়েছে।

● **সংবাদ প্রতিদিন**

(ঘ) হাওড়ার বাসে উদ্ধার বিস্ফোরক, আগ্নেয়াস্ত্র

নিজস্ব সংবাদাতা, হাওড়া, ৫ই অক্টোবর—হাওড়া স্টেশন লাগোয়া দূরপাল্লার বাসস্ট্যান্ড থেকে শনিবার চারটি বিস্ফোরক এবং ছয়ঘড়ার একটি দেশী রিভলবার উদ্ধার করলো হাওড়া জেলা পুলিস। জেলা পুলিস সুপার রাজেশ কুমার জানান, এদিন বেলা সাড়ে এগারোটা নাগাদ গোলাবাড়ি থানা এলাকায় নন্দীগ্রামগামী একটি বেসরকারী বাসে তল্লাশি চালিয়ে ঐ বিস্ফোরক ও আগ্নেয়াস্ত্র উদ্ধার করে পুলিশ। বিস্ফোরকগুলি ল্যান্ড মাইন বলেই পুলিসের সন্দেহ। এই ঘটনায় ঐ বাসের চালক এবং কন্ডাক্টর ছাড়াও বাসের ২৩ জন যাত্রীকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে পুলিস। বিস্ফোরকের প্রকৃতি বুঝতে সাহায্য নেওয়া হচ্ছে সেনাবাহিনীরও।

উল্লেখ্য, রবিবার পশ্চিম মেদিনীপুরের ডেবরায় একটি অনুষ্ঠানে মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য যাচ্ছেন। স্বাভাবিকভাবেই মেদিনীপুরগামী বাস থেকে বিস্ফোরক এবং আগ্নেয়াস্ত্র মেলায় পুলিস সতর্কতামূলক ব্যবস্থা আরও জোরদার করে।

পূজোর আগে সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসাবে নিয়মিতই তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিস। রবিবার পশ্চিম মেদিনীপুরের ডেবরায় মুখ্যমন্ত্রীর একটি অনুষ্ঠান থাকায়, ছিল বাড়তি সতর্কতা। বেলা সাড়ে এগারোটা নাগাদ তল্লাশি চালানোর সময় দীঘা বাস স্ট্যান্ডে দাঁড়িয়ে থাকা ঐ বাসটি থেকে উদ্ধার করা হয় বিস্ফোরকগুলি। বাসটির নম্বর ডব্লুউ বি ১১এ ০৪৪৩। বাসের ১৩ এবং ১৪ নং সিটের বাঙ্কারে রাখা একটি ব্যাগেই রাখা ছিলো বিস্ফোরকগুলি। একটি পলিথিনের ব্যাগে খবরের কাগজে মোড়া ছিল সেগুলি। পুলিস সূত্রে জানা গেছে, ১৩নং সিটটি সংরক্ষিত ছিলো মনোরঞ্জন সামন্তর নামে। আর ১৪নং সিটটি সংরক্ষিত ছিলো আহমেদ মল্লিকের নামে। তবে এখনও পর্যন্ত এবিষয়ে নির্দিষ্ট কোনো তথ্য দিতে পারেননি দু'জনের কেউই।

গোলাবাড়ি থানার পুলিস বিস্ফোরকগুলি উদ্ধার করার পর খবর দেওয়া হয় সি আই ডি কেও। জেলা পুলিস সুপার জানান, সি আই ডি-র বিশেষজ্ঞরা বিস্ফোরকগুলি ল্যান্ডমাইন বলে সন্দেহ করছেন।

কে বা কারা এই বিস্ফোরকগুলি রাখলো, তা খতিয়ে দেখছে পুলিস। কোথায় তা পাচার করা হচ্ছিলো তাও জানার চেষ্টা চলছে।

এই প্রথম নয়, এর আগেও একাধিকবার নানা অস্ত্রশস্ত্র ও বেআইনী সামগ্রী উদ্ধার করা হয়েছে হাওড়ার ঐ বাসস্ট্যান্ড থেকে। গত সরস্বতী পুজোর দিন সেখান থেকেই উদ্ধার করা হয় প্রচুর পরিমাণ গাঁজা। মাস ছয়েক আগেও একটি বাস থেকে উদ্ধার করা হয় দুটি রিভলবার। আর বছর কয়েক আগে দীঘা বাসস্ট্যান্ড থেকে একটি ব্যাগ থেকে উদ্ধার করা হয়েছিলো যাতে ছিল ৪টি রিভলবার। বাসস্ট্যান্ডের শ্রমিক-কর্মচারীরাই সেবার তা উদ্ধার করে তুলে দিয়েছিলেন জেলার তৎকালীন পুলিস সুপার সুরজিৎ পুরকায়স্থর হাতে।

● **গণশক্তি**

(ঙ) এ ডি বি-র নিকাশী উন্নয়ন প্রকল্পে এজেন্সিকেই দিতে হচ্ছে ৮ কোটি ৬ লাখ

নিজস্ব সংবাদাতা, হাওড়া, ৫ই অক্টোবর—এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্কের টাকায় কলকাতা পুরসভার সংযুক্ত এলাকার নিকাশী ব্যবস্থাকে ঢেলে সাজানো হবে। ১৭শো কোটি টাকার এই বিশাল কর্মযজ্ঞের দেখভাল করা, রাজ্য সরকারের সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা এবং সাধারণ মানুষকে সে সম্পর্কে ওয়াকিবহাল করার জন্য কলকাতা পুরসভা একটি জনসংযোগ সংস্থার সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হচ্ছে। নাম প্রেসম্যান অ্যাডভারটাইজিং অ্যাণ্ড মার্কেটিং লিমিটেড। এই জন্যে ওই সংস্থাকে পুরসভা দেবে ৮ কোটি ৬ লক্ষ ৪০ হাজার ২১৯ টাকা। ১৯ সেপ্টেম্বরের মেয়র-পার্ষদ বৈঠকে বিষয়টি অনুমোদিত হয়। ৫ অক্টোবরের মাসিক অধিবেশনে তা সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়।

বিষয়টি চূড়ান্ত অনুমোদনের জন্য পুরসভার মাসিক অধিবেশনে ফেলা হলে বিরোধী দলনেতা নির্মল মুখার্জি জানতে চান এ ব্যাপারে অর্থাৎ এজেন্সিকে নেওয়ার সুপারিশকারী কন্ট্রাক্ট নেগোশিয়েশন কমিটিতে কারা আছেন? ৮ কোটি ৬ লাখ টাকা এজেন্সিকে দেওয়া যুক্তিযুক্ত কিনা!

জবাবে মেয়র জানান, তিনি নিজে পুর কমিশনার এবং সংশ্লিষ্ট দপ্তরের পদস্থ কর্মকর্তারা আছে। তারাই অভিজ্ঞতাসম্পন্ন সম্যান অ্যাডভাটাইজিং অ্যান্ড মার্কেটিং লিমিটেডের নাম প্রস্তাব করে অন্য প্রশ্নের উত্তরে মেয়র জানান, ওই এজেন্সিকে যে ৮ কোটি ৬ লক্ষ টাকা দিতে হচ্ছে তা এ ডি বি-র শর্ত মেনেই।

এ ডি বি-র শর্ত হল দেয় ৩৭০.০০ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের ৫ শতাংশ অ্যাডভাটাইজিং অ্যান্ড মার্কেটিং এজেন্সিকে দিতে হবে।

আগের বামবোর্ডের আমলে ঠিক হয়েছিল, কলকাতা পুরসভার সংযুক্ত এলাকাগুলোর নিকাশী ব্যবস্থা বলে কিছু নেই। সেই কাজ ঢেলে সাজাতে বিপুল অর্থের প্রয়োজন, যা পুরসভা বা রাজ্য সরকারের পক্ষে বহন করা মুসকিল।

তখন ঠিক হয় এশিয়ান ডেভেলপমেন্ট ব্যাঙ্কের কাছ থেকে ঋণ নিয়ে কাজটা করা হবে ৪১টি ওয়ার্ডে। সেইমত উদ্যোগ শুরু হয়। এর মাঝে পুরসভা বামপন্থীদের হাত থেকে চলে যায় তৃণমূল-বি জে পি'র হাতে। এবার সেই ঋণ পাচ্ছে পুরসভা। কর্মসূচির নাম দেওয়া হয়েছে কলকাতা এনভায়রনমেন্টাল ইমপ্রুভমেন্ট প্রোজেক্ট।

সংক্ষেপে কে ই আই পি। এই বিশাল কর্মযজ্ঞের এই ধরনের এজেন্সি মাঝখানে থাকলে অনেক বাড়তি ঝামেলার হাত থেকে রেহাই পাবে পুরসভা।

● **কালান্তর**

(চ) স্বয়ংসম্পূর্ণ ইউনিট হবে হাসপাতালের ইমার্জেন্সি

স্টাফ রিপোর্টার : রাজ্যের বিভিন্ন সরকারি হাসপাতালের ইমার্জেন্সি বিভাগ ঢেলে সাজাতে উদ্যোগী হয়েছে স্বাস্থ্য দফতর। এই উদ্যোগের প্রাথমিক উদ্দেশ্য, আধুনিকীকরণের মাধ্যমে প্রতিটি হাসপাতালের ইমার্জেন্সিকে একটি স্বয়সম্পূর্ণ ইউনিট হিসাবে গড়ে তোলা। এই বিষয়ে প্রাথমিক আলোচনা শেষ হয়েছে। গত শনিবার এস এস কে এম হাসপাতালে এই বিষয়ে ইনস্টিটিউট অব পোস্ট গ্র্যাজুয়েট মেডিক্যাল রিসার্চের ডিরেক্টরের সঙ্গে রাজ্যের বিভিন্ন শিক্ষণ হাসপাতালের অধ্যক্ষ ও সুপারদের বৈঠক হয়। স্বাস্থ্য অধিকর্তা (শিক্ষা) চিত্তরঞ্জন মাইতি জানিয়েছেন, ওই বৈঠকের রিপোর্ট হাতে পাওয়ার পরে স্বাস্থ্য দফতর এই বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে। স্বাস্থ্য দফতর জানিয়েছে, রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবা উন্নত করার জন্য বিশ্বব্যাঙ্কের প্রকল্প থেকে এই খাতে টাকা পাওয়া যাবে।

ইমার্জেন্সির উন্নয়নের জন্য শিক্ষণ হাসপাতালগুলিতে ঠিক কী ধরনের পরিকাঠামো প্রয়োজন, শনিবারের বৈঠকে বিভিন্ন হাসপাতালের কর্তৃপক্ষের কাছে তা জানতে চাওয়া হয়। ইমার্জেন্সির আধুনিকীকরণের জন্য আনুমানিক খরচের একটি হিসাবও চাওয়া হয় হাসপাতাল-কর্তৃপক্ষের কাছে। স্বয়ংসম্পূর্ণ ইমার্জেন্সি চালু করতে গেলে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের সংখ্যা বাড়ানোর প্রয়োজন রয়েছে কি না, তা নিয়েও আলোচনা হয়েছে।

চিত্তরঞ্জনবাবু জানান, স্বাস্থ্যমন্ত্রী সূর্যকান্ত মিশ্র মনে করেন, রাজ্যের সরকারি হাসপাতালগুলির ইমার্জেন্সি বিভাগের পরিষেবা আদৌ যথাযথ ও আধুনিক নয়। সেই কারণেই মন্ত্রী ইমার্জেন্সির আধুনিকীকরণে বিশেষ আগ্রহী। চিত্তরঞ্জনবাবুর কথায়, "আগে রিপোর্ট খতিয়ে দেখি। কী কী পরিকাঠামোগত পরিবর্তন এবং সংযোজন প্রয়োজন, সব বিবেচনা করেই চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।"

চিত্তরঞ্জনবাবু বলেন, প্রাথমিক ভাবে ঠিক হয়েছে, যে-সব হাসপাতালের শয্যাসংখ্যা ১০০০ বা তার বেশি, সেখানে ইমার্জেন্সির জন্য ১০০ শয্যা, এবং যে-সব হাসপাতালে শয্যা-সংখ্যা ৭৫০-এর মতো, সেখানে ইমার্জেন্সির জন্য ৫০টি শয্যা রাখা হবে। এই ব্যবস্থা প্রথমে চালু করা হবে শিক্ষণ হাসপাতালগুলিতে। সাফল্য পাওয়া গেলে জেলা ও মহকুমা স্তরের হাসপাতালেও এই ব্যবস্থা চালু করা হতে পারে। ইমার্জেন্সির আধুনিকীকরণের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ বিশ্বব্যাঙ্কের কাছ থেকে পাওয়া যাবে বলে আশা করছে স্বাস্থ্য দফতর। চিত্তরঞ্জনবাবু জানান, রাজ্যের স্বাস্থ্য পরিষেবার উন্নতির জন্য যে-প্রকল্পে বিশ্বব্যাঙ্ক রাজ্যকে টাকা দিচ্ছে, তাতে অত্যাধুনিক চিকিৎসা-সরঞ্জাম কেনার বরাদ্দ থেকেই এই অর্থ পাওয়া যাবে। তিনি বলেন, ‘‘সরকারি হাসপাতালগুলির পরিকাঠামো রয়েছে। আমাদের মূলত দরকার কিছু নতুন যন্ত্রপাতি। সেটা বিশ্বব্যাঙ্কের টাকায় হয়ে যাবে।’’

নতুন চেহারার ইমার্জেন্সিতে আধুনিক চিকিৎসা ব্যবস্থা তো থাকবেই। থাকবে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারদের দল। ইমার্জেন্সির জন্য আলাদা করে নির্দিষ্ট সংখ্যক শয্যাও রাখা হবে। ইমার্জেন্সির বহির্বিভাগে আসা যে-সব রোগীকে চিকিৎসার জন্য সাময়িকভাবে হাসপাতালে রাখা প্রয়োজন বলে ডাক্তারেরা মনে করবেন, তাঁদের ওই শয্যায় ভর্তি করে নেওয়া হবে। মোট ৪৮ ঘন্টা পর্যন্ত রোগীদের সেখানে রাখা হবে। তার বেশি সময় হাসপাতালে চিকিৎসার প্রয়োজন হলে ওই রোগীকে নিয়মমাফিক ভর্তি হতে হবে।

● **আনন্দবাজার পত্রিকা**

(ছ) মরসুমের প্রথম ট্রফি ইস্টবেঙ্গলের

ইস্টবেঙ্গল—২ ইন্ডিয়ান অয়েল—০

আলভিটো, চন্দন (পেনাল্টি)

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা ৫ই অক্টোবর—কলকাতার বাইরে দীর্ঘদিনের খেতাব খরা কাটিয়ে উঠলো ইস্টবেঙ্গল। নওগাঁতে ইন্ডিপেনডেন্স কাপ ফুটবলে চ্যাম্পিয়ন হলো তারা। খেতাব জয়ের মরসুমের প্রথম ট্রফিও ঘরে তুললো। শনিবার ফাইনাল ম্যাচে ইস্টবেঙ্গল ২-০ গোলে হারিয়েছে ইন্ডিয়ান অয়েলকে। ধূলিয়াজানের এই দলটি গ্রুপ ম্যাচে হারিয়েছিলো ইস্টবেঙ্গলকে। আসল ম্যাচে জিতেই মধুর প্রতিশোধ নিলেন লাল-হলুদ জার্সিধারীরা। এদিন নওগাঁর নুরুল আমিন স্টেডিয়ামে প্রায় পনেরো হাজার দর্শক হয়েছিলো। সকলেই সমর্থন করেছিলো স্থানীয় দলটিকে। ইন্ডিয়ান অয়েলের ফুটবলাররা আক্রমণে ওঠবার সময় সারা মাঠ চিৎকার করে উৎসাহ দিচ্ছিলো। এই প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও ইস্টবেঙ্গল ম্যাচের দুই অর্ধে দুটি গোল করে খেতাব পেয়ে গেলো। নওগাঁর এই টুর্নামেন্টটি

জিতে খুশি দলের ফুটবলাররা। অনেকে এও বললেন, ‘‘তাহলে প্রমাণ হলো আমরাও গঙ্গার ওপারে গিয়ে ট্রপি জিততে পারি।’’

ইস্টবেঙ্গল শুরু থেকে আক্রমণাত্মক নির্ভর ফুটবল খেললেও, গোল পেতে তাদের বেশ অপেক্ষা করতে হয়েছে। কেন না ইস্টবেঙ্গল প্রথম গোলটা পায় বিরতির মিনিট তিনেক আগে। কৌস্তভ ঘোষ ইনসাইড ডজে প্রতিপক্ষের দুই ফুটবলারকে পরাস্ত করে পাস দেন আলভিটোকে। ঠাণ্ডা মাথায় বল জালে পাঠান এই গোয়ানিজ। ইস্টবেঙ্গল দ্বিতীয় তথা শেষ গোলটি পায় এর ঠিক তেইশ মিনিট বাদেই। দ্বিতীয়ার্ধের ২০ মিনিটে চন্দন দাস পেনাল্টি থেকে গোল করেন। ওভারল্যাপ করে সূর্যবিকাশ চক্রবর্তী প্রতিপক্ষ বক্সে ঢুকলে বাধা দেন এক ডিফেন্ডার। রেফারি মৃণাংশু ভট্টাচার্য পেনাল্টির বাঁশি বাজান। এক পাশে গোলরক্ষককে রেখে চন্দন শটে বলে জালে পাঠিয়েছেন। খেলার পরেই ফুটবলারদের অভিনন্দিত করে কোচ সুভাষ ভৌমিক গুয়াহাটি চলে যান। তবে যাওয়ার আগে ছেলেদের বলেছেন কলকাতায় ফিরে উপহার দেবেন। ম্যানেজার দীপ্তেন বসু অবশ্য নওগাঁর হোটেল থেকে টেলিফোনে বললেন, এতো চাপ সত্ত্বেও ছেলেরা ভালো ম্যাচ খেলেছে। এরজন্য কোচকেও প্রশংসা দিতে হবে।

ওকোরো কার্ড সমস্যার জন্য খেলতে পারেননি। সুযোগ পেয়ে কৌস্তভ খারাপ খেলেননি। তাঁর পরিবর্তে ত্রিজিৎ নামেন। যদিও প্রত্যেকটি ম্যাচে ভালো ফুটবল খেলার জন্য রক্ষণের ব্রাজিলীয় ডগলাসকে ম্যান অব দ্য টুর্নামেন্ট বাছা হয়েছে। কোচ অবশ্য সূর্যর খেলার প্রশংসা করেছেন। এদিন নওগাঁর মাঠে ফাইনালে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের ক্রীড়ামন্ত্রী সুভাষ চক্রবর্তী। তাঁর সঙ্গেই ইস্টবেঙ্গল কোচ গুয়াহাটিতে চলে যান ম্যাচের শেষে। কাল দুপুরে ফুটবলারদের সঙ্গেই কলকাতায় ফিরবেন সুভাষ ভৌমিক।

ইস্টবেঙ্গল—অর্পণ, সূর্যবিকাশ, শুভাশিস, সুরেশ, ডগলাস, ষষ্ঠী, দীপঙ্কর (চন্দন), অনীত, কুলোথুঙ্গন, কৌস্তভ (ত্রিজিৎ), ও আলভিটো।

● **গণশক্তি**

(জ) রোগীদের ব্যাপারে আরও মানবিক আচরণ করার জন্য চিকিৎসকদের বললেন বুদ্ধদেব

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা : রোগী ও তাঁর পরিবার-পরিজনদের প্রতি আরও একটু মানবিক হওয়ার জন্য চিকিৎসক ও সংশ্লিষ্ট কর্মীদের বিবেকের কাছে আর্জি জানালেন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য। মঙ্গলবার শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালের শতবর্ষ পূর্তি উৎসবের উদ্বোধন করে মুখ্যমন্ত্রী বলেন, হাসপাতালগুলিতে অনেক অসুবিধা রয়েছে, অনেক চাপ নিতে হয়। তবে দুটি বিষয়ে আমরা জোর দিতে চাইছি। একটি প্রশাসনিক শৃঙ্খলা আর অন্যটি হল রোগী ও তাঁর পরিবারের সঙ্গে একটু মানবিক

ব্যবহার। এটা শুধু সার্কুলার দিয়ে করা যায় না। তাই আপনাদের বিবেকের কাছেই আবেদন করছি। আপনারা অনেক কঠিন কাজ করছেন। যদি রোগীদের আস্থা ফিরিয়ে আনতে পারেন, তাহলে স্বাস্থ্য পরিষেবাকে আরও এগিয়ে নিয়ে যাওয়া সম্ভব হবে।

অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্যমন্ত্রী ডাঃ সূর্যকান্ত মিশ্রও বলেন, সাধারণ মানুষ অনেক উদ্বেগ ও আশঙ্কা নিয়েই হাসপাতালে আসে। কাজেই তাঁদের সঙ্গে ভাল ব্যবহার করা উচিত। পাশাপাশি সাধারণ মানুষের প্রতি তাঁর আবেদন, হাসপাতালগুলিতে নানান অসুবিধা-অভাবের মধ্যে যেসব চিকিৎসক ও কর্মী কাজ করছেন, আপনারা তাঁদের মানসিক অবস্থাও বিবেচনা করুন।

ওই অনুষ্ঠানে স্বাস্থ্য দপ্তরের প্রতিমন্ত্রী প্রত্যুষ মুখোপাধ্যায়, কলকাতা পুরসভার মেয়র সুব্রত মুখোপাধ্যায়, হাসপাতালের সুপার তথা উৎসবের সাংস্কৃতিক কমিটির সভাপতি ডাঃ সমীরকুমার সেনগুপ্ত, কমিটির সম্পাদক দেবাশিস মুখোপাধ্যায় প্রমুখ উপস্থিত ছিলেন। তিন মন্ত্রী এবং মেয়র তাঁদের ভাষণে চিকিৎসার ক্ষেত্রে এই হাসপাতালের ভূমিকার প্রশংসা করেন। পরে হাসপাতালে এন্ডোস্কোপিক সার্জারির একটি নতুন বিভাগ, ল্যাপ্রোস্কোপিক সার্জারিরও উদ্বোধন হয় এদিন।

মুখ্যমন্ত্রী বলেন, হাসপাতালে প্রশাসনিক শৃঙ্খলা অবশ্যই থাকা দরকার। অনেক ক্ষেত্রেই সময়মতো ডাক্তার, নার্স, চতুর্থ শ্রেণির কর্মীরা কাজে এলেও ঠিকমতো কাজ করছেন না। এতে মানুষের মনে ভীষণ প্রতিক্রিয়া হয়। কারণ এটা রাইটার্স নয়। এখানে মানুষের জীবন-মৃত্যুর বিষয়টি জড়িত। তাই হাসপাতালের সুপারের নেতৃত্বে অন্যান্যেরও এ ব্যাপারে এগিয়ে আসতে হবে। আমাদের উপকরণ কিংবা মানবসম্পদ থাকলেও অভাব রয়েছে প্রশাসন ও প্রশাসনিক শৃঙ্খলার। আর, চিকিৎসার সঙ্গে মানবিক ব্যবহারের বিষয়টি ভীষণভাবে যুক্ত।

এ ব্যাপারে তিনি নিজের একটা অভিজ্ঞতার কথা উল্লেখ করে বলেন, চোখের চিকিৎসার জন্য আমি কিউবায় গিয়েছিলাম। ওঁরা জানালেন, সমস্যার পুরোপুরি সমাধান হবে না। তিন দিন পরে বিভাগীয় প্রধান আমাকে ডেকে বললেন, আপনি আমাদের পরিবারের সদস্য হবেন? মনে একটু শঙ্কা নিয়েই সম্মতি দিলে ডাক্তারবাবু বললেন, তাহলে আপনি সিগারেটটা ছেড়ে দিন। এটা তিনি সরাসরি বলতেই পারতেন। কিন্তু সেটাই তিনি বললেন একটু অন্যভাবে।

মুখ্যমন্ত্রী এদিন স্বীকার করেন, শহরের হাসপাতালের প্রচণ্ড চাপ রয়েছে। তিনি বলেন, তাই চিকিৎসা ক্ষেত্রে বেসরকারি উদ্যোগ এগিয়ে আসায় আমরা আনন্দিত। কিন্তু সরকারি হাসপাতালগুলির উন্নতিও করতে হবে। কারণ শহরের ৭০ শতাংশ এবং গ্রামের ৯০ শতাংশ মানুষের চিকিৎসাই হয় সরকারি হাসপাতালে। আর, অসুখ করলেই গ্রামাঞ্চলের মানুষকে যাতে শহরে ছুটে আসতে না হয় সে ব্যাপারেও প্রয়োজনীয় উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।

স্বাস্থ্য দপ্তরের দুই মন্ত্রী এদিন একগুচ্ছ পরিকল্পনার কথা জানান। তাঁরা জানান, উত্তরবঙ্গ, বাঁকুড়া আর বর্ধমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেফ্রোলজি, নিউরোলজি, কার্ডিওলজি বিভাগ খোলার চেষ্টা চলছে। সিটি স্ক্যানের মতো সরকারি হারে ডায়ালিসিসের ক্ষেত্রে বেসরকারি উদ্যোগকে যুক্ত করা যায় কিনা, তাও ভাবা হচ্ছে। এছাড়া ঠিক হয়েছে সব ধরনের হাসপাতালে ভর্তি হওয়া রোগীর সংখ্যা, শয্যার সংখ্যা, মৃতের সংখ্যা, কতজনের এক্স-রে হচ্ছে বা অপারেশন হচ্ছে, তা নথিবদ্ধ করে বিজ্ঞানসম্মত পরিচালন ব্যবস্থা চালু করা হবে। সূর্যবাবু আরও জানান, হাসপাতালের সুপার ও মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষকে কিছু বাড়তি ক্ষমতা দেওয়ার কথা ভাবা হচ্ছে। হাসপাতাল কর্তৃপক্ষকে পে-ক্লিনিক বা অন্যান্য আয়ের কিছুটা খরচ করার স্বাধীনতা দেওয়ার কথাও বিবেচনাধীন রয়েছে।

মেয়র বলেন, কয়েকটি বিভাগের জন্য এস এস কে এম হাসপাতালে না গিয়ে রোগীরা শম্ভুনাথ পণ্ডিত হাসপাতালেই আসেন। তবে এখানে শয্যা সংখ্যার চেয়ে রোগীর সংখ্যা অনেক বেশি হওয়ায় তিনি উদ্বেগ প্রকাশ করেন। বর্জ্য পদার্থ নষ্ট করার জন্য এই হাসপাতাল যে নিজস্ব উদ্যোগ নিয়েছে, তার প্রশংসা করে মেয়র জানান, কলকাতা শহরেও এক বছরের মধ্যে সেই ব্যবস্থা গ্রহণের চেষ্টা চলছে। উল্লেখ্য, এজন্য ওই হাসপাতালে একটি প্ল্যান্ট বসানো হচ্ছে।

● **বর্তমান**

(ঝ) নবম শ্রেণিতে বিতর্কিত ইতিহাস পড়ানো শুরু

আজকালের প্রতিবেদন : দিল্লি, ৮ অক্টোবর—ভারতের ইতিহাসে নেই গান্ধীহত্যার মত মর্মান্তিক ও জাতীয় তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। কেন বাদ? সম্পাদকদের ব্যাখ্যা, ওই ঘটনা নিছক তথ্য মাত্র। গান্ধীজির রাজনৈতিক জীবনচর্চায় যার প্রাসঙ্গিকতা নেই। এভাবেই চেপে যাওয়া হয়েছে হিন্দুত্ববাদী রাজনীতির আদি-ঘাতক নাথুরাম গডসের নাম। ন্যাশনাল কাউন্সিল ফর এডুকেশনাল রিসার্চ অ্যান্ড ট্রেনিং, সংক্ষেপে এন সি ই আর টি অনুমোদিত নবম শ্রেণির ইতিহাসের বইয়ে বি জে পি জোট সরকারের নেতৃত্বে গেরুয়াকরণের এটি একটি নমুনা। ছাত্রছাত্রীদের পড়তে হবে, ১৯৯৬ সালে সাধারণ নির্বাচনের পর বি জে পি দুর্ভাগ্যবশত সংখ্যাগরিষ্ঠতা প্রমাণ করতে পারেনি। ১৩ দিনের সরকারের পতনকে 'দুর্ভাগ্য' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এবং সেই ঘটনা গান্ধীহত্যার চেয়ে রাজনৈতিক তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করেছেন ইতিহাস বইটির লেখক ও সম্পাদকরা। অটলবিহারী বাজপেয়ীর নেতৃত্বে গঠিত সরকারের যে আদপেই গরিষ্ঠতা ছিল না, সে কথা বলা হয়নি। গরিষ্ঠতা প্রমাণ করতে না পারাকে দুর্ভাগ্যজনক বলে মহিমান্বিত করা হয়েছে। নবম শ্রেণির পাঠ্য এই বইয়ের নাম 'সমকালীন ভারত'। লেখক ও সম্পাদকরা যে অন্ধ কমিউনিজম বিরোধিতা থেকে বইটি প্রণয়ন করেছেন, তার দুটি নমুনা দেওয়া

যেতে পারে। লেখা হয়েছে, ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনে কমিউনিস্টদের কোনও ভূমিকা ছিল না। এ দেশের কমিউনিস্ট ও জিন্নার অনুগামীরা স্বাধীনতা সংগ্রাম সমর্থন করেনি। দেশের স্বার্থ রক্ষা না করে তারা মুসলিম লিগকে সমর্থন করেছে। ব্রিটিশকে মদত দিয়েছে। ১৯১৭ সালের অক্টোবর বিপ্লবকে আলোচ্য বইয়ে বলা হয়েছে 'লেনিনের নেতৃত্বে অভ্যুত্থান'। বিশ্বের প্রথম সমাজতান্ত্রিক বিপ্লবে শ্রমিক ও কৃষক শ্রেণীর ভূমিকা নস্যাৎ করতেই 'অভ্যুত্থান' আখ্যা দেওয়া হল। এভাবেই প্রকৃত ইতিহাস বিকৃত করা হয়েছে। ষষ্ঠ শ্রেণির জন্যও অনুরূপ একটি বই প্রণীত হয়েছে। সেখানেও আছে তথ্যের বিকৃতি। দ্বিতীয় বইটির নাম 'ভারত ও বিশ্ব'। এন সি ই আর টি-র ডিরেক্টরের তরফে 'প্রকৃত ইতিহাস লেখা ও ব্যাখ্যা'-র সাফাইও দেওয়া হয়েছে।

● **আজকাল**

(ঞ) স্বদেশী ঃ মুখর হলেন যোশীও

স্টাফ রিপোর্টার, নয়াদিল্লি, ৮ অক্টোবর : বি জে পি-র শীর্ষ নেতৃত্বের প্রতি সংঘ পরিবার প্রকাশ্যে অনাস্থা প্রকাশ করার পরেই কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডঃ মুরলীমনোহর যোশী আর্থিক নীতির বিরুদ্ধে কামান দাগলেন। বি জে পি-র বুদ্ধিজীবীদের এক সভায় ডঃ যোশি বলেন, "শিক্ষায় যেমন সংস্কার করে ভারতীয় ঐতিহ্যের ইতিহাস বর্ণিত হয়েছে, তেমনি আর্থিক নীতির ভিত্তি স্বদেশীয়ানা করতে হবে। নইলে দেশের বিপদ।" আর্থিক নীতি নিয়ে এই প্রথম ডঃ যোশী প্রকাশ্যে মুখ খোলার কারণ, সংঘ পরিবারের মুখপত্র 'পাঞ্চজন্য'র সম্পাদকীয়তে প্রধানমন্ত্রী এবং উপ-প্রধানমন্ত্রীর বিরুদ্ধে প্রবল সমালোচনা।

এবার আক্রমণের তীর উপ-প্রধানমন্ত্রী লালকৃষ্ণ আদবানির দিকেই। আদবানির পাকিস্তান সংক্রান্ত মন্তব্যগুলিকে রীতিমতো ব্যঙ্গ করা হয়েছে সম্পাদকীয়তে।

● **সংবাদ প্রতিদিন**

(ট) বুভুক্ষা, বৈষম্যের সমাধানে নামুক বিজ্ঞান ঃ মুখ্যমন্ত্রী

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা, ৪ঠা অক্টোবর—আর কোনো হিরোশিমা নয়, মানবতার অগ্রগতিতেই হোক বিজ্ঞানচর্চা। নিছক বিজ্ঞানচর্চার জন্যই বিজ্ঞান নয়, বিজ্ঞান সমাধান করুক অনাহার, বুভুক্ষা আর স্বাস্থ্য সমস্যার। আর বিজ্ঞানের হাত ধরেই কমুক উত্তর-গোলার্ধ আর দক্ষিণ-গোলার্ধের অর্থনৈতিক বৈষম্য। শুক্রবার সাহা ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্সের এক অনুষ্ঠানে একথা বলেন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য।

এদিন বিধাননগরে ভ্যারিয়েল এনার্জি সাইক্লোট্রন সেন্টারে মেডিক্যাল সাইক্লোট্রন প্রকল্পের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেন মুখ্যমন্ত্রী। সংস্থার অধিকর্তা অধ্যাপক বিকাশ সিন্‌হা জানান, এই মেডিক্যাল সাইক্লোট্রন প্রকল্পটি বাস্তবায়িত হলে বিশেষত ক্যান্সার এবং হৃদরোগ নির্ণয় এবং চিকিৎসার ক্ষেত্রে নতুন সুযোগ তৈরি হবে। প্রকল্পটি গড়ে তোলার জন্য ৫.২ একর জমিও দিয়েছে রাজ্য সরকার। কসবার কাছে ইস্টার্ন বাইপাসের ধারে দেওয়া হয়েছে ওই জমি। সংস্থার অধিকর্তা আরো জানান, প্রকল্পটির আনুমানিক ব্যয় ৫৫ কোটি টাকা। এর মধ্যে ৩২ কোটি টাকা ব্যয় হবে যন্ত্রপাতির জন্য। তিনি আরো জানান, ভারত সরকার মারফৎ বেলজিয়ামের কাছ থেকে সফট্ লোন হিসাবে পাওয়া গেছে ওই টাকা।

এদিন এছাড়াও সাহা ইনস্টিটিউট অফ নিউক্লিয়ার ফিজিক্সে একটি হিলিয়াম পরিশোধন প্ল্যান্টেরও উদ্বোধন করেন মুখ্যমন্ত্রী। উল্লেখ্য, পশ্চিমবঙ্গের বক্রেশ্বর এবং ঝাড়খণ্ডের তাঁতলই-এর উষ্ণ প্রস্রবণ থেকে গ্যাস পাওয়া যায়, তা থেকেই হিলিয়াম গ্যাস নিষ্কাষণের ব্যবস্থা করছে সাহা ইনস্টিটিউট অব নিউক্লিয়ার ফিজিক্স এবং ভ্যারিয়েবল এনার্জি সাইক্লোট্রন সেন্টার। ক্রায়ো কনডেনসেশন প্রক্রিয়ায় সংগ্রহ করে এনরিচমেন্ট প্লান্টে আনা হয় উষ্ণ প্রস্রবণের গ্যাস। পরে ক্রায়ো অ্যাডসর্পশন প্রক্রিয়ায় সংশোধন করা হয় হিলিয়াম গাসকে। যা পরে ব্যবহার করা হয় পারমাণবিক বিদ্যুৎ কেন্দ্র, মহাকাশ কর্মসূচী, ম্যাগনেটিক রেসোনেন্স ইমেজিৎ (এম আর আই) এবং সুপার কনডাকটিং ম্যাগনেট টেকনোলজিতে।

এদিন ভ্যারিয়েবল এনার্জি সাইক্লোট্রন সেন্টারে সাইক্লোট্রন মেশিনটি ঘুরে দেখেন মুখ্যমন্ত্রী। পরে সাহা ইনস্টিটিউটে উদ্বোধন করেন সংস্থার সুবর্ণজয়ন্তী স্মরণিকা। ১৯৫০ সালে জন্মলগ্ন থেকে ২০০১ সাল পর্যন্ত সময়কালে সংস্থার উল্লেখযোগ্য গবেষণাগুলির তথ্য সংকলিত রয়েছে এই স্মরণিকায়। রাজ্যে পারমাণবিক শক্তি কী কী ভাবে ব্যবহারের সুযোগ রয়েছে, সে বিষয়ে এদিন সংস্থার অধিকর্তা অধ্যাপক বিকাশ সিন্‌হার পরামর্শও চেয়েছেন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য।

● **গণশক্তি**

(ঠ) দশম যোজনায় ৮% উন্নয়ন

স্টাফ রিপোর্টার, নয়াদিল্লি, ৫ অক্টোবর—দশম যোজনায় জাতীয় আয়ের বৃদ্ধির লক্ষ্য ৮ শতাংশে বেঁধে দিলেন প্রধানমন্ত্রী। দশম যোজনার খসড়া পত্র আজ পূর্ণ যোজনা কমিশনের বৈঠকে পেশ করা হয়। খসড়া অনুযায়ী ৮ শতাংশ বৃদ্ধির হারই অনুমোদিত হয়। দেশের অর্থনীতিতে এই পরিবর্তন করার জন্য, এত বৃদ্ধির হারকে ৫.৫. শতাংশ থেকে বাড়িয়ে ৮ শতাংশে নিয়ে যাওয়ার জন্য প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী মূলত পাঁচ দফা দাওয়াই-এর প্রস্তাবও দিয়েছেন। এই পাঁচ দফা সূত্রে রয়েছে—বিলগ্নীকরণ, শ্রম সংস্কার, কর সংস্কার, কৃষিজ পণ্যের বিক্রির উপরে বাধা নিষেধ প্রত্যাহার এবং

সরকারের আয়-ব্যয়ের মধ্যে ভারসাম্য আনা। বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রায় পৌঁছতে দেশীয় বিনিয়োগের সঙ্গে তিনি বিদেশি বিনিয়োগের উপরেও গুরুত্ব দিয়েছেন। তবে সঙ্ঘ পরিবার থেকে শুরু করে দলের ‘সংশয়বাদীদের’ প্রধানমন্ত্রী একই সঙ্গে আশ্বস্তও করেছেন, ‘‘বিদেশি বিনিয়োগের ফলে দেশীয় শিল্প বা জাতীয় স্বার্থ ক্ষুণ্ণ হয় এমন কিছু করা হবে না। এই নিয়ে চিন্তার কোনও কারণ নেই।’’

বৃদ্ধির হার ৮ শতাংশ করা হবে কিনা, বা সেই লক্ষ্য পূরণ সম্ভব কি না, তা নিয়ে এর আগেই নানা সংশয় দানা বাঁধতে শুরু করেছিল। কী পরিমাণ এবং কী ধরনের বিনিয়োগ করলে এই লক্ষ্য পূরণ করা যায়, সেই পরিমাণ বিনিয়োগ সম্ভব কী না ইত্যাদি নিয়েও দ্বিমত ছিল। শেষ পর্যন্ত অবশ্য সব সংশয়ের অবসান ঘটিয়ে যোজনা কমিশনের চেয়ারম্যান তথা প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ী কমিশনের পূর্ণ বৈঠকে জানিয়ে দেন, লক্ষ্য মাত্রা ৮ শতাংশই রাখা হবে। তাঁর চার পাতার বক্তব্যের অধিকাংশ জুড়েই রয়েছে, কেন তিনি এই পথ নিচ্ছেন তার ব্যাখ্যা।

এই লক্ষ্য পূরণ করতে গেলে যে-কর্মসূচী নেওয়া প্রয়োজন, তা ব্যাখ্যা করতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী বলেন, কর ব্যবস্থায় আমূল পরিবর্তন আনতে হবে। নতুন প্রথায় ভ্যালু অ্যাডেড ট্যাক্স (ভ্যাট) ব্যবস্থা যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চালু করতে হবে। তাঁর বক্তব্য, দেশীয় লগ্নি থেকে যতটা সম্ভব উৎপাদন বাড়াতে হবে। প্রধানমন্ত্রীর ধারণা, জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি ৮ শতাংশ করতে গেলে যে-পরিমাণ বিনিয়োগ প্রয়োজন, তার সবটাই দেশী বিনিয়োগ থেকে সম্ভব নয়। সেই কারণেই ঘাটতি পূরণে বিদেশী লগ্নির প্রয়োজন রয়েছে। তবে এরই সঙ্গে যাঁরা এই নিয়ে শঙ্কিত বা সংশয়ের মধ্যে রয়েছেন, তাঁদেরও তিনি আশ্বস্ত করেছেন। তাঁর বক্তব্য, ‘‘দেশের শিল্পের স্বার্থহানি করে বিদেশি বিনিয়োগের সুযোগ করে দেওয়া হবে না।’’

শ্রম সংস্কারের কাজটি যে তিনি আগামী মার্চের মধ্যেই চূড়ান্ত করে ফেলতে চান, এই কথা তিনি সদ্য সমাপ্ত শ্রম সম্মেলনে জানিয়েই দিয়েছিলেন। আজ সেই কথারই কার্যত পুনরাবৃত্তি করেছেন তিনি। তাঁর বক্তব্য, লক্ষ্য পূরণে শ্রম সংস্কার অতি আবশ্যিক। এবং তা করতেই হবে। প্রধানমন্ত্রীর ধারণা, গত কয়েক বছর জাতীয় আয়ের বৃদ্ধি ৫.৫ শতাংশের মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল। তার একটা বড় কারণ পরিকাঠামোগত বাধা।

তাঁর মতে পরিকাঠামো ক্ষেত্রে সংস্কার সাধন অত্যন্ত জরুরি। আজকের বৈঠকে প্রধানমন্ত্রী বিদ্যুৎ ক্ষেত্রে সংস্কার না হওয়ায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছেন। তাঁর বক্তব্য, এই ক্ষেত্রেও দ্রুত সংস্কার দেশকে সার্বিক বিকাশের দিকে এগিয়ে দেবে।

জরুরি ভিত্তিতে সংস্কার প্রয়োজন, এমন ক্ষেত্রগুলিকে চিহ্নিত করতে গিয়ে প্রধানমন্ত্রী প্রশাসনিক

ক্ষেত্রেরও উল্লেখ করেন। তাঁর বক্তব্য, প্রশাসনিক ব্যবস্থা, বিচারব্যবস্থা এবং অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তা ব্যবস্থায় আমূল সংস্কার প্রয়োজন। তাঁর বক্ত, বেসরকারি উদ্যোগ টানতে গেলে এই সার্বিক প্রশাসনিক সংস্কার খুবই জরুরি। তিনি বলেন, সরকারি এবং বেসরকারি উদ্যোগের মধ্যে আরও বেশি সমঝোতা ও সমন্বয় প্রয়োজন।

প্রধানমন্ত্রীর বাসভবনে এই বৈঠকে তিন খন্ডের খসড়াটি পেশ করা হয়। জাতীয় বৃদ্ধির হার নির্দিষ্ট করার সঙ্গে সঙ্গে রাজ্যওয়াড়ি বৃদ্ধির হারও দশম যোজনায় নির্দিষ্ট করা হয়েছে। যোজনা রিপোর্টে রাজ্যওয়াড়ি বৃদ্ধির হার এ বারই প্রথম নির্দিষ্ট করা হল। যোজনা কমিশনের ডেপুটি চেয়ারম্যান কৃষ্ণচন্দ্র পন্থের বক্তব্য, রাজ্যগুলির সঙ্গে বিশদ আলোচনার ভিত্তিতেই এই লক্ষ্যমাত্রা স্থির করা হয়েছে। তিন খন্ডের যোজনা রিপোর্টে এ বারই প্রথম রাজ্যগুলির পরিকল্পনা এবং তার কৌশল নিয়েও একটি আলাদা খন্ড তৈরি হয়েছে।

২০০২-২০০৭, এই পাঁচ বছরের পরিকল্পনায় দারিদ্রের হার ২৬ শতাংশ থেকে ২১ শতাংশে নামিয়ে আনার লক্ষ্য স্থির হয়েছে। সাক্ষরতার হার ৭৫ শতাংশে নিয়ে যাওয়া হবে। সমস্ত গ্রামে পরিশোধিত পানীয় জল সরবরাহ করা হবে।

বৃদ্ধির লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে পরিকল্পনায় চারটি বিষয়কে অধিক গুরুত্ব দেওয়ার কথা বলা হয়েছে যোজনাপত্রে। এগুলি হল—

- পরিকাঠামো এবং সামাজিক ক্ষেত্রে সরকারি বিনিয়োগ বাড়াতে হবে।
- সম্পদ বন্টনের ক্ষেত্রে কার্যক্ষমতা বাড়ানোর বিষয়ে জোর দিতে হবে।
- নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে বিনিয়োগ উপযোগী পরিবেশ তৈরির কথাটি মাথায় রাখতে হবে।
- সরকারের কার্যক্ষমতা এবং দক্ষতা বাড়ানোর দিকে নজর দিতেই হবে। প্রধানমন্ত্রীও তাঁর বক্তব্যে এই দিকগুলি ছুঁয়ে গিয়েছেন।

● আনন্দবাজার পত্রিকা

(ড) ফুটপাথে শিশুর মৃতদেহ, চাঞ্চল্য

স্টাফ রিপোর্টার : শনিবার সকালে পার্ক সার্কাসের কাছে একটি মৃত শিশু পড়ে থাকতে দেখা যায়। চার নম্বর সেতুর পশ্চিম দিকের ঢালে ফুটপাথের উপরে এই দিন ভোরে শিশুটির দেহ পড়ে থাকতে দেখে স্থানীয় মানুষ পুলিশকে খবর দেন। এলাকায় ব্যাপক উত্তেজনা ছড়ায়। বেলা সওয়া ৯টা নাগাদ পুলিশ ঘটনাস্থলে যায়। মৃত শিশুটিকে ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়।

পুলিশ জানিয়েছে, মৃত ওই শিশুটির হাতে একটি টিকিটে লেখা ছিল এক ডাক্তারের নাম। ওই সূত্র পেয়ে পুলিশ ন্যাশনাল মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে যায়। সেখানে খোঁজ নিয়ে পুলিশ জানতে পারে ওই শিশুটির মা মুমতাজ শেখ ওই হাসপাতালেই ভর্তি রয়েছেন। শিশুটির বাবার নাম আজাদ। বাড়ি তিলজলা থানা এলাকার গুলাম, জিলানি খান রোডে। শুক্রবার রাতে মুমতাজ মৃত শিশুটি প্রসব করেন। মাতৃগর্ভেই শিশুটির মৃত্যু হয়েছে।

● **আনন্দবাজার পত্রিকা**

(ঢ) বেহাল রাস্তা, মার খাবে শঙ্করপুরের পর্যটন শিল্প

নিজস্ব প্রতিনিধি, কলকাতা : সামনেই স্টার্ট দেওয়া কোয়ালিস গাড়িটা দাঁড়িয়ে। যাত্রীরা বসে আছেন। কলকাতা থেকে আসা গাড়ির মালিক কাম চালক শুকলালসাহেব রাস্তায় নেমে একটা লাঠি দিয়ে জলের গভীরতা পরীক্ষা করছেন। পর পরই ওই রকম গর্ত। রাস্তা যেন জলাভূমি। বৃষ্টির জলে গর্তগুলি ছোটখাট ডোবার আকার নিয়েছে।

চৌদ্দ মাইল মোড় থেকে শঙ্করপুর যাওয়ার প্রায় সাত কিলোমিটার রাস্তার ছবি এইরকম। ছোট গাড়ি ভেঙে যেতে পারে। বড় গাড়ির মধ্যে সরকারি বাস আর স্ট্যান্ড পর্যন্ত যেতে পারছে না। আর রাস্তার এই অবস্থার পাশাপাশি দিবারাত শঙ্করপুর জুড়ে লোডশেডিং।

বেহাল রাস্তা এবং বিদ্যুতের জন্য শঙ্করপুরে পর্যটন শিল্পের সঙ্গে যুক্ত ব্যবসায়ীদের মাথায় হাত। বস্তুত এবার দুর্গাপুজোর ছুটিতে পর্যটকরা মনোরম এই সমুদ্রসৈকতে ভিড় জমাবেন কিনা তা নিয়ে ঘোর সংশয়ে রয়েছেন তাঁরা। বেসরকারি হোটেল এবং সরকারি অতিথি নিবাসগুলিতে এবার এখনও পর্যন্ত পর্যটকদের বুকিং একেবারেই আশানুরূপ নয়। শঙ্করপুর অঞ্চলের মূল মালিক মৎস্যদপ্তর। দপ্তরের মন্ত্রী কিরণময় নন্দ সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, রাস্তার দায়িত্ব তাঁর দপ্তরের নয়। আর মৎস্য দপ্তরের যা বাজেট তাতে এই রাস্তা মেরামতির সাধ্য তাঁর নেই। তবে, পূর্ব মেদিনীপুর জেলা পরিষদের সভাধিপতি নাবার্ডের টাকায় রাস্তা করে দেবেন বলে তাঁকে আশ্বাস দিয়েছেন বলে মন্ত্রী জানান।

ঘটা করে বছর দেড়েক আগে শঙ্করপুরে ট্যুরিস্ট কমপ্লেক্সের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করেছিলেন তৎকালীন পর্যটন মন্ত্রী মানব মুখোপাধ্যায়। তারপর একটা ইঁটও গাঁথা হয়নি। অথচ, শঙ্করপুরকে আন্তর্জাতিক পর্যটন মানচিত্রে ঠাঁই দেওয়ার চেষ্টায় রাজ্য সরকারের সংশ্লিষ্ট দপ্তর প্রায়ই লম্বাচওড়া কথা বলে। বিজ্ঞাপনে লক্ষ লক্ষ টাকা খরচ করে পর্যটকদের শঙ্করপুরে টানার প্রয়াস চালায় রাজ্য সরকার।

কিন্তু পর্যটক শিল্পকে গড়ে তুলতে হলে যে ন্যূনতম পরিকাঠামো দরকার তা শঙ্করপুরে নেই। মৎস্যদপ্তর তিনটি দারুণ অতিথি নিবাস তৈরি করেছে। মৎস্যগন্ধার পর কিনারা এবং জোয়ার, তিনটি জায়গাই বেশ নিরিবিলি। ব্যবস্থাও ভাল। তিনটে বেসরকারি হোটেল আছে শঙ্করপুরে। আরও চারটি হোটেল তৈরি হচ্ছে। দীঘার ঘিঞ্জি এলাকা এবং ভিড় ছেড়ে, অনেক পর্যটকই এখন শঙ্করপুরকে বেশি পছন্দ করছেন। ঝাউ বন এবং সমুদ্রের আকর্ষণে প্রতি বছর দুর্গাপুজো থেকে পর্যটকদের ভিড় শুরু হয় শঙ্করপুরে।

কাঁথি থেকে দীঘা যাওয়ার রাস্তা এখন এত ভাল যে, চৌদ্দমাইল মোড় পর্যন্ত যেতে আধঘন্টার বেশি লাগে না। এই ২৭ কিলোমিটার রাস্তার পর মোড় ঘুরে ঢুকতে হবে শঙ্করপুর। ৭ কিলোমিটার রাস্তা যেতে লাগবে আধঘন্টার বেশি। সবচেয়ে বড় কথা, শৌখীন গাড়ি নিয়ে পর্যটকরা এই রাস্তায় ঢুকতেই চাইবেন না।

আর বিদ্যুৎ ব্যবস্থা পুরোপুরি বিপর্যস্ত। ২৪ ঘন্টা টানা লোডশেডিংও এখন শঙ্করপুর এলাকার মানুষের গা সওয়া হয়ে গেছে। বিদ্যুতের অভাবে শুধুমাত্র পর্যটন নয়, মার খাচ্ছে মাছের ব্যবসাও। শঙ্করপুরে রয়েছে মৎস্যবন্দর। প্রচুর মাছ ওঠে। ইলিশ, চিংড়ির মতো দামি মাছ মজুত করতে গেলে, প্রচুর বরফ লাগে। কিন্তু বরফ তৈরির কারাখানাগুলি বিদ্যুতের অভাবে ধুঁকছে। চাহিদা অনুযায়ী বরফ সরবরাহ করতে পারছে না তারা।

● বর্তমান

(ণ) ডায়েরিয়া নিয়ন্ত্রণে পানীয় জলের ট্যাঙ্কার পাঠানো হল বারাসতে

স্টাফ রিপোর্টার : উত্তর ২৪ পরগনার বারাসত পুরসভার ২৬, ২৭ এবং ২৯ নম্বর ওয়ার্ড এবং মধ্যমগ্রাম পুরসভার কিছু এলাকায় দূষিত পানীয় জল খেয়ে প্রায় পাঁচশো মানুষ ডায়েরিয়ায় আক্রান্ত হয়ে পড়েছেন। তবে বেসরকারি মতে আক্রান্তের সংখ্যা আরও বেশি। এদের মধ্যে এক বৃদ্ধার মৃত্যু হয়েছে। আক্রান্ত এলাকায় যুদ্ধকালীন তৎপরতায় পানীয় জলের ট্যাঙ্কার পাঠানো হয়েছে এবং খুব তাড়াতাড়ি ১০টি টিউবয়েল বসানো হচ্ছে এবং যে ডিপ টিউবয়েলের জল খেয়ে এত মানুষ ডায়েরিয়ায় আক্রান্ত হয়েছে তা এখনিই বন্ধ করে দেওয়া হচ্ছে। আর যে সমস্ত পাইপ পুরনো হয়ে গেছে সেগুলো পালটে ফেলা হবে। মঙ্গলবার মহাকরণে পুর ও নগর উন্নয়ন মন্ত্রী অশোক ভট্টাচার্য এই খবর দিয়ে বলেন, সমস্ত পরিস্থিতির ওপর প্রশাসন নজর রাখছে। আমরা আমাদের বিশেষজ্ঞদের পাঠিয়েছি। তারা আক্রান্ত এলাকায় গিয়ে পানীয় জলের নমুনা সংগ্রহ করে ইন্সটিটিউট অব পাবলিক হেল্থ ইঞ্জিনিয়ারিং-এ পরীক্ষা করা হবে।

পুরমন্ত্রী আরও বলেন, কে এম ডি এ-র অফিসাররা আক্রান্ত এলাকায় যাবে এবং স্থানীয় মানুষদের বোঝাবে কিভাবে পানীয় জল ব্যবহার করলে মানুষ সুস্থ থাকে এবং তারা আক্রান্ত এলাকায় হ্যালোজেন ট্যাবলেট বিতরণ করবে।

কে এম ডি এ-র অফিসাররা খোঁজ নেবে পানীয় জলের উৎসের সঙ্গে কি কোনভাবে ড্রেনের দূষিত জল মিশেছে কি না। মিশলে কোথায় এবং কিভাবে মিশেছে তারা পরীক্ষা করবে।

অন্যদিকে উত্তর ২৪ পরগনার ডি এম এইচ দ্বিবেদী এদিন জানান, এখন পর্যন্ত ৫০০ জন ডায়েরিয়ায় আক্রান্ত হয়েছে। তাদের মধ্যে ৭৪ জনকে বারাসত হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। ১৩ জনকে নার্সিং হোমে ভর্তি করা হয়েছে এবং একজন কলকাতার আই ডি হসপিটালে ভর্তি হয়েছেন।

ডি এম জানান, গতকাল দূষিত জল খেয়ে ৮০ বছরের এক বৃদ্ধা মারা গেছেন। ডায়েরিয়ায় আক্রান্ত এলাকায় প্রশাসনের পক্ষ থেকে হ্যালোজেন এবং আর এস প্যাকেট পাঠানো হয়েছে যাতে নতুন করে আর কেউ না দূষিত জল খেয়ে ডায়রিয়ার আক্রান্ত হয়।

অতিরিক্ত স্বাস্থ্যসচিব এদিন বলেন, স্কুল অব ট্রপিকাল মেডিসিনের কয়েকজন ডাক্তারকে বারাসাতের আক্রান্ত এলাকায় পাঠানো হয়েছে। তারা দুর্গত এলাকায় মানুষদের পরীক্ষা করবেন এবং জলের নমুনা নিয়ে ক্রমে দু-একদিনের মধ্যে রিপোর্ট দেবেন। দুর্গত এলাকায় মেডিকেল ক্যাম্প বসানো হয়েছে। স্থানীয় পুরসভা তার দেখভাল করছে।

প্রসঙ্গত স্বাস্থ্যমন্ত্রী সূর্যকান্ত মিশ্র এবং স্বাস্থ্য প্রতিমন্ত্রী প্রত্যুষ মুখার্জি উদ্ভূত পরিস্থিতি নিয়ে একটি উচ্চপর্যায়ের বৈঠক এবং ঘটনাবলির পর্যালোচনা করেন।

● **কালান্তর**

(ত) বর্ধমানে ঘূর্ণিঝড়ের তান্ডব, বাজে হত ২

আজকালের প্রতিবেদন : পুজোর মুখে দুর্যোগ। মঙ্গলবার দুপুরের পর ঝড়, তুমুল বৃষ্টি। কলকাতায় উৎসবের মেজাজে ভাঁটা পড়ল। বর্ধমানের অবস্থা আরও খারাপ। সেখানে প্রবল ঘূর্ণিঝড়। বাজ পড়ে মারা গেছেন ২ জন। প্রচুর কাঁচা বাড়ি আর গাছ ভেঙে পড়েছে। বহুক্ষণের জন্য বিদ্যুৎ বিচ্ছিন্ন হয়ে বর্ধমান শহর ছিল অন্ধকার। ঝড়ের তাণ্ডবে সেখানে আহত হয়েছেন কমপক্ষে ৮ জন। সবথেকে খারাপ খবর হল—আবহাওয়া অফিস জানিয়েছে, তৈরি হয়েছে একটি নিম্নচাপ আর ঘূর্ণাবত। তার জন্যই দক্ষিণবঙ্গ জুড়ে এই দুর্যোগ। সকলেরই চিন্তা, পুজোর কদিন আবহাওয়া কেমন থাকবে। নিম্নচাপ আর ঘূর্ণাবর্ত আরও সক্রিয় হবে না তো! উৎসবের আনন্দ ঝড়-বৃষ্টিতে থমকে যাবে না তো! আলিপুর

আবহাওয়া অফিস অবশ্য জানাচ্ছে, নিম্নচাপের রেখাটি এখন পর্যন্ত দুর্বল। এখনই বড় ধরনের দুর্যোগের সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না। তবে সামনের দিনগুলিতে আচমকা অবনতি কিছু ঘটবে কি না এখনই বলা যাচ্ছে না। মঙ্গলবার দুপুরের পর থেকেই আবহাওয়ার পরিবর্তন ঘটতে থাকে। সারাদিন ভ্যাপসা গরমের পর আকাশে কালো মেঘের ছোটাছুটি চলতে থাকে। বইতে থাকে ঠান্ডা হাওয়া। তারপর অবস্থার আরও অবনতি ঘটে। ঝড়ো হাওয়ার সঙ্গে নামে মুষলধারে বৃষ্টি। বর্ধমানের অবস্থা সবথেকে খারাপ হয়। সেখানে দুর্যোগ শুরু হয় দুপুর সাড়ে এগারটা থেকে। প্রথমে মৃদু ঝড়, তারপর তার মাত্রা ক্রমশ বাড়তে থাকে। ঘূর্ণিঝড়ের আকার এত মারাত্মক হয়ে ওঠে যে একসময়ে অনেকেই মনে করেন, টর্নেডো নয় তো! বাজ পড়ে মারা যান নেতিয়া গ্রামের ছনাবড়া দুলে (২০) এবং রায়ন গ্রামের মালকিতায় বধু মালিক (২২)। বর্ধমান বিশ্ববিদ্যালয় এলাকা ঝড়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়। রাজবাটীতে উপড়ে যায় পুরনো গাছ। ভেঙে পড়ে বিদ্যুৎ আর টেলিফোনের থাম। জেলার বিস্তীর্ণ এলাকা বিদ্যুৎহীন হয়ে যায়। শহরের বহু এলাকা জলমগ্ন হয়ে যায়। ক্ষতিগ্রস্ত হয় পুজো মণ্ডপগুলিও। বর্ধমান সদর থানা জানিয়েছে, এই তীব্র ঘূর্ণিঝড় মূলত কেন্দ্রীভূত হয়েছিল বড় বাজার এবং বেড়িয়ান এলাকায়। গাছ আর কাঁচা বাড়ি ভেঙে আটজন আহত হয়েছেন। তাঁদের হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। বৃষ্টি হয়েছে দুর্গাপুর, আসানসোলেও। এদিকে কলকাতার আকাশের হঠাৎ ভোল বদল দেখে সকলেই অবাক হন। শরতের নীল আকাশের আলো উধাও হয়ে নেমে আসে ঘন অন্ধকার। যাঁরা শেষ মুহূর্তের পূজোর বাজারে বেরিয়েছিলেন তাঁরা বিপাকে পড়েন। যাঁরা প্রতিমা আনতে বেরিয়েছিলেন তাঁরা বের করেন পলিথিন। একসময়ে নামে প্রবল বৃষ্টি। সঙ্গে ঝড়ো বাতাস। পুজোর সময়েও এই দুর্যোগ থাকবে নাকি! আবহাওয়াবিদরা অবশ্য আশ্বাস দিয়েছেন, এতটা শঙ্কিত হওয়ার কারণ নেই। আবহাওয়ার এই অবনতি সাময়িক। আলিপুর আবহাওয়া দপ্তরের অধিকর্তা জানালেন, গত কয়েকদিন ধরে পশ্চিম-মধ্য বঙ্গোপসাগর এবং সংলগ্ন দক্ষিণ-পশ্চিম বঙ্গোপসাগরের ওপর একটি নিম্নচাপ রেখা ছিলই। এই সঙ্গে বিহার ও সংলগ্ন দক্ষিণবঙ্গের ওপর একটি ঘূর্ণাবর্ত সৃষ্টি হয়েছে। এটি ভূপৃষ্ঠের এক থেকে সাড়ে তিন কিলোমিটার পর্যন্ত বিস্তৃত। এই যুগলবন্দির প্রভাবেই আবহাওয়ার অবনতি। তবে তিনি জানান, নিম্নচাপ রেখাটি বেশ দুর্বল। বায়ুমণ্ডলে এখনও যথেষ্ট জলীয় বাষ্প থাকাতেই এই বৃষ্টি। এর ফলে আজ বুধবারও আকাশ মেঘাচ্ছন্ন এবং হালকা বৃষ্টির সম্ভাবনা রয়েছে। তবে এর জন্য বড় ধরনের দুর্যোগের সম্ভাবনা দেখা যাচ্ছে না বলে তিনি জানান। প্রাকৃতিক দুর্যোগ হয়েছে মেদিনীপুরেও। বৃষ্টি হয়েছে খড়গপুর, নারায়ণগড়, দাঁতন, এগরা, ঘাটাল, ঝাড়গ্রামসহ সর্বত্র।

● **কালান্তর**

(থ) দিঘা, দার্জিলিঙে পলিব্যাগ প্রতিরোধে কড়া নজরদারি

স্টাফ রিপোর্টার : পুজোয় সুন্দরবন, রাজ্যের পার্বত্য এলাকা, বনাঞ্চল বা দিঘায় পলিব্যাগ (২০ মাইক্রনের কম বা বেশি) ব্যবহারের উপরে জোরদার নজরদারির ব্যবস্থা করেছে রাজ্য সরকার। ওই সব এলাকায় পলিব্যাগ ব্যবহারে আগেই নিয়ন্ত্রণ আরোপ করা হয়েছে। পুজোয় ভ্রমণার্থীরা যাতে যততত্র পলিব্যাগ ফেলে দূষণ সৃষ্টি না-করেন, সেই জন্যই কড়া নজরদারির সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। সোমবার এই হুঁশিয়ারি দিয়েছেন পরিবেশ মন্ত্রী মানব মুখোপাধ্যায়।

ওজোন দিবস উপলক্ষ্যে রাজ্য দূষণ নিয়ন্ত্রণ পর্ষদে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে মানববাবু জানান, বেশ কিছু দিন ধরেই পর্ষদ রাজ্যে পলিব্যাগ নির্মাতা ও মজুতাকারী সংস্থাগুলিকে কড়া নজরে রাখছে। বিভিন্ন এলাকায় হানা দিয়ে বেশ কিছু সংস্থা বন্ধও করে দেওয়া হয়েছে। এই বার সাধারণ মানুষের মধ্যে পলিব্যাগ থেকে সৃষ্ট দূষণ সম্পর্কে সচেতনতা বাড়াতে রাজ্য সরকার বেশ কিছু ট্যুরিস্ট স্পটে ভ্রমণার্থীদের উপরেও কড়া নজরদারির ব্যবস্থা করছে। কারণ, বহু ভ্রমণর্থীরা ওই সব জায়গায় পলিব্যাগ ফেলে নোংরা করে আসেন। মন্ত্রীর কথায়, ''আমরা চাই, মানুষ পলিব্যাগের দূষণ সম্পর্কে সচেতন হোন। কাউকে হেনস্থা করা আমাদের উদ্দেশ্য নয়। মানুষ যদি নিজে থেকেই পলিব্যাগের ব্যবহার বন্ধ করে দেন, তা হলেই আমাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে।" তবে ঠিক কবে থেকে কড়াকড়ি হবে, তা বলতে চাননি মন্ত্রী।

পর্ষদের এক বিবৃতিতে জানানো হয়েছে, গত ৮ অগস্ট এবং ৩ সেপ্টেম্বর কলকাতা, সল্টলেক, বেহালা, হাওড়া, চুঁচুড়া, বর্ধমান, ব্যারাকপুর, বারাসত, আসানসোল ও দিঘার সমুদ্রতীরে হানা দিয়ে বেশ কিছু পলিব্যাগ নির্মাতা, মজুত ও ব্যবহারকারী সংস্থা বন্ধ করে দেওয়া হয়। ২০ মাইক্রনের চেয়ে কম ঘনত্বের পলিব্যাগ ব্যবহার করায় চুঁচুড়ায় বন্ধ করা হয়েছে একটি জুতো প্রস্তুতকারী সংস্থার শো-রুমও।

এ দিকে, একটু যত্ন করলে আর নজর রাখলে কলকাতার মতো বেশি ঘনবসতিপূর্ণ শহরের পরিবেশ-মানচিত্রেরও উন্নতি হতে পারে বলে মন্তব্য করেছেন মার্কিন কনসাল জেনারেল জর্জ এন সিবলি। সোমবার আমেরিকান সেন্টারে 'ইউনাইটেড স্টেটস এশিয়া এনভায়রনমেন্টাল পার্টনারশিপ' এবং 'সিটি ডেভেলপার্স ফোরাম'-এর যৌথ উদ্যোগে আয়োজিত পরিবেশ সংক্রান্ত এক অনুষ্ঠানে তিনি এই মন্তব্য করেন।

সিবলির কথার সূত্র ধরেই ওই অনুষ্ঠানে আমন্ত্রিত দুই মার্কিন বিশেষজ্ঞ কাথ উইলিয়ামস এবং ডোনা ম্যাকিনটায়ার 'গ্রিন বিল্ডিং' বা পরিবেশ-বন্ধু বাড়ি নিয়ে আলোচনা করেন। তাঁদের মতে, শহরের দূষণ-মানচিত্র পরিবর্তন করতে গেলে নতুন বাড়ি নির্মাণে বিশেষ কিছু নীতি মেনে চলা দরকার। এই

নীতিগুলির মধ্যে রয়েছে জলের পরিকল্পিত ব্যবহার এবং পুনর্ব্যাবহার, সূর্যালোক ও বিদ্যুতের নিয়ন্ত্রিত ব্যবহার, বর্জ্য থেকে ব্যবহার্য সামগ্রী তৈরি ইত্যাদি। কে এম ডি এ-র মুখ্য কার্যনির্বাহী অফিসার প্রভ দাসও এদিনের অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন।

● আনন্দবাজার পত্রিকা

(দ) জবাব দেবেন রাজ্যের সাধারণ মানুষ

পশ্চিমবঙ্গ সব দিক থেকে পিছিয়ে পড়ছে। বামফ্রন্ট-বিরোধীদের এই অভিযোগ নূতন নয়। কয়েকটি সংবাদপত্র তো প্রতিদিন অঙ্ক কষছে। উদ্দেশ্য একটাই, বামফ্রন্ট ক্ষমতায় আসার আগে পশ্চিমবঙ্গ ছিল স্বর্গরাজ্য। ছিল না আর্থিক মন্দা। শিল্প, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, বাসস্থানের কোনও সমস্যা ছিল না। আইন-শৃঙ্খলা ছিল সুরক্ষিত। এইরকম সব কিছুই। কিন্তু বামফ্রন্ট গত ২৫ বছরে সব শেষ করে দিয়েছে। পশ্চিমবঙ্গে এখন সর্বনাশের শাসন চলছে। এটা প্রমাণ করার জন্য কয়েকটি সংবাদপত্র, কয়েকজন সাংবাদিক খুবই ব্যস্ত। বৈদ্যুতিন মাধ্যমগুলিও কম যাচ্ছে না। রাজ্য সরকার যে সব দিক থেকেই ব্যর্থ এটা জানান দেবার জন্য কত ব্যবস্থা-আয়োজন। আমরা সমালোচনার বিরুদ্ধে নই। ভুল-ভ্রান্তি-ব্যর্থতার কথা উঠুক, মানুষ মুখ খুলুক—এতে আপত্তির প্রশ্ন ওঠে না। কিন্তু এর পাশাপাশি আমরা আর একটা ছবি দেখতে চাই। সে ছবিটা উন্নয়নের। প্রশ্নটা যদি এভাবে রাখি : গত ২৫ বছরে পশ্চিমবঙ্গ কি সত্যি সত্যি পিছিয়ে গেছে? উন্নয়নের কোনও উদাহরণ নেই? সব রাজ্য অগ্রগতির আলোয় ঝলমল করছে, অন্ধকার শুধু পশ্চিমবঙ্গে? এসব প্রশ্নের উত্তর দেবেন সাধারণ মানুষ। তাঁরাই সব হিসেব-নিকেশ মিলিয়ে নেবেন ব্যর্থতা ও সাফল্যের দাঁড়িপাল্লায়। একটি বিশেষ অর্থনৈতিক পরিস্থিতিতে রাজ্য সরকার এবার অর্ধেক 'বোনাস/অনুদান' দিচ্ছে। সরকারের এই সিদ্ধান্তে সবাই খুশি নয়। কারণটা সঙ্গত না অসঙ্গত—সে বিতর্কে না গিয়ে একটা কথা অসঙ্কোচেই বলা যায় : গুজরাট, মহারাষ্ট্র, অন্ধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক, তামিলনাড়ু, হিমাচল প্রদেশ, মধ্যপ্রদেশ, ছত্তিশগড়, ঝাড়খণ্ড, পাঞ্জাব, মিজোরাম, কাশ্মীর ও সিকিমে বোনাস নেই। বোনাস/অনুদান ছিল, কিন্তু বন্ধ হয়ে গেছে রাজস্থান, মণিপুর, আসাম, বিহারে। মেঘালয়ে বড়দিনে মাত্র ২৫০ টাকা এবং কালীপূজায় ১০০০ টাকা অনুদান দেওয়া হয়। ব্যতিক্রম ছিল পশ্চিমবঙ্গ। কিন্তু এবার পরিস্থিতির শিকার হতে হয়েছে। কারণ, কেন্দ্রীয় সরকারের অর্থনীতি। কেন্দ্রীয় সরকারই এখন তীব্র অর্থনৈতিক সঙ্কটে জর্জরিত। এই সঙ্কটের থাবায় পড়েছে দেশের ২৮টি রাজ্য। মনে রাখতে হবে, পশ্চিমবঙ্গ এই ২৮টি রাজ্যের মধ্যে একটি। কেন্দ্রীয় সরকারের ব্যর্থতার প্রভাবে সব রাজ্যই বিব্রত। পূজোর মাসের পুরো বেতন এবং অর্ধেক বোনাস পাওয়া গেল। কিন্তু সামনের মাসের বেতন সরকার দিতে পারবে কি? এই প্রশ্নটা কেন সুকৌশলে সামনে নিয়ে এসেছে বামফ্রন্ট

বিরোধীরা? উদ্দেশ্য একটাই, তা হলো আতঙ্ক সৃষ্টি করা। বেতন দেওয়ার দায়িত্ব সরকারের। সরকারের পক্ষ থেকে এখন পর্যন্ত আগামী মাসের বেতন সম্পর্কে কোনও মন্তব্য করা হয়নি। কিন্তু সমালোচকদের ঘুম নেই। তারা সরকারকে 'দেউলে' বলতেও দ্বিধা করছে না। তা ওঁরা বলুন। সমালোচনার ঝড় তুলুন। কিন্তু সমস্যা কি শুধু পশ্চিমবঙ্গের? যেখানে, দেশের একাধিক রাজ্য মাসের পর মাস বেতন যোগান দিতে পারছে না, সরকারী পরিষেবা লাটে উঠেছে—সেখানে পশ্চিমবঙ্গ সব সঙ্কট মোকাবিলা করে, সাধ্যমতো সব পরিষেবা বহাল রাখছে। সমালোচকরা ভুল করেও এ কথাটা উচ্চারণ করছেন না। বলছেন না এ কথাও, বি জে পি-জোট সরকার ঋণে ঋণে জর্জরিত। ঋণের সুদ গুনতেই সরকারের কোষাগার শূন্য হয়ে যাচ্ছে। তাই ভাবছে মহার্ঘভাতা বন্ধ করার কথা, অবসরের বয়স কমানোর কথা। আর পেনশন? তাও অনিশ্চিত!

● **গণশক্তি**

(ধ) পথে প্রবাসের সেই পর্যটক অন্নদাশঙ্করের পথ চলা শেষ

স্টাফ রিপোর্টার : বিদায় নিলেন অন্নদাশঙ্কর রায়।

বয়স হয়েছিল ৯৯ বছর। বার্ধক্যজনিত অসুখে বেশ কিছু দিন ধরে ভুগছিলেন তিনি। গত ৮ অগস্ট তাঁকে ভর্তি করা হয়েছিল এস এস কে এম হাসপাতালে। চার দিন আগে শ্বাসনালিতে সংক্রমণ ঘটায় তাঁকে ইনটেনসিভ ট্রিটমেণ্ট ইউনিটে স্থানান্তরিত করা হয়। সোমবার বিকেল ৩টে ৫০ মিনিট নাগাদ সেখানেই শেষ নিঃশ্বাস ফেলেন তিনি।

জীবনের প্রথম ভাগ কাটিয়েছেন ওড়িশার ঢেঙ্কানলে। পিতা নিমাইচরণ রায়, মা হেমনলিনী দেবী। ১৯২১ সালে ঢেঙ্কানল হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিকুলেশন পাশ করেন। বি এ পাশ করেন ১৯২৫-এ। ১৯২৭ সালে আই সি এস পরীক্ষায় প্রথম হন। পরবর্তী কালে পড়াশুনা করেন লন্ডন স্কুল অব ইকনমিক্স এবং লন্ডন স্কুল অব ওরিয়েন্টাল স্টাডিস-এ। কর্মজীবনের গোড়ার দিকে অবিভক্ত বাংলার বিভিন্ন জেলার জেলাশাসক ছিলেন। ১৯৫০ সালে পশ্চিমবঙ্গের জুডিশিয়াল সেক্রেটারি ছিলেন তিনি। ১৯৩০ সালে মার্কিন কন্যা অ্যালিস ভার্জিনিয়া অনডোর্ফকে বিবাহ করে নতুন নাম দেন লীলা রায়।

কোন ভাষায় গড়বেন সাহিত্যজীবন? বাংলা না ওড়িয়া? জীবনের একটা সময়ে বস্তুত এ রকমই একটা দ্বন্দ্বে পড়তে হয়েছিল অন্নদাশঙ্করকে। দু'টো ভাষাই জলের মতো বইত তাঁর কলমে। ১৯২৭ সাল থেকে প্রকাশিত ভ্রমণকাহিনী 'পথে প্রবাসে' দিয়ে বাংলা সাহিত্যের মাটিতে তাঁর পা জমানো। তার পর? অন্নদাশঙ্কর রায় মানে কারোও কাছে 'তেলের শিশি ভাঙল বলে'র মতো 'আপ্তবাক্য' লেখা

ছড়াকার। কারও কাছে 'পথে প্রবাসে'র অসাধারণ পর্যটক। কারও কাছে মানবতাবাদী, ধর্ম নিরপেক্ষ এক চরিত্র। কারও কাছে 'ঋজুরেখ প্রবন্ধ আর লঘুভার ছড়ার মধ্য দিয়ে প্রগাঢ় মানববাদের দিশারী।' তবে তাঁর সম্পর্কে সর্বজনগ্রাহ্য মত—অন্নদাশঙ্কর রায় মানেই স্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গি এবং যুক্তিবাদী অবস্থান। এবং বার্ধক্যের আক্রমণে কেঁপে যাওয়া জীবনের শেষ দিনগুলির মধ্যেও লিখে যাওয়ার অক্লান্ত ইচ্ছে।

৮ অগস্ট এস এস কে এমে ভর্তি হওয়ার পরেও বারো লাইনের একটা ছড়া লিখেছেন—'ঐরাবত'। লিখতে শুরু করেছিলেন চার পাতার—ছেলেবেলার স্মৃতি। আশির দশকে নৈতিকতা, অহিংসা আর সামাজিক সাম্য নিয়ে নিজের সোজাসাপ্টা ভাষায় লিখেছিলেন উপন্যাস—'ক্রান্তদর্শী'। লেখার পরে খুঁতখুঁত। যা বলতে চেয়েছিলেন, বলা হয়নি। তাই তিন বছর আগে লিখতে শুরু করেন 'পুনর্নবীকরণ।' চল্লিশ পাতা পর্যন্ত এগিয়েছিল। ছায়াসঙ্গী সুরজিৎ দাশগুপ্তকে ভার দিয়ে গিয়েছেন সমাপ্ত করতে। উৎসর্গ করতে বলে গিয়েছেন তসলিমা নাসরিনকে।

এই তসলিমা নাসরিনকে নিয়েই যখন বাংলাদেশে মৌলাবাদীদের গলা সপ্তমে উঠেছে তখনও রুখে দাঁড়িয়েছিলেন ব্যক্তিগত ভাবে। তসলিমাকে বাংলাদেশ থেকে নিরাপদে সরিয়ে আনায় তাঁর ভূমিকা জানেন অনেকেই। মৌলবাদ এবং বাদীদের বিরোধী ছিলেন আজীবন। তাই '৯২ সালে বাবরি মসজিদ ভাঙার ঘটনাকে সভ্যতাবিরোধী বলতে দ্বিধায় পড়েননি। অন্নদাশঙ্করের লেখা 'অনুপ্রবেশ' পড়ে ক্ষেপে উঠেছিল হিন্দু মৌলবাদীরা।

মানুষটিকে যাঁরা কাছ থেকে দেখেছেন তাঁদের দাবি, সহজ অথচ দৃঢ় যে সমাজচেতনায় অন্নদাশঙ্করের বিশ্বাস ছিল, সে পথে ভবিষ্যতে হাঁটার লোক খুব কম। কবি শঙ্খ ঘোষের কথায়, ''সমাজজীবনের যে কোনও সঙ্কটের সময়ে পথ নির্দেশ চাওয়ার জন্য একটা সময় সকলের মনে পড়ত রবীন্দ্রনাথের নাম। গত প্রায় ৪০ বছর ধরে সে রকম সঙ্কট মুহূর্তে আমরা তাকিয়ে থেকেছি অন্নদাশঙ্কর রায়ের দিকে। তিনি আর রইলেন না। তাঁর অভাব এখন সকলেই আমরা বোধ করব।'' কবি সুভাষ মুখোপাধ্যায়ের প্রতিক্রিয়া, ''অন্নদাশঙ্কর ছিলেন দুই বাংলার মাথার ওপর অদ্বিতীয় অভিভাবক। তাঁকে হারিয়ে আমরা অসহায় বোধ করছি। ভাষা ও সাহিত্যের সীমানারও বাইরে তাঁর ভাবনা অন্ধকারে আমাদের পথ দেখাক।''

এ দিন তাঁর মৃত্যু সংবাদে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্যের আক্ষেপ, ''বিজয়ার পরেও আমায় চিঠি লিখেছিলেন। হাসপাতালে চিকিৎসার ব্যবস্থা করার ধন্যবাদ দিতে। লিখেছিলেন আস্তে আস্তে সুস্থ হয়ে উঠছি।''

● **আনন্দবাজার পত্রিকা**

১২১.৫ সারাংশ

সাংবাদিকতার প্রকাশ ঘটে যেমন সংবাদপত্র-বেতার-দূরদর্শন-নিউজ এজেন্সি ইত্যাদিতে তেমনি সাংবাদিকের রচনাটিতে ধরা পড়ে বিভিন্ন সাংবাদিক-সংরূপ বা জার্নালিস্টিক জেন্‌র। বিষয় ও লক্ষ্যসাধনের সম্মিলনে ঠিক হয়ে যায় সাংবাদিক কোন্ সংরূপটি গ্রহণ করবেন। অর্থাৎ কী, কীসের জন্য ও কীভাবে—এই তিনটি প্রশ্নের উত্তর থেকে নির্বাচিত করে নিতে হয় জেন্‌রটি। নিউজ-আইটেম, আর্টিক্‌ল্, কমেন্ট্রি, রিপোর্ট, রিপোর্তাজ, অবিচুঅরি, ইন্টারভ্যু, পোর্ট্রেট, ডিসকাশন, রেভ্যু, গ্লস, টেলপিস, কলাম ইত্যাদি প্রত্যেকটি সংরূপের চেহারা আলাদা, রচনারীতি স্বতন্ত্র, মেজাজ ও মর্জি ভিন্ন।

তাছাড়াও রয়েছে হেডলাইন বা শিরোনাম দেবার নানা পদ্ধতি। শিরোনাম খুবই গুরুত্বপূর্ণ।

১২১.৬ অনুশীলনী

ক. ছোট প্রশ্ন [প্রতিটি প্রশ্নের মান ১ নম্বর। একটি মাত্র বাক্যে উত্তর দিতে হবে।]

১। প্রতিবেদন পরিভাষাটি কোন্ ইংরেজি শব্দের প্রতিশব্দ?

২। Report শব্দটির মূল লাতিন শব্দটি কী?

৩। প্রতিবেদন শব্দটি কীভাবে রবীন্দ্রনাথ বাক্যে ব্যবহার করেছেন তার একটি উদাহরণ দিন।

৪। Report-কে বাংলায় কী বলে?

৫। প্রতিবেদক শব্দের অর্থ কী?

৬। মানুষের প্রধান ও সর্বপ্রথম চাহিদা কী?

খ. মাঝারি প্রশ্ন [প্রতিটি প্রশ্নের মান ৫ নম্বর। পাঁচ-ছ'টি বাক্যে উত্তর দিতে হবে।]

১। একজন ভালো প্রতিবেদকের মধ্যে কী কী বিশেষত্ব লক্ষ্য করা যায়?—পাঁচ-ছ'টি বাক্যে লিখুন।

২। প্রতিবেদকের কর্মপদ্ধতির বিভিন্ন স্তরের উল্লেখ করে পাঁচটি বাক্য লিখুন।

৩। প্রতিবেদনে কোন্ কোন্ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়, তা পাঁচটি বাক্যে উল্লেখ করুন।

৪। জুলিয়াস ফুসিকের দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণে রিপোর্তাজ ও রিপোর্টের পার্থক্য চার-পাঁচটি বাক্যে লিখুন।

৫। প্রতিবেদন রচনার সময়ে প্রতিবেদককে মনে মনে কোন্ কোন্ প্রশ্ন ও তার উত্তর কল্পনা করে নিতে হয়?

গ. বড় প্রশ্ন [প্রতিটি প্রশ্নের মান ১০ নম্বর। উত্তর দিতে হবে দশ-বারোটি বাক্যের মধ্যে।]

১। প্রতিবেদন লিখতে বসে প্রতিবেদককে কী কী বিষয়ে সতর্ক থাকতে হয় তা দশ-বারোটি বাক্যে উল্লেখ করুন।

২। নিম্নলিখিত শিরোনাম ব্যবহার করে দশ-বারোটি বাক্যে সংবাদপত্রে প্রকাশের উপযোগী প্রতিবেদন রচনা করুন—

- বেশি রোগীর চাপে হাসপাতালে শিশুমৃত্যু
- পেনশন পেতে শিক্ষকদের হয়রানি
- আন্ত্রিক ছড়াচ্ছে কলকাতায়
- পকেটমার ধৃত
- দুটি বাসে মুখোমুখি সংঘর্ষ, মৃত দশ
- পুলিশের সততা

১২১.৭ গ্রন্থপঞ্জি

১। Franz Faber : *Methodic of Journalistic Work.*

২। R. K. Chatterjee : *Mass Communication.*

৩। Mohit Moitra : *A History of Indian Journalism.*

৪। Harold Frayaman, David Griffiths & Chris Chippindale : *Into Print.*

৫। Yuri Kashlev : *The Mass Media and International Relations.*

একক ১২২ ❑ মাধ্যম বৈচিত্র্য ও প্রতিবেদনের রকমফের

গঠন

১২২.১ উদ্দেশ্য

১২২.২ প্রস্তাবনা

১২২.৩ মূলপাঠ

১২২.৪ প্রতিবেদনের নমুনা

১২২.৫ সারাংশ

১২২.৬ অনুশীলনী

১২২.৭ গ্রন্থপঞ্জি

১২২.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি পড়ার পর আপনি নিচের সামর্থ্যগুলি অর্জন করবেন, এককটি উপস্থাপনার এটাই উদ্দেশ্য—

- মাধ্যম স্বাতন্ত্র্যে প্রতিবেদনের পার্থক্য কীরকম হয় তা আপনি বুঝতে পারবেন।
- নিউজ এজেন্সিতে প্রতিবেদকের ভূমিকা কী তা আপনি জানতে পারবেন।
- নিউজ এজেন্সিতে কীভাবে সংবাদ এসে পৌঁছোয় সে সম্পর্কে একটি প্রাথমিক ধারণা গড়ে উঠবে।
- রেডিও-য় প্রতিবেদন কীভাবে উপস্থাপিত হয়, তা ক'ভাগে ভাগ করা যায় সে বিষয়ে আপনি জানতে পারবেন।
- টি. ভি.-র জন্য কীভাবে প্রতিবেদন তৈরি করতে হয় সে-বিষয়ে আপনি গড়ে নিতে পারবেন একটি স্বচ্ছ ধারণা।
- সংবাদপত্রের উপযোগী প্রতিবেদনের সঙ্গে দূরদর্শনে সম্প্রচারার্থে তৈরি প্রতিবেদনের পার্থক্যটি বুঝতে পারবেন।

- আনুষ্ঠানিক ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিবেদন বলতে কী বোঝায় তা জানা যাবে এখানে।
- কোনো প্রতিষ্ঠানের সচিব, সংগঠনের সম্পাদক হিসাবে কীভাবে প্রতিবেদন তৈরি করতে হয় তা আপনি বুঝতে পারবেন।
- প্রতিবেদনের বিভিন্ন ধরন সম্পর্কে আপনি কিছু কিছু ধারণা তৈরি করে নিতে পারবেন।

১২২.২ প্রস্তাবনা

এটা আজ আর অস্বীকার করা যায় না যে, মানবসভ্যতা নিরন্তর এগিয়ে চলেছে সামনের দিকে। উদ্বেগ, উৎকণ্ঠাকে সঙ্গে নিয়েই ঘটেছে তার ক্রমিক উন্নয়ন। চলছে অবিরত দখলের লড়াই, ক্ষমতা সম্প্রসারণের মরিয়া প্রয়াস। তৈরি হচ্ছে জটিলতর পরিস্থিতি। আর সব ক্ষেত্রেই দেখা যাচ্ছে যোগাযোগ ব্যবস্থার সক্রিয়তা, গণমাধ্যমগুলির বিশাল ভূমিকা। বস্তুত কারিগরি ও বিজ্ঞানের জগতে নিত্য-নতুন উদ্ভাবন পাল্টে দিচ্ছে বিশ্বব্যাপী সমাজ-ব্যবস্থাকে। বড্ড দ্রুত লয়ে ঘটে যাচ্ছে পরিবর্তন। আন্তর্জাতিক রাজনীতিতেও প্রভাব বিস্তার করছে যোগাযোগ ব্যবস্থা, গণমাধ্যম।

ঘটছে চিন্তার বিস্ফোরণ। বদলে যাচ্ছে ভাষা, সমাজ, বিশ্বব্যবস্থা। আর সেই ব্যবস্থায় প্রচলিত ভাষা কোনভাবেই প্রতিবন্ধক নয়। কেননা বিশ্ব জুড়ে কারিগরি ও বিজ্ঞানের জগতে নতুন ভাষার আমদানি হয়ে গিয়েছে।

একথা ঠিক যে বিশ্বজুড়ে প্রচলিত ভাষার সংখ্যা প্রায় ৩,৫০০ হলেও তার মধ্যে কম-বেশি ৫০০টি ভাষার রয়েছে লিপি-বৈচিত্র্য। এর মধ্যেও আবার ২০০টি লিখন-শৈলী ঐতিহ্যের অধিকারী। ১০০টি ভাষার তো কোনো বর্ণমালাই নেই। কোনো কোনো অঞ্চলে, দেশে-দেশে প্রচলিত মৌখিক ভাষার সংখ্যাধিক্য কম সমস্যা তৈরি করেনি। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, কেবলমাত্র আফ্রিকাতেই প্রচলিত হয়েছে ১,২০০টি মৌখিক ভাষা। আমাদের দেশেও সরকারি ও শিক্ষার মাধ্যম হিসাবে স্বীকৃত শিষ্ট ভাষার চেয়ে ১০০ গুণ বেশি রয়েছে আঞ্চলিক ভাষা ও বুলি—যাতে সাধারণ মানুষ কথা বলে থাকেন। ভারতে প্রচলিত এরকম ভাষার সংখ্যা কম করেও ১,৬৫০; সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নে এর সংখ্যা ছিল ৮৯; ঘানায় ৫৬ এবং মেক্সিকান ইন্ডিয়ানদের মধ্যে ২০০ রকমের ভাষা অর্থাৎ আঞ্চলিক ভাষা ও বুলি বিদ্যমান।

তবে ভাষার এই সংখ্যাধিক্য, ব্যাপকতা, জটিলতা, বিচিত্রতা গণমাধ্যমের প্রসারে কোনো রাশ টেনে ধরেনি। বরং ছবির ভাষা আন্তর্জাতিক, অভিনয়ের মুদ্রা সর্বজনীন, সংগীতের আবেদন চিরন্তন।

তাই সংবাদপত্র যেখানে নাক গলাতে পারেনি সেখানে দূরদর্শন, বেতারের অনুপ্রবেশ ঘটেছে সহজেই। আবার দূরদর্শন, বেতার ইত্যাদিতে পুরনো তথ্য খুঁজে পাওয়া যখন শ্রমসাধ্য তখন সাক্ষরদের কাছে সংবাদপত্রের ছাপানো তথ্য থেকে যায় হাতের মুঠোয়।

সব মিলিয়ে গণমাধ্যমগুলিই মেটায় মানুষের সংবাদক্ষুধা, গড়ে তোলে বিশ্ববোধ। এক্ষেত্রে সংবাদপত্রের পাশাপাশি অন্যান্য মাধ্যমগুলির প্রতিবেদন পালন করে এক সদর্থক সৃজনশীল ভূমিকা। সেই অন্যান্য মাধ্যমের প্রতিবেদন রচনার স্বাতন্ত্র্যদীপিত অবদানটি এখানে আলোচিত। পাশাপাশি দেখানো হয়েছে ব্যবহারিক জীবনে, প্রচলিত শিক্ষাব্যবস্থার জেরে কীভাবে তৈরি করতে হয় আনুষ্ঠানিক ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিবেদন।

১২২.৩ মূলপাঠ

সংবাদপত্রের জন্য কীভাবে রিপোর্ট বা প্রতিবেদন তৈরি করতে হয় তার পদ্ধতি ও কৌশল আপনি নিশ্চয়ই এর মধ্যে আয়ত্ত করে ফেলেছেন। কিন্তু টি.ভি, রেডিও-র জন্য কীভাবে প্রতিবেদন রচনা করবেন সেটা হয়তো এখনও রপ্ত করে উঠতে পারেন নি। আসলে পার্থক্যটা খুব বিরাট নয়। মূল পদ্ধতি একই। তবে যেহেতু মাধ্যম স্বতন্ত্র তাই কিছুটা পার্থক্য থেকেই যায়। তাছাড়া সময়ের ব্যাপারটাও বেশ বড়ো, গুরুত্বপূর্ণ। সংবাদপত্রের পাঠক ইচ্ছে করলে রয়ে-সয়ে খবরটি মনে মনে পড়ে নিতে পারেন। সেখানে কোনও তাড়াহুড়ো নেই। কিন্তু দূরদর্শন, আকাশবাণীর ক্ষেত্রে সেটি হবার জো নেই। সেখানে সময় সংক্ষিপ্ত এবং নির্দিষ্ট। যত কম কথা খরচ করে যত বেশি সংখ্যক সংবাদ ধরানো যাবে ততই দর্শক বা শ্রোতার চাহিদা পূরণ হবে। কাজে কাজেই রেডিও বা টিভির জন্য যখন প্রতিবেদন তৈরি করবেন তখন সময়ের ব্যাপারটাকে অগ্রাধিকার দেবেন।

সত্যি কথা বলতে কী, সংবাদপত্রে আপনি নিজেই যেমন ছাপানো খবরগুলো মনে মনে পড়েন, বিশ্লেষণ করেন বা তর্ক-বিতর্ক জুড়ে দেন বন্ধুবান্ধব প্রিয়জনের সঙ্গে কোনো সংবাদ নিয়ে, সেরকম কোনো সুযোগ বা সময় আপনি পাবেন না টিভির সংবাদ নিয়ে আলোচনা করার। বেতারের ক্ষেত্রেও একই কথা প্রায় প্রযোজ্য। টিভিতে, রেডিওয় আপনি বিভিন্ন ঘটনার রিপোর্ট পান সরাসরি সংবাদপাঠকের মুখ থেকে। মনে রাখবেন, দূরদর্শনে প্রথম সংবাদ ও ছবি আসে নিউজরুম বা সংবাদকক্ষে। সেখানে থাকেন বার্তা সম্পাদক বা নিউজ এডিটর বা ভারপ্রাপ্ত কোন সংবাদিক-ব্যক্তিত্ব। নিউজ ও ছবি যা আসে সেগুলি তিন রকমের। তা হল, চলমান চিত্র, স্থির ছবি ও রিপোর্ট বা প্রতিবেদন বা সংবাদ-কাহিনী। নানাভাবে এইসব প্রতিবেদন ও ছবি আসে। টেলিপ্রিন্টার, ফ্যাক্স, ই-মেল, স্যাটেলাইট ইত্যাদিই সাধারণত

এসব খবর ও ছবির বাহন। ব্যাক্তিগতভাবে কেউ কেউ সংবাদ দিয়ে যান যেমন তেমনি দূরদর্শনের প্রতিবেদক, ক্যামেরাম্যানও ঘটনাস্থলে হাজির থেকে খবর, ঘটনা, ছবি তুলে আনেন। বিভিন্ন সংবাদ সরবরাহক প্রতিষ্ঠান বা নিউজ এজেন্সি (যেমন এপি, রয়টার্স, পিটিআই ইত্যাদি এবং অন্যান্য) গণমাধ্যমসহ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান অর্থাৎ হাসপাতাল-প্রশাসন-রাজনৈতিক দল বিভিন্ন রাষ্ট্রের দূতাবাস-শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান-পৌরসভা-ট্রেড ইউনিয়ন-বিভিন্ন গণসংগঠন ইত্যাদি সমাজের সর্বস্তরের প্রতিষ্ঠান থেকে খবর, চলমান চিত্র, স্থির ছবি সংগ্রহ করা হয়। একাজে যুক্ত থাকেন টিভি-রিপোর্টার, চিত্র-সাংবাদিকসহ স্ট্রিংগাররা। এই শেষোক্ত চিত্র-সাংবাদিকরা হলেন ফ্রি-লান্স। এঁরা অর্থের বিনিময়ে বিভিন্ন টি.ভি. চ্যানেল বা প্রতিষ্ঠানে ছবি বিক্রি করে থাকেন। এঁরা ছবি ও সংবাদের সংক্ষিপ্তসার ক্যাসেটে বন্দি করে বার্তা সম্পাদক বা সংবাদকক্ষের ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তিত্বের হাতে তুলে দেন। তারপর নানা জায়গা থেকে সংগৃহীত ও প্রাপ্ত সংবাদ এবং চিত্রসমূহ নির্বাচন, সম্পাদন করেন একজন প্রযোজক ও বার্তা-সম্পাদক যৌথভাবে। প্রয়োজন মাফিক গ্রাফিক্স আর্টিস্টও এ ব্যাপারে সাহায্য করেন। কেননা দৃশ্যনন্দনের ব্যাপারটাও টি.ভি.র পক্ষে জরুরি। সকলের সম্মিলিত প্রয়াসে শেষ পর্যন্ত প্রতিদিনই তৈরি হয় নির্বাচিত সংবাদ ও ছবির তালিকা।

নিউজ এজেন্সিতেও রয়েছে প্রতিবেদকের কাজ। সংবাদ সরবরাহ প্রতিষ্ঠানের কর্মযজ্ঞ বিশাল। সেই কর্মযজ্ঞে প্রতিবেদকের ভূমিকা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কেননা নিউজ এজেন্সির সংবাদের প্রধান সূত্র বা উৎসই হলেন প্রতিবেদকরা। নিচের রেখাচিত্রে দেখানো যাচ্ছে নিউজ এজেন্সির বহুবিচিত্রতর কাজের বহর, তাদের সংবাদপ্রাপ্তির সূত্র, উৎস ও গ্রাহক কারা তা।—

উৎস / সূত্র		**নিউজ এজেন্সি**		**গ্রাহক**
প্রতিবেদক	→		→	বহুল প্রচারিত দৈনিক পত্রিকা
সরকারি বুলেটিন ও সাংবাদিক সম্মেলন	→		→	রেডিও, টি.ভি. স্টেশন
স্থানীয় কন্ট্রিবিউটর	→		→	নানাবিধ কর্মযজ্ঞ বা নেটওয়ার্ক
বৈদেশিক সংবাদদাতা	→		→	স্থানীয় পত্রপত্রিকা
স্থানীয় পত্র-পত্রিকা	→		→	বিভিনন্ন দপ্তর, প্রতিষ্ঠান
অন্যান্য নিউজ এজেন্সি	→		→	পৌরসভা ও স্থানীয় প্রশাসন
রেডিও, টি.ভি. ইত্যাদি	→		→	অন্যান্য গণমাধ্যমের সংবাদদাতা

বলাইবাহুল্য, সংবাদপত্রের প্রতিবেদকের তুলনায় নিউজ এজেন্সির প্রতিবেদকের কাজ মোটামুটিভাবে একইরকম হলেও পার্থক্য রয়েছে রচনার সংহতি সাধনে। সংবাদপত্রের প্রতিবেদনে তবু খানিকটা

শিথিলতা চলতে পারে, কিন্তু নিউজ এজেন্সির প্রতিবেদনে সামান্যতম মেদ-ও কাঙ্খিত নয়। এখানে মিতকথনই কাম্য। ভাষা অবশ্য হবে চাবুকের মতো। অর্থাৎ নিউজ এজেন্সির প্রতিবেদনে কাম্য হল—

- তথ্যভিত্তিক উপস্থাপনা
- ভাবপ্রকাশে যথাসাধ্য সংহতিসাধন ও সংক্ষিপ্ততা
- বুদ্ধিমত্তা ও বিচক্ষণতার প্রতি জোর
- দ্রুততা অর্থাৎ খুব তাড়াতাড়ি প্রতিবেদন তৈরির সক্ষমতা
- প্রামাণিকতা
- নিজস্বতা
- প্রতিবেদনের গঠন হবে ওল্টানো পিরামিডের মতো।

নিউজ এজেন্সির প্রতিবেদনে বস্তুনিষ্ঠতাই সবচেয়ে বেশি কাম্য। এক্ষেত্রে প্রতিবেদক হিসাবে আপনি কিছু কিছু সমস্যায় পড়তেও পারেন কখনো-সখনো। বিশেষ করে বস্তুনিষ্ঠতা-ও পক্ষপাতশূন্যতা নিয়ে বরাবরই দেশে দেশে একটা বিতর্ক থেকে গেছে, যা সবসময়েই তাড়া করে ফেরে সাংবাদিককে। অথচ আজ পর্যন্ত এই বিতর্কের শেষ হয়নি, সুষ্ঠু সমাধানও রয়ে গেছে সুদূরপরাহত। 'পরিপূর্ণ নিরপেক্ষতা' বলে কোনো শব্দ হয় কিনা, তা নিয়েও রয়েছে সমাজবিজ্ঞানীদের মধ্যে বিতর্ক, যদিও ইংল্যান্ড, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের নিউজ এজেন্সিগুলো সম্পূর্ণ নিরপেক্ষতার কথা সোচ্চারে ঘোষণা করে। সমাজ যেখানে শ্রেণিবিভক্ত সেখানে সংবাদেও কি নিরপেক্ষতা বজায় রাখা সম্ভব? মনে রাখতে হবে, প্রত্যেকটি সংবাদেরই রয়েছে একটি সামাজিক মূল্য, সেক্ষেত্রে নিরপেক্ষতা শব্দটি অনেকের কাছে সোনার পাথর বাটি বলে মনে হয়। তবে প্রতিবেদনের শেষে বা মধ্যে যাতে প্রতিবেদক কোনভাবে নিজের কোন মন্তব্যের অনুপ্রবেশ না ঘটান—সে ব্যাপারে ব্রিটেন ও মার্কিন দেশের নিউজ এজেন্সিগুলো সজাগ থাকে। এমন কি, এ ব্যাপারে তাঁদের দিয়ে কড়ার করিয়েও নেন। তাঁদের মতে—

- প্রতিবেদন কেবল তথ্য প্রদান করবে;
- তথ্যের ওপর প্রতিবেদকের কোনো মন্তব্য করার অধিকার নেই;
- সংবাদ উপস্থাপনায় বস্তুনিষ্ঠতাই প্রথম ও শেষ কথা;
- প্রতিবেদন পাঠানোয় বা পরিবেশনে সবরকম পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শনই পরিত্যাজ্য;
- পক্ষে বা বিপক্ষে কোনো মনোভাবই যাতে প্রতিফলিত না হয় সেভাবেই বক্তাদের ভাষণ প্রতিবেদনে স্থান পাবে;

- বিতর্কিত কাহিনীও পাঠাতে হবে ভারসাম্য রক্ষা করে, পক্ষপাতিত্ব না দেখিয়ে;
- নিউজ এজেন্সির প্রতিবেদককে খেয়াল রাখতে হবে যে, এজেন্সি কোন কিছুর বিচারক নয়, নিছকই তথ্যসংগ্রাহক ও প্রেরক।
- কোন রাজনৈতিক দলের প্রতি দুর্বলতা প্রদর্শন প্রতিবেদকের কাছে অনভিপ্রেত, যদিও রাজনৈতিক সচেতনতা অপরিহার্য;
- বিভিন্ন দল, জনগোষ্ঠী, জাতির মধ্যে বিরোধ দেখা দিলেও প্রতিবেদক কোনও পক্ষ অবলম্বন করবেন না। নিউজ এজেন্সির প্রতিবেদক হিসাবে যদি আপনি সাফল্য পেতে চান তাহলে আপনার মধ্যে যে-যে বৈশিষ্ট্য থাকবে বলে আশা করা যায় সেগুলো হল—
- প্রথাগত ও অভিজ্ঞতাসঞ্জাত ব্যাপক ও গভীর শিক্ষা ও জ্ঞান;
- রাজনৈতিক চেতনাবোধ-এ সজাগ মানসিকতা;
- বাস্তবকে সম্যক উপলব্ধি করেই সত্য বলার নির্ভীকতা;
- যাবতীয় প্রতিকূল পরিস্থিতির মধ্যেও সত্য ও প্রাগসরতার পক্ষে দাঁড়ানোর মতো সাহস;
- কিছু অর্থ উপার্জন নয়, বরং জনস্বার্থেই নিজেকে নিযুক্ত রাখা অর্থাৎ থাকবে সাংবাদিকের অঙ্গীকার;
- দায়িত্ববোধ ও সময় সচেতনতা;
- পর্যবেক্ষণক্ষমতা;
- ভালোভাবে কথা বলা ও দ্রুত লিখবার দক্ষতা।

পাশাপাশি প্রতিবেদক হিসাবে নিজেকে সবসময় প্রস্তুত রাখবেন যে-কোনো জায়গায় যাবার জন্য, যে-কোনো পরিস্থিতিতে নিজেকে মানিয়ে নেবার জন্য থাকবেন মানসিকভাবে তৈরি। এটা তো ভুলে গেলে চলে না যে, প্রতিবেদন রচনা নিছক কোন জিনিস দেখা ও তার নীরস বর্ণনা নয়, আরো অনেক কিছু বেশি। সাংবাদিক হিসাবে আপনিও সমাজবদলের, সময়বদলের, ভাবনাবদলের একজন শরিক। আপনার অঙ্গীকার সময়ের কাছে, সমাজের কাছে, সাংবাদিকতার সত্যনিষ্ঠতার কাছে। এর জন্য আপনাকে নিতে হতে পারে দীর্ঘ প্রস্তুতি। চলতে হবে আপনাকে পরিকল্পনামাফিক।

তা করতে গেলে প্রথমেই নিজের জ্ঞানভান্ডারটিকে সচল, সমৃদ্ধ ও আধুনিকতম তথ্যে ভরাট করে রাখবেন। যে-কোন ঘটনার প্রেক্ষাপট বিশদভাবে জানা দরকার। যে বিষয়ে প্রতিবেদন তৈরি করতে আপনি নির্দেশিত হবেন সে-বিষয়ে সম্ভাব্য যাবতীয় তথ্য চটপট জোগাড় করে মনে মনে প্রস্তুতি নিয়ে

নেবেন। অবশ্য এসব সংবাদপত্রের জন্য প্রতিবেদন রচনার সঙ্গে নিউজ এজেন্সির জন্য প্রতিবেদন রচনার বিশেষ কোনো মৌলিক পার্থক্য নেই। তা সত্ত্বেও নিউজ এজেন্সির জন্য প্রতিবেদন তৈরির সময় আপনি একে একে যে ধাপগুলো অতিক্রম করবেন, বা করলে ভালো হয়, তার উল্লেখ করা গেল।—

[প্রতিবেদন রচনার স্তরবিন্যাস

দ্রুত কাজ করা অবশ্য কর্তব্য]

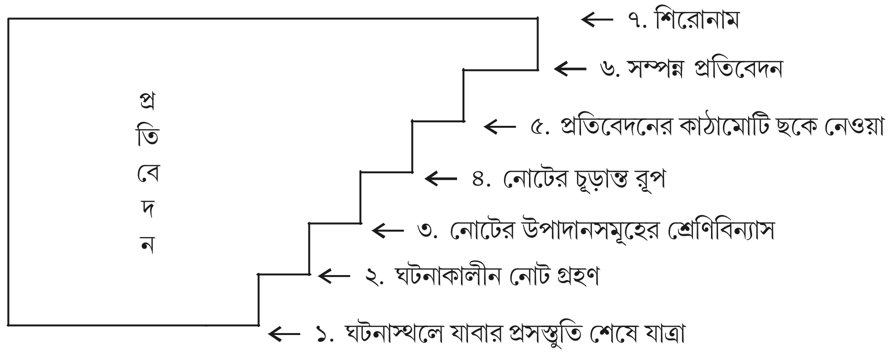

নিউজ এজেন্সির প্রতিবেদকের কাজ, তার পদ্ধতি বিষয়ে সংক্ষেপে যা না-বললেই নয়, তারই উল্লেখ করা হল। আশা করি, ব্যাপারটা অনুধাবন করতে অসুবিধে হবে না। প্রসঙ্গত নিউজ এজেন্সিতে কীভাবে সংবাদ আসে বা সংবাদের উপকরণ জোগাড় করা হয় তা একটি চিত্রের সাহায্যে দেখানো যাক।

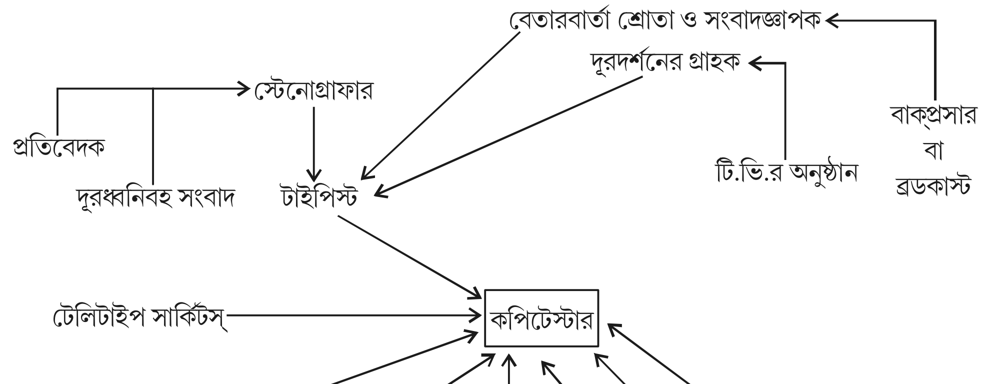

এখন আমরা দৃষ্টি ফেরাতে পারি বেতারকেন্দ্রের দিকে। রেডিও-য় রিপোর্টারের কাজ যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ। তাই বেতার-প্রতিবেদকদের কাজের ধারার পরিচয় জানা জরুরি বলেই বিবেচিত হয়।

একথা আজ আর বলার অপেক্ষা রাখে না যে, সমকালীনতা, প্রাসঙ্গিকতা, গতিময়তা ও নমনীয়তার দিক থেকে খুবই কার্যকর ও প্রভাববিস্তারী গণমাধ্যম হল রেডিও বা বেতার। আকাশবাণীর সহযোগিতাতেই সাংবাদিকতার বিষয় (যেমন সংবাদ, খবরকে ঘিরে আলোচনা, সমাজজীবনের একেবারে হালফিলের সমস্যা ইত্যাদি) ও শৈল্পিক অনুষ্ঠানগুলি শ্রোতাদের মধ্যে দ্রুত প্রচার লাভ করে। রাষ্ট্রীয় সীমানাকে অতিক্রম করে বহু দূরবর্তী অঞ্চলের জনগণের ভিতর পৌঁছে যায় বেতারের অনুষ্ঠান। এভাবেই বি.বি.সি.র প্রচারিত খবর যেমন আমরা শুনতে পাই ভারতবর্ষে তেমনি চিনের, জার্মানির, জাপানের, ইউ.এস.এ.-র সম্প্রচারিত সংবাদ পাই নির্দিষ্ট সময়ে। অবশ্যই এর পিছনে কাজ করে বেতারকেন্দ্রের ট্রান্সমিটারের ক্ষমতার মতো কারিগরি ও বস্তুগত উপকরণের উৎকর্ষ।

সংবাদপত্রের মতো রেডিও-ও এক ধরনের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠান। তাকে প্রায় সময়েই ব্যবহৃত হতে দেখা যায় দেশের শাসন-ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত ব্যক্তি বা দলের প্রচার কার্যের ভূমিকায় এবং তাঁরাও একে ব্যবহার করেন জনগণকে শিক্ষিত করে তুলতে, শাসকদলের আদর্শের দিকে টেনে নিতে, তাঁদের কাছে খবরাখবর পৌঁছে দিতে এবং সংগঠিত করতে। সঙ্গত কারণেই নিজের ক্ষমতার মধ্যে থেকেই বেতার-সাংবাদিককেও সততা ও তৎপরতার সঙ্গে তৎকাল-ঘটনাকে সম্প্রসারিত করতে হয়।

আকাশবাণীর শ্রোতাদের কাছে নিউজ আইটেমের পরেই অত্যন্ত প্রিয় বিষয় হল প্রতিবেদন। এর বিষয়-পরিধি বিস্তৃততর। ঘটমান বা সবেমাত্র ঘটে গিয়েছে এমন বিশাল আন্তর্জাতিক সম্মেলন থেকে শুরু করে ফুটবল ম্যাচ পর্যন্ত প্রতিবেদনে জায়গা করে নিতে পারে। ঘটনার প্রাণবন্ত উপস্থাপনার আনুকূল্যে বেতার-প্রতিবেদক রেডিওর শ্রোতাদের আকৃষ্ট করেন। সংবাদপত্রের মতো বেতারেও প্রধানত দু'ধরনের প্রতিবেদন সম্প্রচারিত হয়। তা হল—

- বিষয়-সম্পর্কিত প্রতিবেদন, এবং
- অভিজ্ঞতা-কেন্দ্রিক প্রতিবেদন।

এই দুধরনের প্রতিবেদনেই বর্ণনামূলক শব্দের সমবায়ে ঘটে বা ঘটতে পারে নিপুণ ও নিখুঁত উপস্থাপনা। তবে সংবাদপত্রের পাঠক যেমন একই খবর বারবার পড়বার সুযোগ পান মুদ্রিত থাকার দৌলতে, বেতারের শ্রোতা সেরকম কোনো সুযোগ পান না। একবার শুনেই রেডিও-র শ্রোতাকে চটপট বুঝে নিতে হয় সমগ্র ঘটনা বা সংবাদের সারবস্তু। এসব কথা মাথায় রেখেই রেডিও-র রিপোর্টারকে তাঁর প্রতিবেদনে প্রথমেই নির্বাচিত শব্দগুচ্ছের সাহায্যে জানিয়ে দিতে হয় তাঁর রচিত প্রতিবেদনের বিষয়বস্তু কী। এজন্য প্রতিবেদককে অনেক অনুশীলন করতে হয়। তাঁকে বের করে নিতে হয় কোন্ কৌশল বা পন্থা অবলম্বন করলে সরাসরি শ্রোতার মনে গেঁথে যাবে তাঁর প্রতিবেদনের মর্মবাণী। এজন্য

চারটি প্রশ্নের মুখোমুখি নিজেকে দাঁড় করিয়ে প্রতিবেদক তাঁর প্রতিবেদন রচনা শুরু করতে পারেন। প্রশ্নগুলি হল—

- কী
- কেন
- কীভাবে
- কোন্ উদ্দেশ্য সাধনে আমাকে রিপোর্ট করতে হচ্ছে?

বলাই বাহুল্য, আমাদের চারপাশে প্রতিদিন যা যা ঘটছে সেই সব ঘটনার অধিকাংশই কিন্তু প্রতিবেদনে জায়গা পাবার যোগ্য নয়। বেতার-প্রতিবেদনে স্থান করে নেবে কেবল গুরুত্বপূর্ণ বিশেষ বিশেষ ঘটনা। তার ভিতর থেকে শ্রোতারা পাবেন অতিরিক্ত তথ্য, আনুষঙ্গিকতা, যুক্তি এবং পশ্চাৎপটের উপাদানসমূহ। প্রতিবেদন লিখতে হয় খুব দ্রুততার সঙ্গে। কেননা বেতারের শ্রোতারা আশা করেন যে তাঁদের বেতারকেন্দ্রই সবার আগে ঘটনাটা কভার করেছে। স্বাভাবিকভাবেই সাংবাদিককে মুহূর্তের মধ্যেই জ্ঞানের প্রয়োগ ঘটিয়ে ঘটনার মূল্যয়ন সেরে ফেলতে হয় এবং কালক্ষেপ না করেই কাহিনী লিখে ফেলতে হয়।

বিষয়সম্পর্কিত প্রতিবেদনে ঘটনাটি যেমন ঘটছে বা ঘটেছে সেরকমই থাকবে। এক্ষেত্রে মূলতঃ নির্ভর করতে হয় টেলিপ্রিন্টেড সংবাদ, রাজনৈতিক বিবৃতি, হ্যাণ্ডবুক, মুদ্রিত প্রচারপত্র, সরকারি পরিসংখ্যান ইত্যাদি ছাপানো উপাদানের ওপর। এর মধ্য থেকেই সাংবাদিককে বেছে নিতে হবে তাঁর প্রতিবেদন রচনার পক্ষে একান্ত অপরিহার্য তথ্য কোন্‌টি এবং সেটিকেই তিনি বিশদ বর্ণনা করবেন বাস্তবকে বিকৃত না করে। তারপর শ্রোতাদের কৌতূহল মেটানোর জন্য তাঁকে ভেবে দেখতে হবে কীভাবে প্রতিবেদনটি উপস্থাপিত করলে সেটি হবে অধিকতর আকর্ষণীয় ও বর্ণময়। বেতারে সম্প্রচারের নিমিত্ত প্রতিবেদনে পরিসংখ্যানের আধিক্য অনভিপ্রেত। বরং সংখ্যাতত্ত্বের কচকচানি বাদ দিয়ে নতুন কোনও তথ্য দেওয়া যায় কিনা, সেদিকেই প্রতিবেদকের নজর দেওয়া ভালো।

অন্যদিকে, ঘটনাস্থল থেকে সংবাদদাতা পাঠান অভিজ্ঞতাভিত্তিক প্রতিবেদন। ঘটনার তিনি প্রত্যক্ষদ্রষ্টা। সেই দিক থেকে প্রতিবেদক তাঁর নিজের দৃষ্টিভঙ্গিতে, অভিজ্ঞতার কষ্টিপাথরে ঘটনার মূল্যায়ন করতে পারেন। ঘটনাস্থল থেকে প্রতিবেদক ঘটনার নিখুঁত বিবরণ দিতে পারেন, সঙ্গে যোগ করতে পারেন তার প্রেক্ষাপট এবং দুইয়ে মিলে বিষয়টিকে দিতে পারেন শৈল্পিক মাত্রা প্রাণের ছোঁয়া। এই অভিজ্ঞতাভিত্তিক প্রতিবেদন বেতারকেন্দ্রে পৌঁছায় সাধারণত—

- দূরভাষের মাধ্যমে,
- স্থানীয় বা বিদেশি বেতারকেন্দ্র থেকে,
- চলমান প্রেরক যন্ত্র থেকে,
- টেপ অথবা উপযুক্ত সম্প্রচার যন্ত্র থেকে।

পরিশেষে যা না বললেই নয়, তা হল, শ্রোতাদের মনোযোগ ধরে রাখার তাগিদে বেতারের প্রতিবেদন হবে অবশ্যই সংক্ষিপ্ত। ভাষা হবে প্রাঞ্জল, সর্বজনবোধ্য ও শৈল্পিক।

মোটামুটি আপনি একটা ধারণা গড়ে নিতে পেরেছেন কীভাবে গণমাধ্যমের উপযোগী প্রতিবেদন তৈরি করতে হয়। এটাও আপনার জানা হয়ে গিয়েছে, গণমাধ্যমের চরিত্র, তার গ্রাহকদের বৈশিষ্ট্য অনুযায়ী প্রতিবেদন-ও হয় বিভিন্ন ধরনের। কাদের জন্য এই প্রতিবেদন, কীসের মাধ্যমে তা প্রচারিত হবে, কোন উদ্দেশ্য আপনি সাধন করছেন তার ওপরেই অন্যতম প্রধান সাংবাদিক-সংরূপ প্রতিবেদন রচনার পদ্ধতি, তার স্তরবিন্যাস ইত্যাদি নির্ভর করে। মাধ্যমের স্বাতন্ত্রে প্রতিবেদনের চরিত্রের পার্থক্যটা কীরকম হয়, এবার তারই খানিকটা নমুনা আপনি এখানে পাবেন।

সংবাদপত্রের উপযোগী প্রতিবেদন তৈরির তুলনায় রেডিও-টি.ভি.-র রিপোর্ট রচনার ধরন আলাদা। এখানে ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠানের আগে বিশেষণ ব্যবহারের বিশেষ চল নেই। প্রত্যক্ষ উক্তিও বর্জন করা হয়। সাধারণভাবে উত্তম পুরুষে অর্থাৎ বক্তা-পুরুষে তৈরি করতে নেই টি.ভি, বেতারের প্রতিবেদন। 'আমি', 'আমি' বা 'আমার', 'আমার'-র জবানিতে প্রতিবেদন বৈদ্যুতিন গণমাধ্যমে সম্প্রচার না-করাটাই রেওয়াজ হয়ে দাঁড়িয়েছে। এছাড়া সংবাদপত্রে যতটা বিস্তারিত হয় কিংবা নিউজ এজেন্সির প্রতিবেদক যতখানি জায়গা জুড়ে প্রতিবেদন পাঠাতে পারেন তার গ্রাহকদের কাছে টি.ভি. বা রেডিও-র প্রতিবেদন তত বড়ো, বিস্তারিত হয় না। সময়ের সংক্ষিপ্ততা এক্ষেত্রে বড়ো বাধা। তাছাড়া শ্রবণেন্দ্রিয়েরও একনাগাড়ে শুনবার ক্ষমতা, মনে রাখবার সামর্থ্য বিবেচনা করতে হয়।

দৃষ্টান্ত হিসাবে নিচের প্রতিবেদনগুলি লক্ষ্য করুন। প্রথমে দেওয়া হল সংবাদপত্রের প্রতিবেদন, আর ঠিক তার পরেই তুলে ধরা গেল দূরদর্শনে সম্প্রচারের উপযোগী প্রতিবেদন। কখনও কখনও আবার দূরদর্শনের উপযোগী প্রতিবেদনের চেয়ে আকাশবাণীর প্রতিবেদন সংক্ষিপ্ত হয়। এর কারণ, দূরদর্শনের গ্রাহকেরা তো শুধু শ্রোতা নন, দর্শকও, কিন্তু আকাশবাণীর গ্রাহকেরা নিছকই শ্রোতা। চোখে দেখা ছবির মধ্যে খানিকটা চোখের আরাম পাওয়া যায়, রিলিফ বা স্বস্তি পাওয়া যায়, কিন্তু আকাশবাণী তথা রেডিও-র প্রতিবেদনে সেই সুযোগ পাওয়া যায় না বললেই চলে।

১২২.৪ প্রতিবেদনের নমুনা

(ক) রাজ্যের নীতিই মানল গোটা দল, দাবি বুদ্ধের

২৩ মার্চ : সাড়ে তিন বছর আগে কলকাতা পার্টি কংগ্রেসে কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের কাছে জ্যোতি বসুর 'ঐতিহাসিক ভুলের' পরাজয়ের মধুর বদলা নিয়ে নতুন পথে চলার ইতিহাস সৃষ্টি করে রবিবার কলকাতা ফিরে যাচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী বুদ্ধদেব ভট্টাচার্য।

পার্টি কংগ্রেসের পঞ্চম দিনটা ছিল তাঁরই। প্রথমত কলকাতায় ফিরেই 'পোকা' পেশের উদ্যোগ নেবেন জানালেন। সেই সঙ্গে সাংবাদিক বৈঠকে কেরলের সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে বুদ্ধবাবু 'সদম্ভে' জানিয়ে দিলেন, শিল্প থেকে সরকারের আর্থিক দায় ছেঁটে ফেলে শিল্প-স্বাস্থ্য-শিক্ষা সর্বত্র বেসরকারি উদ্যোগকে স্বাগত জানিয়ে যে বিকল্প নীতি পশ্চিমবঙ্গে তাঁর দল গ্রহণ করেছে এখন থেকে সেটাই হবে সি পি এমের সর্বভারতীয় নীতি। কেরলের নেতৃত্বেও এ কথা মেনে নিয়েছেন, তা জানিয়ে বুদ্ধবাবু বলেন, ''সি পি এম কোনও রাজ্যে সরকারে থাক বা বিরোধী আসনেই বসুক, এটাই আগামী দিনে দলের ঘোষিত পথ।'' তাঁর মতে, ''সি পি এমন কোনও গোঁড়া কমিউনিস্ট বা সোশ্যালিস্ট কর্মসূচির ভিত্তিতে পশ্চিমবঙ্গে সরকার চালাচ্ছে না। একটি পুঁজিবাদী ব্যবস্থায় বেশির ভাগ মানুষকে 'রিলিফ' দেওয়ার লক্ষ্যে ন্যূনতম যৌথ কর্মসূচির ভিত্তিতে অন্য বাম দলকে নিয়ে সরকার চালাচ্ছে।'' তিনি যে জ্যোতিবাবুর পাদুকায় পা গলানোর চেষ্টা না করে নিজের মতো চলছেন তা-ও গোপন করেননি দেড় বছরের মুখ্যমন্ত্রী।

এই ঘোষণার চার ঘণ্টার মধ্যেই বিকেলে জুবিলি হিলস এলাকায় চন্দ্রবাবু নাইডুর সঙ্গে বৈঠক করে দলের বার্তা পৌঁছে দিলেন পশ্চিমবঙ্গের কনিষ্ঠতম পলিটব্যুরের সদস্য। চন্দ্রবাবু তাঁকে এই ৩৬ ডিগ্রির গরমেও শাল উপহার দিয়ে জানিয়ে দিলেন, এন ডি এ থেকে আরম্ভ করে যৌথভাবে কেন্দ্রের কাছে আর্থিক দাবিদাওয়া পেশ, অনেক ব্যাপারেই তাঁদের মধ্যে আলোচনা হয়েছে। বুদ্ধবাবু ঝানু রাজনীতিবিদের মতোই আলোচনার শাঁস পুষ্পস্তবক আর চাদরের ছোবড়ার আড়ালে লুকিয়ে রেখে বলেছেন, ''দুই রাজনীতিবিদ যখন এক হন, তখন তো রাজনীতির আলোচনা হবেই। মুখ্যমন্ত্রী হিসাবে দু'জনের মধ্যেই শিল্প আর কৃষির বিষয়ে আলোচনা হয়েছে।''

দু'জনের মধ্যে ৪৫ মিনিট নানা বিষয়ে আলোচনা হয়। অযোধ্যা থেকে গুজরাত—কেন্দ্রীয় সরকার অনেক ক্ষেত্রেই ধর্মনিরপেক্ষতা বজায় রাখতে ব্যর্থ হচ্ছে। আপনি কী ভাবছেন? বুদ্ধের প্রশ্নের জবাবে চন্দ্রবাবু বলেছেন, ''আমরা ধর্মনিরপেক্ষ দল। বাইরে থেকে এন ডি এ-কে সমর্থন করছি। সব রাজনৈতিক

দলেরই কিছু নিজস্ব বাধ্যবাধকতা আছে। অন্ধ্রে কংগ্রেসকে আটকাতেই আমরা বাজপেয়ীর সঙ্গে আছি।” এক দিন আগেই চন্দ্রবাবু কংগ্রেস নিয়ে সি পি এমের বিরুদ্ধে ‘ডাবল স্ট্যান্ডার্ডের’ অভিযোগ করেছিলেন। বুদ্ধ-নাইডু বৈঠকের মাধ্যমে সি পি এম-টি ডি পি’র বরফ গলা শুরু হল।

বুদ্ধবাবুর আগে ত্রিপুরার মুখ্যমন্ত্রী মানিক সরকারও চন্দ্রবাবুর সঙ্গে বৈঠক করেন। দু’জনের মধ্যে উগ্রপন্থী সমস্যা নিয়ে আলোচনা হয়। পশ্চিমবঙ্গ এবং ত্রিপুরার দুই সি পি এম মুখ্যমন্ত্রীই এ বার পার্টি কংগ্রেসে ভারতীয় জাতীয় কংগ্রেসের সম্পর্কে তাঁদের কড়া মনোভাব গ্রহণের সিদ্ধান্ত চন্দ্রবাবুকে জানান বলে দলীয় সূত্রে খবর। সন্ধ্যায় বিষয়টি নিয়ে পলিটব্যুরো বৈঠক বসে। আগামী দিনেও টি ডি পি-সি পি এম-এর মধ্যে আলোচনা চালু থাকবে।

ভিন রাজ্যে এসে পশ্চিমবঙ্গের শিল্পায়নে গতি এবং দেশি-বিদেশি পুঁজি বিনিয়োগের কথা তুলে ধরার পাশাপাশিই বুদ্ধবাবু বিশ্ব হিন্দু পরিষদ, বজরং দলের সংখ্যাগুরু মৌলবাদের পাশাপাশি সংখ্যালঘু মৌলবাদের বিপদ নিয়েও বলেন। তিনি জানান, মুসলিম মৌলবাদের বিপদ এবং উগ্রপন্থী সমস্যা নিয়ে পার্টি কংগ্রেসে আলোচনাও হয়েছে। হায়দরাবাদের মতো মুসলিম অধ্যুষিত শহরে এসে মাদ্রাসা নিয়ে তাঁর অবস্থানের প্রেক্ষিতে যে কঠিন প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে এটা বোধহয় প্রত্যাশিতই ছিল। তাঁর পুরনো অবস্থানের কথা জানিয়ে বুদ্ধবাবু বলেন, ‘‘সঠিক চিন্তাধারার মুসলিমরা আমার কথা মেনে নিয়েছেন। আরবি এবং ধর্ম পড়ানোর পাশাপাশি মাদ্রাসায় ইংরাজি, বিজ্ঞান, অঙ্ক, ইতিহাস এবং ভূগোল পড়ানো উচিত। অনেক সময়েই মৌলবাদীরা সন্ত্রাসের পথে যাচ্ছে, আমরা তা রুখব।”

কিন্তু এই ব্যাপারে তাঁর উদ্যোগকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আডবাণী প্রশংসা করেছেন, ব্যাপারটা তিনি কীভাবে দেখেছেন? কী জবাব দেবেন? কিছুটা হেসে, কিছুটা লজ্জা পেয়ে বুদ্ধবাবু বলেন, ‘‘কাগজে দেখেছি, জানি না কেন আডবাণী আমার প্রশংসা করেছেন।”

সংগঠিত অপরাধ দমনে ‘পোকা’কে পলিটব্যুরো সবুজ-সংকেত দেওয়ায় বুদ্ধবাবু তাঁর খুশি চেপে রাখেননি। তিনি বলেন, ‘‘বাংলায় ‘পোকা’ শব্দের অর্থ কীট। আমরা কিন্তু খারাপ কিছু করছি না। ‘পোটো’ ছিল খারাপ। তা আমরা রাজ্যসভায় হারিয়েছি। কিন্তু পশ্চিমবঙ্গে যেভাবে অপহরণ, হাইজ্যাকিং, সশস্ত্র উগ্রপন্থা বেড়ে যাচ্ছে তা রুখতে একটা আইন দরকার।” বাজপেয়ী এবং স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী আডবাণীকে তিনি বলেছেন, আইনশৃঙ্খলা রাজ্যের সসম্যা, এ কথা তুলে ধরে বুদ্ধবাবু বলেন, ‘‘প্রয়োজন হলে যে কোনও রাজ্য এমন আইন করতে পারে। উত্তরবঙ্গে যে ভাবে আলফা এবং অন্য উগ্রপন্থীর সমস্যা বাড়ছে, বিহার সংলগ্ন দক্ষিণবঙ্গে তেমনই সশস্ত্র জনযুদ্ধ গোষ্ঠীর প্রভাব বাড়ছে। তা রুখতে ‘পোকা’ প্রয়োজন।”

বুদ্ধবাবু স্বীকার করেন, পার্টি কংগ্রেসের প্রথম দিন তিনি ‘স্পিকটি নট’ ছিলেন চাপেই। আজ তাঁর মুখে বিজয়ীর হাসি।

● আনন্দবাজার পত্রিকা

- হায়দরাবাদে গতকাল সি পি আই এমের পার্টি কংগ্রেসের পঞ্চম দিনে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীবুদ্ধদেব ভট্টাচার্য এক সাংবাদিক সম্মেলনে জানান, কলকাতায় ফিরে তিনি পোকা আইন পেশের উদ্যোগ নেবেন। সাংবাদিকদের তিনি আরো জানান, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও শিল্পের ক্ষেত্রে বেসরকারি উদ্যোগকে আহ্বান করার বিকল্পনীতি সি পি আই এম সর্বভারতীয় ক্ষেত্রে গ্রহণ করেছে। পরে শ্রীভট্টাচার্য তেলুগু দেশম পার্টির নেতা শ্রীচন্দ্রবাবু নাইডুর সঙ্গে এক আলোচনায় মিলিত হন। তাঁদের মধ্যে পঁয়তাল্লিশ মিনিট নানা বিষয়ে আলোচনা হয়।

(খ) দাঙ্গার জন্য ভর্ৎসিত মোদী

স্টাফ রিপোর্টার, নয়াদিল্লি, ২৪ মার্চ—দাঙ্গা নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতার জন্য গুজরাতে সরকারের 'নিষ্ক্রিয়তা' এবং 'অপদার্থতা'কে দায়ী করলেন জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান জে এস বর্মা। তিনি বলেছেন, এর পর হোলি ও মহরমে রাজ্যে যাতে শান্তি বজায় থাকে, তার ব্যবস্থা করতে হবে। কমিশনের এই তীব্র ভর্ৎসনার পরই হোলি ও মহরমে শান্তি বজায় রাখার জন্য মুখ্যমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীকে নির্দেশ দিয়েছেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী লালকৃষ্ণ আডবাণী। প্রধানমন্ত্রী অটলবিহারী বাজপেয়ীও সিমলায় বলেছেন, গুজরাতে হিংসা ভারতের ভাবমূর্তি নষ্ট করেছে এবং রাজ্যে অবিলম্বে হিংসা থামা দরকার। রাজ্যে হিংসা অবশ্য এখনও থামেনি। আমেদাবাদে আজ এক মহিলা-সহ তিনজনের মৃত্যু হয়েছে। শহরের বেশ কিছু এলাকায় নতুন করে কার্ফু জারি করা হয়েছে। বডোদরা, হিম্মতনগর, ছোট উদয়পুর, আনন্দেও বেশ কিছু এলাকায় কার্ফু জারি হয়েছে।

এই অবস্থায় হোলি ও মহরমে শান্তি বজায় রাখা নিয়ে কেন্দ্র ও মানবাধিকার কমিশন রীতিমতো চিন্তিত। কাল মহরম, সপ্তাহের মাঝামাঝি হোলি। এই দুই ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যাতে গুজরাতে নতুন করে হিংসা শুরু না হয়, তার জন্য আডবাণী আজ ফোনে মোদীর সঙ্গে কথা বলেন। পুলিশকে চূড়ান্ত সতর্ক করা ছাড়াও দাঙ্গাপ্রবণ জেলাগুলিতে বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়ার নির্দেশ দেন তিনি। বিশেষত শহরগুলিতে শান্তিরক্ষার জন্য তিনি সব সম্প্রদায়ের মানুষদের নিয়ে কমিটি তৈরির প্রস্তাবও দিয়েছেন। আডবাণী গুজরাতের মানুষের কাছেও আবেদন করেন, তাঁরা যেন সব সম্প্রদায়ের প্রতি শ্রদ্ধা বজায় রাখেন।

প্রধানমন্ত্রীও আজ গুজরাতে হিংসাত্মক ঘটনা শেষ করার ডাক দিয়েছেন। সিমলায় এক সভায় বাজপেয়ী বলেন, গোধরায় যা হয়েছে, তা অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক এবং তার পরের দাঙ্গা 'পরিতাপের বিষয়'। তিনি বলেন, গুজরাতের ঘটনা দেশের ভাবমূর্তি নষ্ট করেছে। তাঁর আশ্বাস, তাঁর সরকার ধর্মের ভিত্তিতে দেশের মানুষের মধ্যে ভেদাভেদ করবে না।

বর্মা অবশ্য আজ উদ্বেগ প্রকাশ করে স্পষ্ট বলেছেন, গুজরাতের পরিস্থিতি এখনও স্বাভাবিক হয়নি। রাজ্য সরকার ৭২ ঘন্টার মধ্যে শান্তি ফিরিয়ে আনতে পেরেছে, এই দাবি উড়িয়ে দিয়ে তিনি বলেন, ‘‘তিন সপ্তাহ স্বাভাবিক অবস্থা ফিরিয়ে আনার পক্ষে যথেষ্ট। কিন্তু আমি রাজ্যে কোথাও স্বাভাবিক অবস্থা দেখতে পাইনি।’’ বর্মা বলেন, গুজরাতের উচ্চপদস্থ অফিসাররা দাঙ্গা-আক্রান্ত মানুষের কাছে যাননি, ত্রাণ শিবিরগুলিতে যাননি। তিনিই প্রথম উচ্চপদস্থ অফিসার যিনি মানুষের সঙ্গে কথা বলেন। আক্রান্ত মানুষদের পুনর্বাসনের ওপর জোর দেন বর্মা। তিনি জানান, পুরো বিষয়টির বিচার করতে শীঘ্রই কমিশনের সব সদস্যদের বৈঠক হবে। আনুষ্ঠানিক ভাবে কমিশন পরে রিপোর্ট দেবে। কিন্তু পরিস্থিতি রীতিমতো উদ্বেগজনক বলে তিনি সাংবাদিক সম্মেলন করে তাঁর মতামত জানিয়েছেন।

এ দিকে দাঙ্গার পরিপ্রেক্ষিতে গুজরাতের মুসলমান সম্প্রদায় এবার মহরম উপলক্ষে মিছিল বার না করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে রাজ্যের অতিরিক্ত স্বরাষ্ট্রসচিব প্রকাশ শাহ জানিয়েছেন। তিনি বলেন, মুসলমানরা নিজে থেকেই এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। তবে প্রশাসন তা সত্ত্বেও কোনও ঝুঁকি নিচ্ছে না। তাঁর কথায়, মুসলমান সম্প্রদায়ের মনের মধ্যে একটা ভীতি ঢুকে গিয়েছে যে তাঁরা যা-ই করুন, তাঁদের ওপর আবারও হামলা হতে পারে। রাজ্য সরকার সমস্ত জেলায় প্রশাসনকে হিংসা রুখতে সব রকম ব্যবস্থা নেওয়ার জন্য সতর্ক করে দিয়েছে। সেনাবাহিনী এখনও দাঙ্গার এলাকায় টহল দিচ্ছে।

আজ দিল্লির আরও কিছু সংগঠন স্বাধীনভাবে গুজরাতে সরেজমিনে তদন্ত করে ফিরে এসেছে। গণতান্ত্রিক মহিলা সমিতির রিপোর্টে বলা হয়েছে, গুজরাতের দাঙ্গা গোধরার ঘটনার স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিক্রিয়া বলে যে দাবি করা হচ্ছে, তা ঠিক নয়। সদস্যরা বলেছেন, ‘‘আমরা যা দেখেছি, তা হল সরকারি ব্যবস্থার সম্পূর্ণ অপপ্রয়োগ।’’ মুম্বইয়ের সংগঠন কমিউনালিজম কমব্যাট-এর মতে, যথেষ্ট পরিকল্পনা করে এই দাঙ্গা করা হয়েছিল, কারণ পয়লা মার্চ একই সময়ে ৪৬টি জায়গায় আক্রমণ চালানো হয়েছে। গোধরার ঘটনার পর ২৬ ঘন্টা অবধি কোনও হিংসাত্মক ঘটনা ঘটেনি। ২৮ ফেব্রুয়ারি করসেবকদের প্রার্থনা সভার পরে দাঙ্গা শুরু হয়। অপর একটি সংগঠন পিস অ্যান্ড সেকুলারিজম-এর এক মুখপাত্র বলেন, হানাদার দলগুলিতে লোক ছিল পাঁচ থেকে ২০ হাজার পর্যন্ত। সংগঠিত হানার উদ্দেশ্যে মোবাইল ফোন হাতে কিছু মানুষকে দেখা গিয়েছে।

দাঙ্গার সুবিচার পাওয়ার উদ্দেশ্যে বিভিন্ন সামাজিক অধিকার সংগঠন গুজরাত সরকারের বিরুদ্ধে জনস্বার্থ মামলা দায়েরের সিদ্ধান্ত নিয়েছে।

● আনন্দবাজার পত্রিকা

- গতকাল নতুন দিল্লিতে জাতীয় মানবাধিকার কমিশনের চেয়ারম্যান জে. এস. বর্মা দাঙ্গা নিয়ন্ত্রণে ব্যর্থতার জন্য গুজরাত সরকারের নিষ্ক্রিয়তাকে দায়ি করেন। তিনি আরো বলেন,

হোলি ও মহরমের সময় গুজরাতে যাতে শান্তি বজায় থাকে তার ব্যবস্থা করতে হবে। এই পরিপ্রেক্ষিতে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী শ্রীলালকৃষ্ণ আদবানি গুজরাতের মুখ্যমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদীকে হোলি ও মহরমে শান্তি বজায় রাখার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন। এদিকে রাজ্যে হিংসা এখনও অব্যাহত। আমেদাবাদে গতকাল এক মহিলাসহ তিন জনের মৃত্যু হয়েছে। ভাদোদরা, হিম্মতনগর, ছোটো উদয়পুর, আনন্দ-এও বেশ কিছু এলাকায় কারফিউ জারি করা হয়েছে।

(গ) তিস্তা-তোর্সা লাইনচ্যুত

বিশেষ সংবাদদাতা : রাজধানী এক্সপ্রেসের ভয়াবহ দুর্ঘটনার ন' দিন পরে ফের বড় রকমের একটি রেল দুর্ঘটনা ঘটল মুর্শিদাবাদের আজিমগঞ্জের কাছে মহিপাল রোড স্টেশনে। ৩১৪২ ডাউন তিস্তা-তোর্সা এক্সপ্রেসের ছটি কামরা বৃহস্পতিবার রাত পৌনে বারোটায় লাইনচ্যুত হয় মহিপাল রোড স্টেশনে ট্রেনটি ঢোকার মুখে। গভীর রাত পর্যন্ত এই দুর্ঘটনায় হতাহতের নিশ্চিত কোন খবর রেলসূত্রে পাওয়া যায়নি। তবে রেলের উচ্চপদস্থ অফিসাররা ঘটনাস্থলে ছুটে গেছেন। মালদহ থেকে পাঠানো হয়েছে উদ্ধারকারী একটি ট্রেন এবং চিকিৎসকদের দল। ট্রেনটির ইঞ্জিনের পর থেকে তিন, চার, পাঁচ, সাত, আট, বারো নম্বর বগি লাইন থেকে ছিটকে পড়েছে বলে জানা গেছে। আজিমগঞ্জ-বারহাড়োয়া লুপ লাইন থেকে ট্রেনটি মহিপাল রোডে ওঠার সময় এই দুর্ঘটনাটি ঘটে। ঘটনাস্থলটি সাগরদীঘির কাছে হলেও প্রত্যন্ত অঞ্চল। রাত দুটোতেও দুর্ঘটনার বিস্তারিত সংবাদ কলকাতায় পৌঁছায়নি। মুর্শিদাবাদ জেলার এস পি ঘটনাস্থলে রওনা হয়ে গেছেন। রেলসূত্রে জানানো হয়েছে, মহিপাল রোডে ট্রেনটি ঢোকার সময় গতিবেগ পনেরো কিলোমিটারে সীমাবদ্ধ ছিল বলে এই দুর্ঘটনায় হতাহতের ঘটনার সম্ভাবনা কম। তবে কি কারণে এই লাইনচ্যুতি ঘটল তা পরিষ্কার করে বলতে পারেননি কলকাতার কোন রেলকর্তা। জানা গেছে, ট্রেনটি লাইনচ্যুত হওয়ার পর স্থানীয় লোকজনই উদ্ধারকাজে হাত লাগিয়েছেন। তবে গভীর রাত হওয়ায় উদ্ধার কাজে অসুবিধার সৃষ্টি হয়েছে। কলকাতায় পাওয়া খবরে জানা গেছে ট্রেনটির এস-টু, এস-থ্রি এবং এস-ফোর শয়নযানগুলি লাইনচ্যুত হয়ে ছিটকে পড়েছে। এছাড়াও বাতানুকুল একটি কামরা এবং দুটি সাধারণ কামরাও লাইনচ্যুত হয়েছে। মালদহে রাত বারোটা কুড়ি নাগাদ খবর পৌঁছানোর পর মেডিকেল টিম সেখানে রওনা হয়েছে। সাগরদীঘি থানা রাতে জানিয়েছে, দুর্ঘটনার খবর পাওয়ার পর উচ্চপদস্থ পুলিশ অফিসাররাও ঘটনাস্থলে পৌঁছে গেছেন। তবে সাগরদীঘি থানাও হতাহতের কোন খবর জানাতে পারেনি। রেলের একটি সূত্রে জানা গেছে, ট্রেনটির গার্ড নাকি জানিয়েছেন এই দুর্ঘটনায় কেউ আহত বা নিহত হননি। তবে এই খবরের সমর্থন মেলেনি। ট্রেনটি আলিপুরদুয়ার থেকে নিউ জলপাইগুড়ি হয়ে শিয়ালদহে আসছিল। ট্রেনটি যখন লুপ লাইন থেকে মেন লাইনের দিকে আসছিল

তখনই দুর্ঘটনাটি ঘটেছে বলে রেলসূত্রে জানানো হয়েছে। তবে রেলের উচ্চপদস্থ অফিসারদের অনেকেই এখন রফিগঞ্জে রাজধানী এক্সপ্রেসের দুর্ঘটনার তদন্ত কাজে ব্যস্ত থাকায় তাঁদের পাওয়া যায়নি। এদিন সকালেই নীলাচল এক্সপ্রেস ফিসপ্লেট খোলা থাকলেও একটি দুর্ঘটনার হাত থেকে রেহাই পায়। তারপরই এই বড় মাপের দুর্ঘটনাটি ঘটল। বলাই বাহুল্য ন'দিনের মধ্যে দুটি দুর্ঘটনা রেলমন্ত্রী নীতিশ কুমারকে আরও অস্বস্তিতে ফেলল।

● **সংবাদ প্রতিদিন**

- আজ মুর্শিদাবাদের আজিমগঞ্জের কাছে মহিপাল রোড স্টেশনে ৩১৪২ ডাউন তিস্তা-তোর্সা এক্সপ্রেসের ছ'টি কামরা লাইনচ্যুত হয়েছে। দুর্ঘটনায় হতাহতের খবর এখনও রেলসূত্রে পাওয়া যায়নি। রেলের উচ্চপদস্থ আধিকারিকেরা ঘটনাস্থলে গেছেন। মালদহ থেকে উদ্ধারকারী একটি ট্রেন চিকিৎসক দলসমেত ঘটনাস্থলে পৌঁছেছে। দুর্ঘটনার কারণ এখনও সরকারিসূত্রে জানা যায় নি।

গণমাধ্যমের জন্যই যে একমাত্র প্রতিবেদন তৈরি করতে হয় তা নয়, ব্যবহারিক জীবনেও এর মূল্য রয়েছে। নানা ব্যাপারেই এর প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। সংগঠনের কাজে, সরকারি দপ্তরে, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের বর্তমান অবস্থা তুলে ধরতে এবং বিগত দিনগুলির কার্যাবলী ও আগামী দিনের কর্মসূচির রূপরেখা তুলে ধরতে, কোন প্রতিষ্ঠানের তরফে কোনো ব্যাপারে তদন্তে গেলে, সরকারের বিভিন্ন বিভাগের বার্ষিক কাজকর্মের খতিয়ান এবং সামগ্রিক চেহারা ফুটিয়ে তুলতে, কোন বিষয়ে তদন্ত কমিশন গঠিত হলে তার জন্য প্রতিবেদন তৈরি দরকার হয়ে পড়ে। স্বাভাবিকভাবেই আনুষ্ঠানিক ও প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিবেদন রচনার উদ্দেশ্য, পদ্ধতি জানা দরকার। এখানে আপনি দৃষ্টান্তসহ তার পরিচয় পাবেন। এবং নিজেকে সে ব্যাপারে উপযুক্ত করে তুলতে সক্ষম হবেন। প্রতিষ্ঠানের অডিট রিপোর্ট-ও প্রতিবেদনের অন্তর্গত হবার যোগ্য—যদিও তা স্বতন্ত্র ধরনের।

এরকম ব্যবহারিক, আনুষ্ঠানিক, প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিবেদন রচনাও একধরনের শব্দশিল্প। এর মধ্যেও যেমন রচনাশৈলীর নান্দনিক পরিচয়টি নিহিত থাকে তেমনি থাকে বাস্তবের রূপ, নির্দিষ্ট ও কার্যকর পন্থা। আগামী দিনের কর্মসূচি তুলে ধরার মধ্যে ভবিষ্যতের স্বপ্ন ও পথনির্দেশ। প্রতিবেদন রচনার সময় প্রতিবেদকেও সেজন্য মেনে চলতে হয় কিছু কিছু পদ্ধতি, নিয়মকানুন।

আদর্শ প্রতিবেদনে যেসব বৈশিষ্ট্য সাধারণত আশা করা হয় সেগুলি হচ্ছে—

- অনিবার্যভাবেই প্রতিবেদনে থাকবে পর্যবেক্ষক বা প্রতিবেদক বা তদন্তকারীর পক্ষে প্রয়োজনীয় বা তাঁর আহৃত যাবতীয় প্রাসঙ্গিক তথ্য, পরিসংখ্যান এবং উপাদান।

- সমস্ত তথ্য হবে নির্দিষ্ট, সুনির্বাচিত, নির্ভুল, প্রাঞ্জল ও সম্পূর্ণ।
- প্রতিবেদন হবে কৌতূহল-উদ্দীপক ও আকর্ষণীয়।
- কোনো নির্দিষ্ট ব্যক্তি বা সংস্থার কর্তৃপক্ষের কাছে যথাযথ সম্বোধন করে প্রতিবেদন পেশ করতে হয়।
- প্রতিবেদনে সংক্ষিপ্ততা কাম্য। অর্থাৎ রিপোর্ট হবে টু দ্য পয়েন্ট।
- প্রতিবেদনের একটি শিরোনাম বা টাইটেল থাকবে।
- সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষ যাতে কোন ব্যাপারে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারেন সেজন্য নির্দিষ্ট আদলে প্রতিবেদনটিকে উপযোগী করে তৈরি ও পেশ করতে হয়।
- রিপোর্টের প্রথম অনুচ্ছেদেই বিচার্য বা অনুসন্ধেয় বিষয়টি স্পষ্টভাবে উল্লেখ করা দরকার।
- প্রতিবেদনের উপস্থাপনা হবে যুক্তির পরাস্পর্য রক্ষা করে।
- কেবলমাত্র প্রয়োজনীয় তথ্য, পরিসংখ্যান, সুনির্দিষ্ট ঘটনা ইত্যাদি নিয়ে আলাদা আলাদা অনুচ্ছেদের সমবায়ে তৈরি করতে হয় প্রতিবেদনের অবয়ব।
- সুপারিশ করার মতো কিছু থাকলে তা দিতে হবে প্রাসঙ্গিক বিষয় বা অংশের শেষে।
- প্রতিবেদনের ভাষা হবে সরল, প্রাঞ্জল। সেখানে কোনরকম দ্ব্যর্থকতা থাকবে না।
- প্রতিবেদনে সদর্থক বিবরণই সাধারণভাবে বাঞ্ছিত।
- তারিখসহ প্রতিবেদকের স্বাক্ষর থাকা প্রতিবেদনে আবশ্যিক।

প্রত্যেক সংগঠনকেই বার্ষিক প্রতিবেদন তৈরি করতে হয়। ট্রেড ইউনিয়ন, ক্লাব, অ্যাসোসিয়েশন ইত্যাদি সারা বছরের কাজকর্মের খতিয়ান, আত্ম-সমালোচনা, ভবিষ্যৎ কর্মসূচির রূপরেখা ও আয়ব্যয়ের হিসাবসহ বার্ষিক প্রতিবেদন উপস্থাপিত করতে হয় সাধারণ সদস্যদের মধ্যে, বার্ষিক সাধারণ সভায়। সাধারণ এই প্রতিবেদন পেশ করেন সংগঠনের সাধারণ সম্পাদক অথবা ভারপ্রাপ্ত ব্যক্তি। একে বলে সাংগঠনিক প্রতিবেদন।

এর বাইরেও তৈরি করতে হয় আরো একাধিক ধরনের প্রতিবেদন। সচিব-সংক্রান্ত কর্মধারার মধ্যে পড়ে এরকম প্রতিবেদনের যদি আমরা শ্রেণিবিভাজন করি, তাহলে বিষয়, চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য অনুসারে কমপক্ষে আরো ছ'টি ভাগে ভাগ করতে পারি প্রতিবেদনসমূহকে। সেই বিভাজন নিম্নরূপ হতে পারে—

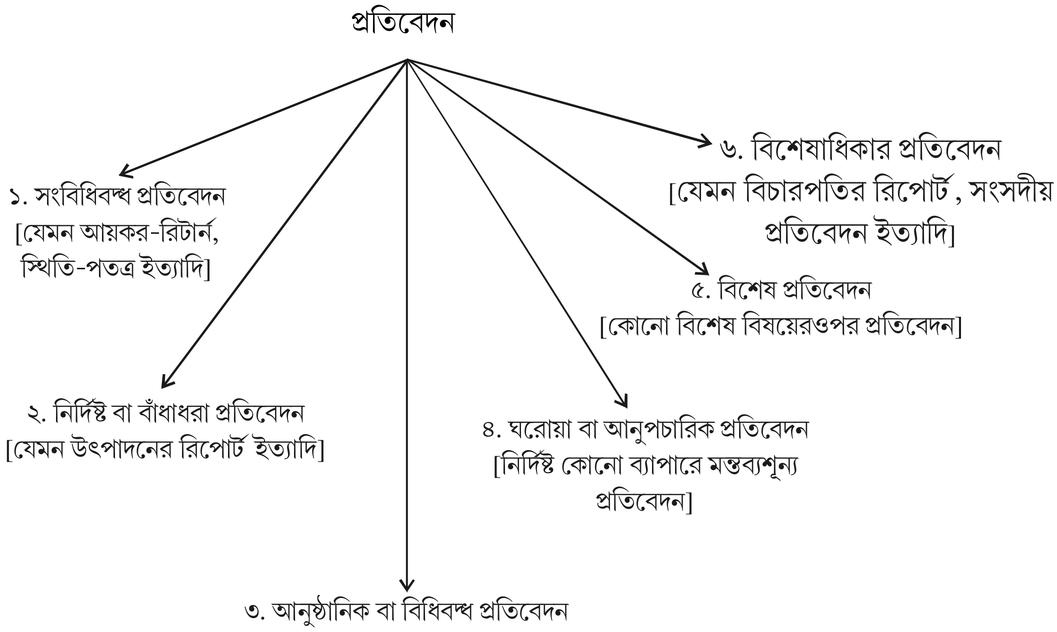

[যেমন, বিশেষ কোনো ব্যাপার নিয়ে তদন্তের জন্য নিযুক্ত অধস্তন ব্যক্তি কমিটি কর্তৃক মুখ্য-নির্বাহী আধিকারিকের কাছে পেশ করা প্রতিবেদন।]

নিচে কয়েকটি এ ধরনের প্রতিবেদনের নমুনা দেওয়া হল। আশা করি এই দৃষ্টান্তগুলির সাহায্যে আপনার সামর্থ্যের যেমন বৃদ্ধি ঘটবে তেমনি বাস্তবে ব্যবহার করতে পারবেন।

(ঘ) দপ্তর পরিষেবায় যান্ত্রিকীকরণ নিয়ে প্রতিবেদন

মাননীয় সভাপতি,
পরিচালনক পর্ষৎ
জন টমসন অ্যান্ড কোম্পানি লিমিটেড
১০ রাসেল স্ট্রিট
কলকাতা ৭০০ ০১৬

৭ জানুয়ারি, ২০০৩

বিষয় ঃ **দপ্তর পরিষেবায় যান্ত্রিকীকরণ**

মহাশয়,

আপনার নির্দেশমাফিক আমাদের প্রতিষ্ঠানের দপ্তর পরিষেবায় যান্ত্রিকীকরণের সম্ভাবনা নিয়ে আমি পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত করে আপনার বিবেচনার্থে নিম্নলিখিত প্রতিবেদন পেশ করছি।

হিসাব বিভাগে যান্ত্রিক পদ্ধতি প্রবর্তনের রয়েছে ব্যাপক সুযোগ। বিশেষ করে বিলিং, মেশিন, নগদান খাতা, চেক সংরক্ষণ, টড চেক স্বাক্ষরকারী যন্ত্র, যোগ-বিয়োগের যন্ত্র ইত্যাদি ব্যবহার করা যেতে পারে। গণযন্ত্রের প্রচলনে কাজে যতটা দ্রুততা আসবে তেমনি নির্ভুলতার পরিমাণ শূন্যের কোঠায় গিয়ে দাঁড়াবে বলে বিশ্বাস।

প্রতিলিপিকরণের ক্ষেত্রে স্টেনসিল ডুপ্লিকেটার সহজেই ব্যবহার করা যায়। চিঠি খোলার যন্ত্র, ফোল্ডিং ও ইনসার্টিং মেশিন, ফ্র্যাঙ্কিং মেশিন, ঠিকানালেখ ও শ্রুতদূরধ্বনিবহ বা ডিক্টাফোন ব্যবহার করা যেতে পারে আমাদের ডাকবিভাগে।

সামগ্রিকভাবে যান্ত্রিকীকরণ ব্যয়হ্রাস ঘটাবে, শারীরিক শ্রম কমাবে অথচ কাজ হবে নির্ভুল এবং দ্রুত। এতে আমাদের প্রতিষ্ঠানের সুনামও বৃদ্ধি হবে। অবশ্য এর জন্য প্রাথমিক ব্যয় করতে হবে আনুমানিক ২,০০,০০০ (দু লক্ষ) টাকা।

তাছাড়া, এর ফলে কর্মচারীদের মধ্যে এক ধরনের বিরূপ মানসিকতা তৈরি হতে পারে। তাঁদের প্রশিক্ষণ দেবার ব্যবস্থা করাও আবশ্যক।

আমি বিশ্বাস করি, এ ব্যাপারে আপনার সিদ্ধান্ত গ্রহণে আমার পর্যবেক্ষণ আপনাকে সাহায্য করবে।

আপনার বিশ্বস্ত,
কৌস্তুভ বসু
সচিব

(ঙ) কারখানায় অগ্নিকান্ডের জন্য ক্ষতিপূরণ বিষয়ক সংস্থার প্রধানকে প্রতিবেদন

মাননীয় পরিচালন অধিকর্তা
বসুমজুমদার বৈদ্যুতিন প্রতিষ্ঠান
২১০ কাশীপুর রোড
কলকাতা ৭০০ ০০২

২১ জানুয়ারি, ২০০৩

বিষয় ঃ **অগ্নিকাণ্ডের জন্য আমাদের প্রতিষ্ঠানের ক্ষতি**

সবিনয় নিবেদন,

আমাদের বেলিলিয়াস রোডস্থিত কারখানায় এক ভয়াবহ অগ্নিকাণ্ড ঘটে যায় ২০ জানুয়ারি, ২০০৩-এ ভোর চারটে নাগাদ। এর ফলে আমাদের সমস্ত মজুতপণ্য ও কাঁচামালের ব্যাপক ক্ষতি হয়,

যার মূল্য হবে আনুমানিক ৭৫,০০০.০০ (পঁচাত্তর হাজার) টাকা। উপরন্তু, প্রায় ৩০,০০০.০০ (তিরিশ হাজার) টাকা দামের মজুতমাল সম্পূর্ণ ভস্মীভূত হয়।

যে মুহূর্তে অগ্নিকাণ্ডের ঘটনাটা আমাদের নিরাপত্তা আধিকারিকের নজরে আসে, তৎক্ষণাৎ তিনি দমকলবাহিনীকে খবর দেন। প্রায় তিন ঘন্টা ধরে লড়াই করে দমকলবাহিনী আগুন আয়ত্তে আনেন। আমি নিজে ঘটনাস্থলে ছুটে যাই সকাল ছ'টা নাগাদ এবং স্থানীয় থানায় ঘটনাটা জানাই। পাশাপাশি আমি অগ্নিবীমা সংস্থার কাছেও লিখিতভাবে সংবাদ পাঠাই।

আপনার বিশ্বস্ত,

অমিতাভ বন্দ্যোপাধ্যায়

সচিব

(চ) কর্মচারীদের বিক্ষোভ সম্পর্কে প্রতিবেদন

সিমপ্লেক্স কোম্পানি লিমিটেড

২৩/৬ রাসেল স্ট্রিট

কলকাতা ৭০০ ০১৬

মাননীয় সভাপতি

পরিচালন পর্ষৎ ৮ জানুয়ারি, ২০০৩

বিষয় ঃ **কর্মচারীদের বিক্ষোভ সম্পর্কে প্রতিবেদন**

সবিনয় নিবেদন,

আপনার নির্দেশমতো আমাদের প্রতিষ্ঠানের কর্মচারীদের বিক্ষোভ সম্পর্কে নিম্নোক্ত বিষয়ে বক্ষ্যমান প্রতিবেদন নিবেদন করছি এবং তাঁদের সঙ্গে দ্বিপাক্ষিক বৈঠকে যে সমাধানসূত্র বেরিয়েছে তা উপস্থাপিত করছি।—

১. **বর্তমানে প্রচলিত মহার্ঘভাতার হার বৃদ্ধি প্রসঙ্গে ঃ** দুর্মূল্য ভাতার হার বৃদ্ধির দাবি নিয়ে দীর্ঘকাল ধরেই কর্মচারীরা আন্দোলন করছেন। এ বিষয়ে আমি দীর্ঘ সময় ধরে কর্মচারী ইউনিয়নের প্রতিনিধিদের সঙ্গে আলোচনা করি এবং শেষ পর্যন্ত বর্তমানে প্রচলিত দুর্মূল্য ভাতার হার সমানভাবে সকলের জন্য ২০% বাড়ানোর প্রস্তাব দিই। এর ফলে প্রতি মাসে অতিরিক্ত খরচ হবে ২,০০,০০০.০০ (দু লক্ষ) টাকা।

২. **ভরতুকি হারে জলখাবার সরবরাহ ঃ** এ বিষয়ে পূর্ণ সময়ের প্রত্যেক কর্মচারীর ক্ষেত্রে জলখাবার

(টিফিন) খাতে যদি ১.০০ (এক) টাকা হারে ভরতুকি দেওয়া হয় তাহলে কর্মচারী ইউনিয়নের প্রতিনিধিগণ আন্দোলন প্রত্যাহার করে নিতে সম্মত হয়েছেন। এর জন্য প্রতি মাসে অতিরিক্ত আরো ১০,০০০,০০ (দশ হাজার) টাকা ব্যয় হবে।

৩. **ভ্রমণ ভাতা প্রসঙ্গে ঃ** এই বিষয়টি নিয়ে এক বছর বাদে পুনরায় আলোচনা করা হবে বলে আমার মৌখিক প্রতিশ্রুতিতে কর্মচারীদের প্রতিনিধিবর্গ খুশি।

৪. **চতুর্থ শ্রেণির কর্মচারীদের জন্য পোশাক ভাতা প্রসঙ্গে ঃ** এই দাবিটি আপাতত স্থগিত রাখতে ইউনিয়নের নেতৃত্ব সম্মত হয়েছেন। তবে এক বছর পরে বিষয়টি নিয়ে পুনরায় আলোচনা করা যেতে পারে।

সন্তোষের সঙ্গে আপনাকে জানাচ্ছি যে, উপর্যুক্ত ব্যবস্থাগ্রহণ সাপেক্ষ কর্মচারী ইউনিয়নের প্রতিনিধিগণ দু মাসের জন্য বিক্ষোভ প্রদর্শন স্থগিত রাখতে সম্মত। সুতরাং, আমি আপনাকে অনুরোধ জানাই, উল্লিখিত পদক্ষেপের ভিত্তিতে আপনি সহৃদয়তার সঙ্গে কর্মচারীদের দাবিগুলি বিবেচনা করবেন এবং বর্তমান অচলাবস্থা দূরীকরণে যথাযোগ্য ভূমিকা গ্রহণ করবেন।

শ্রদ্ধাসহ
বিনীত
সুদীপ সান্যাল
সচিব

(ছ) সাধারণ সীমিত কোম্পানির সংবিধিবদ্ধ প্রতিবেদন

নাগনন্দী লিমিটেড

নিবন্ধিত দপ্তর ঃ ২৯ পদ্মপুকুর রোড
কলকাতা ৭০০ ০২০

১৯৫৬ সালের কোম্পানি আইনের ১৬৫ ধারা অনুসারে পরিচালকবর্গ ও নথিভুক্ত অনুবর্তীর শংসার্থে নাগনন্দী লিমিটেড সংবিধিবদ্ধ প্রতিবেদন

সংবিধিবদ্ধ সভার তারিখ ও স্থান ঃ
১৫ নভেম্বর, ২০০২
২৯ পদ্মপুকুর রোড, কলকাতা ৭০০ ০২০

নথিবদ্ধ করানোর জন্য শ্রী অভিজ্ঞান সেনগুপ্ত, সচিব, নাগনন্দী লিমিটেড, ২৯ পদ্মপুকুর রোড কলকাতা ৭০০ ০২০

পরিচালকবর্গের প্রতিবেদন

১.	অবিশেষ শেয়ারের মোট সংখ্যা বরাদ্দ	ঃ	১০,০০০
২.	নগদে শেয়ারের সংখ্যা বরাদ্দ	ঃ	১০,০০০
৩.	নগদ ব্যতিরেকে শেয়ারের সংখ্যা বরাদ্দ	ঃ	শূন্য
৪.	পূর্ণপ্রাপ্ত শেয়ারের সংখ্যা বরাদ্দ	ঃ	শূন্য
৫.	নগদে দেয় প্রদত্ত শেয়ার বাবদ গৃহীত অর্থের পরিমাণ	ঃ	৪০,০০০.০০ টাকা

৬. সংলগ্ন বিবরণ অনুযায়ী ১০.১০.২০০২ পর্যন্ত মূলধনি হিসাবে জমাখরচ।

৭.	হাতে রোক স্থিতি ১০.১০.২০০২ পর্যন্ত	ঃ	৪,০০০.০০ টাকা

৮. কারো সঙ্গে কোনো দায় গ্রহণ চুক্তি নেই।

৯. পরিচালকবর্গ এবং ব্যবস্থাপকের পক্ষ থেকে কোনোরকম বকেয়া কিস্তির তলব নেই।

১০. কোনোরকম আয়োগ অথবা দালালি পরিশোধ হয়নি অথবা পরিচালকবর্গ বা ব্যবস্থাপকের পরিশোধ্য কিছু নেই।

১১. পরিচালকগণের বিশদ বিবরণ

●	শ্রী সুশোভন সামন্ত	১৬ ম্যান্ডেভিল গার্ডেনস কলকাতা ৭০০ ০১৯	শিল্পপতি
●	শ্রী কৌস্তুভ বসু	২৬ আর ইস্ট রোড কলকাতা	বাস্তুকার
●	শ্রী দীপকরঞ্জন নাগ	১৬৯/২, রাজা এস.সি. মল্লিক রোড কলকাতা ৭০০ ০৪৭	শিল্পপতি
●	শ্রী অঞ্জলি নন্দী	২৯এ, ব্রড স্ট্রিট কলকাতা ৭০০ ০১৯	শিল্পপতি
●	শ্রী বিজয়চাঁদ সিংহানিয়া	১৭ বি সুইন হো স্ট্রিট কলকাতা ৭০০ ০১৯	ব্যবসায়ী
১২.	নিরীক্ষকের বিশেষ বিবরণ	পাল অ্যান্ড কোং	সনদপ্রাপ্ত

শ্রী তারাপদ পাল এফ.সি.এ. ২ ওল্ড কোর্ট হাউস স্ট্রিট হিসাব-পরীক্ষক

কলকাতা ৭০০ ০০১

(জ) কোনো মহাবিদ্যালয়ে পাঠ্য বিষয়ের সম্প্রসারণ সম্পর্কে বিশ্ববিদ্যালয়ে পরিদর্শক দলের প্রতিবেদনের খসড়া (খুব সংক্ষেপে)

কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়
পরিদর্শক প্রতিবেদন

১.	মহাবিদ্যালয়ে নাম	....	পাথরপ্রতিমা মহাবিদ্যালয়
২.	পরিদর্শনের তারিখ	....	১৮ নভেম্বর, ২০০২
৩.	পরিদর্শন-দলের সদস্যবৃন্দ	....	ড. বিমল চট্টোপাধ্যায় ড. সুবীর গঙ্গোপাধ্যায় ড. দীপক সেনশর্মা ড. উপাসনা ঘোষ মহাবিদ্যালয় পরিদর্শক
৪.	যে বিষয়ের সম্প্রসারণ সম্পর্কে অনুমোদন চাওয়া হয়েছে	....	বাংলা (সাম্মানিক)
৫.	বিষয়টির অনুমোদন চাওয়ার সমর্থনযোগ্য যুক্তিসংগত কারণ	....	ছাত্র-ছাত্রী ও স্থানীয় এলাকার অভিভাবক-অভিভাবিকাদের নিরন্তর দাবি
৬.	বর্তমান সুবিধা ঃ		
●	যে কক্ষটিতে পাঠদান করা হবে তার মাপ	....	কক্ষ নং ৪ (৮ মিটার × ৬ মিটার)
●	বর্তমানে যদি বিষয়টির কোনো শিক্ষক থাকেন তাহলে তাঁদের নাম, শিক্ষাগত যোগ্যতা, নিয়োগের তারিখ ইত্যাদি	....	১. মহ. সিরাজুল ইসলাম এম.এ. পি.এইচ.ডি ১৭.২.২০০০ ২. নন্দিতা বন্দ্যোপাধ্যায় এম.এ. ১.৩.২০০২
●	মহাবিদ্যালয়ে যোগ্যতাসম্পন্ন গ্রন্থাগারিক আছে কিনা	....	হ্যাঁ, আছে। ড. শুক্লা চৌধুরী

- নিকটবর্তী কোন্ কলেজে বিষয়টি পড়ানো হয়.... সুন্দরবন মহাবিদ্যালয়, কাকদ্বীপ, ২৫ কিলোমিটার দূরবর্তী

৭. বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় সংশ্লিষ্ট বিষয় / নিকট সম্পর্কিত বিষয়ে ছাত্রছাত্রীদের সাফল্য .... সন্তোষজনক

৮. মহাবিদ্যালয়ে সামগ্রিক পরিস্থিতি / অবস্থা ....

- উপস্থিতির হার
  - (i) ছাত্রছাত্রীদের .... গড়পরতা
  - (ii) শিক্ষক-অশিক্ষক কর্মচারীদের .... সন্তোষজনক
- নিয়মশৃঙ্খলা .... খুবই ভালো
- আর্থিক অবস্থা .... সুদৃঢ়

৯. সুপারিশ :

পরিদর্শকগণ মহাবিদ্যালয়ে বাংলা সাম্মানিক বিষয়টির সম্প্রসারণের আবেদন মঞ্জুর করার সাময়িক সুপারিশ করছে তিন বছরের জন্য এবং তা কার্যকর হবে নিম্নলিখিত শর্তাদি পূরণ সাপেক্ষ ২০০৩-২০০৪-এর শিক্ষাবর্ষ থেকে।—

- শিক্ষক নিয়োগ সংক্রান্ত .... দুজন পূর্ণ সময়ের শিক্ষক দরকার
- ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষামূলক ভ্রমণের জন্য অনুদান .... বার্ষিক ২৫,০০০.০০ (পঁচিশ হাজার) টাকা
- অন্তর্গৃহীত ছাত্রছাত্রীর সংখ্যা .... ৩০ জন
- বই কেনা .... ৫০,০০০.০০ (পঞ্চাশ হাজার) টাকা

১৩. বিশেষ মন্তব্য, (যদি থাকে) .... নেই

বিমল চট্টোপাধ্যায়
যুগ্ম-পরিদর্শকের স্বাক্ষর

সুবীর গঙ্গোপাধ্যায়
যুগ্ম-পরিদর্শকের স্বাক্ষর

উপাসনা ঘোষ
যুগ্ম-পরিদর্শকের স্বাক্ষর

তারিখ ঃ ১৮.১১.২০০২

....
মহাবিদ্যালয়ের পরিদর্শকের স্বাক্ষর

বি.দ্র. অন্যতম যুগ্ম-পরিদর্শক ড. দীপক সেনশর্মা পরিদর্শনে যেতে পারেন নি, তাঁর ব্যক্তিগত অসুবিধা থাকায়।

(ঝ) দপ্তরে নিয়ম-শৃঙ্খলার অবনতি ঘটার প্রবণতা সম্পর্কে প্রতিবেদন

প্রতি ২ জানুয়ারি, ২০০৩

পরিচালন অধিকর্তা

ফোনেক্স ইন্ডিয়া লিমিটেড

৬৪ বি.বা.দী. বাগ

কলকাতা ৭০০ ০০১

বিষয় ঃ **দপ্তরে নিয়ম-শৃঙ্খলার অভাব**

সবিনয় নিবেদন,

আপনার নির্দেশ মোতাবেক আমাদের কলকাতা দপ্তরের কাজকর্মে নিয়ম-শৃঙ্খলার ক্রমাবনতি নিয়ে আমি স্বাধীনভাবে যে তদন্ত করি তার প্রতিবেদন আপনার বিবেচনার্থে পেশ করছি।

কাজে যোগ দেওয়ার সঠিক সময় না মেনে দপ্তরে কর্মচারীদের হাজিরা এবং প্রতিষ্ঠানের বেশ কয়েকজন বরিষ্ঠ আধিকারিকের বিলম্বে উপস্থিতি নিয়ম-শৃঙ্খলার অবনতির প্রথম কারণ বলে আমার ধারণা। দ্বিতীয়ত দপ্তরে নিয়ম-শৃঙ্খলার অবনতি প্রবণতা কারণ সম্ভবত কর্মচারীদের বহুবিধ দাবি মেটানোর ব্যাপারে পরিচালকের তরফে প্রদত্ত পূর্ব-প্রতিশ্রুতি কার্যকর না করা। তৃতীয়ত বরিষ্ঠ আধিকারিকদের প্রতি অধঃস্তন কর্মচারীদের আনুগত্য না দেখানোর ব্যাপারে ট্রেড-ইউনিয়নের প্ররোচনা।

আমার প্রস্তাব হল ১. কোনো কর্মচারী পরপর তিন দিন দেরিতে দপ্তরে এসে কাজে যোগ দিলে একদিনের ছুটি কাটা যাবে বলে আগাম সতর্কবার্তা জারি করা। ২. অধঃস্তন কর্মচারীর পক্ষে বরিষ্ঠ আধিকারিক সহ ঊর্ধ্বতন কর্মচারীর অফিস-সংক্রান্ত নির্দেশ বা অনুরোধ অমান্য করা দুর্বিনয় বলেই বিবেচিত হবে—তা জানিয়ে দেওয়া। ৩. কালক্ষেপ না করে কর্মচারীদের দাবি-দাওয়ার ব্যাপারে পরিচালনের তরফে দেওয়া পূর্ব প্রতিশ্রুতি বাস্তবায়িত করতে যে পরিচালকবর্গ অঙ্গীকারবদ্ধ, তা কর্মচারীদের জানিয়ে দেওয়া।

আমার বিনীত অনুরোধ, প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে ও কর্মচারীদের মধ্যে অকস্মাৎ নিয়ম-শৃঙ্খলা না-মানার অশুভ প্রবণতা দূরীকরণে আপনি প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করবেন। নমস্কারসহ

আপনার বিশ্বস্ত

কণিষ্ক বন্দ্যোপাধ্যায় (সচিব)

(ঞ) অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল জানিয়ে সংবাদপত্রে প্রকাশের জন্য প্রতিষ্ঠানের তরফে প্রতিবেদন

হোটেল ওপেক ইন্ডিয়া লিমিটেড

নিবন্ধিত দপ্তর : ৪১ জওহরলাল নেহেরু রোড, কলকাতা ৭০০ ০৭৩

৩০ জুন, ২০০২ তারিখে সমাপ্ত তিন মাস সময়ের

অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল

(কোটি টাকায়)

	৩০-৬-২০০২ তারিখে সমাপ্ত তিন মাস	পূর্ববর্তী বৎসরে অনুরূপ তিনমাস	৩১-৩-২০০২ তারিখে সমাপ্ত পূর্ববর্তী হিসাবের বৎসর
নিকট বিক্রয়	৮১.৭৫	১০০.৩৭	৩৭৪.৭২
অন্যান্য আয়	৯.৩৭	৮.৯৫	৫২.৬১
মোট আয়	৯১.১২	১০৯.৩২	৪২৭.৩৩
মোট ব্যয়			
(ক) মজুত পণ্যে বৃদ্ধি/হ্রাস	—	—	—
(খ) ব্যবস্থা, স্টোর্স, সুরা ও ধূমপান খাতে খরচ	৮.৩৬	৯.১০	৩৭.২৮
(গ) কর্মী বাবদ ব্যয়	২৬.৬৩	২৭.০৪	১০৮.৯৬
(ঘ) বিদ্যুৎ ও জ্বালানি	১০.৫২	১১.২৮	৪০.৯৬
(ঙ) অন্যান্য ব্যয়	৩৫.১৩	৩৬.৪৫	১৪৩.৮৯
মোট	৮০.৬৪	৮৩.৮৭	৩৩১.০৯
মোটমাট লাভ	১০.৪৮	২৫.৪৫	৯৬.২৪
সুদ	২.৭৫	৪.৮৯	১৮.৬০
মূল্যাপকর্ষ	৭.১৬	৬.৯০	২৮.৮৪
অতিরিক্ত দফা ও করের পূর্বে লাভ	০.৫৭	১৩.৬৬	৪৮.৮০
প্রতিপূরক নিধি-ভুক্ত বিবিধ ব্যয়	০.০৮	১.০৭	০.১৪
করের পূর্বে লাভ	০.৪৯	১২.৫৯	৪৮.৬৬
চলতি করের সংস্থান	০.০৪	১.৯৪	৫.৩০
শুদ্ধ লাভ (চলতি করের পর)	০.৪৫	১০.৬৫	৪৩.৩৬
বিলম্বিত কর	০.২১	—	৭.৮০
শুদ্ধ লাভ	০.৬৬	১০.৬৫	৩৫.৫৬
আদায়ীকৃত অবিশেষ অংশ মূলধন (লিখিত মূল্য-প্রতিটি ১০ টাকা)	৫২.৩৯	৫২.৩৯	৫২.৩৯
পুনর্মূল্যায়ন রিজার্ভ বাদে রিজার্ভ			৬২৬.৪৬
অবিশেষ অংশ পিছু মূল ও লঘুকৃত আয়—টাঃ	(০.৩১)	১.৫৫	৪.৮৭

ক্ষেত্রভিত্তিক আয়, ফলাফল এবং বিনিযুক্ত মূলধন

	৩০-৬-২০০২ তারিখে সমাপ্ত তিন মাস	৩১-৩-২০০২ তারিখে সমাপ্ত পূর্ববর্তী হিসাবের বৎসর
ক্ষেত্রভিত্তিক আয়		
ক। হোটেল	৮৫.৭৫	৩৯৬.২১
খ। অন্যান্য	৩.৭৫	১৩.২৯
মোট	৮৯.৫০	৪০৯.৫০
বাদ : আন্তঃক্ষেত্র আয়		
নিকট বিক্রয়		
কাজকর্ম-সূত্রে আয়	৮৯.৫০	৪০৯.৫০
ক্ষেত্র ভিত্তিক ফলাফল		
নিম্নোক্ত প্রতিটি ক্ষেত্র থেকে সুদ ও করের পূর্বে লাভ		
ক। হোটেল	২১.০৯	১০৭.২০
খ। অন্যান্য	০.৮৪	৩.৯২
মোট	২১.৯৩	১১১.১২
বাবদ :		
১। সুদ		
২। অবণ্টনীয় আয় বাদসাদ	২.৭৫	১৮.৬০
দেওয়ার পর অন্যান্য অবণ্টনীয় ব্যয়	১৮.৬১	৪৩.৭২
অতিরিক্ত দফা ও করের পূর্বে মোট লাভ	০.৫৭	৪৮.৮০
বাদ : প্রতিপূরক নিধিভুক্ত বিবিধ ব্যয়	০.০৮	০.১৪
করের পূর্বে লাভ	০.৪৯	৪৮.৬৬
বিনিযুক্ত মূলধন		
ক। হোটেল	১২৩১.৩৭	১১৯১.২০
খ। অন্যান্য	২০.২৪	১৯.৪০
মোট	১২৫১.৬১	১২১০.৬০

।। বিশেষ দ্রষ্টব্য।।

- ভারতীয় হোটেল শিল্পের মরসুমি চরিত্রানুযায়ী প্রথম তিন মাসের ফলাফল পুরো বছরের কাজ-কারবারের ইঙ্গিতবাহী নয়।
- আমেরিকায় বিশ্ব-বাণিজ্য কেন্দ্রে বিপর্যয়ের পর ভারতে ভ্রমণার্থীদের আগমন বেশ কমে যাওয়ায় প্রতিষ্ঠানের কাজকর্মে যথেষ্ট বিঘ্ন ঘটে। উপরন্তু বিশ্বজোড়া মন্দা, আর্থিক টানাটানি, জ্বালানি সংকট, ভারতীয় উপমহাদেশে রাজনৈতিক অস্থিরতা, সন্ত্রাসবাদের তান্ডব, মৌলবাদের হিংস্রতা—সব মিলিয়ে পর্যটন-শিল্পে খানিকটা প্রতিকুল প্রভাব পড়ে। তার প্রতিফলন ঘটে প্রথম তিন মাসের কাজকর্মে।
- আলোচ্য তিন মাস সময়ে সুদের পরিমাণ, সুদের পরিবর্তন খাতে ১.৮১ কোটি টাকার লাভ বাদসাদ দেওয়ার পরে দাঁড়িয়েছে ২.৭৫ কোটি টাকা। অন্যান্য ব্যয়ের মধ্যে বিদেশি মুদ্রায় ঋণের পুনর্মূল্যায়ান খাতে আলোচ্য তিন মাসে লোকসান হিসাবে ২.৬৫ কোটি টাকা অন্তর্ভুক্ত।
- অবিশেষ অংশ-পিছু আয় প্রাসঙ্গিক হিসাব-মান অনুযায়ী শুদ্ধ লাভ থেকে আলোচ্য তিন মাস সময়ের আনুপাতিক অগ্রাধিকার লাভের অংশ বাদ দেওয়ার পর হিসাব করা হয়েছে। ফলে এই তিন মাস সময়ের অবিশেষ অংশ-পিছু আয় নেতিবাচক হয়েছে।
- উপর্যুক্ত অনিরীক্ষিত আর্থিক ফলাফল প্রতিষ্ঠানের পরিচালক পর্ষৎ-এর এক সমিতি কর্তৃক ৩১ জুলাই, ২০০২-এ অনুষ্ঠিত তাঁদের সভায় বিবেচনাক্রমে নথিভুক্ত করা হয়েছে।

৩১ জুলাই, ২০০২ তীর্থংকর চক্রবর্তী

সভাপতি

১২২.৫ সারাংশ

প্রতিবেদন নানা ধরনের হয়। তার প্রকাশ-প্রচার-উপস্থাপনের মাধ্যম-ও আলাদা-আলাদা। সংবাদপত্রে প্রকাশের উপযোগী প্রতিবেদনের সঙ্গে বেতারে প্রচারের জন্য তৈরি প্রতিবেদনের খানিকটা ফারাক থাকে। অনুরূপ নিউজ এজেন্সির প্রতিবেদনের সঙ্গে দূরদর্শনের প্রতিবেদনের পার্থক্যটা কারো নজর এড়ায় না। অর্থাৎ মাধ্যম-স্বাতন্ত্র্যে প্রতিবেদনের রকমফের ঘটে। পাশাপাশি ভঙ্গিতে, স্বাদে অন্যরকম হয়ে যায় সাংগঠনিক-প্রাতিষ্ঠানিক-আনুষ্ঠানিক প্রতিবেদন।

১২২.৬ অনুশীলনী

ক. ছোট প্রশ্ন [প্রতিটি মান ১ নম্বর।]

১। 'হ্যাঁ, বা 'না' লিখে, কিংবা এককথায় উত্তর দেবেন।

অ. সংবাদপত্রের উপযোগী প্রতিবেদনের সঙ্গে কি দূরদর্শনে সম্প্রচারের উপযোগী প্রতিবেদনে কোনো পার্থক্য আছে কি?

আ. রিপোর্ট ও রিপোর্টাজ কি এক?

ই. রিপোর্ট ও নিউজ-আইটেম কি অভিন্ন?

ঈ. সংবাদের জন্যে তৈরি প্রতিবেদনের সঙ্গে কি প্রাতিষ্ঠানিক প্রতিবেদনের পার্থক্য আছে?

উ. মেক্সিকান ইন্ডিয়ানদের মধ্যে অন্তত কত রকম ভাষা ও বুলি আছে?

২। বিশ্ব জুড়ে সংবাদ সরবরাহ করে এমন দুটি নিউজ এজেন্সির নাম লিখুন।

খ. মাঝারি প্রশ্ন [প্রতিটি প্রশ্নের মান ৫ নম্বর। পাঁচ-ছ'টি বাক্যে উত্তর দিতে হবে।]

১। নিউজ এজেন্সির সংবাদপ্রাপ্তির সূত্র বা উৎস কী কী?—পাঁচটির নাম লিখুন।

২। নিউজ এজেন্সি থেকে সংবাদ কেনেন কারা?—পাঁচটির নাম লিখুন।

৩। 'নৌকাডুবি ঘটেছে'—এ বিষয় নিয়ে দূরদর্শনে প্রচারের উপযোগী একটি প্রতিবেদন মাত্র পাঁচটি বাক্যে রচনা করুন।

৪। বাস দুর্ঘটনায় একজন পথচারীর মৃত্যু ঘটেছে।—এ বিষয় নিয়ে বেতারে প্রচারের উপযোগী একটি প্রতিবেদনের খসড়া তৈরি করুন।

৫। রেগে গিয়ে পুলিশ একজন ছাত্রকে কামড়ে দিয়েছে।—এ বিষয়ে বিভিন্ন গণমাধ্যমের জন্য নিউজ এজেন্সির তরফে একটি সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদন তৈরি করুন।

গ. বড় প্রশ্ন [প্রতিটি প্রশ্নের মান ১৫ নম্বর। কোনো উত্তরই ১৫টি বাক্যের বেশি হবে না।]

১। নিউজ এজেন্সির প্রতিবেদনে সাধারণত কী কী কাম্য?

২। ব্রিটেন ও আমেরিকা যুক্তরাষ্ট্রে সাধারণভাবে নিউজ এজেন্সির প্রতিবেদকদের কাছে কী কী আচরণ দাবি করা হয়?

৩। নিউজ এজেন্সির সার্থক প্রতিবেদকের মধ্যে কোন্ কোন্ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যায়?

৪। নিউজ এজেন্সির জন্য প্রতিবেদন রচনার স্তরবিন্যাস ব্যাখ্যা করুন।

৫। অবিরাম বৃষ্টিতে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন জেলায় চাষের ক্ষতি হয়েছে।—এ বিষয় অবলম্বন করে ১৫টি বাক্যে সংবাদপত্রের উপযোগী প্রতিবেদন রচনা করুন।

৬। সংবাদপত্রে প্রকাশিত নিচের প্রতিবেদনগুলি পড়ুন। তারপর প্রত্যেকটি সংবাদ নিয়ে পাঁচটি বাক্য করে দূরদর্শনের উপযোগী প্রতিবেদনের খসড়া প্রস্তুত করুন।

(ক) মাদ্রাসা শিক্ষায় মান উন্নয়নে পর্ষদ

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা, ১২ই নভেম্বর—রাজ্যের মাদ্রাসাগুলির পঠন-পাঠনের মান আরও উন্নত করার লক্ষ্যে পশ্চিমবঙ্গ মাদ্রাসা শিক্ষা পর্ষদ বেশ কিছু প্রশাসনিক পদক্ষেপ নিচ্ছে। মঙ্গলবার মাদ্রাসা পর্ষদের সভাপতি ড. আবদুস সাত্তার এক বিবৃতিতে জানিয়েছেন, হাই মাদ্রাসা এবং আলিম পরীক্ষা ২০০০-র ফলাফলের ভিত্তিতে বেশ কিছু মাদ্রাসার পঠন-পাঠন নিয়ে প্রশ্ন তুলে মাদ্রাসা ভিত্তিক প্রতিবেদন সংগ্রহ করা হবে। পর্ষদের সার্কুলার (সার্কুলার নম্বর ৮০৮) জারি করে সংগৃহীত মাদ্রাসাভিত্তিক বিস্তারিত প্রতিবেদনের ভিত্তিতে এর পরবর্তী পর্যায়ে নেওয়া হবে কিছু পরিকল্পিত পদক্ষেপ। তিনি জানিয়েছেন পর্ষদের যে সমস্ত মাদ্রাসার ৪০ শতাংশের কম ছাত্রছাত্রী হাই মাদ্রাসা ও আলিম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছে সেই সমস্ত মাদ্রাসার পঠন-পাঠন ও শিক্ষাগত পরিকাঠামো খতিয়ে দেখা হবে। ছাত্রছাত্রীদের সহপাঠক্রম দক্ষতার প্রশ্নটিও গুরুত্ব দিয়ে দেখা হবে বলে তিনি জানিয়েছেন।

তিনি জানিয়েছেন, লক্ষ্য করা যাচ্ছে সাধারণ গ্রাম ও মফস্বলের ছাত্রছাত্রীরা সমসাময়িক সমাজ সম্পর্কে যথেষ্ট সচেতন হচ্ছে না। এর ফলে প্রতিযোগিতার বাজারে তারা অনেক ক্ষেত্রেই পিছিয়ে পড়ছে। এই ঘাটতি কাটানোর জন্য উদ্যোগ নিতে হবে শিক্ষকদেরই। শিক্ষকদের নিয়ে প্রশিক্ষণ কর্মসূচী অবশ্য চালু রয়েছে। আগামী দিনে প্রধান শিক্ষকদেরও প্রশিক্ষণ কর্মসূচী নিয়ে একটি ম্যানুয়াল বা নির্দেশিকা প্রস্তুত করা হবে। দক্ষ প্রশাসক হিসেবেও প্রধান শিক্ষকদের তৈরি হতে হবে বলে তিনি মন্তব্য করেন। এর পাশাপাশি মাদ্রাসাগুলির শিক্ষাগত ন্যূনতম পরিকাঠামো আছে কিনা তাও খতিয়ে দেখা হবে এবং তার ভিত্তিতে কিছু ব্যবস্থাও গ্রহণ করা হবে।

(খ) বেসরকারি স্কুলে বেনিয়ম ঃ অভিযোগ শিক্ষামন্ত্রীর কাছে

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা, ১২ই নভেম্বর—তোপসিয়া অঞ্চলে একটি বড় মাপের বেসরকারী স্কুল চিলড্রেন্স অ্যাকাডেমি বেশ কিছুদিন ধরেই চলছে যাবতীয় নীতি নিয়মকে দূরে সরিয়ে রেখেই। স্কুল সংক্রান্ত অনৈতিক কার্যকলাপের অভিযোগ স্কুলেরই ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকদের একাংশের। তাঁরা স্কুল সংক্রান্ত বেশকিছু অনিয়ম ও অবৈধ কার্যকলাপের অভিযোগ জানিয়েছেন রাজ্যের বিদ্যালয় শিক্ষামন্ত্রী কান্তি বিশ্বাসের কাছে। তাঁরা অভিযোগ তুলেছেন স্কুল চালানোর নামে স্কুলের মালিক ও অধ্যক্ষ শঙ্কর

চৌধুরী চালাচ্ছেন বেদম ব্যবসা। শুধু তাই নয় স্কুলের শিক্ষক-শিক্ষিকাদের ও বেশ অপ্রীতিকর পরিস্থিতির মধ্যে দাঁড়িয়ে ন্যূনতম বেতনের বিনিময়ে শিক্ষকতা করতে হচ্ছে। কিন্তু স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের কাছ থেকে কি কিছু কম পয়সা আদায় করা হয়? মোটেই না। ছাত্রপিছু-২৫০ থেকে ৪০০ টাকা টিউশন ফি নিয়ে প্রতিদানে শিক্ষার ন্যূনতম পরিকাঠামোর ব্যবস্থা করা হয়নি স্কুলের।

অথচ সরকারী অনুমোদন পাওয়ার জন্য স্কুলের অধ্যক্ষের তৎপরতা কিছু কম নয়। তবে স্কুলের অনুমোদন না পেলেও স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের হালতু হাইস্কুলের মাধ্যমে মাধ্যমিক পাস করানোর ব্যবসা চলছে ভালোই। স্থানীয় মানুষের অভিযোগ, স্কুলের অধ্যক্ষ ও মালিক শঙ্কর চৌধুরী স্কুল চালানোর পাশাপাশি এলাকায় দেশী মদের দোকানও চালাচ্ছেন। স্কুলের ৮০০ ছাত্রের কাছ থেকে ভালো অঙ্কের অর্থ আদায় করা হলেও শিক্ষক-শিক্ষিকাদের মাসিক আড়াই থেকে তিন হাজার টাকার বিনিময়ে শিক্ষকতা করতে বাধ্য করা হয়। জানা গেছে, শিক্ষিকাদের ক্ষেত্রে কিছু কুরুচিকর পরিস্থিতিরও মুখোমুখি হতে হয় মাঝেমধ্যে। দিনের পর দিন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আড়ালে এই রমরমা ব্যবসা দেখে বিক্ষুব্ধ এলাকারই কিছু মানুষ।

(গ) বিশ্বমানের শিশুবিভাগ এজি'তে

আগামী পাঁচ বছরের মধ্যে কলকাতার অ্যাসেম্বলি অব গড হাসপাতালের শিশু বিভাগকে বিশ্বমানের করতে চায় আন্তর্জাতিক সংগঠন মিশন অব মার্সি। শনিবার সংগঠনের প্রেসিডেন্ট বব হউলিহান জানিয়েছেন, এই হাসপাতালটিকে তাঁরা চলতি বছরে অধিগ্রহণ করছেন। এর পর এটিতে বিশ্বমানের শিশু বিভাগ করতে হলে কী কী করতে হবে তা জানার জন্য সমীক্ষা চালানো হবে। তবে শিশু বিভাগের পাশাপাশি এর অন্য বিভাগগুলিও চালু থাকবে। নতুন বিভাগের ব্যাপারে সহযোগিতা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন রাজ্যের স্বাস্থ্যমন্ত্রী সূর্যকান্ত মিশ্র। এ দিনই হাসপাতালের সপ্তাহব্যাপী রজতজয়ন্তী উৎসবের সূচনা করে মিশন ও হাসপাতালের হয়ে সূর্যকান্তবাবু বেশ কয়েক জন প্রতিবন্ধীকে হুইলচেয়ার দেন। হউলিহান জানিয়েছেন, আগামী তিন বছরের মধ্যে ১০ লক্ষ ডলার দান সংগ্রহ করে অত্যাধুনিক যন্ত্রপাতি আনা হবে। আমেরিকা থেকে প্রখ্যাত শিশুরোগ বিশেষজ্ঞরাও এই হাসপাতালে আসবেন।

(ঘ) 'ফার্ম হাউস-এর ওপর কর বসতে পারে

স্টাফ রিপোর্টার, নয়াদিল্লি, ২৪ অক্টোবর—সাধারণ কৃষি ক্ষেত্রকে কর কাঠামোর বাইরে রেখে 'ফার্ম হাউস'-এর উপর কর বসানো যায় কিনা তা নিয়ে চিন্তা ভাবনা শুরু করেছে কেন্দ্রীয় সরকার। কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী অজিত সিংহের বক্তব্য, ''বড়লোকের ফার্ম হাউসের উপর কর বসানোর কথা ভাবা হচ্ছে।'' তবে সাধারণভাবে কৃষি ক্ষেত্রের উপর আয় কর বা অন্যান্য কোনও কর বসানোর কোনও প্রশ্নই নেই বলে অজিত সিংহ জানিয়ে দেন।

তবে কৃষি ক্ষেত্রে কর বা অন্য কিছু নিয়ে নয়, আপাতত অজিত সিংহ উদ্বিগ্ন কৃষিক্ষেত্রে বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার চুক্তি নিয়েই। ১৯৯৫ সালে স্বাক্ষরিত চুক্তি অনুযায়ী ২০০৫ সাল থেকেই কৃষি ক্ষেত্রের বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত ভারতে লাগু হতে চলেছে। তার আগে আলাপ-আলোচনার সুযোগ নিয়ে তিনটি বিষয়ে ভারত সরকারকে যতখানি সম্ভব সুবিধা আদায়ের চেষ্টা করতে হবে। বিশেষ করে উন্নত দেশগুলির বাজারে ঢোকার বিষয়, কৃষি ভর্তুকি এবং শুল্ক কাঠামো নিয়ে ভারতকে কিছু সুবিধা দেওয়ার চেষ্টা করতে হবে। কার্যত সেই আলোচনায় বসার আগে কেন্দ্রীয় সরকার চাইছে দেশ জুড়ে একটি সার্বিক রাজনৈতিক ঐকমত্য।

এই ঐকমত্যের লক্ষ্যেই আজ দিল্লিতে সমস্ত রাজ্যের কৃষিমন্ত্রীদের একটি বৈঠক ডেকেছিলেন কেন্দ্রীয় কৃষিমন্ত্রী অজিত সিংহ। বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থার সদস্য-দেশগুলির সঙ্গে চূড়ান্ত আলোচনার আগে কেন্দ্রের দেশের মধ্যেই আরও কয়েক দফা বিভিন্ন স্তরে আলোচনা করতে চায়। আগামী ২৯ অক্টোবর সমস্ত রাজনৈতিক দল এবং বেসরকারি স্বেচ্ছাসেবী সংস্থাগুলির সঙ্গে বসছে কেন্দ্রীয় সরকার।

আজকের বৈঠকের পর, অজিত সিংহ জানান, সব রাজ্যের মতামত আমরা শুনেছি। মূলত তিনটি বিষয় নিয়ে আমাদের চিন্তা। এই বিষয়গুলি হল : অভ্যন্তরীণ ভর্তুকি, রফতানি ভর্তুকি এবং শুল্ক হার। উন্নত দেশগুলি নিজ নিজ দেশের কৃষি ক্ষেত্রকে বিশ্ব বাণিজ্যের জন্য তৈরি করতে প্রচুর ভর্তুকি দিচ্ছে। কিন্তু ভারতের মতো উন্নয়নশীল দেশের পক্ষে এত ভর্তুকি দেওয়া সম্ভব নয়।

উল্লেখ্য, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র সম্প্রতি ১১৫ বিলিয়ন ডলারের কৃষি ভর্তুকি ঘোষণা করেছে। অন্যদিকে, ইউরোপিয় ইউনিয়নের ভর্তুকি প্যাকেজের পরিমাণ সাড়ে তিনশ বিলিয়ন ডলার। এরফলে, বিশ্ব বাজারে তাদের কৃষকরা বাড়তি সুবিধা পাবেন। এরই পাশাপাশি রফতানি ভর্তুকিও এই সব উন্নত দেশগুলি বাড়াচ্ছে। ফলে তুলনামূলক কম দামে বিশ্ব বাজার দখল করা তাদের পক্ষে সম্ভব। অন্যদিকে, বহিঃরাষ্ট্রের পণ্যের ক্ষেত্রে উচ্চ শুল্ক ধার্য করে তার গতি রোধ করার সুযোগও উন্নত দেশগুলির রয়েছে।

এই অবস্থায় ভারত সরকার যেমন কৃষ্টি ক্ষেত্রে ব্যাপক ভর্তুকি দিতে পারছে না তেমনই রফতানি ভর্তুকি দিয়ে উচ্চ শুল্কের বিষয়টিকে নিষ্ক্রিয় করতে পারছে না। অজিত সিংহের বক্তব্য, এই পরিস্থিতিতে উন্নত দেশগুলির সঙ্গে আলোচনায় বসে সমানে সমানে খেলার জন্য আলোচনা চালাতে চায় নয়াদিল্লি। ভারতের লক্ষ্য, অন্য দেশের কৃষি ভর্তুকি কমানোর চাপ দেওয়া। একই সঙ্গে রফতানি ভর্তুকি কমানো ও শুল্ক হার কম রাখতে উন্নত দেশগুলির উপর চাপ তৈরি করলে ভারতীয় কৃষি পণ্য সুবিধা পেতে পারে। শুল্ক হার কম রাখতে পারলে সেই সব দেশের বাজারে ভারতীয় পণ্যের প্রবেশের সুযোগ থাকবে।

৭। নতুন এলাকায় একটি শো-রুম খোলার সম্ভাবনা নিয়ে সচিব হিসাবে আপনি আপনার প্রতিষ্ঠানের উপযুক্ত কর্তৃপক্ষের কাছে যে প্রতিবেদন পেশ করবেন তার খসড়া প্রস্তুত করুন।

৮। কলকাতায় অনুষ্ঠিতব্য শিল্পমেলায় একটি স্টল খোলার যথার্থ বিষয়ে আপনি আপনার প্রতিষ্ঠানের পরিচালক পর্ষৎ-এর চেয়ারম্যানের কাছে প্রতিবেদন উপস্থাপন করুন।

১২২.৭ গ্রন্থপঞ্জি

১। R. K. Chatterjee : *Mass Communication.*

২। Vladimir Hudec : *Journalism*

৩। Julius Waldschmidt : *Journalistic Genre and Their Use in Radio*

৪। Yuri Kashlev : *The Mass Media and International Relations.*

৫। C. B. Gupta : *Office Orgnaisation and Management.*

৬। Roy & Roy : *Modern Secretarial Practice and Office Procedure.*

৭। J. P. Bose : *Secretarial Practice and Office Procedure.*

একক ১২৩ ❑ অনুচ্ছেদ

গঠন

১২৩.১ উদ্দেশ্য

১২৩.২ প্রস্তাবনা

১২৩.৩ মূলপাঠ

১২৩.৪ সারাংশ

১২৩.৫ অনুশীলনী

১২৩.১ উদ্দেশ্য

এই এককটি মন দিয়ে কয়েকবার পড়ুন। খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ুন। পড়া শেষ হয়ে গেলে আপনি নিজে নিজেই বুঝতে পারবেন যে আপনি নিচে লেখা সামর্থ্যগুলি অর্জন করে ফেলেছেন। এই যে সামর্থ্য আয়ত্ত করলেন তার মূলে অনেকটাই রয়েছে এই এককটি উপস্থাপনার উদ্দেশ্য। সেই উদ্দেশ্যগুলি হল—

- যে-কোনো বিষয়কে সহজ ও সুন্দরভাবে সংক্ষেপে প্রকাশ করবার ক্ষমতা অর্জন।
- যে-কোনো বিষয় নিয়ে নিজের মতামত দিতে পারবেন খুব তাড়াতাড়ি।
- অবান্তর প্রসঙ্গ ছেঁটে ফেলে আসল কথাগুলি মনোজ্ঞ ভঙ্গিতে উপস্থাপন করবার দক্ষতা অর্জন।
- অল্প কথায় যে-কোনো বক্তব্যকে সংহত অথচ সাবলীলভাবে প্রকাশ করার প্রবণতা তৈরি হয়ে যাওয়া।
- মুহূর্তের ঝিলিক-মারা চিন্তাগুলি কীভাবে লেখার মধ্যে ফুটিয়ে তোলা যায় সেই কৌশলটির আয়ত্ত।
- তথ্যনিষ্ঠ থেকে কীভাবে একটি বিষয়কে গুছিয়ে লেখা যায় তার কৌশল রপ্ত করা।
- কোন্ বিষয়টা কীভাবে উপস্থাপন করতে হয়, কার পরে কোন্ তথ্য বা বিষয় পরিবেশন করতে হয় এবং কীভাবেই তা শেষ করতে হয় সে বিষয়ে যথাযথ ও যথোচিত ধারণা অর্জন।

১২৩.২ প্রস্তাবনা

সহজ করে লিখতে আমায় কহ যে / সহজ করে যায় না লেখা সহজে। একেবারে খাঁটি কথা। ঝকঝকে ভাষায় সাজিয়ে-গুছিয়ে সহজ করে বলতে পারা লেখার ব্যাপারটা আদপেই সহজ নয়। বরং এটাই হল সবচেয়ে কঠিন ব্যাপার। আমরা যেমন-যেমন ভাবি সেরকমটি ঠিক লিখে উঠতে পারি না। এর পিছনে যেমন শিষ্ট ভাষার একধরনের সীমাবদ্ধতা আছে, তেমনি রয়েছে চিন্তার অস্বচ্ছতা, অগোছালো ভাব। ফলে মনে মনে যা আওড়াই, লিখতে গিয়ে তা মাঝে মাঝেই পিছলে যায়, জুতসই শব্দ আসে না কলমের ডগায়। এর জন্য প্রথমেই দরকার নিয়মিত অনুশীলন। মনের দরজা-জানলা খোলা রেখে লেখকদের রচনা যেমন পড়তে হবে তেমনি ভেবে দেখতে হবে কীভাবে লেখক তাঁর ভাবনাকে শব্দের পর শব্দের মালা গেঁথে পরিবেশন করেছেন। বিষয় ও রীতি কীভাবে এক হয়ে অনবদ্য হয়ে উঠেছে সেদিকটায় খেয়াল রাখতে হবে বেশি বেশি করে।

অনুচ্ছেদ শব্দটার অভিধানগত অর্থ হল প্রবন্ধাদির বিভাগ বিশেষ। একে বলা যায় ক্ষুদ্র একটি পরিচ্ছেদও, ইংরেজিতে প্যারাগ্রাফ। সাধারণভাবে অনুচ্ছেদ বলতে বোঝায় এমন এক ধরনের স্বয়ংসম্পূর্ণ রচনা যার মধ্যে লেখকের ভাব-ভাবনার পরিপূর্ণ প্রকাশ ঘটবে খুবই সংক্ষেপে, এবং একটিমাত্র অনুচ্ছেদের স্বল্প-পরিসরে। অর্থাৎ একটি অনুচ্ছেদের মধ্যেই সমগ্র বিষয়টির সামগ্রিক পরিচয় দিয়ে দিতে হয়। এখানেই প্রবন্ধের সঙ্গে অনুচ্ছেদের মৌলিক তফাৎ। প্রবন্ধের ক্ষেত্রে এক-একটি তথ্য ও বক্তব্য পরিবেশনের জন্য স্বতন্ত্র অনুচ্ছেদ বাঞ্ছনীয়, কিন্তু অনুচ্ছেদের বেলায় সেটি হবার জো নেই। কেননা একটিমাত্র অনুচ্ছেদ-এর মধ্যেই পুরে দিতে হয় যাবতীয় ও নিতান্তই অপরিহার্য তথ্য ও বিষয়। এখানে একাধিক অনুচ্ছেদ রচনার কোনো সুযোগ নেই।

তবে প্রবন্ধের মতো অনুচ্ছেদ-ও একটি শিল্পকর্ম। এ জন্য যেসব ব্যাপারে সচেতন থাকলে ভালো হয় সেগুলি হল ঃ

(ক) নির্বাচিত বা প্রদত্ত বিষয়টি সম্পর্কে মনে মনে একটা স্পষ্ট ধারণা প্রথমে গড়ে নেবেন।

(খ) বক্তব্য ও ভাষার পুনরুক্তি বর্জন করে চলবার চেষ্টা করবেন।

(গ) ভাষায় সাধু রীতি ও চলিত রীতি মিশিয়ে ফেলবেন না। এ ধরনের মিশ্রণ পরিত্যাজ্য।

(ঘ) বানান নির্ভুল হবে।

(ঙ) ভাষা যাতে সহজ, সরল, স্পষ্ট হয় সেদিকে যত্ন নেবেন।

(চ) অনুচ্ছেদের প্রথম বাক্য থেকে শেষ বাক্যটি পর্যন্ত যাতে দৃঢ়পিনদ্ধ চেহারা পায় সেদিকে খেয়াল রাখলে ভালো হয়।

(ছ) রচনাভঙ্গিকে হৃদয়গ্রাহী করে তুলতে চেষ্টার কসুর না-করাই বিধেয়।

(জ) নীরস তথ্যকেও জারিয়ে নেবার চেষ্টা করবেন মনোজ্ঞ পদ্ধতিতে। অকারণ উচ্ছ্বাস পরিহার করাই কাম্য।

১২৩.৩ মূলপাঠ

মোটামুটিভাবে বুঝতে পারলেন অনুচ্ছেদ জিনিসটা কী। এবার নিচে পরপর কয়েকটি অনুচ্ছেদ রচনার নমুনা দেওয়া হল। প্রত্যেকটি অনুচ্ছেদ খুঁটিয়ে পড়ুন। তাহলেই বুঝতে পারবেন, প্রস্তাবনায় যা যা বলা হয়েছে, তার বাস্তব চেহারাটা কেমন দাঁড়ায় মূলপাঠে। এই রচনার পদ্ধতিটা। কী বা কোন্ কৌশল অবলম্বন করলে ঝকঝকে অনুচেছদ রচনা করা যায়, সেটাও স্পষ্ট হয়ে যাবে। প্রসঙ্গত মিলিয়ে দেখুন, কোন একটি বিষয়ে আপনাকে অনুচ্ছেদ লিখতে বললে আপনি যেমন-যেমন মনে-মনে সেই বিষয়টির পয়েন্টস বা সংকেত গুছিয়ে নেন তার সঙ্গে প্রদত্ত অনুচ্ছেদগুলির মিল-অমিল কোথায় কোথায় হচ্ছে বা হচ্ছে না সেটা এক ঝলকে জরিপ করে নিন। তবে খেয়াল রাখবেন সব অনুচ্ছেদ যে একই ছাঁচে তৈরি হবে এমন কোন জবরদস্তি এক্ষেত্রে খাটবে না। অনুচ্ছেদ-ও যেহেতু শিল্পকর্ম সেজন্য চিন্তার স্বাধীনতা, প্রকাশভঙ্গির নিজস্বতা প্রশংসারই দাবি রাখে।

(ক) বিশ্বমাতৃভাষা দিবস

এক-একটা বছর বা বিশেষ বিশেষ দিনকে তাৎপর্যমণ্ডিত করে তুলতে রাষ্ট্রসঙ্ঘের উদ্যোগে এর আগে দেশে দেশে পালিত হয়েছে আন্তর্জাতিক নারীবর্ষ, শিশুকন্যাবর্ষ, বিশ্বস্বাস্থ্য দিবস, আন্তর্জাতিক নারীদিবস, বিশ্ব পরিবেশ দিবস, মানবাধিকার দিবস ইত্যাদি। সেই ধারার অঙ্গস্বরূপ ২০০০ সাল থেকে ফেব্রুয়ারির ২১ তারিখটি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসাবেই চিহ্নিত। প্রত্যেক বছরেই এই দিবসটি যথাযোগ্য মর্যাদার সঙ্গে পালিত হয়ে আসছে আমাদের দেশে। পালিত হয় বাংলাদেশে। বিশ্বের সর্বত্র। আসলে, ২১ ফেব্রুয়ারি বাংলা ভাষাভাষীর কাছেই এক গর্বের দিন। এই দিনই আবার আমাদের শোকের দিন, সংগ্রামের দিন, স্বপ্ন প্রতিষ্ঠার দিন। আত্ম-আবিষ্কারের এই দিনটিতেই মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার সংগ্রামে ওপার বাংলার মানুষ রচনা করেন এক কালজয়ী রক্তঝরা ইতিহাস। এই দিনটিই স্মরণ করিয়ে দেয় বাহান্নর ভাষা-শহিদদের স্মৃতি। ১৯৫২ সাল। বাংলাদেশের রাজধানী ঢাকা শহরে মাতৃভাষার স্বাধিকার রক্ষার দাবিতে আন্দোলন সংগঠিত হয়েছিল। এই একুশে ফেব্রুয়ারিই সেদিন ঢাকায় রাজপথ ভিজে গিয়েছিল বরকত, সালাম, রফিক ও জব্বার—চারজন ভাষা শহিদের রক্তে। বলাই বাহুল্য, ধর্মের ভিত্তিতে, ভারতের অঙ্গচ্ছেদেই জন্ম নিয়েছিল পাকিস্তান—পূর্ব ও পশ্চিম। কিন্তু পূর্ব ও পশ্চিমের ভৌগোলিক দূরত্ব, সাংস্কৃতিক ব্যবধান, ভাষাগত পার্থক্য অস্বীকার করেই পাকিস্তান সরকার পুবের ওপরও

চাপিয়ে দিয়েছিল উর্দুভাষার জবরদস্তি। ১৯৫২-র ২৬ জানুয়ারি ঘোষিত হয়—"একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা।" ফুঁসে উঠল পূর্ব ভূখণ্ডের বাঙালি জনগণ। ২৭ জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরনো কলাভবনের আমতলায় হল প্রতিবাদ সভা। ৩০ জানুয়ারি ছাত্র ধর্মঘট। ২১ ফেব্রুয়ারি পূর্ববঙ্গ জুড়ে ডাক দেওয়া হল সাধারণ ধর্মঘটের। পরিস্থিতি অগ্নিগর্ভ। মিছিলে মিছিলে উত্তাল সমগ্র প্রদেশ। আকাশ-বাতাস কাঁপিয়ে দাবি উঠল 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই—বাংলা চাই, বাংলা চাই', 'মুখের ভাষা, মায়ের ভাষা কেড়ে নেওয়া চলবে না—চলবে না চলবে না।' মাতৃভাষার প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে এ-এক গৌরবোজ্জ্বল যুগান্তকারী ইতিহাস। এই সংগ্রামের ধারাই যেন নতুন ব্যঞ্জনা পেল ১৯৫৬-র ১ নভেম্বর যখন ভাষার ভিত্তিতে রাজ্যগঠনের দাবি নিয়ে পুরুলিয়া থেকে হাজার-হাজার বাংলাভাষীর পদযাত্রা এল কলকাতায়। মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার সংগ্রামে ১৯৬১-র ১৯মে শিলচরে শহিদ হলেন একজন মহিলাসহ ১১ জন। তবে ১৯৫২-র ২১ ফেব্রুয়ারি ছিল সমস্ত ভাষা-সংগ্রামের প্রেরণাস্থল, আলোকবর্তিকা। তাই এই দিনটিকে পৃথিবী জুড়ে স্মরণ করার মধ্যে মাতৃভাষার মর্যাদাই স্বীকৃত। ধ্বনিত হয় ঃ

আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলিতে পারি?
ছেলেহারা শত মায়ের অশ্রু গড়া এ ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলিতে পারি?

(খ) ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর

যে মননক্রিয়া হল মনের জীবন, সেই জীবনই মনুষ্যত্ব। আর সেই মনুষ্যত্বে যিনি সীমাহীন আকাশ, অভ্রংলিহ স্বর্ণচূড়া তিনিই হলেন অলোকসামান্য পুরুষ ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর। এক লহমায় তিনিই ঘুচিয়ে দিয়েছেন শত শত শতাব্দীর কুসংস্কারদীর্ণ আমাদের সমাজ-অচলায়তনের অন্ধকার, ছড়িয়ে দিয়েছেন শিক্ষার আলো, আর্ত-হৃদয়ে সঞ্চার করেছেন করুণার অমৃত-বারি। তিনিই সেই বিরলতম ব্যক্তিত্ব যিনি অবজ্ঞার তাপে শুষ্ক এই মরুভূমির দেশে প্রবাহিত করে দেন মানবতার মন্দাকিনী। পাশাপাশি তিনিই সেই মহত্তম ভাষাশিল্পী যিনি বাংলার গদ্যের গভীরে প্রথম তোলেন ছন্দের কল্লোল, আনেন শৈল্পিক সংযমের সুমিত সুষমা। এ হেন চেতনার তরবারি ঈশ্বরচন্দ্রের আর্বিভাব ঘটে সেকালের হুগলির (বর্তমান মেদিনীপুর) অন্তর্গত বীরসিংহ গ্রামে, ঠাকুরদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও ভগবতীদেবীর গৃহে। সময়টা ২৬ সেপ্টেম্বর ১৮২০। গ্রামের পাঠশালাতেই তাঁর প্রাথমিক পাঠ গ্রহণ। তারপর কলকাতা। সংস্কৃত কলেজ তাঁর প্রথাগত শিক্ষালাভের মর্মভূমি। প্রত্যেক পরীক্ষায় তিনি হতেন প্রথম, পেতেন বৃত্তি। দারিদ্র্য তাঁকে কখনও বিভ্রান্ত করতে পারেনি, বরং করেছে আরো বেশি প্রত্যয়ী, সংগ্রামী, দৃঢ়। অসাধারণ অধ্যয়ন স্পৃহার অসামান্য স্বীকৃতি পান ১৮৪০-এ, লাভ করেন 'বিদ্যাসাগর' উপাধি। তারপর যোগ দিলেন ফোর্ট

উইলিয়ম কলেজে, হলেন বাংলা বিভাগের হেড-পণ্ডিত। তারপর অধ্যক্ষ হিসাবে দায়িত্ব নিলেন সংস্কৃত কলেজের। কিন্তু বেশি দিন সেখানে নিজেকে বন্দি করে রাখতে পারলেন না। তৈরি করলেন মেট্রোপলিটন স্কুল ও কলেজ। একে একে গড়ে তুললেন একাধিক বিদ্যালয়। শিক্ষাবিস্তারে তিনি ছিলেন অনলস, নারীশিক্ষা বিস্তারে দৃঢ়ব্রতী, সংগ্রামী। বিধবা বিবাহ তিনি প্রচলন করেন, বাল্যবিবাহ করেন নিবারণ। তাঁর কথায়, 'বিধবা বিবাহ আমার সবচেয়ে বড় সৎকর্ম'। ইংরেজি শিক্ষার প্রসারেও তাঁর সক্রিয় ভূমিকা দীপ্যমান। তাঁর 'বর্ণপরিচয়' মাতৃভাষা শিক্ষার আজও প্রথম ধাপ। কথামালা, বোধোদয়, চরিতাবলী, আখ্যানমঞ্জরী, বেতাল পঞ্চবিংশতি, শকুন্তলা, সীতার বনবাস, ভ্রান্তিবিলাস ইত্যাদি বিদ্যাসাগরের রচনাসম্ভার বাংলা গদ্যসাহিত্যের এক-একটি উজ্জ্বল হিরের টুকরো। রবীন্দ্রনাথের কথায়, 'বিদ্যাসাগর বাংলা ভাষার প্রথম যথার্থ শিল্পী ছিলেন।' তাঁর মতে, 'বিদ্যাসাগর বাংলা গদ্য ভাষার উচ্ছৃঙ্খল জনতাকে সুবিভক্ত সুবিন্যস্ত সুপরিচ্ছন্ন এবং সুসংগত করিয়া তাহাকে সহজ গতি এবং কার্যকুশলতা দান করিয়াছেন।' বস্তুত, বিদ্যাসাগর আমাদের জীবনে পুরোপুরি বিচ্ছিন্ন, নিঃসঙ্গ, বিরলতম ব্যক্তিত্ব। তাঁর অজেয় পৌরুষ, নিরলস সংগ্রাম, সর্বব্যাপী মানবতা, কঠোরতা, দুর্দমতা, অনম্যতা, জীবনবাদ সব মিলিয়ে তিনি এক জ্যোতির্ময় মনুষ্যত্ব। অবশেষে সংগ্রামে, বেদনায়, মানবমহিমার এই অপারাজেয় পৌরুষশিখা নির্বাপিত হয় ১৮৯১-র ২৯ জুলাই। 'বজ্রাদপি কঠোরাণি মৃদুনি কুসুমাদপি' বিদ্যাসাগর যথার্থই নিয়েছিলেন আমাদের মানুষ করার ভার। মাইকেল মধুসূদনের কথায়,

বিদ্যারসাগর তুমি বিখ্যাত ভারতে।
করুণার সিন্ধু তুমি, সেই জানে মনে,
দীন যে, দীনের বন্ধু!—উজ্জ্বল জগতে
হেমাদ্রির হেম-কান্তি অম্লান কিরণে।

(গ) রবীন্দ্রনাথ

আমাদের মর্মে মর্মে যাঁর অধিষ্ঠান, যিনি রয়েছেন আমাদের শয়নে-স্বপনে-জাগরণে, আমাদের সেই অস্তিত্ব, স্মৃতি-সত্তা-ভবিষ্যৎ হলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তিনিই কবীনাং কবিতমঃ, স্বপ্নের দিশারী, ভারত-আত্মা বিশ্বপথিক। জন্মেছিলেন ১২৬৮ বঙ্গাব্দের ২৫ বৈশাখ। পিতা ঃ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর, মাতা ঃ সারদা দেবী। রবীন্দ্রনাথ ছিলেন তাঁদের চতুর্দশতম সন্তান। আবির্ভূত হন তিনি উনিশ শতকের নবজাগরণের প্রাণকেন্দ্র কলকাতার জোড়াসাঁকোর ঠাকুর-পরিবারে। শিক্ষা নিয়েছিলেন মূলত জীবনের পাঠশালা থেকে। 'বনফুল' দিয়ে কাব্যাঞ্জলি শুরু করে 'ভানুসিংহ ঠাকুরের পদাবলী' শোনান, আর তুলে ধরলেন 'কবিকাহিনী'। তারপরেই 'শৈশব-সংগীতে'র সীমানা পেরিয়ে 'সন্ধ্যাসংগীত' অতিক্রম করে শোনালেন 'প্রভাতসংগীত', স্পষ্ট হল 'ছবি ও গান'। 'কড়ি ও কোমল'-এ 'মানসী' রচিত হল, ভরে গেল 'সোনার তরী।' চিত্রিত 'চিত্রা'য় 'চৈতালি'-তে দেখা গেল 'কণিকা'। 'কথা' দিয়ে 'কল্পনা'র উদ্দামতায়

‘ক্ষণিকা’র দ্যুতি ছড়িয়ে ‘নৈবেদ্য’ রচনা করলেন। ‘স্মরণ’ হল স্মরণীয়তর, ‘শিশু’ প্রাণময়। ‘উৎসর্গ’ করলেন কবি ‘খেয়া’। নিবেদিত হল ‘গীতাঞ্জলি’, গাঁথলেন ‘গীতিমাল্য’, শেষ হল ‘গীতালি’। না, শেষ নয় এখানেই। ‘বলাকা’র ডানায় ‘পলাতকা’র ছায়া নিয়ে ‘শিশু ভোলানাথ’ ‘পূরবী’তে যে সুর তুললেন তার ‘লেখন ও স্ফুলিঙ্গ’ ‘মহুয়া’র সৌরভে ‘বনবাণী’তে এসে ঘোষণা করল ‘পরিশেষ’। সত্যিই কি সমাপন? ‘পুনশ্চ’ তিনি ‘বিচিত্রতা’য় ‘শেষ সপ্তক’ রচনা করবেন বলে ‘বীথিকা’র ‘পত্রপুট’-এ ‘শ্যামলী’কে ঘিরে ‘খাপছাড়া’ ভাবে ‘ছড়ার ছবি’ এঁকে ‘প্রহাসিনী’র ‘ছড়া’য় এসে দাঁড়ালেন ‘প্রান্তিক’-এ। জ্বালতে চাইলেন ‘সেঁজুতি’। ‘আকাশপ্রদীপ’-এর আলোয় ‘নবজাতক’ ‘সানাই’ বাজিয়ে ক্ষণিকের আশ্রয় নিলেন ‘রোগশয্যায়’। ‘আরোগ্য’ লাভ করতে দেরি হল না। ৮১তম ‘জন্মদিনে’ই অনুভব করলেন ‘শেষ লেখা’র তাগিদ। অবশ্য এ সবের ফাঁকে-ফাঁকে কবি-সার্বভৌম রবীন্দ্রনাথের লেখনীতে গীতিনাট্য, কাব্যনাট্য, নাট্যকাব্য, রোমান্টিক ট্রাজেডি, রূপক-সংকেতিক, সামাজিক, ঋতুনাট্য, নৃত্যনাট্য তৈরি হয়ে যায়। বাংলা ছোটগল্পের তো তিনিই যথার্থ রূপকার। ভাষাতত্ত্ব, শিক্ষাতত্ত্ব, রাষ্ট্রচিন্তা, ছন্দোবিজ্ঞান, বিশ্বপরিচয়—সব কিছু নিয়ে সমৃদ্ধ করলেন বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যের ভুবনটি। ছিন্নপত্র, ছিন্ন পত্রাবলী, চিঠিপত্রে উন্মোচিত হল তাঁর হৃদয়ের অনুভূতি, ঘটল মনীষার বিচ্ছুরণ, আবেগের শতঝর্ণাধারা। পেয়ে যান নোবেল পুরস্কার-ও। গড়ে তোলেন শ্রীনিকেতন, শান্তিনিকেতন, বিশ্বভারতী। অবশেষে ১৯৪১-এর ৭ আগস্ট ছিন্ন করলেন তিনি মর্ত্যমমতা। কিন্তু আমরা জানি—

তিনি জীবনের সংগীত
তিনি সত্তার নির্ভর
তিনি মুক্তির পথনির্দেশ
তিনি চলমান সুন্দর।

(ঘ) কাজী নজরুল ইসলাম

বিংশ শতাব্দীর অসম্ভবের সম্ভাবনার যুগে যিনি জন্মগ্রহণ করে সমগ্র বাঙালি জাতির স্বপ্নকে ভাষা দিয়েছিলেন কবিতায়, গানে তিনিই হলেন কাজী নজরুল ইসলাম। বিপ্লবী বাংলার এই অগ্নিহোত্রী কবিই ছিলেন যেন কালবোশেখির ঝড়, দুর্বার ধূমকেতু। রণোন্মত্ত সৈন্যদলের তিনি তূর্যবাদক, জীবনযুদ্ধের অগ্নিবীণা। আবির্ভাব তাঁর ১৮৯৯-এর ২৪ মে, বর্ধমানের চুরুলিয়ায় ফকির আহম্মদ ও জাহেদা খাতুনের পরিবারে। অভাব-অনটন ছিল তাঁর নিত্যসঙ্গী। তাই প্রথাসিদ্ধ লেখাপড়া তাঁর বেশি দূর হয় নি, নিরবচ্ছিন্ন তো নয়ই। সাত বছর বয়সেই বাবাকে হারিয়ে জীবনসংগ্রামে ঝাঁপিয়ে পড়তে হয় তাঁকে। নানান পেশায় পড়েন জড়িয়ে, আবার বিদ্যালয়ের নেশাও তাঁর ঘুচত না। কোরান-শরীফ পাঠ করা ও ধর্মীয় উপদেশ দান যাঁর বাল্যে ছিল বৃত্তি তিনিই পরে লিখলেন, ‘কাটিয়ে উঠেছি ধর্ম-আফিম নেশা / ধ্বংস করেছি ধর্ম-যাজকী পেশা।’ কখনো ভিড়লেন লেটো দলের জন্য গান বা পালাগান রচনার

আসরে, আবার কখনো টিকে থাকার দায়ে নেন রুটির দোকানে চাকরি। মাঝে মাঝে আবার বিদ্যালয়ে যাতায়াত, ঘন ঘন চলত স্কুল পাল্টানোও। দশম শ্রেণির ছাত্রাবস্থাতেই নাম লেখালেন সেনাবাহিনীতে, হয়ে গেলেন হাবিলদার, বয়স তখন সতেরো। আবার ছেদ পড়ল। সৈনিক জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটল। ফিরে এলেন কলকাতার নাগরিক পরিমণ্ডলে। বেছে নিলেন সাংবাদিকতার বৃত্তি। যোগ দিলেন 'নবযুগ' দৈনিকে। পরে যুক্ত হন 'দৈনিক সেবক'-এর সঙ্গে। ১৯২২ সাল। বের করলেন নিজেই একটি কাগজ—'সাপ্তাহিক ধূমকেতু'। রবীন্দ্রনাথ জানালেন স্বাগত। বললেন, 'আয় চলে আয়, রে ধূমকেতু, /আঁধারে বাঁধ অগ্নিসেতু,/দুর্দিনের এই দুর্গশিরে/উড়িয়ে দে তোর বিজয় কেতন', সেই বিজয় পতাকাই নজরুল ওড়ালেন বাংলা কবিতায়, যৌবনের শিরায় শিরায়। তাই ব্রিটিশের রাজরোষে পত্রিকাটি হল বাজেয়াপ্ত, নজরুল কারারুদ্ধ। এক বছর বাদে হলেন মুক্ত। বিয়ে করলেন প্রমীলা সেনগুপ্তকে। নিজের জীবনেই প্রমাণ রাখলেন 'মোরা এক বৃন্তে দুটি কুসুম হিন্দু-মুসলমান/মুসলিম তার নয়নমণি, হিন্দু তাহার প্রাণ।' ১৯২২-এ বেরোয় তাঁর 'অগ্নিবীণা'। ঘোষণা করলেন 'আমি চির-বিদ্রোহী বীর—/আমি বিশ্ব ছাড়ায়ে উঠিয়াছি একা চির উন্নত শির'। পরের বছরেই 'দোলন-চাঁপা'। বললেন, 'আজ সৃস্টি-সুখের উল্লাসে—/মোর মুখ হাসে মোর চোখ হাসে মোর টগবগিয়ে খুন হাসে/আজ সৃষ্টি-সুখের উল্লাসে।' একে একে প্রকাশিত হল বিষের বাঁশী, ভাষার গান, প্রলয় শিখা, ছায়ানট, পুবের হাওয়া, সাম্যবাদী, চিত্তনামা, সর্বহারা, ফণিমনসা, সিন্ধুহিন্দোল, ঝিঙে ফুল, সাত ভাই চম্পা, জিঞ্জীর, চক্রবাক, সন্ধ্যা, নতুন চাঁদ, মরু ভাস্কর, শেষ সওগাত। লিখেছেন অজস্র গান, দিয়েছেন সুর। অনুবাদ-ও যেমন করেছেন হাফিজকে, ওমর খৈয়ামকে তেমনি লিখেছেন গল্প, উপন্যাস, পত্রোপন্যাস, প্রবন্ধ, নাটিকা, গীতিনাট্য, ছায়াচিত্রের কাহিনী ইত্যাদি। অবশেষে ট্রাজিক নায়কের মতোই দীর্ঘদিনের মৌন যন্ত্রণা নিয়ে তিনি মারা যান ১৯৭৬-এর ২৯ আগস্ট। তাঁর দেহ সমাধিস্থ হয় বাংলাদেশে। অন্নদাশঙ্কর রায় যথার্থই লেখেন—

ভুল হয়ে গেছে বিলকুল
আর সব কিছু ভাগ হয়ে গেছে
ভাগ হয়নিকো নজরুল।

(৬) পরিবেশ

সুস্থ স্বাভাবিক জীবনযাপনের ক্ষেত্রেই শুধু নয়, নিরাপত্তার ব্যাপারেও আজ যা বিরাট প্রশ্ন হয়ে মানুষকে শঙ্কিত, বিপর্যস্ত করে তুলছে তা হল পরিবেশ দূষণের সমস্যা। অবক্ষয়ের দিকে যেন দ্রুত ছুটে চলেছে আমাদের পরিবেশ, হারিয়ে যাচ্ছে তার সুষম বিন্যাস, সংগতি সাধক ভারসাম্য। বাস্তবিকই যে পৃথিবী আমাদের বাসভূমি, যেখানে যুগ যুগ ধরে বংশ পরম্পরায় স্বচ্ছন্দে জীবনযাপনের জন্য প্রয়োজনীয় জল-বায়ুমণ্ডল-উদ্ভিদ ও বন্যপ্রাণী সমৃদ্ধ আরণ্যভূমি, মাটি, মাটির নিচের খনিজ পদার্থ—জীবনের পক্ষে সহনীয় উষ্ণতা—সকল শক্তির উৎস সূর্যালোক রয়েছে, আজ সেখানে পড়েছে

গ্রহণের ছায়া। ক্ষিতি, অপ, তেজ, মরুৎ, ব্যোম্ সহ সজীব ও অজীব উপাদান নিয়ে গড়া জীবনের নির্ভরস্থল পরিবেশে লেগেছে বিনষ্টির ছোঁয়া। অথচ আমরা ভুলে যাই, এই পৃথিবীর অনন্য সম্পদ যে জীবন, কোটি কোটি বছর ধরে পরস্পরের ওপর নির্ভর করে বিভিন্ন প্রজাতির জীব যেখানে বসবাস করছে, সেই বিশ্বের কোন জীবের পক্ষেই আর টিকে থাকা সম্ভব হবে না, যদি মানুষ বঞ্চিত হয় পরিবেশের আনুকূল্য থেকে। তাই পরিবেশের পক্ষে ক্ষতিকর উপাদান ও বর্তমান সমস্যাবলিকে যেমন আমাদের সনাক্ত করা জরুরি তেমনি প্রয়োজন তার প্রতিকারকল্পে সঠিক ব্যবস্থাগ্রহণ। বস্তুত শিল্পবিপ্লবের পর থেকেই পরিবেশের ওপর যথেচ্ছ অনাচার, অত্যাচার শুরু হয়। মানুষের হাতেই ঘটে যায় তার গুণগত মানের বদল। দেখতে দেখতে আজ সেই সমস্যার ব্যাপকতা মানবসভ্যতাকেই চ্যালেঞ্জর সামনে দাঁড় করিয়ে দিয়েছে। গ্রেট কমনস্ বা মহত্তম যৌথ সম্পত্তি-ও পরিবেশ দূষণে আক্রান্ত। জীবাশ্ম জ্বালানির অনিয়ন্ত্রিত ব্যবহার আবহমণ্ডলে বাড়িয়ে দিয়েছে কার্বন ডাই-অক্সাইডের পরিমাণ, পাশাপাশি নিধন হচ্ছে সবুজ অরণ্য। ক্লোরোফ্লুরোকার্বন যৌগদের ব্যবহার, নির্গমন এবং অন্যান্য ওজোন ধ্বংসকারী গ্যাসীয় পদার্থের নির্গমনের ব্যাপকতা শান্তমণ্ডলে ওজোন-গর্ত ধীরে ধীরে বাড়িয়ে চলেছে। বেশি বেশি ফসলের আশায় কৃষিক্ষেত্রে যেভাবে ক্ষতিকারক রাসায়নিক পদার্থের ব্যবহার দিনকে দিন বেড়ে চলেছে তাতে বাস্তুতন্ত্র ও জনস্বাস্থ্য ভয়ংকর বিপদের মুখোমুখি। ক্লোরিন ঘটিত কীটনাশক পদার্থ ডিডিটি, অ্যালড্রিন, ক্লোরডেন, লিনডেন, হেপ্টাক্লোর, সাইরেক্স, কেপোন, ডায়েলড্রিন-এর ব্যাপক প্রয়োগ মহাসমুদ্র ও মেরু অঞ্চলকেও নিরাপদ রাখছে না। অতি-বেগুনি রশ্মির প্রভাবও যদি নিয়মিত বেড়ে যায় তাহলে একদিন এই পৃথিবী হয়ে যেতে পারে নির্বীজ, এমনকি জীবশূন্য-ও। অবশ্য কয়েক বছর ধরে পরিবেশ সম্পর্কে সচেতনতা বর্ধমান। ১৯৭২ সালেই সুইডেনের স্টকহোমে আন্তর্জাতিক সম্মেলনে 'পরিবেশ' নিয়ে হয় গুরুত্বপূর্ণ আলোচনা। ১৯২২-র জুন মাসে পরিবেশ ও উন্নয়ন নিয়ে রাষ্ট্রসংঘের যে সম্মেলন হয় রিও ডি জেনেরিও-য় তা বসুন্ধরা সম্মেলন হিসাবেই পায় পরিচিতি। তাছাড়া বিভিন্ন দেশেও প্রণীত হচ্ছে পরিবেশ সুরক্ষায় বিবিধ আইন। আমাদের দেশে প্রথম আইন তৈরি হয়েছিল ১৮৭৮-এ, নাম তার ভারতীয় বনভূমি আইন। তারপর একের পর এক অনেক আইনই প্রণয়নয় হয়। এর মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ্য হল জল (দূষণ নিবারণ এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৭৪; বায়ু (দূষণ নিবারণ এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণ) আইন, ১৯৮১; জল (দূষণ নিবারণ এবং দূষণ নিয়ন্ত্রণ) উপকর আইন, ১৯৭৭; পরিবেশ (সংরক্ষণ) আইন, ১৯৮৬। পরিবেশ রক্ষার দাবিতে আমাদের দেশে আন্দোলনও খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পরিবেশ আন্দোলন এখন চিপকো আন্দোলন, নর্মদা বাঁচাও আন্দোলন, সাইলেন্ট ভ্যালি আন্দোলন খুবই গুরুত্বপূর্ণ। পরিবেশ আন্দোলন এখন বিশ্বজোড়া মাত্রা পেয়েছে। আন্তর্জাতিক ভাবনার এলাকাভিত্তিক প্রয়োগই হল পরিবেশ সংরক্ষণের উজ্জ্বল কম্পাস।

(চ) মৌলবাদ

মানবসভ্যতার অস্তিত্বকেই যারা বিপন্ন করে তুলছে মাঝে-মাঝে, থমকে দিতে চাইছে চিন্তা-ভাবনার অগ্রগতি তারই অন্যতম হল মৌলবাদ। মননের নির্বাসনে, মত্ততার অন্ধকারে প্রচ্ছন্ন নরক যেন নেমে

আসে এই সুশোভনা ধরণীতে সেই মৌলবাদের পোশাক পরে। দাঁত-নখ বের করা বর্বরতা নেমে আসে একুশ শতকের পায়ে কখনও ভারতের মাটিতে, আরবের মরুমৃত্তিকায়। নেমে আসে আফগানিস্তানের গুহায় গুহায় পাহাড়ে পাহাড়ে, পাকিস্তানের নগরে বন্দরে, লাতিন আমেরিকার দেশে দেশে, আফ্রিকার কৃষ্ণকায় খরার মণ্ডলে। জ্বলে গুজরাত, জ্বলে প্যালেস্তাইন। জ্বলে আসলে মনুষ্যত্ব, সংস্কৃতির মুখ, মেধা ও মনীষার মানচিত্র। বস্তুত ইংরেজি ফান্ডামেন্টালিজম শব্দটির চালু বাংলা হল মৌলবাদ। এ শিকড় রয়েছে লাতিনে বা ফরাসিতে। যখন কোন বিষয়ের মূলগত চিন্তাভাবনার উপলব্ধির মধ্যে অস্পষ্টতা-অস্বচ্ছতা-জড়তা থাকে, অথচ তা নিয়ে প্রকাশ পায় বিচিত্র-বিকৃত অন্ধতা, সেই তিমিরবিলাসী চিন্তাভাবনাকে বলা যায় মৌলবাদ। আবার, 'যদি উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে একটি বিষয়কে দুর্বোধ্য, দুর্জ্ঞেয়, নানাবিদ অপ্রয়োজনীয় আচার-অনুষ্ঠানের বেড়াজালে বেঁধে ফেলা হয়, যদি বৃহত্তর সামাজিক স্বার্থে একটি বিষয়ের প্রয়োগকে ব্যাহত করে একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠী বা স্বার্থান্বেষী চক্রের স্বার্থে তাকে কাজে লাগানো হয়, তাহলে বৈজ্ঞানিক বিচারে আমরা বলব চিন্তাভাবনা এবং কাজের ক্ষেত্রে মৌলবাদের প্রকাশ ঘটছে।' এবং এই মৌলবাদের গহ্বর থেকে বেরিয়ে আসে সাম্প্রদায়িকতা। বলাই বাহুল্য, মৌলবাদীরা সব সময়েই চান তাঁদের সমাজ হয়ে উঠবে শুদ্ধতায় পরিপূর্ণ, গোঁড়া, পিউরিটান, মনোলিথিক। এঁরা একমার্গী। এঁরা চান রাজনীতি ও ধর্মের মিলন। কার্যত কিছু কুসংস্কারকে বৈজ্ঞানিক সত্য হিসাবে চিহ্নিত করা মৌলবাদের অন্যতম ধর্ম। এতে সমূলে ধ্বংস হয়ে যায় ব্যক্তিবুদ্ধি, বিনষ্টি পায় ইতিহাসের সত্য, বিজ্ঞানের যুক্তি, দর্শনের বোধ, ধর্মের অন্তঃসার, সমাজবিবেক। দাপিয়ে বেড়ায় সংখ্যাগরিষ্ঠতার বিভীষিকা, শোনা যায় মানবতার মর্মন্তুদ আর্তনাদ। তাই প্রশ্ন জাগে,

নাৎসিরা ছিল আরো কি ভয়ংকর?
নব-নাৎসিরা ফিরে এলো এই দেশে?
সবরমতিতে চালু গ্যাস চেম্বার।
ধর্ম কোথায়? লজ্জাও থমকায়।

(ছ) বাংলার ঋতুবৈচিত্র্য

ঋতু-রঙ্গমঞ্চে বাংলা অপরূপা, প্রাণপ্রদীপ্তা। প্রকৃতির রূপ-রস-বর্ণ-গন্ধ বাংলাকে করেছে অনবদ্য, অসামান্য। একদিকে তার কোমল-মধুর মায়াময় প্রকৃতি, আর একদিকে তার রুক্ষ-কঠিন শুষ্ক-ভয়াল ভ্রূকুটি। বাংলার ঋতুবৈচিত্র্য তার প্রকৃতিকে করেছে লীলাময়ী। ঋতুরঙ্গশালায় কখনো সে লাস্যময়ী, আবার কখনো রণরঙ্গিনী। সূর্যকে ঘিরে আবর্তনের পথে নিরন্তন পরিক্রমা করে চলেছে পৃথিবী। এরই ফলে পৃথিবীর নানা জায়গায় হয় উত্তাপের তারতম্য আর এই উষ্ণতার তারতম্যে পৃথিবীর বুকে নেমে আসে পর্যায়ক্রমে শীত ও গ্রীষ্ম। প্রকৃতির রঙ্গশালায় জেগে ওঠে ঋতু-বৈচিত্র্যের লীলাখেলা। বাংলার প্রকৃতিও এই নিয়মের বাইরে নয়। এই ঋতুর পর অন্য ঋতুর চলে নিত্য আসা-যাওয়া, শোনা যায় আগমনী-বিজয়া। রুদ্র সন্ন্যাসীর পিঙ্গল জটাজাল বিস্তার করে বর্ষারম্ভেই দেখা দেয় ভয়াল-ভৈরব গ্রীষ্ম।

সূর্যের দাবদাহে নিষ্করুণ রুক্ষতার তপ্ত নিঃশ্বাস ছড়িয়ে পড়ে শহরে ও গ্রামে, কাননে-প্রান্তরে। পাশাপাশি ঘটে ফলের সম্ভার। অবশেষে বৈশাখ-জ্যৈষ্ঠ পেরিয়ে শ্যামল সুন্দর রূপে আসে বর্ষা। আষাঢ়-শ্রাবণে বর্ষার বিভঙ্গবিলাসে লীলায়িত হয় জীবনের নিগূঢ় তাৎপর্য। বজ্রমানিক দিয়ে গাথা বর্ষার মালা। বর্ষাশেষে ঘটে শরতের অভিষেক। একদিকে 'ভরা বাদর, মাহ ভাদর', আর একদিকে নীল আকাশে শাদা মেঘের ভেলা, অপরাজিতার নীল-বাহার, কাশের গুচ্ছ, শিউলির সুঘ্রাণ। শারদোৎসবে মেতে ওঠে প্রকৃতি। প্রাণের ছোঁয়ায় শরতের মহিমা। তারপর হেমন্তের মৃদু পদক্ষেপ। বড়ো কুণ্ঠিত, সংকুচিত যেন তার আগমন। কবির কথায় 'শুয়েছে ভোরের রোদ ধানের উপর মাথা পেতে/অলস গেঁয়োর মতো এইখানে কার্তিকে ক্ষেতে'। হেমন্তের পরে শীত। রিক্ততার ছায়া সর্বত্র। 'আমলকি-ডাল সাজল কাঙাল/খসিয়ে দিল পল্লবজাল।' কখনো কখনো কনকনে ঠান্ডার সঙ্গে হঠাৎ হঠাৎ কুয়াশার উপস্থিতি। গরম জামা-কাপড়ে শরীর জুড়ে সকলেই জবুথবু। উত্তরবঙ্গসহ বাঁকুড়া-পুরুলিয়া-বীরভূম-মেদিনীপুরে শীতের কামড় বেশ কঠিন। তবে বাতাসে বাতাসে এ সময়েই নলেন গুড়ের ঘ্রাণ, ফুলকপি-বাঁধাকপি-টম্যাটো-ধনে পাতার বাহার। সবশেষে ঋতুরাজ বসন্তের আবির্ভাব। নবযৌবনের বার্তা ছড়িয়ে পড়ে দিকে দিকে। 'আজি দখিন-দুয়ার খোলা/এসো হে, এসো হে, আমার বসন্ত এসো।' বাস্তবিকই বহুবর্ণময় বাংলার ঋতুবৈচিত্র্য।

১২৩.৪ সারাংশ

অবান্তর প্রসঙ্গের ডালপালা ছেঁটে ফেলে, যুক্তির পারম্পর্যে গেঁথে, ভাষার মাধুর্যে রচনারীতির স্বাদুত্বে ও ঠাসবুনোটে একটি বিষয়কে একটি মাত্র অনুচ্ছেদে উপস্থাপিত করাই হল আদর্শ অনুচ্ছেদ নির্মাণ। এ-ও হল এক ধরনের ভাষাশিল্প।

১২৩.৫ অনুশীলনী

নিম্নলিখিত বিষয়গুলি সংক্ষেপে অনুচ্ছেদ রচনা করুন। দরকার মতো উত্তর-সংকেতের সাহায্য নিন।

(ক) *বিবেকানন্দ ও যুবসমাজ* [*উত্তর সংকেত* ঃ ভূমিকা—বিবেকানন্দের প্রাসঙ্গিকতা—বিবেকানন্দের আদর্শ—মানবসেবায় বিবেকানন্দ—যুবসমাজের বর্তমান অবস্থা—উপসংহার।]

(খ) *যুদ্ধ নয়, শান্তি চাই* [*উত্তর সংকেত* ঃ ভূমিকা—মানুষের অগ্রগতির ইতিহাস মূলত সৃষ্টির, শান্তির—যুদ্ধের কারণ—যুদ্ধের ভয়াবহ চেহারা—বিজ্ঞানের অপপ্রয়োগ—শান্তির প্রয়োজন—যুদ্ধবিরোধী প্রতিক্রিয়া—বুদ্ধিজীবীদের ভূমিকা—উপসংহার।]

(গ) *নিরক্ষরতা দূরীকরণ* [*উত্তর সংকেত* ঃ ভূমিকা—নিরক্ষরতা কী ও কেন—ভারতের অবস্থা—সরকারি ব্যবস্থার সীমাবদ্ধতা—নিরক্ষরতা দূরীকরণে যুবসমাজের ভূমিকা—উপসংহার।]

(ঘ) *মুক্ত শিক্ষাব্যবস্থা* [*উত্তর সংকেত* ঃ ভূমিকা—মুক্তশিক্ষা কী—মুক্ত শিক্ষাব্যবস্থার রীতি—প্রথাগত শিক্ষাব্যবস্থার ত্রুটি ও ড্রপ আউট—মুক্ত শিক্ষাব্যবস্থা একটা আন্দোলন—পশ্চিমবঙ্গে মুক্ত শিক্ষাব্যবস্থা কোন্ স্তরে—উপসংহার।]

(ঙ) *ভারতের জাতীয় সংহতি* [*উত্তর সংকেত* ঃ ভূমিকা—প্রাচীন ভারতের সংহতি—জাতীয় সংহতির গুরুত্ব—এদেশের হালফিল চেহারা—বিচ্ছিন্নতাবাদের কারণ—বিচ্ছিন্নতাবাদ প্রতিরোধের উপায়—উপসংহার।]

(চ) *ড্রাগ ঃ সর্বনাশা অভিশাপ* [*উত্তর সংকেত* ঃ ভূমিকা—ড্রাগ কাকে বলে—ড্রাগের উৎসভূমি---বাজার---ড্রাগ-আসক্তদের কীভাবে চেনা যায়—প্রতিরোধের উপায়—উপসংহার।]

(ছ) *বনসৃজন* [*উত্তর সংকেত* ঃ ভূমিকা—প্রাচীন ভারতের বনভূমির মর্যাদা—বিজ্ঞানের আবিষ্কার ও বনভূমি—বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে বনভূমি—ভারতে শিল্পোদ্যোগ ও বনভূমি—রবীন্দ্রনাথ ও বনমহোৎসব—উপসংহার।]

(জ) *আমাদের জীবনে বিজ্ঞান* [*উত্তর সংকেত* ঃ ভূমিকা—মানবসভ্যতা ও বিজ্ঞান—দৈনন্দিন জীবনে বিজ্ঞানের ভূমিকা—জীবনের নানাদিকে বিজ্ঞান—বিজ্ঞান নির্ভরতার প্রতিক্রিয়া—উপসংহার।]

(ঝ) *বিজ্ঞান শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা* [*উত্তর সংকেত* ঃ ভূমিকা—বিজ্ঞানশিক্ষায় আগ্রহের কারণ—বিজ্ঞান শিক্ষার নানা স্তর—বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গি—দেশ ও জাতিগঠনে বিজ্ঞানশিক্ষার গুরুত্ব—উপসংহার।]

(ঞ) *বিজ্ঞান ও কুসংস্কার* [*উত্তর সংকেত* ঃ ভূমিকা—বিজ্ঞান কাকে বলে—কুসংস্কার বলতে কী বোঝায়—সামাজিক ও ব্যক্তিগত কুসংস্কারের কিছু দৃষ্টান্ত—কুসংস্কার দূরীকরণে বিজ্ঞানের ভূমিকা—উপসংহার।]

(ট) *বাংলার কুটিরশিল্প* [*উত্তর সংকেত* ঃ ভূমিকা—কুটিরশিল্প বলতে কী বোঝায়—বাংলার কুটিরশিল্পের পরিচয় ও তার গৌরবময় অতীত—পতনের কারণ---কুটিরশিল্পের গুরুত্ব---পুনরুদ্ধারের চেষ্টা ও সরকারি-বেসরকারি উদ্যোগ—উপসংহার।]

(ঠ) *সাহিত্য পাঠের প্রয়োজনীয়তা* [*উত্তর সংকেত* ঃ ভূমিকা—বিজ্ঞান ও সাহিত্যের সম্পর্ক—সাহিত্য বলতে কী বোঝায়—সাহিত্যের উদ্দেশ্য—সভ্যতার অগ্রগতি ও সাহিত্য—ধ্রুপদী সাহিত্যের অমরত্ব—প্রতিবাদী সাহিত্য—বিশ্বশান্তি প্রসারে সাহিত্যের ভূমিকা—উপসংহার।]

(ড) *শীতের সকাল* [*উত্তর সংকেত* ঃ ভূমিকা—ঋতুচক্রে শীতের তাৎপর্য—শীতের সকালের রূপ—শীতের সকালের আমেজ—শীতের সকাল ঃ শহরে ও গ্রামে—শীতের সকালের দুঃখ—উপসংহার।]